CUL-H0457-3/-P30639

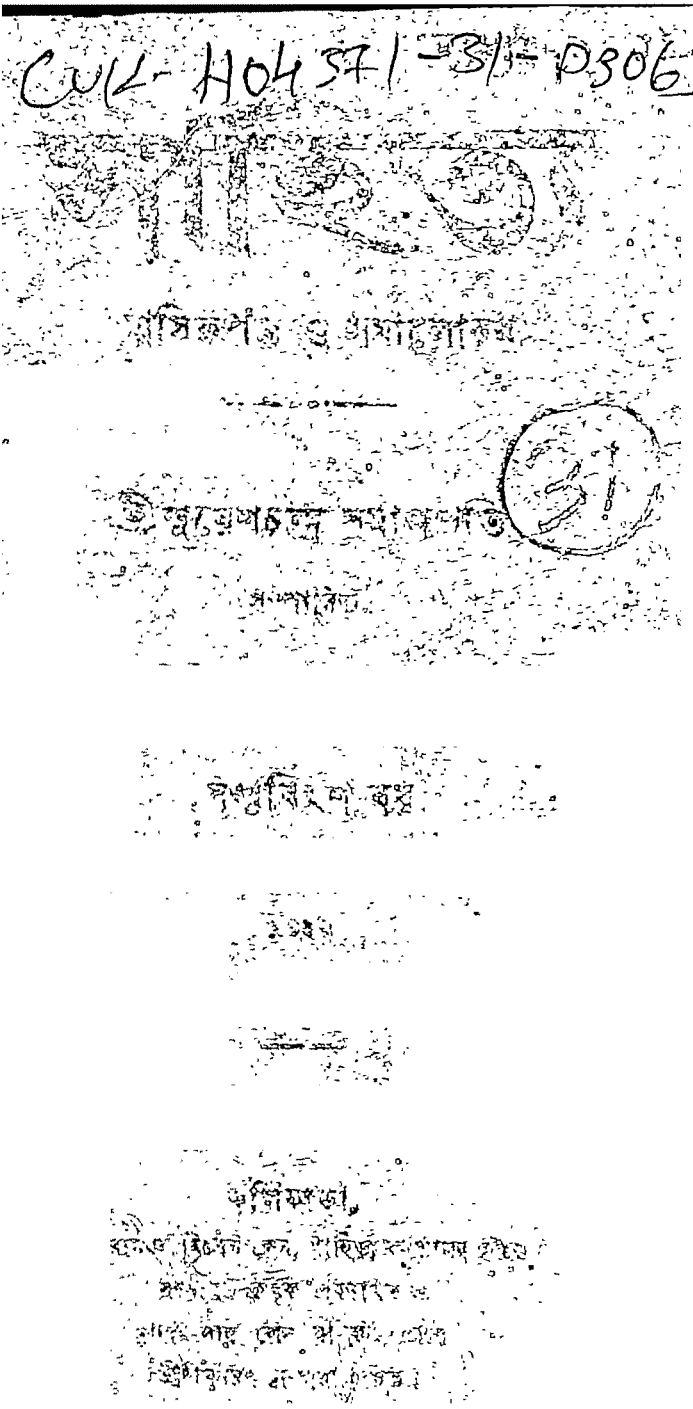

হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

বাঙ্গালার প্রাচীন বৌদ্ধকাব্যের প্রকৃতি ৩১৩

শ্রীযুক্ত

পথাদনীর পুণ্যপুঁথি ১৬৩

নরেন্দ্রলাল সরকার

ঘোড়ার চৌষট্টি রকম রোগ ৫৫১

অরেন্দ্রনাথ মজুমদার

চুরিবাসরী (গল্প) ৫৮১

বেহারা ছানা (পদ্য) ৭৭

উপল (গল্প) ১২

হলি-ডে (গল্প) ৯০৩

অরুণাচল সমাজপতি

পঙ্কু বিদ্যার মন্দির প্রতিষ্ঠা ৫৩৩

শান্তি সাহিত্য সমালোচনা ৭৩,

১৫৮, ২২৫, ৫৫, ৭৩, ৯৪৮, ৫২৮, ৬০৫, ৩১৪, ৭৫৩, ৬২৫

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ৩৩৮

হরিদ্রুম শাস্ত্রী

রঙ্গ প্রসঙ্গ ৬৯৫

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

'আপন' ও 'পর' (গল্প) ৫২৫

আমার আশা (গল্প) ৭৮৭

নাস্তিকের স্বর্গজ্ঞান (গল্প) ৫০২

প্রেম (গল্প) ১২৭

প্যারিটাস মিল ৩৫৭

মাগদার ৬২৫

স্মৃতি-কথা ৫৭৩

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

মাদ্রিপ্রতম কালীয় যন্ত্রসমিতি ৩০৯

মন্ত্রালেখীর অভিশাপ ৩০৯

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
বাক্-সংযম	শ্রীবালীপদ মজুমদার	৯৭
রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে'	শ্রীজালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	২০
বাঙ্ময়ী (কবিতা)	শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষ	৩৮
মহাত্মা ও মহাত্মা	শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায়	৩১
	ঘ	
ঘোমটা (গল্প)	শ্রীমায়াসুন্দর ভট্টাচার্য	৯৩
	চ	
চরকা প্রতিষ্ঠা	শ্রীবিজয় কৃষ্ণ	৩৮
চাষি-সংগঠন		
চরকার অভ্যুদয়	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার	৩৫
শ্রীমন্ত	শ্রীবিনয়কুমার চট্টোপাধ্যায়	৫৩
	ব	
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতি	শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৯৮
বঙ্গের নদী-পরিচয় ও নদী-তত্ত্ব	শ্রীমণীন্দ্রলাল নন্দী ও শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়	৪৩
বঙ্গের কথা-শিল্প	শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	৬৩
	ভ	
ভোরের ফুল	শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষ	৭৯
ভিক্ষু (কবিতা)	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়	৩৭
ভারতীয় সমালোচনা	সম্পাদক	৮৭
ভূমিকম্প	শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	৭৭
	ম	
মনি-মূল্য (গল্প)	শ্রীমহাদেবনাথ মুখোপাধ্যায়	৩৯
মুক্তাগাছা (গল্প)	শ্রীগোপালকুমার রায়	৫৭

লেখক-কবি-গায়ক-চিত্রশিল্পী সূচী।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
সমাজ (কবিতা) ৮০৭

অনুরূপা দেবী
নারীজন্ম (কবিতা) ৬৫৬

অবিনাশ ঘোষ
চিত্রকর (কবিতা) ৮৫৬

অমিয়কৃষ্ণ দেব
[illegible] ১৮৭

আইনি-আকবরী
[illegible] মহাপণ্ডিত
[illegible] ৬৬৭

আবদুল করিম সিদ্দিকী
[illegible] ১৬৭, ৫৬১, ৬৮৮

আবদুল ওয়াহেদ
[illegible] ১২৪

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
[illegible] ৯২

ইন্দুমতী মুখোপাধ্যায়
[illegible] ৬০৪
[illegible] ৩৭১
[illegible] ৫৭৬
[illegible] ১৮৭
[illegible] ১৭৭

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
[illegible] ৬৬৬

কবীন্দ্রনাথের 'পত্রে-বাইরে' ৬৩৭
[illegible] ৮৮৬

গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়
দর্জীচিত্র (কবিতা) ৩১১

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী
পুরাতন ও নূতন (কবিতা) ৫৬

গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ
চন্দ্রদোষ ২৪৬
প্রাচীন শিব পাদন ২৯, ২৫৮
শিবরাত্রি ২৯

চুনীলাল সেন
বৈষ্ণব কবিতা ৩৫৫

জগদীশচন্দ্র বসু
[illegible] জগদীশচন্দ্রের আত্ম
[illegible] ১৩৫

জ্যোতিন্দ্রনাথ রায়
[illegible] ৬৫৯

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়
আমার দুই [illegible] ২১৩
শিকার ৫৪৬

দীনেন্দ্রকুমার রায়
[illegible] ১৬৬

দেবকুমার রায়চৌধুরী
[illegible] ৫৬, ২৬৫

[illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible]

যে-সব রোমান্‌দিগের স্থাপত্যের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, ইহারা শিক্ষিতরুচির, তাহারা অন্য বিষয়ে সমস্ত মনঃপ্রাণ অর্পণ করিয়াছিল বলিয়াই এ বিষয়ে অমনোযোগী হইয়াছিল। শৌর্যবীর্য জাতির বাহু করিয়া থাকে, এ কথাও ভুলিলে চলা যায়। গ্রীসীয়-প্রণোদিত যে চিত্রাভাস চারুকলার দেখি, তাহা কখনই রোমস্থাপত্যদিগের বিকাশের বা ইহার মৌলিকত্ব ও একতানত্বের হেতু হয় নাই। যে-জাতির আদর্শ—সাম্রাজ্যসংস্থান ও সমাজীকরণ, সে জাতি কখন শিল্পচর্চা করিবে? বা তাহার বিশুদ্ধিরক্ষায় মনোনিবেশ করিবে? আত্মাভিমান লোপ করিয়া ইহা তাহার বসনে ভূষিত করিয়া দিয়াছে বলিয়া ইহারা স্বাবলম্বিত্বকে স্বাধীনতারূপে স্থাপিত করে। আমরা এই অংশেই রোমান্‌স্থাপত্যে ইট্রাস্‌কান্ (Etruscan) ও গ্রীক্ প্রভাবের বিভিন্ন সংমিশ্রণ দেখিতে পাই। ইহাতে রোম্যানেরা অপর্যাপ্ত বোধ করিতেন না, কেন না, অট্টালিকাদির সুবিধা হইলেই তাহারা তুষ্ট হইতেন। রোম্যানেরা সমস্ত ইটালী ও ভূমধ্যসাগরের অন্তর্গত দ্বীপগুলি, স্পেন এবং এসিয়ায় সাম্রাজ্যবিস্তার করিয়া আফ্রিকা, সিরিয়া ও অন্যান্যদিগের গ্রীসের অধীনতা স্বীকার করিলেন। এই অধীনতা-স্বীকারে, গুরু ও শিষ্যের মধ্যে যে ভক্তি ও শ্রদ্ধা ব্যক্তিত হয়, তাহার কোথাও পাওয়া যায় না; ইহা হইতে সূচিত হয় যে, এ বিষয়গুলির চর্চা তাহার অট্টালিকার সাধন অপেক্ষা বহুনিম্নস্তরে অবস্থিত।

ইতিহাসের এক হিসাবে কঠিন হইলেও প্রকৃতপক্ষে তত কঠিন নহে, ইহার পারিভাষিক ব্যাপার আয়ত্ত করা সামান্য সময়সাপেক্ষ, কিন্তু ইহার সঙ্গে নিজেই প্রাণপণে আয়ত্ত করিতে হইবে নিবিষ্ট শিক্ষার প্রয়োজন। যে বিদ্যা বিদ্যালয়ে, চতুষ্পাঠীতে, বা স্থপতির শিল্পবিদ্যালয়েও মিলিবে না, তুমি, হেমন্ত, বা খড়ির ভাণ্ডার শেষ করিলেও হয়ত সে বিদ্যার পৌঁছিবে না। মিকেলেঞ্জেলো যাহা সাধিতে সাধিতে সহসা আয়ত্ত করিয়াছিলেন, অতএবস্থ বিশ্বকর্মীর শিল্প, গথিক, অর্ডারাদি, বাস্তুতত্ত্ব, বা ভিট্রুভিয়াস্ (Vitruvius) পাঠ করিলেও "তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে" থাকিবে; গ্রীক্ বা রোম্যান্‌দিগের নিজস্ব "অর্ডার"-গুলি (Orders) স্বতন্ত্রভাবে, বা তাহার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করিয়া বিশ্ব-শিল্প হইতে জীবন্ত করিয়া রেখাচিত্রে, মডেলে, প্রস্তরে উপস্থিত ও অধিষ্ঠিত করিয়া আলোচনা করিলে স্থাপত্যের প্রাণের সন্ধান পাইবে না। ইহার আইন-কানুন, বিধি-নিষেধ বুঝা যাইবে সত্য, কিন্তু ইহার বিশেষত্ব কোথায়, তাহা কিছুই বুঝা যাইবে না। এই বিধি-ব্যবস্থার দিকে অবশ্য হইবার তু

দিগ্‌দুয়ারপণ্ডের মতও আনিই হইয়াছিল, — যৌনে যে ধর্ম আছে, তাহা নহে কিন্তু, এ হিসাবে সমাজের দেহেই বিশেষ শক্তি গ্রন্থ হইয়াছে।

পথীকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিলে নিশ্চয় দিয়া আপনার জন্মগত স্বাধীনতা নষ্ট হইয়া যায় বটে, কিন্তু পক্ষীর যে কলনদীতে দৈব কারুকার্য ও উপাদিত হয়, তাহার সহিত তাহার তুলনা হয় কি? যতই রাজপুরুষ বুঝি বলুক না, বিধি-ছন্দের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। কৃত্রিম নরনারীর এই ইউরোপে সাইনক্যুনের এই নাম পাল্টি করিবার জন্য বড় চেষ্টা হইয়া গিয়াছে। বাস্তবিক যে মানুষের জীবনের চরম উদ্দেশ্য—সংস্কারবর্জিত হওয়া, সে কি প্রকারে Convention-এর আদেশ নতমস্তকে বহন করিবে? তাহার চিত্ত যে বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে। এই বিদ্রোহের ফলে ইউরোপে যা পাইতেছে এক নূতন ধারার প্রবাহ বহিতে থাকে।—এই নূতন প্রবাহে সমস্ত ইউরোপ ভাসিয়াছিল। সমাজে যেমনটি হয়, এ ক্ষেত্রেও তাহা হইয়াছিল। সমাজ মূলে যে প্রেমের আলোক পুরাতন করিতে পারে না। এই পেচক-ভাব সমাজে সংক্রামক প্রয়োজনীয় হইলেও, এক হিসাবে বিশেষ অনিষ্টের হাত করে। পূর্বোক্ত আপুতার নূতন ধারা প্রথম প্রথম কৃত্রিমতার হইলেও, পরে ইহার ভিতরে অনেক ঐশ্বরিক ভাসিয়া গিয়াছিল। সমাজ বিদ্রূপ করিয়া ইহার নাম দিলেন—"গথিক ষ্টাইল" (Gothic style) বা বর্বর রীতি।

বিধি-ব্যবস্থা-নিয়ন্ত্রিত ভারতবর্ষেও এ বিদ্রোহের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে দক্ষিণ-ভারতের মহীশূর রাজ্যে হৈসল-বংশীয় বিষ্ণুবর্দ্ধন রাজার সময়ে একনাচার্য এই বিদ্রোহের সূচনা করেন। ইহার ফলে মন্দির বিমানের ত্রিরিয়া নেল, ত্রিতল, বা চতুরস্রাকার বিমানের পতন ভারকারের পরিণত হইল।

এই নব আকৃতিতে ছায়ালোকের এমন সুন্দর মিলন হইল যে, মনস্তাত্ত্বিক তাহার মহিমায় বিশেষ প্রীত হইয়া এই নব-রীতির প্রবর্তন করিলেন। একনাচার্য শুধু আকৃতির পরিবর্তন করিয়াই তৃপ্ত হইলেন না; তিনি গৃহভিত্তিতে নব পদ্ধতিতে আলোক সঞ্চারিত সূচক বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন; তজ্জন্যই এ মন্দির শ্রেষ্ঠ রাজা ভাস্কর্যের উদ্ভাবনা করিলেন। বিদ্রোহী একনাচার্য অমর হইয়া গেলেন। মহীশূর-ভ্রমণকালে দেখিয়াছি যে, আজ সাত বৎসর পরেও স্থানীয় লোকে ভক্তি ভরে একটি মূর্তি দেখাইয়া বলে,—ইহা রাজশিল্পী একনাচার্যের মূর্তি।

১। এই সুন্দর মহীশূরের বেলুড়ের প্রস্তরালয় দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে।

[illegible] পুনরাবৃত্তি দেখি [illegible] হিসেবে। ইহা পূর্বোক্ত [illegible] চরিত্র-পাঁচ শত বৎসর পূর্ববর্তী।

যাঁহারা জৈবিক পদার্থের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয় অবগত আছেন যে, ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও ইহারা পরস্পরসাপেক্ষ; এই পরস্পরসাপেক্ষতার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে, পদার্থটির আত্মত্বের সম্ভাবনাও [illegible]। [illegible] সম্বন্ধেও এ নিয়ম প্রযোজ্য। শিল্প-রচনা করিবার সময় দেখিতে হইবে যে, ব্যক্তিভাবে ইহার মূল্য কতটুকু; কেবল বিভক্ত ভাবে দেখিলে চলিবে না; ইহাও দেখিতে হইবে যে, সমষ্টির [illegible] ইহার কি সম্বন্ধ, এবং সমষ্টি হিসাবে ইহার সার্থকতা কতটুকু। এই দুই ও সমষ্টি ভাবে শিল্পের না দেখিলে ইহা নিতান্ত বিসদৃশ, অসংলগ্ন ও সৌন্দর্য্যবিহীন হইয়া পড়ে। সৌন্দর্য্যের মূল তত্ত্ব এই ব্যষ্টি-সমষ্টির মধ্যে নিহিত। বাস্তবিক, আমরা দৃষ্টির সীমা [illegible] একটুবিস্তৃত করিলে দেখি যে এই বিশ্বপ্রপঞ্চে শুদ্ধ স্বতন্ত্রতার কোনও মূল্য নাই। বস্তু বা সমষ্টির অংশীভূত ভাবে যে স্বতন্ত্রতা দেখা যায়, কেবল তাহারই একমাত্র সার্থকতা। এই মূল সত্যটি শুধু যে জৈবিক জগতেই প্রযোজ্য, তাহা নহে; নৈতিক জগতেও ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত।

একটি গৃহ নির্মাণ করিতে গেলে যদি বায়ু ও আলোক চলাচলের বিশেষ বন্দোবস্ত না করিয়া "ভেন্টিলেটর" বা "আলোকরন্ধ্র" যদি ভিত্তি খোদিত না হয়, কিংবা গ্রামেদাবাদের সিদ্ধ সায়েদের মসজিদ-গাত্রস্থ সৌন্দর্য্যের [illegible] Tracery window দ্বারা বায়ু ও আলোক চলাচলের বন্দোবস্ত করা যায়, তাহা হইলে শিল্প-দেবতা ও অসন্তুষ্ট হইবেনই, গৃহটির সার্থকতাও লুপ্ত হইবে।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্স-দেশে সাধারণ রুচির সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিলে আমরা স্থাপত্য-অলঙ্কারের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই। তখন বাহিরের চাকচিক্য ভিতরের সাধ্য, সুবিধা, আরাম প্রভৃতি [illegible] ধূলে [illegible] হইয়াছিল। সৌন্দর্য্য বাহিরের সৌন্দর্য্য ও চাকচিক্য দেখিয়া ভিতরের বাসগৃহগুলির দুর্দ্দশা দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়।

স্থাপত্যের অঙ্গগুলি কি, ইহা বলিয়া বিশেষ ফললাভ আছে। এরূপ সংজ্ঞাদান যে ইহার পক্ষীভূত তাহা অনেকে স্বীকার করিতে না। তাঁহাদের মতে, প্রত্যেক [illegible] নিরুপণ-চেষ্টা কি দেখাইতে পারিলেই যথেষ্ট হইল। তাহারা বলেন, [illegible] স্থাপত্য-ব্যবস্থায় অবহিত হইবে, সেই বিষয়ে [illegible] নয়।

[illegible] উচিত। এ যদি সত্যকার আদর্শের অভিব্যক্তি কিছুই নাই। কিন্তু তাহা [illegible] যাপত্য-বিদ্যের চরম লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করিব না। [illegible] পূর্বে প্রাচীন নির্মাণ-কৌশলীরা যে-সকল নিয়ম নির্ধারিত করিয়াছিলেন, [illegible] আজ এখন বিলুপ্ত হইলেও সেগুলির [illegible] তাঁহাদের কীর্তির [illegible] বিদ্যেছে। কিন্তু ইহাদের শিল্প কোথায়? শুধু হাসিয়া বা নিশ্চল-কৌতূহল দেখিলে চলিবে না। আর একটি জিনিস আছে, যাহা ইহার প্রতিষ্ঠাকে [illegible] করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তাহাকে যদি [illegible] আধ্যাত্মিকভাবে গ্রহণীয় হয়। ইহার উত্তরে পুরাতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, [illegible] সৌধের অংশগুলির সামঞ্জস্য-রক্ষা বা যথাযথভাবে বিন্যাস-সম্পাদন করিলেই স্থাপত্যের উদ্দেশ্য বা ক্রিয়া সিদ্ধ হয়। একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, ইহা আংশিক।

যদি প্রশ্ন করা যায় যে, মানবের লক্ষ্য কি, তাহা হইলে, এমন এক বিষয়ের নাম করিতে হইবে, যাহাতে ইহার বিশেষত্ব, এবং যাহা মানবজীবনের [illegible] মধ্যে মিলিবে না। তেমনই, স্থাপত্যের লক্ষ্য কি বলিলে, এমন একটি বস্তুর নির্দেশ করিতে হইবে, যাহা ইহা ভিন্ন অন্য বিষয়ের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। [illegible] বা অংশগুলির সমন্বিতরূপ বা ঢঙের সামঞ্জস্যই যদি স্থাপত্যের চরম লক্ষ্য হইল, তাহা হইলে সঙ্গীত, চিত্র, কাব্য প্রভৃতি হইতে ইহার বিশেষত্ব কোথায়? রস্কিন্ (Ruskin) যথার্থই বলিয়াছেন যে, "Proportion is a principle [illegible] of architecture but of existence." বাস্তবিক, সমস্ত জগতেই আমরা সামঞ্জস্য বা শৃঙ্খলার পরিচয় পাই। স্থাপত্যের যদি ইহাই একমাত্র লক্ষ্য হইল, তাহা হইলে, ইহার উদ্দেশ্য অতিসহজ হইয়া পড়ে, এবং ইহাতে কোনও বিশেষত্ব থাকে না। যদি কোণার্কের সূর্যমন্দিরের, বা তাহার [illegible] পরস্থ শিখরাজ বিমানের ভিত্তিগাত্রস্থ বহির্নিষ্ক্রান্তাংশগুলি (projection) নিরূপণ করা যায়, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, ইহাদের স্থাপন-বিন্যাসে কোথাও [illegible] সামঞ্জস্য রহিয়াছে; [illegible] হয়শালেশ্বরের মন্দিরের ভাস্কর্যচিত্রিত কোণগুলিতে যেমন সঙ্গতি দৃষ্ট হয়। তাহা বলিয়া এই সকল মন্দিরের ভাস্কর্য-বিন্যাসের চরম সার্থকতা কি পরোক্ষে আধিভৌতিক নাম-সাদৃশ্যবিধানের মধ্যে নিহিত? ইহা যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। আমি তাঁহাদিগকে [illegible] মন্দিরসমূহের ভাস্কর্যগুলির দিকে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে বলি। তাঁহারা যদি উহাদের [illegible] বা panel, বা niche, বা তাহাদের [illegible] চাল-

গুলি, যা ভিত্তিগাত্রস্থ সূর্য্য দেবের রথচক্রের কারুকার্য্য দেখেন, তাহা হইলে বুঝিবেন যে, সূর্য্যমন্দিরের বিশেষত্ব কোথায়। তেমনই যদি হালেবিড্ মন্দিরের অপূর্ব্ব Frieze, কর্ণিস্ ও ভস্কর্য্য মূর্ত্তিগুলি দেখেন, তাহা হইলে বুঝিবেন, স্থাপত্যের বিশেষত্ব ও সার্থকতা কোথায়।

এ স্থলে একটি বিষয়ের উল্লেখ আবশ্যক। আমাদের ভারতবর্ষের স্থপতিরা এই অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে গিয়া ইহার নির্ম্মাণকৌশল ও অবয়বগুলির সুচারু সন্নিবেশসাধনে ততটা মনোযোগী ছিলেন না। এই কারণে আমরা বিমানগাত্রের প্রত্যেক অংশে ভাস্কর্য্যের বাহুল্য দেখি। এই উপলক্ষ্য করিয়াই Fergusoh ইহাকে over-decorated ugliness বলিয়া শ্লেষ করিয়াছেন। কিন্তু এই শ্লেষ করিবার পূর্ব্বে একটি বিষয় ভাবিয়া দেখা উচিত। এই যে ভাস্কর্য্য-প্রাচুর্য্য, ইহা দেব-চরণে পুষ্পাঞ্জলি-রূপ নহে কি? যে দেশে দেবতার শৃঙ্গার-বেশের ব্যবস্থা আছে, যেখানে দেবতাকে পুষ্পে, অলঙ্কারে, অম্বরাগে ও বেশভূষায় আপাদমস্তক শোভিত করা হয়, সে দেশের বিমানগাত্রের প্রত্যেক অংশে যে ভাস্কর্য্যের প্রাচুর্য্য থাকিবে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি? ভক্তের হৃদয়ে আনন্দ, বিস্ময় ও ভক্তিরসের উদ্ভাবনা যাহাতে হয়, তাহাও আর এক উদ্দেশ্য। এমন কথা যেন কেহ মনে না করেন যে, এই ভাস্কর্য্য-বিন্যাসের কোনও নিয়ম নাই; যেখানে সেখানে যেমন তেমন ভাবে কারুকার্য্য করিলেই হইল। একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে যে, ইহার মধ্যে একটি রীতি, শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য ও সংযম বর্ত্তমান।

এই অলঙ্কার-প্রাচুর্য্যের কথা বলিতে গিয়া একটি বিষয় মনে আসিতেছে। ইউরোপের মধ্যযুগের গথিক রীতির প্রথম স্তরের অনুশীলন করিলেও আমরা ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই না। বেয়ো, রাইম্স্, রুয়ে, প্যারি (নতরদেম্) প্রভৃতির ক্যাথিড্রেলগুলি নিরীক্ষণ করিলে আমরা দেখি যে, যে পর্য্যন্ত চক্ষু যায়, কারুকার্য্যের জটিলতা ও প্রাচুর্য্য সেই পর্য্যন্ত; তাহার উর্দ্ধে ইহার জটিলতার হ্রাস করিয়া কারুকার্য্যকে নীরস ও সহজসাধ্য করা হইয়াছে। ভক্তের হৃদয়ে আনন্দ ও বিস্ময়ের উদ্রেক করা ভিন্ন ইহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে।

ব্রংফলন স্থাপত্যের অঙ্গীভূত কি না, এ বিষয়ে বিশেষ মতভেদ আছে। রঙ দ্বারা মৌখলির যে সৌন্দর্য্যের বিকাশ ও হ্রাস হইতে পারে, সে বিষয় বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে না। মনে কর, কোনও বাটীর কর্ণিস্ হরিদ্রা-বর্ণে রঞ্জিত করা হইল, এবং ভিত্তিগাত্র সুধাধবল করা হইল; পার্শ্ববর্ত্তী আর

একখানি বাটীর ভিতরগুলি হরিদ্রা বর্ণে রঞ্জিত করিয়া ঝুলি, অন্যটির করা হইল। দুইখানি বাটী একই পরিপার্শ্বিক দৃশ্যের মধ্যে পাশাপাশি অবস্থিত থাকিলেও, দর্শকের মনের উপর একই প্রকার প্রভাব বিস্তার করিবে না। প্রথমখানি এমনই বিসদৃশ বোধ হইবে যে, চক্ষু কখনই ইহার দিকে ফিরিতে চাহিবে না। চক্ষে যেন একপ্রকার যন্ত্রণা উপস্থিত হইবে। আর একটি উদাহরণ দিতেছি। এক ঘর হইতে আর এক ঘরে যাইবার দ্বার হরিদ্র-বর্ণে রঞ্জিত করা হইল, এবং দ্বারের বহির্মুখী জানালাগুলি শ্বেত, পীত, বা লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইল; আর একখানি বাটীর বহির্মুখী জানালাগুলি হরিদ্র বর্ণে রঞ্জিত করিয়া মধ্যের দ্বারগুলি পীত বর্ণে রঞ্জিত করা হইল। প্রথমোক্ত অট্টালিকার দিকে চাহিলে মনে নিশ্চয়ই বিদ্রোহের সূচনা হইবে, দ্বিতীয়োক্তটিতে শান্ত ও সংযত ভাবের উদ্রেক হইবে। এই কারণেই বহির্দেশে গৃহভিত্তির উপর উজ্জ্বল পীতবর্ণ অপেক্ষা শ্বেত পীতের মিশ্রণ অধিকতর মনোজ্ঞ।

পূর্ব্বোক্ত ধারণাটির বিশেষ স্থাপত্যের আলোচনা করিলে দেখা যায়, ইহা প্রাচীন যুগ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বর্ণকে স্থাপত্যের অঙ্গবিশেষ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। প্রাচীন মিশর, আসীরীয়া, কল্‌ডিয়া প্রভৃতি দেশে এবং ফলাইরা সৌধশিল্পের উৎকর্ষ-প্রকাশের চেষ্টা দেখা যায়। গ্রীক্ ও রোমানুদিগের মধ্যেও এ প্রথা ছিল; এথেন্স ও ডেল্‌ফিতে যে সকল প্রাচীন গৃহের ধ্বংসাবশেষ ভূগর্ভ হইতে বাহির করা হইয়াছে, তাহাতে এখনও কতদিনের পুরাতন বর্ণের উজ্জ্বলতা দৃষ্ট হয়।

ভারতবর্ষের স্থাপত্যের আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, অনেক স্থলে মন্দিরাদির সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি বিষয়ে বর্ণসম্পদের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে। উড়িষ্যার মন্দিরগুলির মধ্যে অনেকের গাত্র রক্তবর্ণে রঞ্জিত দেখা যায়। দক্ষিণ-ভারতে ভ্রমণকালে হিন্দু ও জৈন স্থাপত্যের অনুশীলন করিবার সময় নানা বর্ণের বিচিত্র সমাবেশ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। শুক্রনীতির চতুর্থ অধ্যায়ে চিত্রিত প্রাসাদের উল্লেখ পাইয়াছি। বরাহমিহির-রচিত বৃহৎ-সংহিতায় বজ্রলেপ নামক সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে এ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দৃষ্ট হয়।

অনেকের ধারণা যে, কল্পনাপ্রবণতাই বুঝি স্থাপত্যের উৎকর্ষবিধানের একমাত্র সহায়ক। অনুসন্ধিৎসু হইলে কি পাওয়া যায় না, কিন্তু

তাহা বলিয়া উহাকে একমাত্র পরিচালনা করিতে বিশেষ বিপদে পড়িতে হয়। কিরূপ উপকরণ মিলিলে, এবং কি উদ্দেশ্যে কোন্ স্থানে গৃহের নির্ম্মাণ করিতে হইবে, তাহা বিশদরূপে ভাবিয়া অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। কোন সৌধের শুদ্ধচিত্র অঙ্কিত করিলে বিশেষ সার্থকতা নাই। এ সৌধ মানস ও আদর্শরাজ্যে হয় ত স্বপ্নসৌধের রচনা করিতে পারে, কিন্তু বাস্তবরাজ্যে ইহার স্থান কোথায়? বাস করিবার বাটী যেরূপ হইবে, কোনও সভাসমিতির জন্য সাধারণ ব্যবহার্য্য গৃহ সেরূপ কখনই হইবে না। আবার মূলার্জ্জনার স্থান যেরূপ ভাবে নির্ম্মাণ করিতে হইবে, সভাগৃহের সেইরূপ নির্ম্মাণ করিলে চলিবে না; কিন্তু উভয়েই সাধারণের জন্য কল্পিত। মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রে দেখা, কাল ও পাত্র হিসাবে যেমন মানবীয় বিধিব্যবস্থার প্রচলন আছে, সেইরূপ দেশ-কাল-পাত্র-বিচার স্থাপত্যকে বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্ত্তিত করে। আমি কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি। আমাদের কলিকাতাস্থ নাট্যশালাগুলির আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। স্থূলতঃ দেখিতে গেলে কলিকাতা, লণ্ডন, বা প্রাচীন এথেন্স, বা ভেনিস নাট্যশালাগুলির মধ্যে একই সুসমঞ্জস ভাবে কার্য্য করে; কারণ, ইহাদের প্রত্যেক থিয়েটারেই দর্শকদিগের দেখিবার ও শুনিবার জন্য উপযোগী স্থান ও আসনের ব্যবস্থা, নটী বা নটীদিগের সজ্জাগৃহের বন্দোবস্ত, অভিনয় দেখিবার জন্য উচ্চ মঞ্চ বা বেদীর নির্ম্মাণ, রাজন্ প্রভৃতির জন্য স্বতন্ত্র স্থানের ব্যবস্থা, ইত্যাদি। যদিও পূর্ব্বোক্ত মৌলিক ব্যবস্থাগুলি সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি উহাদের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ রহিয়াছে। প্রাচীন এথেন্সের নাট্যশালা ও আধুনিক নাট্যশালার মধ্যে যে প্রভেদ লক্ষিত হয়, তাহার কারণ চিন্তা করিলে আমরা দেখি যে, প্রাচীন কালে দিবসে অভিনয় হইত, এবং দৃশ্যপট দিবসেই প্রদর্শিত হইত, সুতরাং দিবসে দৃশ্যপট দেখিবার জন্য যে বন্দোবস্ত হওয়া উচিত, রাত্রে সে বন্দোবস্ত কখনই উপযোগী হইতে পারে না। এই জন্যই স্থাপত্যেরও বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়।

অতীত ও বর্ত্তমান আলোর ব্যবহার যে স্থাপত্যের উপর বিশেষ কার্য্যকরী, তাহা এই নাট্যশালা হইতেই বেশ বুঝা যাইবে। রোমানদিগের নাট্যশালার কল্পনা গ্রীকদিগের নিকট হইতে গৃহীত হইলেও, উভয়ের মধ্যে বেশ পার্থক্য লক্ষিত হয়। যেখানে গ্রীকদিগের গায়কেরা থাকিত, সেখানে রোমানদিগের সেজ টাঙ্গান হইতেছে। এই কারণে রোমানদিগের নাট্যশালা গ্রীকদিগের স্থায় সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত থাকিলে, রোদ আকাশ সমাচ্ছন্ন করিয়া দিবে।

হইত; দর্শকদিগের বসিবার স্থানগুলির মধ্যেও পার্থক্য দৃষ্ট হয়। স্বাস্থ্য হিসাবে যাহাই হউক, কলিকাতার থিয়েটারগুলিতে আমাদের জাতীয় আচার ব্যবহারের উপযোগী করিবার চেষ্টা লক্ষিত হয়।

পঞ্চভূতাত্মক দেহের আশ্রয়ে যেমন ভাব বা রসের অভিব্যক্তি, তেমনই প্রস্তর, কাষ্ঠ প্রভৃতি উপকরণের সাহায্যেই স্থাপত্যের বিকাশ; এই দেহের আশ্রয়েই যেমন শান্ত, রৌদ্র, বীভৎস প্রভৃতি নানারসের প্রকাশ, তেমনই উপাদানের বা উপকরণের বিচিত্র সন্নিবেশ বা বিন্যাসেই স্থাপত্যের বিশিষ্টতা। মার্কিণদেশের কোনও মন্দিরের গোপুরম্ বা দ্বারপ্রাসাদ দর্শন করিলে তাহার অঙ্গীভূত প্রস্তরসমূহের নিটোল কাঠিন্য বা প্রস্তরাত্মকত্ব দর্শকের চিত্তে ঔদ্ধত্যের সহিত যেন একটা ত্রাস বা আতঙ্কের সঞ্চার করে। দেবায়তন হইলেও, দর্শকের চিত্তে একটা জড়ত্বের প্রবাহ অবিভ্রান্তগতিতে বহিতে থাকে। ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু মহিমান্বিত তাজের প্রতি দৃষ্টি প্রসারিত করিলে সে দৃষ্টি ফিরিতে চাহে না। হৃদয়ে অনন্ত ভাবনার দ্বার খুলিয়া যায়। এখানে হড়পিণ্ডের মধ্যেও বাহিরের অমূর্ত্ত চৈতন্যের একটা তরঙ্গ বহিতে থাকে; ইহাও উপলব্ধি করিয়াছি।

স্থাপত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা বিষয়ে উপকরণের যথেষ্ট প্রভাব। ইহাও আবার বাহ্যের কথা; ঐতিহাসিকের চক্ষে দেখিলেও উপকরণের প্রভাবকে নগণ্য মনে করিলে চলিবে না। পূর্ব্বে বর্ত্তমানের কথাটাই বলিয়া রাখা ভাল; তাহার পর ভাবীকের কথা কহিব। বর্ত্তমানকে লৌহের যুগ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। আমাদের বাসভবনগুলিকে ইষ্টকাবৃত লৌহের খাঁচা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। এই খাঁচাগুলিতে Institute of British Architect-এর ছাপ থাকিলেও, আমাদের চিত্তে ভাবনার দ্বার খুলিয়া দেয় না; এই সকল একান্ত উন্নতশীর্ষ সৌধগুলি বহিরাঙ্গনে প্রসারের সুবিধা না দেখিয়া উচ্চে অভ্রস্পর্শী হইয়া তালপত্রের সিপাহীর ন্যায় আমাদের নগরীর প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত। এখনকার সৌধগুলি যদি ভবিষ্যদ্বংশীয়ের নিকট আদর্শ বলিয়া গৃহীত হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতের চিন্তা বড় আশাপ্রদ নহে।

অতীতের প্রতি দৃষ্টি প্রসারিত করিলে আমরা স্থাপত্যের উপর উপকরণের বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করি। প্রাচীন মিশরদেশীয় স্থাপত্যের অনুশীলন করিলে আমরা প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাসাদে অধিকতর প্রাচীন কালের ব্যবহৃত মৃত্তিকা ও বংশাদির নিদর্শন বেশ সুন্দররূপে উপলব্ধি করিতে পারি। মিশরদেশীয়

[illegible] ভাস্কর্য্য [illegible] ও [illegible] ভাস্কর্য্য [illegible] হইয়াছিল। [illegible] গথিক কৌশল বহুপরবর্ত্তী [illegible] ও [illegible] [illegible] বর্ত্তমান দেখি। [illegible] ও [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] ও ইউরোপ প্রভাব [illegible] প্রভাবিত হয়। [illegible] [illegible] [illegible] পূর্ব্বতন যুগে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (Byzantine) যুগের কাচ ও [illegible] (Mosaic) [illegible] [illegible]

শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

ভাঙ্গন।

১

বিনোদবাবু ওকালতী পাশ করিয়া, সকলেই মনে করিয়াছিল যে, তিনি অল্পদিন চাকাতেই 'প্র্যাকটিস্' করিবেন, কিন্তু হঠাৎ কলিকাতা পুলিস কোর্টে ভাল হওয়াতে আত্মীয় স্বজনের মুখ শুকাইয়া গেল। একটী বিশেষ কারণ এই যে, বিনোদের স্ত্রী (চন্দ্রমুখী) বাঙ্গলাদেশের মেয়ে। কেহ কেহ বলিত যে, তাহাকে বিবাহ করিয়া বিনোদবাবু পড়িয়া করেন নাই। প্রমাণস্বরূপ, চারি বৎসর হইল, বিনোদ বিলাত হইয়াছে, তাহার মধ্যে দুইবারমাত্র তিনি দেশে আসিয়াছিলেন, এবং যে কয়দিন ছিলেন, তাহার মধ্যে দুই ঘণ্টার বেশী স্ত্রীর সহিত কথোপকথন করেন নাই। অবশ্য কথোপকথন না করিবার একটী প্রধান কারণ এই যে, বিনোদ বাবু ইংলিশিড্ ঘোর, ভাষাজ্ঞানবিহীন, এবং কলিকাতায় থাকিয়া তাহার ভাষা খুব 'রোবস্ত' হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও কথোপকথনের বদলে একটু আদর, কিম্বা একটী চুম্বন, কিম্বা আন্তরিক একবার মনের কথা বলিতে পারিলে অনেকের মনোদুঃখ দূর হইয়া যাইত। এটা খুব স্বাভাবিক কারণ। চন্দ্রমুখী খুব সুন্দরী, এবং বিশ্বসংসারের সৌন্দর্য্যরাশিও পুঞ্জীভূত মায়া সুন্দরী হইয়া [illegible] একটু [illegible] করিয়া থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে তাহার [illegible] বিশেষ [illegible] কেহ নাই। চন্দ্রমুখীকে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে সে চুপ্‌চাপ থাকিত, কাহাকে ভালবাসেন না। চন্দ্রমুখী নিজেকে ভালবাসিতে জানে, তাই হাসে কম, কাঁদে বেশী। স্ত্রীলোকের একটা কোমলতা [illegible] নাই। তাহাদের বাহ্য পদার্থের পরে কোমলতা থাকে। যেমন

তাহার বড় ভাই খুসমাষ্টারী করিত। আর একটী কারণ, তাহাদের পল্লীর তীরের যাটী 'ভাঙ্গনে' ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, এবং যাহা কিছু জমী ছিল, তাহারও সঙ্গে তাহাও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং চন্দ্রমুখীর শ্বশুর নলিনীকান্ত বড় গরীব। চন্দ্রমুখী কেবল সেই 'ভাঙ্গনে'র কথা ভাবিত, কাঁদিত, এবং ভাইকে মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিত। চন্দ্রমুখী অনেকটা সেকালের মেয়েদের মত। কিন্তু তাহার স্বভাবের একটা অন্তর্দৃষ্টি ছিল। তাহার বলে চন্দ্রমুখী বুঝিতে পারিত যে, সংসারটায় সমাজও ভাঙ্গিতেছিল। মধ্যে মধ্যে তাহার ভয় হইত যে, তাহার সঙ্গে তাহার অদৃষ্টও ভাঙ্গিবে। তখন সে কি মনে করিয়া একবার হাসিত। যে স্নেহটুকু সে পিত্রালয়ে পাইয়াছিল, তাহার এক কণাও চন্দ্রমুখী শ্বশুরালয়ে দেখিতে পাইত না। দেশের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে, এবং স্বামীর সঙ্গে তাহার যেটুকু বিশেষ বন্ধন, সে তাহার কূল কিনারা লক্ষ্য করিতে না পারিয়া মনে মনে মধ্যে মধ্যে শিহরিয়া উঠিত। সকলে বলিত যে, চন্দ্রমুখী বুদ্ধিমতী হইলেও তাহার একটু পাগলের ছিট ছিল।

বিনোদ বাবুর বৃদ্ধ পিতা ঢাকায় এক জন প্রসিদ্ধ মহাজন। তিনি একমাত্র পুত্র এবং পুত্রবধূ যাহাতে সুখে থাকে, তাহার তার গৃহিণীর উপর দিয়া দোকানে দিনরাত্রি কাটাইতেন। গৃহিণী সেই ভার ভগবানের উপর ন্যস্ত করিয়া হরিনামের মালা জপ করিতেন। কিন্তু বিনোদ কলিকাতায় ওকালতী আরম্ভ করিলে তাহার একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল। কলিকাতায় ছেলেপুলে বেয়াড়া হইয়া যায়। তাহারা ব্রাহ্মণ-বংশ, কুলীন ও নামজাদা হিন্দু। যদি বিনোদ সাহেব হইয়া যায়, কিংবা কোনও প্রকারে জাতিতে জলাঞ্জলি দেয়, কিংবা আর একটা জাতির কন্যাকে বিবাহ করিয়া ফেলে, তবে কুলে একটা ভয়ানক কলঙ্ক ঘটিবে। এই ভয় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হওয়াতে তিনি কর্ত্রীকে দোকান হইতে বাটীতে আনয়ন করিয়া অনেক বুঝাইলেন, এবং হরিনামের মালা শিকায় তুলিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা অঙ্ক পরিত্যাগ করিলেন। কর্ত্তা শেষজীবনে এই একটা ঘোর অন্যায় দেখিয়া নরহরি উকীলকে ডাকাইলেন, এবং তাঁহার দ্বারা পুত্রকে সুদীর্ঘ পত্র লিখাইলেন। তাহার 'মজমুন' এই যে, ভূমণ্ডলে জীবজন্তু সকলেই তাহাদের জাতিগত বিশিষ্টতা রাখে। কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, ভল্লুক, বানর, সকলেই এই নিয়ম পালন করে। জাতি রাখিয়াও সমাজ সুখে ও স্বাধীনভাবে, স্ত্রী ও পুরুষ লইয়া, সৃষ্টির সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারে। ঋষিরা জ্ঞানী হইবার জাতি ভাঙ্গিবার পরামর্শ দেন নাই, ইহাতে ঈশ্বরের অভিপ্রায় বুঝা যায়। এ সব যুক্তি

ব্যক্তিগত চরিত্র যে খুব উচ্চস্থানে আরোহণ করিয়াছিল, তাহা বিনোদ বাবু পত্র দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন। এই চরিত্রবলটুকু বিনোদবাবুর যে থাকে নাই, তাহাও নহে। তবে সেটুকু তখনও প্রচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু একটা অভ্যাস পিতার নিকট হইতে বিনোদ বাবু সম্পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহা আহারের চেষ্টা। সকালে এক বাটী দুধ, তাহার সঙ্গে একখানি পাঁপর, এবং বেলা এগারটার সময় অন্ততঃ চব্বিশ রকম ব্যঞ্জনে সুশোভিত প্রকাণ্ড একখানা ভাত, এবং তাহার সহিত পায়স, আবার বেলা চারিটার সময় অন্ততঃ চব্বিশখানা লুচী ও তাহার সঙ্গে পুষ্টিকর আলুর দম ও মিষ্টান্ন, এবং সন্ধ্যার সময় দুই তিন পেয়ালা চা ও একমুঠা ছোলা ভাজা, এবং রাত্রি দশটার সময় পোলাও কালিয়া প্রভৃতি, এবং নিদ্রাকালেও স্বপ্নে নানাবিধ উপাদেয় দ্রব্য চর্ব্বণ কিংবা লেহন, ইহা বিনোদ বাবুর বাল্যকাল হইতে অভ্যস্ত। অথচ তিনি বলিতেন যে, ভারতবর্ষের দুর্দ্দশা দেখিয়া আহার এক প্রকার ছাড়িয়া দিয়াছেন। বিনোদবাবু যে পদার্থগুলি আহার নিজে ভালবাসিতেন, তাহা নহে, দশ জন বন্ধু বান্ধবকেও ডাকিয়া জোর করিয়া খাওয়াইতেন, এবং কেহ এই প্রকার ভোজন করিয়া অসুস্থ হইলে, তাহাকে এবং তাহার স্ত্রীকে আশীর্ব্বাদ করিতেন, এবং পরদিবসের সময় একথালা জলখাবার ও এক যোড়া ফরাসডাঙ্গার ধুতী এবং এক যোড়া বারাণসী শাটী পাঠাইয়া দিতেন। কাজেই বিনোদবাবুর বন্ধু বান্ধবের অভাব ছিল না।

বিনোদবাবুর স্বীয় স্ত্রী চন্দ্রমুখীর উপর আক্রোশের প্রধান কারণ এই যে, সে স্থূলা, এবং খাইতে পারে না, কাজেই বায়ুগ্রস্তা। বায়ুগ্রস্ত লোককে বিনোদ বাবু একটু ঘৃণা করিতেন, এবং দেখিলে শিহরিয়া উঠিতেন। বায়ুর প্রাবল্য হইলে 'জাতীয় বিশিষ্টতা' ও 'ব্যক্তিগত চরিত্র' যে ফুটিয়া উঠে না, সে ধারণাটুকু বিনোদবাবুর স্বভাবতঃই হইয়াছিল, এবং বায়ুগ্রস্ত লোকের সহবাসে তাহার মস্তিষ্কও যে অস্বাভাবিক ধারণ করে, তাহাও বিনোদবাবুর-মতে বিজ্ঞানসঙ্গত। এই তথ্যটুকু যাহারা জানিত না, তাহারাই মনে করিত যে, বিনোদ বাবু স্ত্রীকে ভালবাসেন না। বাস্তবিক, বিনোদ বাবু মধ্যে মধ্যে যে চেষ্টা করেন নাই, কিন্তু সফল না হইবার কারণ তাঁহারই ব্যক্তিগত চরিত্র। তিনি বিদেশে থাকিয়া অনেক সময় মনে করিতেন যে; স্ত্রীকে খুব ভালবাসেন, কিন্তু নিকটে গেলে তাঁহার মতের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া যাইত। পিতার পত্র পাইয়া

কিয়ৎক্ষণ পরে চন্দ্রমুখী ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল, 'বাড়ীতে অনন্তবাবু ভিন্ন আর কে আছে?'

ঝি। সবগুলো লোকের জন্যে বাড়ীতে করা কি সহজ? তাই সন্ধ্যে বাবু ছোলাভাজা খান।

চন্দ্রমুখী। তিনি সন্ধ্যার সময় বাটীর মধ্যে আসেন?

ঝি। একবার সাতটা আটটার সময় আসেন। কাপড় চোপড় ছেড়ে গণেশের মাকের দিকে যান।

চন্দ্রমুখী তাহার পূর্ব্বে বাদাম, পেস্তা ও ছোলা ভাজিয়া, ক্ষীরের সঙ্গে মিশাইয়া, মিছরী দিয়া, দশ ত্রিশখানা বরফী তৈয়ারী করিল, এবং সেইগুলি বিনোদ বাবুর কাপড় বদলাইবার ঘরে আলির সম্মুখে একটা থালে রাখিয়া, তাহার উপর গিলা বসিয়া রহিল।

বিনোদবাবু যথাসময়ে ঘরে প্রবেশ করিয়া চুল ফিরাইবার সময় এক খানি বরফী দেখিতে পাইলেন। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাহার একখানা গলাধঃকরণ করিলেন। মনে হইল, খুব উপাদেয়। সবগুলি ক্রমে ক্রমে আহার করিয়া খুব তুষ্ট হইলেন, এবং শরীর সবল বোধ হওয়াতে বাহিরে গিয়া বলিলেন, 'আজ আমি হাঁটিয়া গড়ের মাঠে যাইব'।

বিনোদবাবুর অভ্যাসের পরিবর্ত্তন দেখিয়া বন্ধুগণ বিস্মিত হইল। হৃষীকেশ আর এক বন্ধুর দিকে কটাক্ষ করিয়া বলিল, 'বুঝতে পেরেছ?'

সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, নিশ্চয়।

বিনোদবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'ও সব কিছু নয়। তোমরা ঠিক বুঝিতে পার নাই। তোমাদের জাতিগত বিশিষ্টতার দরুণ মধ্যে মধ্যে খুব ভুল হয়। তাহার কারণ যে, তোমরা ব্যক্তিগত চরিত্রের দিকে লক্ষ্য কর না।'

বিনোদবাবু বেড়াইতে গেলেন না। রাত্রি দশটার সময় বাটী ফিরিয়া আবার আহারে বসিলেন। দেখিলেন যে, অন্য দিন অপেক্ষা আজ আহারের সুব্যবস্থাটা অনেক বেশী। তাহার কারণ তিনি যে বুঝেন নাই, তাহা নয়, কিন্তু সে সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করিয়া সময় নষ্ট করা বাহুল্য বিবেচনা করিয়া তিনি আবার মনোযোগী হইলেন।

এমন সময় প্রায় হস্তে ঢাকাই শাড়ীর অবগুণ্ঠনে আবৃতা চন্দ্রমুখী নিকটে আসিয়া ক্ষীণ কম্পিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'বাতাস করিব?'

বিনোদবাবুর প্রথমে মনে হইল, যেন গোটাকতক মশা উড়িতেছিল। কিন্তু

পরে বোধ হইল যে, স্ত্রীর আগমনে তাঁহার ক্ষুধার বেগ কমিয়া যাইতেছে। তিনি মনে ভাবিলেন যে, সত্য কথা বলাই 'ব্যক্তিগত চরিত্র-বিকাশে'র পক্ষে প্রধান সহায়। অতএব তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'কোনও দরকার দেখছিনে। গোটা-কতক মশা আছে বটে, কিন্তু খাওয়ার সময় আমার নিশ্চিন্ত হইয়া খাওয়াই অভ্যাস। এটা অনেকে জানে না। সেই জন্য ডিস্টার্ব করা হয়।'

চন্দ্রমুখী অবগুণ্ঠনের আড়াল হইতে স্বামীর গম্ভীর মুখ দেখিয়া চলিয়া গেল।

৪

বিনোদবাবু মনে করিয়াছিলেন যে, রাত্রিকালে স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম দেখার সময় কথোপকথনটা একটা দুরূহ ঘটনা হইয়া পড়িবে। সেই জন্য তিনি আহার করিয়াই অন্যদিনকার মত শয্যাগত হন নাই। বাহিরে গিয়া একবার গেটের 'হুট' এবং আর একবার ভূদেববাবুর 'সামাজিক প্রবন্ধ' প্রভৃতি পুস্তক লইয়া ওলট পালট করিতে করিতে রাত্রি বারটা বাজিয়া গেল। শয়নগৃহে প্রবেশ করিবার সময় মনে করিয়াছিলেন, চন্দ্রমুখীকে নিদ্রাগতা দেখিতে পাইবেন। কিন্তু তাহা না দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। তদন্ত করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, চন্দ্রমুখী তাহার অনেক পূর্ব্বেই পিসীর সঙ্গে মহাভারত পড়িতে পড়িতে পার্শ্বের ঘরের মেজের উপর মাদুর পাতিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইয়াছে।

বিনোদবাবুর অহঙ্কারে একটু আঘাত লাগিয়াছিল, কিন্তু 'ব্যক্তিগত চরিত্র' রক্ষার জন্য তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। অন্য দিন হইলে সেই নিদ্রাতেই প্রভাত হইয়া যাইত, কিন্তু আজ রাত্রি দুইটার সময় তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সেই নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে বিনোদবাবুর চরিত্রেও একটা ক্ষুদ্র ভাঙ্গনের রেখা দেখা দিয়াছিল। বোধ হয়, তিনি নীরবে ও নিঃশব্দে ঘরের কপাট খুলিয়া চন্দ্রমুখীর ঘরে তাকাইয়া দেখিলেন যে, সে বারান্দায় উঠিয়া গিয়াছে। সেখানে রেলিং ধরিয়া কলিকাতার গভীর রাত্রির জনশূন্য রাস্তার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। চৈত্র মাস। মধুমাসের নৈশবায়ু তাহার অবগুণ্ঠন ও কেশগুচ্ছের খানিকটা মধ্যে মধ্যে অপসৃত করিয়া সুন্দর মুখের অর্দ্ধভাগ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছিল। বিনোদবাবু ইলেকট্রিক লাইটে তাহা দেখিতে পাইয়া একবার স্তম্ভিত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, 'এমন সময় হঠাৎ কথা কহিয়া ভয় দেখানো উচিত নয়।' আবার ভাবিলেন, 'এটা উচিত হচ্ছে না।' খানিকটা অগ্রসর হইলেন। বোধ হইল, যেন চন্দ্রমুখীর মুখ ঈষৎ কম্পিত হইল। তাহাতে বিনোদবাবুর একটু লজ্জা হইল। বোধ হইল যে, তাঁহার হৃদয় অতি ঘন ঘন স্পন্দিত

হইতেছে, শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, মাথা ঘুরিতেছে। এমতাবস্থায় 'আমোদ-প্রদ কথোপকথন অসম্ভব', এবং তাঁহার "হাট ফেল্ হইতে পারে", এই প্রকার বিবেচনা করিয়া তিনি আবার ধ্যানে আসিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

বেলা সাড়েটার সময় নিদ্রাভঙ্গের পর বিনোদবাবু বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, ঋষীকেশবাবু ও আরও দুই তিন জন বন্ধু অভ্যস্ত চা-পানের জন্য বসিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহার দৈনিক বাদাম ও গরম দুগ্ধের পেয়ালার সঙ্গে আরও দুই এক রকম চাট্‌নি জলখাবার প্রস্তুত। তিনি হাত মুখ ধুইয়া সেইগুলি খাইতে বসিয়া গেলেন।

ঋষীকেশবাবু বন্ধু বিপিনের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন, 'আজ বিনোদবাবুর চোখ একটু ঢুলু ঢুলু না? আজ অন্যদিনকার চেয়ে চেহারাখানা একটু রুক্ষ, রকম দেখাচ্ছে না?' বিপিনবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'বোধ হয়'। এই কথাতে বিনোদবাবু চটিয়া গেলেন—'তোমরা আসল কথা না জানিয়াই একটা যাহা তাহা অনুমান কর; ইহা জাতিগত বিশিষ্টতার দোষ।' ইহা বলিয়াই বিনোদলালের বোধ হইল যে, ইহা খুব বীরত্বের কথা, এবং কথা সোজার পরাকাষ্ঠা, এবং তৎক্ষণাৎ 'গীতা'র টীকার সূত্রে খুব খিলিয়া গিয়াছে।

ঋষীকেশ ও বিপিনবাবুদিগের 'ফরেন্ পলিসী' অনেকটা চাণক্যবৎ। বিপিনের স্ত্রীর সঙ্গে বিনোদের স্ত্রীর প্রথম হইতেই খুব মেশামিশি না হইলে পাছে মাটার খরচের 'বজেট্ এষ্টিমেট্' কোনও তারতম্য হয়, এ সম্বন্ধে তাহাদিগের অতিশয় পূর্ব্বাপর সাবধানতা ছিল। অতএব উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টায় ঋষীকেশ বলিল, 'আমার স্ত্রী আজ আপনার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসবেন।'

বিনোদবাবু। খুব সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু জানেন বোধ হয়, সে বাঙ্গাল, একটু বে-এক্তিয়ার হয়ে যেতে পারে। এখনো ভদ্রতা শেখে নাই।

ঋষীকেশ। সে জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না। আমার স্ত্রী তাকে দু-দিনে সব শিখিয়ে দেবে।

বিনোদবাবু। কথাটা যত দূর গোঁড়া শুনে, কচ্ছেন, তা নয়। বাঙ্গালদের একটা জাতীয় বিশিষ্টতা আছে, এবং ব্যক্তিগত চরিত্র সেই দিক দিয়া ফুটিয়া ওঠে। তারা কারও কাছে শিখতে চায় না। নিজের মনে যদি ভাল হ'তে চায়, তবেই সুফল, নয় ত না পেলে আরও বিপদ। পয়ার ভাজনের কথা শুনেছেন ত? সেই রকম।

ঋষীকেশ। আমার স্ত্রী নিতান্ত 'আচারী' লোক। সে ভদ্রতাটা করতে

চায় না। তবে আমার বিশ্বাস, সে বশীভূত কর্ত্তে পারে। কি বল বিপিন?

(চেয়ারোপরি।)

বিপিন। ঠিক।

বিনোদ। আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখুন।

প্রবীকেশ বাবুর স্ত্রী বিমলা একটী বাদামী রঙের রেশমী জ্যাকেট ও এক-খানা ক্ষীণ সবুজ বর্ণের পাতলা সাড়ী পরিধান করিয়া একোচুলে চন্দ্রমুখীর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, একটী চেয়ারে আরোহণ করিয়া চন্দ্রমুখী উড়িষ্যা দেশের ছোট ছোট জগন্নাথের পট লইয়া দেয়ালে আঁটা দিয়া ঠুকিতেছে। সুসজ্জিত সুরম্য ঘরের মধ্যে এই রকম বেমানান কদাকার পটের বিস্তার দেখিয়া বিমলা বিস্মিত হইয়া কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া পড়িল।

গৃহস্থিত বস্তু আদির মধ্যে চন্দ্রমুখী তাহাকে দেখিতে পাইয়া ইঙ্গিত করিয়া ডাকিল, 'এস না।'

বিমলা অগ্রসর হইয়া বলিল, 'আমি কে—বল ত?'

চন্দ্রমুখী। ধৃতী

ধৃতী বিমলা বলিল, 'আচ্ছা। দেখছি, শ্রীমতী একবার চেয়ার ছেড়ে নামি?'

পরিধাতা চন্দ্রমুখী কৌচের উপর বসিলে বিমলা জিজ্ঞাসা করিল, 'এ সব ব্যাপার কি? এমন সুন্দর ঘর নষ্ট কচ্ছ কেন?'

চন্দ্রমুখী। সুন্দর ঘরে সকলই আছে, কেবল ঠাকুর দেবতা নাই, তাই তাদের দেয়ালে ঠুকে দিচ্ছি।

ইহা বলিয়া চন্দ্রমুখী ধৃতগুলি পট সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহা দেখাইল। জগন্নাথ, বলরাম, গোষ্ঠের শ্রীকৃষ্ণ, নদীয়ার নিতাই, পূর্ব্বযুগের এবং প্রহ্লাদ, শ্রীরামচন্দ্র, এই সকল কয়খানা পট। চন্দ্রমুখী বলিল, 'আমি সবগুলি এই ঘরে রাখব।

বিমলা। এ সব দেখলে উনি যে ব্যস্ত হয়ে পালাবেন।

চন্দ্রমুখী। আমাদের দেশে স্বামী স্ত্রীর ঘরে বড় একটা আসে না। বাহিরে থাকে। আমরা পট নিয়ে ঘরে থাকি। এতে ভূতের মোরাঘ্যা হয় না।

বিমলা। আমাদের দেশে আমরা স্বামীকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ঘরে নিয়ে আসি। গান করি, কাব্য গাতে নিয়ে চেয়ারে বসে থাকি, ভাল ভাল খাবার তৈরী ক'রে ডাকি, নিতান্ত পক্ষে দরকার হ'লে চুরীটে ধ'রে মারি, তার আর ভুলে নিস্তার একবার আসে।

চন্দ্রমুখী। এসব যাঁদা ফুলোন নয়? পদ্ম ও যাগীর ঠ মধ্যে প্রভেদ আছে। পুরুষদের অন্তরীক্ষের বাইরে নেমে, বেমন ভোমরা, মৌমাছি বাঁধে। মানুষের মধ্যে একটু তফাৎ। যাকে ভারা বিয়ে ঠ করে, সে ভাদের ভোগবিলাসের দাস হিসেবটা ঠিক পালন করে। কিন্তু বিবাহ হয় যেমনি ওদের ভেতরটা পাঁচ পাড়ে বদলে। এর মানে কি?

বিজয়া। মানে, ওদের সংসারের মধ্যে ভরে নিতে হয়। তার ওপর স্ত্রীকে ভোগবিলাস ভার সাথে নিয়ে চলে মহীন হয়ে পড়ে।

চন্দ্রমুখী। আমার বেলা সে ভোগটা খুব চালিয়ে ছিল।

বিজয়া। স্ত্রীলোকদের স্বামীর অর্থমর্জাই ভাল। অর্থমর্জার ভোগের ইচ্ছা। অভিধানে ভগবান পর্যন্ত বর্জিত হন।

চন্দ্রমুখী। স্ত্রী যদি সতীন হয়, স্বামী তবুই নিরিবিলি বে পড়ে পড়ে থাকে।

বিজয়া। তবে তার চরিত্র ভাল হয়।

চন্দ্রমুখী। দরিদ্র ভাল কিসে হয়? ভুলিয়ে রেখে কি চরিত্র ভোলান যায়? ছটি ছেলেমেয়ে ও ভুলিয়ে রাখতে পারে না।

বিজয়া। তবে বেধানে ওটি ছুকলেই কি চরিত্র ভাল হয়?

চন্দ্রমুখী। ওটাকে ভোমাদের দেশে 'পাতিব্রত উপাসনা' বলে। ওতে চরিত্র ভাল হয় না, কিন্তু স্বামীর মাথাটি খাওয়া হয়। আমার বোন হয়, ও ভাল। ভোল যে কুল দেবতা, তিনি বড় রসিক। তিনি ওদেরকে কাপড়ের ভাঁজে ভোমাদের অমুক ভাই ভাকে বিবাদে করে না। পটগুলো দেখলে তাঁর ভক্তের ভক্ত মনে পড়ে, আমি মনে মনে বোধ হয় যে, ভক্ত আছে বলেই ভগবান একটাই মাত্র, সেটা 'অবশ্য'।

বিজয়া। তবে স্বামী আসে কেন?

চন্দ্রমুখী। ওই স্বরূপের রাস্তাটা দেখিয়ে দেবার জন্য। ভাবহীনের যে রাস্তাই তাঁর খাড়া করে, তবুও ও পালিয়ে যায়। তাদের বাদের বড় ভুল যেতে হয়। এর সোজা চারা নেই, সিধা নেই, ছুটকনারা নেই। ভোগটা কি রকম হয়, তার বোধের মিষ্টতা নেই। তাই! ও সব বদখেয়ালী ওই রকম। তার ওটা এক সময় অনেক বাঙ্গালীর ছিল, এখন আনন্দময়ী স্ত্রী পুরুষ ছিল, এখন তা নেই। কিন্তু এখনও সাধারণ বাঙ্গালীর ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে ওই ভাবটা

ভেদের চূরমার করেছে। তার কুঞ্জে সে সুরভি সুদূর দিগন্তে কিছুই রাখে না। কেবল শ্মশানের বালি তার কাছে থাকতে পায়। সে খুঁটী-নিলিমটুকু চায়, কিন্তু পায় না। বাঁদর-তুলানি ভালবাসা সে তুচ্ছকে দেখতে পারে না। আমাদের বাঙ্গালাদেশের মেয়ে পদ্মার মতন। তোমরাও সেই রকম ছিলে, কিন্তু সভ্যতার মায়া চেপে রেখে দিয়েছে, পুরাণো কথা ভুলে গিয়েছ। এককালে তুমিই সমুদ্র ছিলে। তখন আমাদের কেবল পাখা ও সিঁদুর পেলেই জন্ম সার্থক হ'ত। এখন আমরা মানুষ হয়েছি বলে' তুচ্ছ পার্থিব পদার্থের মধ্যে স্বাধীনতা খুঁজে বেড়াই।'

ইহা বলিয়া চন্দ্রমুখী বিমলার হাতে এক জোড়া সুন্দর শাঁখা পরাইয়া দিল, এবং মাথায় একটু সিন্দুর দিয়া সজলনয়নে বলিল 'ভাই, তুমি স্বামী-সোহাগিনী হও।'

৬

হৃষীকেশ বাবু রাত্রিকালে বাটী ফিরিয়া স্ত্রীর নিকট চন্দ্রমুখীর খবর পাইবার প্রত্যাশায় প্রফুল্লমুখে শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু অন্যদিনের ন্যায় বিমলা স্বামীর প্রতীক্ষায় চেয়ারের উপর 'নভেল' লইয়া বসিয়া ছিল না। কেবল খুকী শয্যায় এক পার্শ্বে শুইয়া নাক ডাকাইতেছিল। ঘরের নির্ব্বাণোন্মুখ ল্যাম্পের দীপ্তি হৃষীকেশ বাবু একটু বর্দ্ধিত করিয়া দেখিলেন যে, বিমলা ছাদের উপর বালিশে মাথা দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া আছে।

হৃষীকেশ বাবু নিকটে আসিয়া বলিলেন, 'কি আশ্চর্য্য! আজ বিছানা পাততে পাড়া হয় নাই? তোমার কি অসুখ করেছে?'

বিমলা গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, 'তুমি শুয়ে থাকগে, আমি কতকগুলো কথা ভাবছি।'

হৃষীকেশ। আমাকে বল না কেন?

বিমলা। তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি? কাল থেকে খরচপত্র তুমিই করিও, সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা আমাকে যেন দিও না। আমার সময় হয়ে এসেছে।

হৃষীকেশ। এ সব কথা আজ তোমার মুখে নূতন শুনছি। বোধ হয়, ও বাড়ীর বৌ তোমাকে শিখিয়েছে।

বিমলা। আমি তারাদাসের মন্ত্র নিয়েছি, আর তোমাদের মতন্ত্রন্ত্র মানি না। তাদের রাজীতেও এলার বিয়ে দিয়েছি। তোমরা কে কি জন্মান্তর

লোক, তা এত দিন জানতুম না। 'নেকুটাই'-পরে' ঘোরাফেরা করা, কাব্য বেড়াও, কিন্তু বাস্তবিক কেউ কাহাকেও ভালবাস না। আমাদের ঘরের মধ্যে অধীন রেখে বাইরে স্বাধীনতা দিতে চাও! এমন স্বাধীনতার মুখে ছাই।

হৃষীকেশ। বেশ বুঝতে পাচ্ছি যে, তুমি ও বাড়ীর বৌএর সঙ্গে মিশে বিগড়ে গিয়েছ, আর চারি দিকে বিদ্রোহের সূত্রপাত করে বেড়াচ্ছ। তোমাকে আমি ঘরেও যেমন স্বাধীনতা দিয়েছি, বাইরেও তেমনই। আর কি চাও?

বিমলা। দুই স্বাধীনতারই মুখে আগুন। কেবল স্বরূপ চাই। আমি যা খুসী করব, আর তুমি যা খুসী ক'রে বেড়াবে, এর নাম স্বাধীনতা নয়। তুমি যা চাও, আমি তা ক'রব, আর আমি যা চাই, তুমি তা ক'রবে, ইহারই নাম স্বাধীনতা। এইটুকুর মধ্যে স্বামী ও স্ত্রী, রাজা ও প্রজা, বা ও সন্তানের বাধন। সেটুকু না হ'লে সব ভেঙ্গে-চুরে যায়। সেটুকুর নাম ভালবাসা।

হৃষীকেশ। তুমি ঘোর 'সোস্যালিষ্ট' হয়ে পড়লে দেখ্‌ছি। বাঙ্গালদের ব্রাহ্ম মিশতে দেওয়াই আমার অন্যায় হয়েছে। এখন বুঝতে পাচ্ছি, স্ত্রী স্বাধীনতার মধ্যেও বিপদ আছে। আমি যে তোমাকে ভালবাসি না, তা তোমাকে কে বল্‌লে?

বিমলা। তোমার কথাতেই বুঝতে পাচ্ছি। এতদিন মোহের আঁধারে পড়েছিলুম, তুমি মিষ্ট কথায় ভুলাতে, এখন তোমার চরিত্র প্রকাশ হয়ে পড়ছে।

হৃষীকেশ বাবু বিনোদ বাবুর 'ব্যক্তিগত চরিত্রের' কথা ভাবিলেন, এবং নিজের কথা ভাবিলেন, এবং শেষ একটা উপায় অবলম্বন করিয়া বিমলার হাত ধরিয়া বলিলেন, 'ক্ষমা কর।'

ইহাতে বিমলা আরও চটিয়া গেল, এবং স্বামীর হাত ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া 'ও মিথ্যে হাত, মিথ্যে হাত! তোমার ভালবাসা মৌখিক। তুমি অপরাধী, তা নিজেই স্বীকার কচ্ছ।' ইহা বলিয়া বিমলা অঞ্চলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিল।

হৃষীকেশ বাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, 'বিমলা! কেঁদ না। এ সংসারটাই মিথ্যে, তা আমি কি করব?'

বিমলা। সংসারটাকে সত্য কর, নয় ত গুরুর কিসের? সত্য কথা বল। সত্য ব্যবহার কর। সত্যের জন্য প্রাণ দাও। ভাল না বাসতে পার, দরকার নাই। অনেক পুণ্য করলে তবে স্বামীর ভালবাসা পাওয়া যায়। কিন্তু মৌখিক ভালবেসে না, সত্যের অপলাপ করিও না। যুগে যুগে তোমরা নিন্দা আর

দেখিয়েছে, তাই আমরা নির্জ্জনে বসে' ভগবানের কল্যাণময় মঙ্গলদিয়ে পূজা করেছি। তোমাদের মধ্যে তাঁর সত্যভাব না ফুটলে, তোমাদের পূজা ভণ্ডুল কি ক'রে? যখন বাহিরে যাই, তখনও তাঁকে পাইনে। তোমাদের মত তোমাদের সমাজও প্রবঞ্চক। সকলে প্রলোভন দিয়ে ভুলাতে চায়, আত্মাটুকু নষ্ট করতে চায়। তার মধ্যে স্বাধীন হয়ে বেড়িয়ে লাভ কি? জ্ঞানলাভ? তা তোমাকে দিয়েই ত শিখেছি, তোমার মত আরও দশ জনের কাছে গিয়ে আবার নূতন ক'রে শিখে লাভ কি? বরং এমন সমাজকে সুদ্ধিনে ছারখার করা ভাল।

হৃষীকেশ। বিমলা! তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। আমি তোমাকে আসল কথা ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিইগে চল।

বিমলা। (চক্ষু মুছিয়া) আসল-কথা অনেক দিন বুঝেছি। তবে আর একটা এমন জিনিস যে, বুঝলেও বুঝতে দেয় না, হয় ত গিগ্‌গির একেবারেই মরব। তুমি শোওগে। খিয়েটার দেখে রাত্রি জেগে শরীর খারাপ ক'রো না।

সকালবেলা চা খাইবার সময় বন্ধুবর্গ একত্রিত। সম্মুখে রাশীকৃত জলখাবার। সকলেই খুব খুসী। কিন্তু বিনোদ বাবু যেন একই বিষয়,—একটু উৎকণ্ঠিত। গত নিশাকালেও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয় নাই। তিনি হৃষীকেশ বাবুর অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হয় নাই, তাহা তাঁহার চক্ষু দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। অপর্য্যাপ্ত আহার পাইয়াও, অনেক বন্ধু বান্ধবের মধ্যে থাকিয়াও, অবহেলে বরচপত্র করিয়াও, মানব-জীবনে একটা অভাব থাকিয়া যায়, এবং বিবাহ হইলে সেই অভাবটার দিকে লক্ষ্য হয়, এবং জীবন অশান্তিময় হইয়া পড়ে, এই রকম তাঁহার বোধ হইতেছিল। স্ত্রীশিক্ষার 'নিশিষ্টতা' এবং 'ব্যক্তিগত চরিত্রের' ফলে কখন কোথায় কি রকম ভাবে অবস্থা দাঁড়ায়, ক্রমে তাহা বিনোদ বাবুর নিকট স্পষ্ট হইয়া পড়িতেছিল।

হৃষীকেশ ঘরে মানমুখে প্রবেশ করিলে, বিনোদ বাবু অনেকটা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার স্ত্রীর পূর্ব্বদিনের দৌত্য সফল হয় নাই। তিনি সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন: খবরটা কি?

হৃষীকেশ। খুব খারাপ। লাভের মধ্যে আমার স্ত্রী পর্য্যন্ত 'সোশ্যালিষ্টদের' মত দিনেড়ে উঠেছে।

বিনোদ বাবু বলিলেন, ঠিক ভাই। আমার স্ত্রীও গত রাত্রে ঐ রকম

কি বকছিস। আমার এখন বৃদ্ধ বয়স, তাতে আফিং খাই; বুঝতে না পেরে বাইরের ঘরে এসে ঘুমিয়ে পড়লুম।'

নবকুমার বাবু বলিলেন, 'কি আশ্চর্য্য! শুনি ত আমার স্ত্রী সেই অবধি বাপের বাড়ী চলে' গেছে।'

বিপিন। বৃদ্ধ বয়সে ভালবাসা একটা বিড়ম্বনামাত্র। যাঁরা টেনিসন প্রভৃতির মত অমর কবি, তাঁরা হয় ত টিথোনাসের কথা মনে করিয়া মধ্যে মধ্যে ভালবাসাকে জাগ্রত করিতে পারেন। কিন্তু আমরা সেরূপ মানুষ, কখন চক্ষু বুজে ফেলব, তার ঠিক নেই, এর মধ্যে একটা বিশ্বব্যাপক বাসনা বনিতার সম্রাটের মত স'রে পড়তে হবে।

নবকুমার। বরং সম্রাট প্রজাদের ভালবাসাকে টিকে থেকে পারেন, কিন্তু রমণীর প্রেম বিষম জিনিস। ভগবানের প্রেমই এত দিনে বুঝতে পারি নাই, তাই তাঁকে নমস্কার ক'রে একটু দূরে থাকি; স্মরণ, তাঁর কৃপাদৃষ্টি হলেই ভবধাম ছাড়তে হবে, সেটা নিশ্চয়। পক্ক গাত্তবের স্বর্গারোহণ ভগবৎ কৃপাদৃষ্টিরই ফলে।

বিনোদ। তোমরা যা বলছ, তা আমার মনে লাগছে না। 'ব্রাহ্মিকাল' চরিত্র খুব ফুটে না উঠলে জনসাধারণ হবে কি ক'রে? স্ত্রীলোকের প্রেম থাকবেই, নচেৎ তাদের জন্মে আভিজাত বিশিষ্টতা, বল ও বীর্য্যের বিকাশ কি ক'রে হবে? তবে চরিত্রবলই আসল বল। বংশবৃদ্ধিতে সেটার ক্ষুরণ না হলে জাতির উন্নতি হয় না। এই জন্য প্রেমের সঙ্গে ও চরিত্রের সঙ্গে বিশেষ একটা সম্পর্ক আছে। একটার মধ্যে আর একটা অন্তর্নিহিত হয়ে বংশপরম্পরা এগিয়ে যায়। জননীদের এখন যেমন চরিত্র, হয় ত স্ত্রীলোকেরা তা চায় না, এই জন্য তারা বিদ্রোহী হয়ে পড়বে, সেটা কিছু আশ্চর্য্য নয়। শুধু জ্ঞান হইলে চলে না। জ্ঞানে বংশ বিস্তার হয় না। প্রেম তাকে বশ ক'রে সৃষ্টিনিকাশের মধ্যে নিয়ে যায়।

ঋষীকেশ। তবে আপনি বাঙ্গিত চরিত্র টুকু ফুটিয়ে তুলুন। আমাদের মাত্রা তা হবে না। এত লেখাপড়া শিখেও যে স্ত্রী পুরুষ কাঁদালীর মত প্রেমের ঝুড়ি হাতে ক'রে ঘুরে' বেড়াবে, সেটা বিষম দৃশ্য।

বিনোদ বাবু বলিলেন, 'আমারও সেই রকম বোধ হচ্ছিল, কিন্তু মনে করছিলুম যে, শিক্ষা পেয়ে স্ত্রীলোকেরা সেইটুকু আপনিই বুঝে নেবে। আপনাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে যে, প্রেম একটা বিদ্রোহী জিনিস। কিন্তু চরিত্রবলে প্রেমকে অধীন করে নিতে কতক্ষণ?'

বিপিন। আপনি একবার চেষ্টা ক'রে দেখুন না কেন?

বিনোদ বাবু জলখাবারগুলি ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ করিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, দেখা যাবে। আজকে পুলিস-কোর্টে একটা স্ত্রীচুরীর মোকদ্দমায় নিযুক্ত হয়েছি, সেটাকে 'ডিফেণ্ড' ক'রে এসে বৈকালে দেখা যাবে।

নবকুমার। আজকে বৃহস্পতিবার, বাড়িভাড়াটা কেটে গেলে যা হয় ক'রবেন। হঠাৎ কিছু গুরুতর হ'লে আমাদের জলখাবারটা বন্ধ হয়ে যাবে।

বিনোদ বাবু হাসিয়া বলিলেন, 'সে ভয় নাই। ভগবান চিরকাল আমাদের আহারটা যোগাচ্ছেন, হঠাৎ বন্ধ করার কোনও কারণ নেই।'

বিনোদ বাবু গম্ভীরভাবে কাছারী চলিয়া গেলেন। তিনি যাইবার পরেই আকাশে একটা কালো মেঘ দেখা দিল। ক্রমে খুব ঝড় উঠিল, এবং মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিল। কলিকাতার বড় বড় গাছ পড়িয়া গেল।

বেলা পাঁচটার সময় বিনোদ বাবু বাটীতে আসিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার ভাল ভাল ছবিগুলি কে ঘর হইতে টানিয়া বারান্দায় ফেলিয়া দিয়াছে। তাঁহার বাক্স ভাঙ্গিয়া পুরাতন প্রেমিকার যাবতীয় প্রেমপত্রিকা কালি মাখাইয়া কে দেয়ালে সাঁটিয়া দিয়াছে। যে আলমারীর সম্মুখে তিনি প্রত্যহ তাঁহার সুন্দর মুখ বারংবার দেখিয়া কালো চুলগুলি ঘন ঘন ফিরাইতেন, তাহা কে ভাঙ্গিয়া খান্-খান্ করিয়াছে। ভাল মখমল-মণ্ডিত সোফা ও কৌচগুলি কে ওলট-পালট করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। গৃহ শ্রীহীন, যেন শ্মশানে অগ্নি জ্বলিতেছে।

বিনোদ বাবু পিসীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ সব ব্যাপার কি?'

পিসী হরিনামের মালা জপিতে জপিতে মস্তকে বলিলেন, 'বাবা, কিছু মনে করিও না, বৌমার একটু পাগলের ছিট্ আছে। তুমি তার সঙ্গে দুটো কথা কহিও, সে একলা পড়ে থাকে।'

বিনোদ বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'আচ্ছা।' তখনও আকাশে ঘোর মেঘ। বিদ্যুৎ হাসিতেছিল। বিনোদ বাবুর জাতিগত শোণিত উত্তপ্ত হইয়া তীব্রবেগে বহিতে

৮

তখন আরম্ভ হইয়াছিল।

বিনোদ বাবুর প্রথমে ইচ্ছা হইল, চন্দ্রমুখীকে ডাকিবেন। কিন্তু 'ক্রিয়ন্ত' চরিত্রের উন্মেষের ফলে তিনি বুঝিলেন যে, তাহা হইলে একটা খুন খারাপী হইয়া যাইবে। কোনও কথা না কহিয়া তিনি একবার বাহিরে গেলেন, এবং

সকলকে বলিলেন, 'আমার শরীর খারাপ, আজ রাত্রিরে খাব না।' আহার ঘটার মধ্যে ফিরিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পাঁজার পাতা উল্টাইতে লাগিলেন।

ক্রমে সেটা বুঁজিয়া ফেলিয়া দিলেন। তাঁহার সাধের সংসার যে ভাসিয়া দিয়াছিল, সেই দুরন্ত স্ত্রীর উপর তাঁহার বড় রাগ হইল। তাহার নিকট হইতে চলিয়া যাওয়াই তাঁহার পক্ষে শ্রেয়স্কর বোধ হইল। তিনি সংসার ছাড়িতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

আবার মুষলধারে বৃষ্টি পড়িল। আবার ঝড় বহিল। বিনোদ বাবুর ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি মনে করিলেন, প্রথমে হৃষীকেশ বাবুর বাটীতে গিয়া তাঁহাকে সব বুঝাইয়া দিবেন, এবং ঢাকায় তাঁহার পিতাকে পত্র লিখিবেন যে, তাঁহার সন্তান সংসার ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের পথ নিষ্কণ্টক করিয়া দিয়াছে। বিনোদের চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বহিল। তখন দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া বিনোদ বাবু কেবল একখানা চাদর গায়ে দিয়া ও একগাছি ছড়ি লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইবার জন্য অগ্রসর হইলেন।

সে গৃহের সকল দুয়ারই কে বন্ধ করিয়া দিয়াছিল; কেবল একটি দুয়ার উন্মুক্ত ছিল। সেটা চন্দ্রমুখীর পান সাজিবার ঘর।

ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বিনোদ বাবু সেই দিক দিয়া বাহির হইলেন, কিন্তু হঠাৎ বাধা পড়িল।

সম্মুখে মুক্তকেশে সন্ন্যাসিনীর বেশে চন্দ্রমুখী দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল। সে কখন সে সাজে সজ্জিত হইয়াছিল, তাহা কেহ জানে না। তাহার নিজের একখানা গেরুয়া রঙের পট্টবস্ত্র ছিল। আজ সেখানা খুব সাহস করিয়া পরিধান করিয়াছিল।

স্বামীর বৈরাগ্য দেখিয়া গৌরবান্বিতা সতী তাহার কোমল বাহুলতার পবিত্র বন্ধনে স্বামীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিল।

বিনোদ বলিল, 'ছাড়,—আমি তোমার মুখ দেখ্‌ব না।'

চন্দ্রমুখী। চন্দ্রাবলীর মুখে যাচ্ছ নাকি? দেখ বঁধু হে! আমি যে তোমার দেবতা হে! সংসারের মায়া ছেড়ে যাচ্ছ, কিন্তু চন্দ্রাবলীর প্রেমপত্রিকা-গুলোর মায়া এড়াতে না পেরে সেগুলি বাক্সে বন্ধ ক'রে রেখেছিলে? হে নিষ্ঠুর! জান নাকি স্ত্রী চিন্ময়ী? স্বামীর মনের প্রত্যেক ভাব এসে তার মনে ছায়া দিয়ে যায়? আমার বুকে এই রকম ক'রে তীক্ষ্ণ ছুরী বিঁধিয়ে তুমি কি

[illegible] তুমি কেমন দেবতা, বল? [illegible] ভোমার মহত্ত্বের [illegible] [illegible] [illegible], মরণে ভোমার নবে নহ মরণে বার, আমার মত [illegible] তুমি জীবন ও মরণের মধ্যে একটা মুক্তির রাস্তা করে' আমাকে বিলের মধ্যে [illegible] পাঠাবে, তা কি কখনও হয়?

নজী জামীর মুখে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিনোদ বুঝিতে পারিল যে, একটা জীবনের ভার তাহার বুকের মধ্যে বিনোদের পুরুষে যে শক্তিবহ্নি ফুটে নাই, আজ তাহা ফুটিয়া উঠিল। মমতা ও স্নেহের মত মন সেই মুহূর্ত্তের মধ্যে কেন্দ্রীভূত।

তখনও প্রবল বাড়ী বহিতেছিল। বিনোদের বোধ হইল, যেন ঝড়ের [illegible] কিন্তু সেই ঝড়ের মধ্যেও একটা আকৃষ্টিক-চরিত্র মন্ত্র এবং 'অতিপ্রাকৃত বিশিষ্টতা' অনাহত স্রোতের ন্যায় আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতেছে। বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি তাহার রহস্য করিতে পারে না; 'মতামত' তাহাকে মুখ [illegible] পারে না। তাহার মধ্যে 'ছায়াপথে'র মতই বহুদূর বিস্তৃত নিরাট নিরালা ও অনন্তশেষীতে ব্যাপ্ত। সেখানে সেইটুকু বিশেষত্ব।

ছেঁড়া পরিশ্রান্ত হইয়া বিনোদের কোলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নিজের [illegible] সে পরার আকাশের রঙ্গ দেখিতেছে। পূর্ব্বদিক পবিত্র করিয়া তাহার [illegible] রক্তলালিমা নদীবক্ষ বাহিয়া পশ্চাদ্দেশে বিস্তৃতিতেছে। তাহার [illegible] মুক্তির স্মৃতি পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি অবলম্বন করিয়া জন্মান্তরের— দীর্ঘ, [illegible] যে পরীক্ষা তাহাদের পূর্ব্বজীবনের ইতিহাস [illegible] করিয়া দিয়াছিল, [illegible] তাহাদের চরিত্রকে ফুটাইয়া দিতেছে। বাহুতে [illegible] উপরীক্ষার দিবসগুলি সেই নূতন সৃষ্টির উন্মেষ দেখিয়া থাকে। তাহাদের [illegible] একটী নূতন আলো ও টীকা পড়িয়াছে।

[illegible] বিনোদ আকাশের দিকে নিম্ন দৃষ্টি-নিবদ্ধ করিয়া [illegible] [illegible] দেখিতেছিল।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

প্রাচীন শিল্প-পরিচয়।

সিংহাসন।

সিংহাসন পদার্থটি শিক্ষিত অশিক্ষিত জনের নিকট সমান সুপরিচিত। পিতামহী-কথিত গল্প হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চাঙ্গের সাহিত্য পর্য্যন্ত উহার নাম-কীর্ত্তনের অভাব নাই। কিন্তু উহার আকৃতি বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞানে আমরা নিতান্তই নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছি। কারণ, ইহা রাজ-ভোগ্য বস্তু। বর্ত্তমান সময়ে অলঙ্কারান্বিত-সিংহাসনোপবিষ্ট রাজার দর্শন আমাদের পক্ষে দুর্লভ হইয়াছে। সুতরাং একমাত্র শাস্ত্রবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া আমাদিগকে উহার স্বরূপনির্ণয়ের চেষ্টা করিতে হইবে।

যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে আসন-যুক্তি প্রকরণে কথিত হইয়াছে যে, আসন সাধারণতঃ দুই প্রকার; এক সাধারণ ও অপর অসাধারণ সংজ্ঞায় অভিহিত। তন্মধ্যে সিংহাসন 'বিশেষ' বলিয়া ও অন্য 'আসন' সামান্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

যুগভেদে ও সূর্য্যাদিগ্রহের দশাবিশেষে আঢ্য নৃপতিদিগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সিংহাসনের নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। সত্যযুগের সিংহাসনে পঞ্চ সোপান, ত্রেতাযুগে চারি সোপান, দ্বাপরে তিন সোপান ও কলিযুগে দুই সোপান নির্ম্মাণের ব্যবস্থা দেখা যায়। সিংহাসনের চরণগুলি সিংহাঙ্কিত হইবার উপদেশ আছে। চরণের সংখ্যা সত্যাদি যুগক্রমে চত্বারিংশ, ত্রিংশ, বিংশ, এবং ষোড়শ হইবার ব্যবস্থা আছে। সূর্য্যাদি অষ্টগ্রহের দশায় আঢ্য ভূপতিদিগের ভোগ্য সিংহাসন যথাক্রমে—পদ্ম, শঙ্খ, গজ, হংস, সিংহ, ভূম, বৃষ ও হয়, এই আট নামে অভিহিত হইয়াছে।

সমস্ত সিংহাসনেরই রাজপাত্র নামক সোপান, অর্থাৎ ভিত্তি, নির্ম্মাণের পূর্ব্বে রাজার স্বকৃতপরিমাণে অষ্ট-হস্ত-মিত হওয়া আবশ্যক। উহার উচ্চতা এক পুরুষ পরিমিত করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

উক্ত সোপানের মধ্যে অর্দ্ধপরিমিত রাজাসন, অর্থাৎ সিংহাসন স্থাপিত হইবে। কলিযুগে রাজাসন অর্দ্ধহাতে করিয়া কথিত হইয়াছে।

অষ্ট প্রকার সিংহাসনের মধ্যে পদ্ম-সংযুক্ত আসন গাম্ভারী-কাষ্ঠের দ্বারা নির্ম্মিত, এবং পদ্মমালার দ্বারা চিত্রিত হইবে। উহার অবয়বগুলি পদ্মরাগ-মণি-নিধানের দ্বারা সুশোভিত, এবং বিশুদ্ধ স্বর্ণের দ্বারা আবৃত হইবে। উহার পাদাগ্রে পদ্মকলিকা হইতে বিনির্গত আটটি পুত্রিকা (পুতুল) অষ্ট দিকে নিহিত হইবে। এই পুত্রিকাগুলি রাজার স্বাদশাঙ্গুলপরিমিত, এবং পদ্মরাগমণি দ্বারা চিত্রিত হওয়া আবশ্যক। এতদুপরি নিহিত রাজাসনে চারিটি ও বারটি পুত্রিকা স্থাপিত হইবে, এবং মাঝে মাঝে নবরত্নে খচিত হইবে। রক্তবস্ত্রাবৃত এই আসন পদ্ম-সিংহাসন নামে অভিহিত হইয়াছে।

পদ্ম-সিংহাসন।

শঙ্খ-সিংহাসন দেবদারু কাষ্ঠের দ্বারা নির্ম্মিত, এবং শঙ্খচিত্রাবলির দ্বারা সুশোভিত হইবে। এই সিংহাসনের পাদাগ্রে শঙ্খনাভি, এবং স্থানে স্থানে বিশুদ্ধ স্ফটিকে নির্ম্মিত সাতাশটি পুত্রিকা বিন্যস্ত হওয়া আবশ্যক। শুভ্রবস্ত্রের দ্বারা উহার আবরণ করিতে হয়। পীঠে এইরূপ নিহিত হইয়াছে।

শঙ্খ-সিংহাসন।

গজ-সিংহাসন পনস কাষ্ঠের দ্বারা নির্ম্মিত, এবং হস্তি-প্রতিকৃতিশ্রেণীর দ্বারা সুশোভিত হইবে। প্রবাল, বৈদূর্য্যমণি ও সুবর্ণ দ্বারা উহার শোভা-সম্পাদন আবশ্যক। উহার পদাগ্রে নিহিত হস্তীর মস্তক ও পুচ্ছের প্রতিকৃতি হইতে সমুদ্ভিত মাণিক্যনির্ম্মিত এক একটি পুত্রিকা রচনা করিবার ব্যবস্থা আছে। রক্তবস্ত্র প্রভৃতি উহার ভূষণ-রূপে বিহিত হইয়াছে।

গজ-সিংহাসন।

হংস-সিংহাসন শাল কাষ্ঠের দ্বারা নির্ম্মিত, এবং হংসের প্রতিকৃতি-শ্রেণীর দ্বারা সুশোভিত হইবে। পদ্মরাগমণি, স্বর্ণ ও কুরুবিন্দ, এতদ্‌ত্রিতয়ের দ্বারা উহার শোভা-সম্পাদন করিতে হয়। উহার পাদাগ্রে হংসের প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিতে হয়, এবং ইহাতে গোমেদমণি-নির্ম্মিত একবিংশতিসংখ্যক পুত্রিকা স্থাপিত করিতে হয়। পীতবর্ণ বস্ত্র ইহার ভূষণ-রূপে বিহিত হইয়াছে।

হংস-সিংহাসন।

সিংহ-সিংহাসন চন্দন কাষ্ঠের দ্বারা নির্ম্মিত, এবং সিংহের প্রতিকৃতি-শ্রেণীর দ্বারা সুশোভিত হইবে। উহার অবয়বগুলি বিশুদ্ধ হীরকের দ্বারা চিত্রিত করিতে হয়, এবং উহার চরণ-নিহিত সিংহ-চিহ্নগুলি বিশুদ্ধ স্বর্ণের দ্বারা বিরচিত করিতে হয়। ইহাতে একবিংশতি-পু

সিংহ-সিংহাসন।

সর্ব্বাঙ্গ পুত্তলিকা-পূর্ণতের ব্যবস্থা আছে। মূলে শক্তিমন্ত্র-জপান্তে বিবিধ পাদের দ্বারা উহার অলঙ্করণ করিতে হয়। মুক্তার দ্বারা ইহার আবরণ বিহিত হইয়াছে।

ভূমি-সিংহাসন।

ভূমি-সিংহাসন বিস্তৃত চম্পক কাষ্ঠের দ্বারা নির্ম্মিত, এবং অমরের প্রতিকৃতি-সমূহের দ্বারা সুশোভিত হইবে। উহাতে বিশুদ্ধ অবয়ব মণি যুক্ত করিতে হয়। উহার পাদাগ্রে পদ্মকোরকের আকৃতি ও স্বাধিষ্ঠিতি পুত্তলিকা-বিধানের ব্যবস্থা আছে। নীল পতাকা উহার ধ্বজ-রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

যূপ-সিংহাসন।

যূপ-সিংহাসনের উপাদান নিম্ব কাষ্ঠ। যূপের প্রতিকৃতি-শ্রেণীর দ্বারা উহার শোভা সম্পাদন বিহিত হইয়াছে। ইহাতে হাট, যজ্ঞনীয়মণি ও স্বর্ণ, এই ত্রিবিধ বস্তু দ্বারা উহাকে চিহ্নিত করিতে হয়। উহার প্রাগ্রাগ্রে যূপের মস্তকচিহ্ন-স্থাপন এবং চত্বারিংশৎসংখ্যক পুত্তলিকা বিন্যস্ত করিতে হয়। উহা নীলধ্বজাদিযুক্ত হইয়া থাকে।

হয়-সিংহাসন।

এই সিংহাসন বকুল কাষ্ঠের উপাদানে নির্ম্মিত, এবং হয়-প্রতিকৃতি-নিচয়ের দ্বারা সুশোভিত হইবে। উহাতে সর্ব্বপ্রকার বজ্রালঙ্কারের দ্বারা শোভিত পঞ্চসপ্ততিসংখ্যক পুত্তলিকা বিন্যস্ত করিতে হয়। উহার চরণাগ্রে অশ্বমস্তক-চিহ্ন বিহিত, এবং বিচিত্র বস্ত্রাদি উহার ধ্বজরূপে কথিত হইয়াছে।

এই অষ্ট প্রকার মহা-সিংহাসন ভৌমদেব কর্ত্তৃক কল্পিত, এবং উহা পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মত।

সিংহাসনের এতাদৃশ নির্ম্মাণপদ্ধতি সত্ত্বেও অমরসিংহ স্বর্ণময় রাজাসনকে সিংহাসন নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহার রহস্য কি? তবে কি তাঁহার সময়ে কেবল স্বর্ণের দ্বারাই সিংহাসন প্রস্তুত হইত? অন্যত্র অক্ষরের অবয়-দ্বারিংশৎ বড়ই সমস্যাপূর্ণ। উহা হইতে এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে, রাজ-ঘোগ্য আসনের নাম ভদ্রাসন। (নৃপাসনং যত্তদ্ ভদ্রাসনং সিংহাসনন্তু তৎ) যদি ঐ আসন স্বর্ণময় হয়, তবে উহা সিংহাসন নামে সমাখ্যাত হইয়া থাকে। সুতরাং ভদ্রাসন ও সিংহাসন, এই উভয়ের আকারগত কোনও প্রভেদ নাই কেবল উপাদানের পার্থক্যানুসারেই নামান্তর বিবেচিত হইয়াছে, বুঝিতে হয়। কাদম্বরী-পাঠে জানা যায় যে, রাজকুমার চন্দ্রাপীড় স্বর্ণময় সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। (স্বর্ণময়ং প্রথমং মেরুং চন্দ্রাপীড়ঃ সিংহাসনং

উদ্ভিদ-জীবনের অবস্থাত্রয়।

প্রাণী সকল যেরূপ সুষুপ্তি, বিরাম ও জাগরণ, এই তিন অবস্থার অধীন, উদ্ভিদগণও পরিকল্প সেই অবস্থাত্রয়ের অধীন থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। প্রণিধান করিলে বুঝা যায় যে, উদ্ভিদগণই কখনও নিদ্রাভিভূত, কখনও বা জাগ্রত, আবার কখনও বা জাগ্রত থাকিয়াও নিঃস্পন্দভাবে অবস্থান করে। শেষোক্ত অবস্থাই জীব বা উদ্ভিদের স্বপ্নাবস্থা।

আহারাভাবে উদ্ভিদ পর্য্যাপ্ত আহার্য্য-অভাবে বৃদ্ধি পায়, এবং ফুল ফল ধরে। এ সময়ে আহার্য্যের অভাব বা অনটন হইলে, উদ্ভিদ অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হয়, অপত্যা ফুল-ফল-ধারণে বা গন্ধ মুকুল উদ্ভূত করিতে অল্পাধিক অসমর্থ হয়। বৃদ্ধি বা ফল-ফুল, এ সকলই পারাহারের অবশ্যম্ভাবী ফলমাত্র। উদ্ভিদ-দেহে যে সকল পদার্থ আহরিত হয়, তাহাই রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া ফল, ফুল, পত্র ও শাখা প্রভৃতি নানা আকারে উদ্ভিদ-শরীরে প্রকাশ পায়। সেই সকল আহরিত পদার্থের মধ্যে যে সাধ্য বা শক্তি নিহিত থাকে, তাহা উদ্ভিদ-শরীরের অভ্যন্তরে ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। উক্ত শক্তি অগ্নি ভিন্ন আর কিছুই নহে। দুই খণ্ড কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে অগ্নি উৎপন্ন হয়। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, কাষ্ঠখণ্ডদ্বয়ে অগ্নি আছে, কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি বিদ্যমান, কেবল ঘর্ষণের অপেক্ষা। সেইরূপ উদ্ভিদের অবয়বে এবং উদ্ভিদ-খাদ্যে অগ্নি বিদ্যমান। কেবল উভয়ের একত্র সংমিশ্রণের ফলে অগ্নি বা শক্তি উৎপন্ন হয়। কিন্তু ইহার উত্তরদায়ক সূর্য্যের কিরণ সম্পাত না হইলে পৃথিবীর কোনও বস্তুরই জড়তা দূর হয় না। যাহা উক্ত জাগরণাবস্থায় উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় কোনও দ্রব্যের অভাব না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিলে, উদ্যানস্বামী সমুচিত প্রতিদান পাইয়া থাকেন। উক্ত প্রবন্ধ বাহুল্য ভয়ে লিখিত হইল না। সাধারণতঃ বসন্তকালই পূর্ণ জাগরণের অবস্থা। জাগরণের দিন সমাগত প্রায় হইলেই ইহারা তাহা বুঝিতে পারে; সুতরাং ইহাদিগকে জাগরিত করিবার জন্য আমাদিগকে প্রয়াস পাইতে হয় না। এই সময়ে ইহাদিগের আহার্য্য-উৎপাদন শক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায়। সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গে—কেশিকামূল (Hair-root)

ইহাকে পত্ররন্ধ্র (Stomata) পর্য্যন্ত সকলেই উৎপন্ন, সকলেই জীবন্ত। নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যেই উদ্ভিদের কার্য্য শেষ করিয়া লইতে হয়। যেন মহাকাল বসিয়া রহিয়াছেন,—প্রাণী ও উদ্ভিদ-জগতের তিনি কার্য্য করাইয়া লইতেছেন।

কঠোর শ্রমের পর বিশ্রামের প্রয়োজন, ইহা প্রকৃতির অপরূপ বিধান। যে মুহূর্ত্তে উদ্ভিদে এত কিপ্রতা, এত কার্য্যশীলতার আবির্ভাব হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারি বেগ হ্রাস হইয়া আইসে। উদ্ভিদ স্থিরভাব ধারণ করে। উদ্ভিদের এই অবস্থা—বিশ্রামকাল।

ঋতুবিশেষে বা ঋতুজীবী উদ্ভিদ—যথা বসন্তবাহার Season flowers) পুষ্প ও ফল প্রদান করিয়া চিরবিশ্রাম গ্রহণ করেন। ইহাই তাঁহাদিগের স্বভাব, ইহাই তাঁহাদিগের বিশেষত্ব। দীর্ঘজীবী হইয়া বিভিন্ন ঋতুর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বাল্যযৌবনকে চলিতে হয়, তাহারা মৃত্তিকা প্রভৃতির সম্পূর্ণ অধীন। বিশ্রামকালে ইহারা নিঃস্পন্দভাবে অবস্থান করে, এবং যাহা কিছু আহার করে, তাহা কেবল জীবন রক্ষার্থে মাত্র, সুতরাং নামমাত্র। বিশ্রামটা কার্য্যে কি কারণ, তাহা বলা বড় কঠিন। তবে দেখিতে পাই, বিশ্রামকালে খাদ্য-আহরণ ও পরিপোষণ যেরূপ জড়তা প্রাপ্ত হয়, পরিপাক-ক্রিয়াও সেইরূপ স্থিরপ্রায় হইয়া থাকে। বর্দ্ধিষ্ণুতা, কোনও ক্রিয়াই একেবারে স্থগিত হয় না। তাহা হইলেই তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য হইত। বিশ্রামকালে কোনও ঔষধিকে উত্তেজিত করা উচিত নহে। অনেকে উদ্ভিদকে অসময়ে জাগরিত করিয়া ফল-ফুল-প্রসবে বাধ্য করিয়া থাকেন। উক্ত পীড়ন উদ্যানিক ভাষায় Forcing নামে পরিচিত। পীড়ন হইলেও উদ্যানিক—সৌখীনও ব্যবসায়ী নির্ব্বিশেষে—তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন;—ইহা নিত্য ঘটনা। বিশ্রামকালে উদ্ভিদের কোনও পাট, চর্চ্চা, বা পরিচর্য্যার প্রয়োজন হয় না; পারিপার্শ্বিক কোনও কারণে তাহার জীবন সঙ্কটাপন্ন না হয়, কেবল তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিলেই হয়।

উদ্ভিদের বিশ্রামকালে উদ্যানকলা প্রদর্শন করিতে হইলে প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। এ সময়ে উদ্ভিদশরীরের সমস্ত ক্রিয়া মন্দভাব ধারণ করিয়া মূলগত অধিক রসাকর্ষণ করিতে পারে না; পত্ররন্ধ্র অধিক বাষ্পোদ্গম করিতে পারে না; কলতঃ উদ্ভিদমধ্যে পরিপাক-ক্রিয়ার বিলম্ব ঘটে না। ইহাও দেখা যায়, বিশ্রামকালে উদ্ভিদের বন হইয়া যায়। কিন্তু যখন পত্রের মূলোদ্ভেদ হইতে ঐ উদ্ভিদে সেই ক্রিয়াশীলতার আবির্ভাব হয়, তখনই উদ্ভিদের মূল তরল ও পল্লব হইয়া কিঞ্চিদধিকে প্রধাবিত হইতে থাকে। কিন্তু এই বিশ্রামের

আছে।—এ সময়ে সরস ঐক্ষবাদির ভাগ খেজুর গাছ ও বিশ্বাছ লাভ করে। খেজুর রসও তখন ঘন হয়। কিন্তু অন্য সময়ে উহার রস পরিমাণে অধিক হয়, রসের তারল্য বৃদ্ধি পায়, মিষ্টতা অল্প হয়। গ্রীষ্মপ্রধান হইতে শীতকালে রস নির্গত করিতে দেখা যায়, তাহা অতিশয় ঘন আঠার ন্যায়, সুতরাং অপেয়, কিন্তু অপর ঋতুতে দেখিয়াছি, উহার রস তরল, সাধারণ জলের মত, এবং সুপেয়। ইহাই বিশ্রামকাল। বিশ্রামকালে উদ্ভিদ-শরীরের ক্রিয়াশীলতার হেতু পত্রনিচয় কোনও কাজ করে না, শাখা প্রশাখাদি হইতে পত্রপুঞ্জে রস আকৃষ্ট হয় না, পত্রস্থ বায়ুমণ্ডল হইতে বাষ্প গ্রহণ করে না। অধিকন্তু বিশ্রামকালে উদ্ভিদ-পোষণীয় যাহা কিছু থাকে, তাহা উদ্ভিদ শাখা পল্লবাদিতে সঞ্চারিত করিয়া যায়। এইরূপে উদ্ভিদ ও পত্রের পরস্পর সংযোগ বিলুপ্ত হয়; পত্রগুলি শুষ্কমুণ্ড হইয়া ভূতলে স্থান পায়। উদ্ভিদের পত্রচ্যুতির ইহাই কারণ। পত্র উদ্ভিদে যতক্ষণ সংযুক্ত থাকে, ততক্ষণ উভয়ের মধ্যে দৃঢ় বন্ধন থাকে। উভয়ে ছাড়াছাড়ি হয় না। এ অবস্থায় কোনও গাছ হইতে একটী পত্র ছিঁড়িলে ছিন্নস্থান হইতে রস নির্গত হয়; কিন্তু যে পাছের পাতা পাকিয়া গিয়াছে, কিংবা যে পত্র বৃক্ষচ্যুত হইবার সময় সমাগত হইয়াছে, তাহা ছিঁড়িয়া লইলে রস নির্গত হয় না। বসন্তকালে গাছের পাতা ঈষৎ বায়ুর সঞ্চারে দিনরাত্রি খসিয়া পড়ে। সে সকল পত্রের বোঁটার আগে আঠা বা রস থাকে না।

রাত্রিকালই নির্দ্দিষ্ট সুষুপ্তির সময়। সারাদিনের জীবন-সংগ্রামে জীব ও উদ্ভিদ, উভয়েই নিদ্রার আশ্রয়ে কিছুক্ষণের জন্য দুঃক্লেশশূন্য স্থির অবসরে নিজ নিজ বিশ্রাম হয়। এইরূপে যে যত নিশ্চিন্তমনে প্রগাঢ় নিদ্রায় আত্মভূত হইতে পারে, সে তত অধিক শক্তি লাভ করিয়া পরদিনের জীবন-সংগ্রামে নবোৎসাহে ও নববীর্য্যে প্রবেশ করিতে পারে। ইহা স্বাভাবিক নিদ্রা, অধিকক্ষণব্যাপী নহে।

ক্লান্তির পরেই বিরাম। তাহার পর নিদ্রা। শরীর স্নিগ্ধ ও উত্তেজনাহীন না হইলে নিদ্রাকর্ষণ হইতে পারে না। জাগরণজনিত ক্লান্তির কথা বলিয়াছি, বিরামের কথাও বলিয়াছি। বিরামের কাল অতীত হইয়া গেলে সুষুপ্তির কাল আইসে। জাগ্রৎকাল অপেক্ষা সুষুপ্তিকালে জীবনীশক্তি অধিকতর নিবিড়ভাবে দেহমধ্যে অবস্থান করে। মানুষের দীর্ঘকাল নিদ্রা হয় না। আমরা অতি বুদ্ধিমান জীব বলিয়া তিন চারি মাস কাল একদিকমে ঘুমাইতে পারি না। উদ্ভিদেও এত জ্ঞান নাই যে, দীর্ঘকালের আহার উপার্জ্জন করিয়া নিদ্রা যাইবে।

নাটক ও "অবিমারক", "চারুদত্ত", "প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ", "স্বপ্নবাসবদত্ত", "কর্ণভার" ও "উরুভঙ্গ" নামক পাঁচখানি বিখ্যাত নাটকেরও রচনা করিয়াছিলেন। এই ত্রয়োদশ নাটকের মধ্যে ত্রিবান্দ্রম-সংস্কৃত-গ্রন্থাবলীতে আরও পাঁচখানি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, এই ত্রয়োদশ নাটকের আবিষ্কর্ত্তা ও প্রচারক দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী। তিনি বহু গবেষণার ফলে, শাস্ত্রীয় যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই নাটক-চক্রের প্রণেতা মহাকবি ভাস। এই নাটকের বিষয়-বস্তুর গঠন, ভাষা, রচনা-ভঙ্গী, এবং তাহাতে শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার ইত্যাদি উপরিবর্ণিত নানা-বিষয়ক ঐতিহাসিক তথ্যের আলোচনা করিলে, এতদ্ভিন্ন যে গুপ্ত যুগের কবি কালিদাসের "মালবিকাগ্নিমিত্র" নাটকে উল্লিখিতনামা প্রাচীন কবি ভাসের লেখনী-প্রসূত, তদ্বিষয়ে সংশয়ের কারণ থাকিতে পারে না। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ নানা সংস্কৃতজ্ঞ পাশ্চাত্য মনীষিগণও তাহা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও ত্রিবান্দ্রমের ভট্টনাথ-স্বামী নামক এক জন পণ্ডিত বিগত ডিসেম্বর সংখ্যার "Indian Antiquary"—নামক পত্রিকায় এই নাটকচক্রের রচয়িতা ভাসকে "ভাসাভাস"-রূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্য অনেকগুলি নিরর্থক যুক্তির অবতারণা করিয়া, ভাস-নাটক-চক্রের মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সে যাহা হউক, এ স্থলে আমরা সে সম্বন্ধে কোনও বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। বর্ত্তমান প্রস্তাবে ভাস-রচিত "কর্ণভারম্" নামক একাঙ্ক নাটকের আলোচনা করিব।

মহাভারতের বনপর্ব্বের ২৮৯—৩০০ম অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া মহাকবি ভাস এই ক্ষুদ্র নাটকখানির রচনা করিয়াছেন। ভারতীয় যুদ্ধের পূর্ব্বে, আর্য্যাবর্ত্ত-দেশে ভিক্ষার্থী আগত দেবরাজ ইন্দ্রকে, পরমধার্ম্মিক মহর্ষি কর্ণ অযাচিত কবচ-কুণ্ডলদ্বয় কর্ত্তন করিয়া প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, সূর্য্যদেব কর্ণকে তাহা হইতে নিবারিত করিয়াও, নিজ কর্ণ হইতে নিষ্ক্রান্ত করিয়া ব্রাহ্মণ-প্রার্থিত কুণ্ডলদ্বয় ও নিজ "সৌরীয়" কবচ প্রদান করিয়াছিলেন।—এই কথাই এই নাটকের প্রধান কথা।

যদি নাটকাবলীর নমস্কার বা নান্দী-শ্লোক হইতে কবির ইষ্ট-দেবতা নির্ণয় করা ঠিক হয়,—তাহা হইলে মহাকবি ভাসকে পরম-বৈষ্ণব বলা যাইতে পারে। নাটক-চক্রের নমস্কার-শ্লোকে ভাস "কেশব", "নারায়ণ", "পদ্মনাভ", "দামোদর", "বজ্র-হস্ত" [বজ্রধারী ইন্দ্রের হস্ত] "শ্রীধর" প্রভৃতি বৈষ্ণবী সংজ্ঞায় প্রতি ভক্তি-ভাব-প্রদর্শন-পূর্ব্বক তাঁহাদের গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। "কর্ণভার" নাটকের আদ্য শ্লোকেও তিনি "শ্রীধরম্" [বিষ্ণু] উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা

... [...] ... ...

করিতেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও তাঁহাকে সুকুমার ও বর্ম-সমন্বিত দেখিয়া তাঁহার সমরে অবধ্য মনে করিয়া পারিতেন হইতেন।

"কর্ণের জনক ভগবান্ সূর্য পূর্ব হইতেই জানিয়াছিলেন যে, পাণ্ডুপুত্রদিগের হিত-সাধনে রত হইয়া, ব্রাহ্মণবেশে কর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার 'সহজ' [জন্ম-সিদ্ধ] কুণ্ডলদ্বয় ও কবচ ভিক্ষা করিবেন। পিতা পুত্রের চরিত্র সম্পূর্ণরূপে জানিতেন। কর্ণ কখনও নিজে যাচ্ঞা করিতে জানিতেন না—দান করাই তাঁহার প্রধান কার্য ছিল। ব্রাহ্মণকে প্রয়োচিত বস্তু প্রত্যাখ্যান করা তাঁহার নীতি-বিরুদ্ধ কার্য ছিল। বিশেষতঃ, যখন তিনি যথাবিধানে স্নানান্তে সলিলোত্থিত হইয়া অঞ্জলিবদ্ধ-হস্তে দিবাকরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সেই দেবতার স্তব করিতেন, তখন কর্ণের কিছুই বিদ্যাভিক্ষে অদেয় থাকিত না, এবং ব্রাহ্মণগণও বিত্তলাভের আকাঙ্ক্ষায় সেই সময়েই কর্ণের সমীপে অধিকরূপে উপস্থিত হইতেন। দেবরাজ ইন্দ্রও, কবচ-কুণ্ডলের জন্য সেই সময়েই উপস্থিত হইবেন, সূর্যদেব তাহাও জানিতেন। সেই জন্য তিনি পুত্র-স্নেহ-প্রণোদিত হইয়া স্বপ্নে কর্ণকে দর্শন দিয়া তাঁহাকে সাবধান করিবার জন্য বলিয়াছিলেন,—"তোমার জ্ঞানশক্তি পরিত্যক্ত হইয়াই শত্রু [পাণ্ডবদের হিতকল্পনায়] তোমার নিকট কুণ্ডল ও কবচ ভিক্ষা করিয়া তোমাকে হীনশক্তি করিতে চাহিবেন; কিন্তু তুমি অমৃতোপম এই দুই বস্তু ব্যতীত অন্য যাহা কিছু—ধন, স্ত্রী, দেশ, বিত্ত ইত্যাদি শত্রুকে দিতে চাহিও। মনে রাখিও—

"যদি দাস্যসি কর্ণ ত্বং মহেন্দ্রে কুণ্ডলে শুভে।
আয়ুঃ প্রকাম কল্পা মৃত্যোর্বশমুপৈষ্যসি।
কবচেন সমাযুক্তঃ কুণ্ডলাভ্যাং চ মানদ।
অবধ্যস্ত্বং রণেঽরীণামিতি বিদ্ধি বচো মম।" [বনপর্ব, ৩৯২। ১৮]

"যদি তুমি তোমার জন্মসঙ্গ এই শুভ কুণ্ডলদ্বয় প্রদান কর, তাহা হইলে তোমার আয়ুঃক্ষয় হইবে, এবং তুমি মৃত্যুর বশবর্তী হইবে।—আর, হে মানদ, যদি তুমি কবচ-কুণ্ডল-যুক্ত থাকিতে পার, তাহা হইলে তুমি রণক্ষেত্রে অরিগণের অবধ্য থাকিবে।" কর্ণ উপদেশদাত্রী দেবতাকে সূর্য বলিয়া জানিতে পারিয়া তাঁহার যথোচিত পূজা করিলেন, এবং তাঁহাকে অনুনয়বচনে বলিলেন যে, তিনি যেন তাঁহাকে স্বব্রত হইতে ভ্রংশিত না করেন। "সাত্যের যখন"—ইহাই যাঁহার চরিত্রের মূলসূত্র, সিদ্ধান্তে আত্মপ্রাণ দান করিবার

"যদি তুমি সত্যব্রত হও, তাহা হইলে, হে অনঘ, তোমার এই সহজ বর্ম ও কুণ্ডলদ্বয় দান হইতে উৎকরণ করিয়া আমাকে প্রদান কর।" কর্ণ প্রথমতঃ এই দুই বস্তু প্রদান করিতে একটু অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন,—পাকশাসন অন্য কিছুই লইতে চাহিলেন না। কর্ণ ভিক্ষার্থীকে দেবরাজ বলিয়া চিনিতে পারিয়া, এই দুই বস্তুর পরিবর্তে তাঁহার নিকট অমোঘ শক্তি চাহিলেন। শক্তি-অস্ত্র প্রদান করিয়া ইন্দ্র তাঁহাকে ইহাও বলিয়া গেলেন যে, এই শক্তির প্রয়োগ দ্বারা তিনি যে বিশিষ্ট রিপুর বিনাশসাধন করিতে চাহেন, তিনি নারায়ণ কৃষ্ণ কর্তৃক রক্ষিত হইবেন। তাহা সত্ত্বেও কর্ণ কেবল এক রিপু-বধের জন্য ইন্দ্র হইতে অমোঘ শক্তি গ্রহণ করিয়া, স্বগাত্র হইতে ছিন্ন করিয়া "নহুষ" কবচ ও কর্ণ হইতে উন্মোচন করিয়া অম্লতোপ কুণ্ডলদ্বয় ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন।

এই মহাভারতীয় কথা অবলম্বন করিয়া মহাকবি ভাস "কর্ণভার" নাটকের রচনা করিয়াছেন। তাহাতে মূল কর্ণের দান-শীলতা ও গুরুভক্তির পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাব্য দ্বারা লোকচরিত্রে শিক্ষাদান কবির প্রধান কার্য্য। ভাসের নাটকচক্রে এই কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অভিনয়ের উপযোগী করিবার জন্য কবি উপরি-উল্লিখিত ভারতীয় কথার কোন্ অংশে কতটুকু অনৈক্য ও বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছেন, তাহা নিম্নলিখিত নাটকীয় কথাবস্তু হইতেই অনুমিত হইতে পারিবে।

কথাবস্তু।

যুদ্ধকাল উপস্থিত। উভয় পক্ষের রাজসিংহগণ গজারূঢ়, হয়ারূঢ় ও রথারূঢ় হইয়া সিংহনাদ করিতেছেন। দুর্য্যোধনও সমরাঙ্গনে যাইবার জন্য প্রস্তুত। তিনি ভটমুখে অঙ্গরাজ কর্ণকে সরদ্ধ হইয়া আসিবার জন্য সংবাদ পাঠাইলেন। অনেকের সমর-পরিচ্ছদ-পরিবৃত হইয়া, মদ্রাধিপতি শল্যকে রথ-সারথি-রূপে লইয়া, যুদ্ধের জন্যই অগ্রসর হইতেছিলেন। পূর্ব্বপরীক্ষিতপরাক্রম কর্ণের মনে কেন এই যুদ্ধের পূর্ব্বে অনুভূতপূর্ব্ব হৃদয়পরিতাপ অনুভূত হইতেছিল, তাহার কারণ বুঝিতে পারা যাইতেছিল না। নিদাঘ-সময়ে স্বভাব-রুচিমান সূর্য্যদেব মেঘাবরুদ্ধ হইলে যেরূপ পরিদৃষ্ট হন, সমরাগ্রযায়ী অত্যুগ্রদীপ্তিমান কর্ণও পরিতাপ-তপ্ত হইয়া তদ্রূপই লক্ষিত হইতেছিলেন। মহাযুদ্ধে কত বোধের, কত অশ্বের, কত বারণের, কত রথের অস্ত্র প্রত্যস্ত অজস্র প্রযুক্ত অস্ত্রের আঘাতে কত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছে। কর্ণের মনে সর্ব্বদাই বিষাদ ছিল যে,

তাঁহার পরপক্ষের পক্ষীভূত হইলে যজ্ঞ নরপতিগণ পক্ষীবশেষ প্রত্যাবর্তন করিতে পারিবেন না; যুদ্ধে তিনি যেন কৃতান্ত যমরাজের ন্যায় বিক্রমশালী—বন্ধুদিগের হিতেচ্ছু হইয়া তিনি আত্মপরাক্রমের কত পরিচয় দিবেন। কিন্তু অমিতশক্তিশালী কর্ণের মনেও আজ কি এক বিষুরতা উপস্থিত। তাঁহার স্মরণ হইল, তিনি কুন্তীগর্ভজাত—কিন্তু সূত-পত্নী রাধার প্রতিপালিত বলিয়া বিশ্রুত। আজ কুরুসিংহের প্রিয়েচ্ছু হইয়া তিনি যাঁহাদের বিরুদ্ধে সমর-প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, সেই যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব তাঁহারই সহোদর—কনিষ্ঠ ভ্রাতা। মাতা কুন্তীও তাঁহাকে ভ্রাতৃবর্গের সহিত যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত বিষয়ই তাঁহার মানসিক কষ্টের কারণ। কর্ণ আজ রথ-চালক মদ্ররাজ শাল্যের নিকট ভৃগুবংশকেতু ক্ষত্রান্তক পরশুরাম হইতে তিনি কিরূপ নিষ্ফল অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেই বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বলিলেন যে, একদা তিনি তাপসবেশ-সহকারে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। পরশুরাম আশীর্ব্বচনের পর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কো ভবান্ কিমর্থমিহাগতঃ?"—"তুমি কে? কেনই বা এখানে আসিয়াছ?" কর্ণ উত্তর করিলেন যে, অখিল অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য তিনি তৎসমীপে উপস্থিত হইয়াছেন। জামদগ্ন্য ক্ষত্রিয়বংশগণের সহিত পূর্ব্ববিরোধ আছে বলিয়া, কখনও ক্ষত্রিয়কে অস্ত্রোপদেশ করিতেন না, কেবল ব্রাহ্মণদেরই অস্ত্র শিক্ষা দিতেন। কিন্তু কর্ণ,

"নাহং ক্ষত্রিয় ইত্যস্ত্রোপদেশং প্রতীচ্ছামি।"

"আমি ক্ষত্রিয় নহি", এই বলিয়া অস্ত্রোপদেশ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কতিপয় দিবস অতিক্রান্ত হইলে, একদিন কর্ণ তপঃ-বৃদ্ধি-সাধনের জন্য গুরুর সহিত বনভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। বনে ভ্রমণে পরিশ্রান্ত হইয়া গুরুদেব পরশুরাম শিষ্য কর্ণের অঙ্কে মস্তক রক্ষা করিয়া নিদ্রিত হইলেন। কর্ণ পশ্চাতে এই সময়ের একটি ঘটনা বলিতে লাগিলেন—

"কুতো বজ্রমুখের মাম ক্ষমিত্বা ঽবধাবধোক্তয়ে
নিদ্রাচ্ছেদভয়াদপি গুরোর্ধৈর্য্যাৎ জড়ে স্থিতঃ।
উদ্যন্ পক্বকপোতঃ স সহসা রোষান্ধধীর্দীপিতো
ভূত্বা মাংস্য ইবাপপাত ঝটিতি ব্রহ্মাসনে মদ্ভিদে।"

সহসা আমার উপরে বজ্রমুখ-নামক কর্মি-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। শুনিলাম নিশ্চয়ই হইবে, এই ভয়ে ধৈর্য্যসহকারে আমি তখন যোগে মন দিলাম। মন্ত্রপূত হইয়া তিনি [শুকদেব] সহসা উত্থিত হইলেন, এবং রোষাবেশে উদ্দীপিত হইয়া আমাকে [কর্ণের বলিয়া] চিনিতে পারিয়া শাপ দিলেন—"তোমার সমস্ত অস্ত্র কাজ-বিফল হইবে।" কর্ণ শল্যকে বলিলেন যে, আমার উদ্ধারের দিন উপস্থিত। বাস্তবিকই অস্ত্র কর্ণের অস্ত্রগুলি নির্ব্বীর্য্য লক্ষিত হইতেছিল। দীনভাবাপন্ন যোদ্ধৃগণ বিষণ্ণ হইয়া মুহুর্মুহু পরিদৃষ্ট হইতেছে—মদবারিগন্ধী গজগণও রণক্ষেত্র হইতে নিবর্ত্তিত হইতেছে—সমরদুন্দুভি সকলও নিঃশব্দ। সারথি শল্যের হৃদয়ে যেন বিষাদ-শল্য প্রবেশ করিল। কিন্তু মহাবীর কর্ণ—

"হতোঽপি লভতে স্বর্গং জিত্বা তু লভতে যশঃ।
উভে ত্বহন্যতে লোকে তস্মাৎ নিষ্ফলতা রণে।"

"রণে নিষ্ফলতা নাই; কারণ, [যোদ্ধা] হত হইলেও স্বর্গ লাভ করেন—জয়ী হইলে যশোলাভ করেন—লোকে এই উভয় বস্তুই বহুমত।"—এই বলিয়া শল্যকে অশ্বস্ত করিলেন। কোথোজ-কুল-জাত, সুপর্ণ-সমান-বেগ অশ্বকুলের পরাক্রম স্মরণ করিয়া কর্ণ ভাবিলেন যে, তাহাদের সাহায্যে গোব্রাহ্মণের, প্রতিশ্রুতার, রণে অপরাঙ্মুখ যোধপুরুষের ও প্রাপ্তকাল নিজের অক্ষয়ের ব্যবস্থা করিতেই হইবে। তিনি তখন প্রসন্ন হইয়া শল্যকে এই বলিয়া সাহস দিলেন যে, তিনি পাণ্ডবগণের অনুচ্ছ সমরমুখে প্রবেশ করিয়া "প্রথিতগুণপ্রাচ্য" যুধিষ্ঠিরকে বধ করিয়া, নিজ শরবর-বেগে অর্জ্জুনকে নির্পাতিত করিবেন। যেখানে অর্জ্জুন অবস্থিত আছেন, সেইখানে রথচালনার জন্য তিনি শল্যকে আদেশ করিলেন। উভয়ে রথারোহণ করিবেন, এমন সময়ে এক বিপ্র উপস্থিত। এক বিপ্র দীন-সঙ্কুচ-স্বরে দূর হইতে বলিলেন—

"ভো কর্ণ, সহস্রং ভিক্ষার্থং যাচেঽহং।"

"হে কর্ণ, সহস্রের ভিক্ষা যাচ্ঞা করিতেছি।" অতি প্রভাবশালী বিপ্রবরের এই আহ্বান শুনিয়া কর্ণের শ্রবণগণও যেন অবকাশ-প্রাপ্তির উৎকর্ণ হইল। তিনি তৃণ-নয়নে "বলিভুক্-গ্রীবার্পিতানন" হইয়া, যাইতে যাইতে চিত্রার্পিতদের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন। কর্ণ স্বয়ং বিপ্রকে আত্মানপূর্ব্বক অভিবিক্তনে তাঁহাকে "ভাবিন্" বলিয়া সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"যঃ কৃষ্ণাগ্রজ-নামসঙ্ক-লীলৈক-শালেয়মৌলি-মণি-ম্লিষ্ট-পাদপদ্মঃ।
বিপ্রেন্দ্র-পাদ্যমহসা ভূ বিভিন্ন-মৌলিঃ কর্ণঃ কুতস্তমসমে রণভূমিমেতি।"

"আমার যে পাদপদ্ম [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] যাহার [illegible] বিপ্রেন্দ্রের পাদরজঃস্পর্শে পবিত্র হইল, সুতরাং যে আমার [illegible] নমস্য হইলাম, সেই আমি—কর্ণ কখনই [illegible] করিতে পারি।" ব্রাহ্মণরূপী বজ্রাভিবাদনে কি বলিবেন স্থির করিতে না পারিয়া মনে মনে ভাবিতেছেন—

"যদি দীর্ঘায়ুরিত্যেষ ব্রূতে দীর্ঘায়ুর্ভবিষ্যতি। যদি নেতি ব্রূতে, দুষ্টঃ
মাং বাধতেঽসৌ। তমাদুভয়ং পরিত্যজ্য ত্রিতীয়ং কিঞ্চিদেব ব্রূতাদিতি। তথা—দুষ্টঃ।"

যদি দীর্ঘায়ু হও বলি—[কর্ণ] দীর্ঘায়ু হইবেন, যদি কিছুই না বলি, তাহা হইলে গুরু বলিয়া আমাকে পরাভূত করিবেন। এই উভয় [illegible] কি বলি? হউক, ঠিক করিয়াছি।" এইরূপ ভাবিয়া তিনি পরিশেষে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন,—

"যাবৎ কল্পং যুগো বিপ্র, চন্দ্রো বিপ্র, হিমবন্তো বিপ্র, মাতরো বিপ্র, চিরং তিষ্ঠ দেবতো।"

হে কর্ণ, পৃথিবীর ন্যায়, চন্দ্রের ন্যায়, হিমালয়ের ন্যায়, [illegible] ন্যায় তোমার যাবৎ [অটল] থাকুক।" কর্ণও প্রাণ অপেক্ষা যশকেই অধিকতর মূল্যবান মনে করিতেন। তিনি একবার বিপ্রকে এইমাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন না, কেন তিনি তাঁহাকে "দীর্ঘায়ুর্ভব" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন না? কিন্তু তিনি পুনরায় ভাবিলেন যে, নশ্বর দেহ হউক হইলেও প্রতিপালন-গুণ-প্রভাবে [illegible] চিরকাল বর্ত্তমান থাকিবে। সেই জন্য তিনি আজন্ম [illegible] আশীর্ব্বাদকেই শোভন মনে করিয়া বলিলেন—

"কর্ত্তা হি যদৈঃ পুরুষেণ মাদৃশো
দুঃখপ্রতিকারপরা নৃগাশ্রিতঃ।
স্বয়ং প্রণামোদ্যতমাত্মজন্মনা
হতেষু দেহেষু কথা ধরস্তু ॥"

"সর্ব্বপ্রযত্নে পুরুষের যশঃসাধন করা বিধেয়; কারণ, মানবদিগের [illegible] দুঃখ নিবারণ করাই [illegible]। অতএব, প্রণামোদ্যত [illegible] বর্ষ লক্ষ করিয়া বলা যাইতে পারে যে, [illegible] হইলেও [illegible] [চিরকাল] বর্ত্তমান থাকে।"

কর্ণ অতিথিরূপী ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কি ইচ্ছা করেন; এবং তাহা নিশ্চয় অতিথিকে কি দিতে পারেন? বিপ্র কেবল বলিলেন যে, তিনি একটি [illegible] ইচ্ছা করেন। কর্ণ তাহাই দিতে চাহিয়া [illegible] [illegible] বলিলেন, তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

পবিত্র অগ্নিহোত্র-প্রার্থনীয় ধেনুকুলের শৃঙ্গগুলি কনকালঙ্কৃত করিয়া তিনি অভিথিকে দিতে চাহিলেন। কিন্তু অতিথি মুহূর্ত্তে ফীরপাণি করিয়া নিঃশেষিত করিলেন বলিয়া গো-সহস্র গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। তাহার পর কর্ণ তাঁহার প্রধান সাধন, সূর্য্যাশ্ব-সদৃশ-বরণ, বায়ুবেগ-সদৃশবল, যুদ্ধ-পরীক্ষিতবল, কাম্বোজ-দেশ-জাত বহু সহস্র বাজিকুল দান করিতে চাহিলেন। কিন্তু অতিথি মুহূর্ত্তে সেই অশ্ব সকলে আরোহণ করিয়া ফেলিবেন, তাহাদের রশ্মি প্রমোক্ষনানন্তর বাধিত হইবে না বলিয়া, সেগুলি লইতে স্বীকার করিলেন না। তৎপরে কর্ণ পর্ব্বতাকার, মেঘ-গম্ভীর-ঘোষ, কপোলস্রাবি-মদলেখা-সমন্বিত, সমরে রিপু-বিমর্দ্দনক্ষম বারণ-বৃন্দ ব্রাহ্মণকে প্রদান করিতে চাহিলেন;—কিন্তু অতিথি ব্রাহ্মণ মুহূর্ত্তে গজকুলেও আরোহণ করিয়া ফেলিবেন বলিয়া তাহাও লইতে ইচ্ছা করিলেন না। কর্ণ অপর্য্যাপ্ত ধনও দিতে চাহিলে, ব্রাহ্মণ-বেশী শক্র প্রথমতঃ তাহা লইবার ভান করিয়াও পরে তাহা লইতে অস্বীকার করিলেন। কর্ণ ভয় করিয়া পৃথিবী দান করিতে চাহিলেন। ব্রাহ্মণ পৃথিবী লইয়া কি করিবেন? দান-শূর কর্ণ পূর্ব্বাজ্জিত নিজ-পুণ্যফল পর্য্যন্ত বিপ্রকে দিতে চাহিয়া বলিলেন—"তেন হি অগ্নিষ্টোমফলং দদামি।"—"তাহা হইলে আমার অগ্নিষ্টোমফল দিতে পারি।" ব্রাহ্মণ তাহাও লইতে চাহিলেন না। "তেন হি যজ্ঞিয়ো দদামি"—"তাহা হইলে আমার নিজ মস্তক কাটিয়া দিতে পারি", কর্ণ এরূপও বলিলেন। ব্রাহ্মণ "অবিহা! অবিহা!" বলিয়াই তাহা লইতে অস্বীকার করিলেন। এবার কর্ণের কিঞ্চিৎ মতিভ্রম ঘটিল। তিনি অর্থীকে প্রসন্ন হইতে অনুরোধ করিয়া, অদেয় বস্তুও দান করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি বলিলেন—

"জন্মৈঃ সহৈব জনিতং মম দেহরক্ষা
দেবাসুরৈরপি ন ভেদ্যমিদং সহাস্থৈঃ।
পেয়ং তথাপি কবচং মম কুণ্ডলাভ্যাং
প্রীত্যা যদা ভগবতো রুচিতং যদি স্যাৎ॥"

"যদি ভগবান অভিথির রুচি হয়, তাহা হইলে আমি দেহের রক্ষাকবচ আমার জন্মের সহিত উৎপন্ন হইলেও, এবং সশস্ত্র দেবাসুর কর্ত্তৃক তাহা অভেদ্য হইলেও, প্রীতির সহিত আমার এই কবচ সকুণ্ডল দান করিতে পারি।" শক্র সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন, "দেহি দেহি!"—"তাহাই দাও, তাহাই দাও।" কর্ণ ব্রাহ্মণের ভাবের দেখিয়া জানিলেন যে, হয় ত ইহা কপট-বুদ্ধি কংসেরই চক্রান্ত,—

বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাস।

[কলিকাতার চৈতন্য লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত অনন্তরেষ এম্. এ. মোনাহান কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ]

ধর্ম্মপাল, কান্যকুব্জবিজয় ও রাষ্ট্রীয় প্রতিপত্তি;—যুদ্ধবিগ্রহ ও তাহার ফলাফল;—ধর্ম্মপালের রাজ্যভুক্তি ও সমসাময়িক কান্যকুব্জ;—দেবপাল ও তাহার প্রতিপত্তি;—দেবপালের সহিত সমসাময়িক সম্বন্ধ;—বাদলস্তম্ভের গুর্জ্জররাজ ও দ্রাবিড়রাজ নিরূপণ;—কলচুরি রাজবংশের শাসনলিপি;—শাসনোক্ত কৃষ্ণরাজ ভোজ ও কাম্বোজ;—তাম্রশাসন ও ধর্ম্মমঙ্গল;—প্রথম বিগ্রহপাল;—নারায়ণপাল;—রাজ্যপাল;—দ্বিতীয় গোপাল;—দ্বিতীয় বিগ্রহপাল;—প্রতীহার রাজগণের আলোচনা, রাষ্ট্রকূটরাজগণের আলোচনা;—প্রতীহার-সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি;—পাল রাজগণের অধিকারভূমি, উত্তর বাঙ্গালায় কাম্বোজ-আক্রমণ;—মহীপাল;—পালরাজগণের রাজত্বকাল।

গোপাল পরলোকে গমন করিলে, ধর্ম্মপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। রমাপ্রসাদ চন্দ প্রণীত গৌড়রাজমালায় ধর্ম্মপালের রাজ্যপ্রাপ্তির কাল সম্বন্ধে বিভিন্ন শাসন-প্রদত্ত প্রমাণের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশদ আলোচনা আছে; তাহার স্থূল ও মূল কথা এই যে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষে অথবা নবম শতাব্দীর প্রথমে তিনি রাজ্যলাভ করেন। ধর্ম্মপালের রাজত্বকালের বিশিষ্ট ঘটনা—কান্যকুব্জ-বিজয়।

ধর্ম্মপাল।

কেবল বাঙ্গালার পাল-রাজবংশের শাসনলিপি নহে, পরন্তু দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট-রাজবংশের শাসনলিপি ও পশ্চিম-ভারতের প্রতীহার-রাজবংশের শাসনলিপি,—বহুসংখ্যক রাজকীয় শাসনলিপি,—সমস্বরে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত করিয়াছে যে,—ধর্ম্মপাল কান্যকুব্জ রাজ ইন্দ্রায়ুধকে রাজ্যচ্যুত করিয়া চক্রায়ুধকে তাহার সিংহাসনে স্থাপিত করেন, এবং এই চক্রায়ুধ তাবধি ধর্ম্মপালের অধীন মিত্র-নৃপতিরূপে বিরাজ করিয়াছিলেন।

কান্যকুব্জ-বিজয় ও প্রাধান্য প্রতিপত্তি।

পালিমপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের একটি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম ও মধ্য-ভারতের বহু বিভিন্ন জাতিকে ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক চক্রায়ুধের কান্যকুব্জাধিপতি-নির্ব্বাচনে সম্মতি জ্ঞাপন করিতে হইয়াছিল; তাহা হইতে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে,—পোষ্য শুধু কান্যকুব্জ নহে,

[illegible] উত্তর-পশ্চিম গৌড়-প্রদেশ, বিন্ধ্য, মালব ও রাজপুতানার [illegible] বিধ্বস্ত ও পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ অনুমান [illegible] আমরা বস্তুতঃ ঐতিহাসিক ভাবে এখন পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে পারি যে,—কান্যকুব্জ-বিজয়ের সময় উত্তর ভারতে ধর্ম্মপালের প্রতিপত্তি অতিশয় প্রবল ছিল।

নারায়ণের সিংহাসনে আরোহণ প্রতিষ্ঠাপিত হইবার পর, বৎসের উত্তরাধিকারী প্রতীহার-রাজ দ্বিতীয় নাগভটের সহিত ধর্ম্মপাল-সহায় চক্রায়ুধের বিরোধ উপস্থিত হয়। গোয়ালিয়রে প্রাপ্ত একখানি প্রতীহার-শিলালিপিতে, চক্রায়ুধ ও ধর্ম্মপাল, উভয়ই নাগভট কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। ধর্ম্মপাল মুঙ্গেরে নারায়ণ-স্বামীর নিমিত্ত রাষ্ট্রকূট-রাজ তৃতীয় গোবিন্দের আশ্রয় লইয়াছিলেন বলিয়া প্রতিভাত হয়। গোবিন্দের পুত্র প্রথম অমোঘবর্ষের রাজ্যশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে,—চক্রায়ুধ ও ধর্ম্মপাল, উভয়ই গোবিন্দের নিকট বশ্য হইয়াছিলেন। এই সকল ব্যাপারে কেবল প্রতীহার ও রাষ্ট্রকূট-লেখের প্রমাণের উপর নির্ভর করা নিরাপদ নহে; কিন্তু, পাল-রাজগণের লিপিগুলিতে এই সকল বিষয়ের উল্লেখ না থাকায়, তাহা যে পাল-প্রতিপত্তির পরিপন্থী হয় নাই—ইহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে। রাধাকুমুদ বাবুর অনুমান হইতেছে যে, রাষ্ট্রকূট-রাজ তৃতীয় গোবিন্দ প্রতীহার-রাজ দ্বিতীয় নাগভটকে পরাভূত করিয়া, রাজধানী হইতে বিতাড়িত করেন, এবং তাঁহার পর ধর্ম্মপাল ও চক্রায়ুধ নির্ব্বিঘ্নে আপন আপন রাজ্য ভোগ করেন, এবং গোবিন্দ-প্রত্যাবর্ত্তনের পর পর্য্যন্ত প্রতীহার-রাজগণ কখনও স্বাধিকারে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন নাই।

[illegible] বিশেষ, বিশেষজ্ঞ হিসাবে, এইরূপ অনুমানের পক্ষপাতী যে,—রাজমহল জিলার [illegible] আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এবং যা [illegible] রাজধানী ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধরূপে [illegible] পারা যায় না। [illegible] যে [illegible] ঐতিহাসিক [illegible] প্রতীহার-রাজগণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

আমা তারানাথ লিখিয়া গিয়াছেন,—ধর্ম্মপাল ৬৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইহা অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু তারানাথের কথা প্রত্যাখ্যান করিবার পক্ষে তিনি যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা সুস্পষ্ট নহে।

ধর্ম্মপালের রাজত্বকাল ও সমসাময়িক কান্যকুব্জ।

যোধপুর রাজ্যে দৌলতপুরে মিহির-ভোজের একখানি তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে;—তাহা কান্যকুব্জে ৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রচারিত হইয়াছিল। ইহা হইতে নিশ্চিতরূপে এরূপ প্রমাণ হয় না যে, প্রতীহার নৃপতিগণ কান্যকুব্জে তাঁহাদের স্থায়ী রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।—কান্যকুব্জ তাঁহাদের সাময়িক-অধিকার-ভুক্ত হওয়াও অসম্ভব নহে। ধর্ম্মপাল ৬৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন—তারানাথের এই উক্তি যদি আমরা গ্রহণ করি, এবং ৮০০ খ্রীষ্টাব্দকে যদি ধর্ম্মপালের রাজ্য-প্রাপ্তির কাল বলিয়া গণনা করি, তাহা হইলে, উপরি-উল্লিখিত অব্দ ধর্ম্মপালের রাজত্বকালের ভিতরই পড়িবে। ধর্ম্মপালের রাজত্বকালের পরিমাণ সম্বন্ধে তারানাথের প্রমাণকে পরিত্যাগ করিলেও, ধর্ম্মপাল যে ন্যূনকল্পে ৩২ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা খালিমপুর-তাম্রশাসনেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারণ, এই তাম্রশাসন তাঁহার রাজত্বকালের দ্বাত্রিংশৎ বর্ষের অঙ্ক-সংবলিত। তাঁহার উত্তরাধিকারী দেবপাল যে অন্যূন ৩৩ বৎসর কাল রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণও আমরা মুঙ্গেরগিরি (মুঙ্গের) শাসনলিপিতে প্রাপ্ত হই। অতএব, আমরা যদি ৮০০ খ্রীষ্টাব্দকে ধর্ম্মপালের সিংহাসনারোহণের আনুমানিক কাল বলিয়া ধরিয়া লই, তাহা হইলে, যে ৮৪৩ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জ নিঃসন্দিগ্ধরূপে মিহির-ভোজের অধিকারে ছিল, তাহা ধর্ম্মপালের অথবা দেবপালের রাজত্বকালের ভিতরই পড়িবে।—কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই অধিকারকাল যে কত দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল, তাহা আমাদিগের বিদিত নহে।

প্রথম পাল-নৃপতিগণের রাজত্বকাল সম্বন্ধে এবং তাঁহাদিগের সহিত প্রতীহার-রাজগণের যুদ্ধ বিগ্রহের ফলাফল সম্বন্ধে এখনও অনেক সংশয়ের অবকাশ আছে। কিন্তু ধর্ম্মপাল যে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, এবং তাহার অল্পকাল পরেই কান্যকুব্জ বিজয় করিয়া তদ্দেশে কিয়ৎকালের নিমিত্ত আপনার সার্ব্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং পরে প্রতীহার রাজগণের সহিত বাঙ্গালার পালরাজগণের ও তাঁহাদিগের মিত্রশক্তি দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট-রাজগণের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ বিগ্রহ হয়,—ইহা একরূপ অখণ্ড-

মগধই পোণ্ড্রবর্দ্ধন হইয়াছে। এই যুদ্ধ বিগ্রহে বহু ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, এবং পরিবর্ত্তনকালে অশান্তিও দেখা দিয়াছে; কিন্তু এই যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যেই অবশেষে গুপ্তবংশীয় রাজগণ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে কান্যকুব্জে আপনাদিগকে স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং সম্ভবতঃ মগধ ও তীরভুক্তি (মিথিলা) প্রদেশও অধিকার করেন। ধর্ম্মপাল গৌড়বর্দ্ধনের জনৈক সংস্কারক ছিলেন বলিয়া প্রতিভাত হয়। তাঁহার রাজত্বকালে, এবং তাঁহারই উৎসাহে, সুবিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত হরিভদ্র মহাযানী বৌদ্ধগণের প্রধানতম ধর্ম্মগ্রন্থ অষ্টসাহস্রিকার ভাষ্য প্রণয়ন করেন।

ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকূট-রাজকুমারী রণ্ণাদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন;—রাষ্ট্রকূট-রাজগণের সহিত তাঁহার রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের বিচার করিয়া দেখিলে, ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

খালিমপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে লিখিত আছে,—পল্লীগ্রামের গোপালক-বধূদের মুখে, ক্রীড়ারত শিশুগণের কণ্ঠে, এবং পিঞ্জরাবদ্ধ শুকপক্ষিগণের কণ্ঠে তিনি আপনার প্রশংসাগীতি শ্রবণ করিয়া সবিনয়ে মস্তক অবনত করিয়া এক-দিকে মুখ ফিরাইয়া লইতেন।—ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি,—ধর্ম্মপাল লোকহিতৈষী ও লোকপ্রিয় নরপাল ছিলেন।

ধর্ম্মপাল স্বর্গারোহণ করিলে, তাঁহার পুত্র দেবপাল রাজ্যলাভ করেন। তাঁহার রাজত্বকালের ত্রয়স্ত্রিংশৎ রাজ্যাঙ্ক-সংবলিত মুঙ্গেরলিপি (মুঙ্গের) সিপি-লিপি হইতে, এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পৌত্র নারায়ণ পালের রাজত্বকালের পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্ক-সংবলিত নারায়ণপাল-প্রদত্ত মুঙ্গেরগিরির অপর একখানি শাসনলিপি হইতে, এবং দেব-পালের মন্ত্রী দর্ভপাণির প্রপৌত্র ও নারায়ণ পালের প্রধানামাত্য গুরব মিশ্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাদলস্তম্ভ নামে সুপরিচিত স্তম্ভের গোদিত লিপি হইতে, দেব-পালের রাজত্বের বিবরণ আমরা কিয়ৎপরিমাণে অবগত হইতে পারি। এতদ্ব্যতীত দেবপাল সমসাময়িক নৃপতি-গণের নিকট হইতে যে সকল উপঢৌকন লাভ করিয়াছিলেন, তাহার তালিকা হইতেও তাঁহার রাজ্যের বিস্তৃতি সম্বন্ধে কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়।

দেবপাল ও তাঁহার দিগ্বিজয়।

দেবপাল মুঙ্গেরগিরিতে আপনাকে পরমসৌগত, পরমোপাসক, পরমবুদ্ধ, পরমধর্ম্ম, পরমসঙ্ঘ, পরমদান, পরমশীল, পরমক্ষান্তি, পরমবীর্য্য, পরমধ্যান, পরমপ্রজ্ঞা, পরমবিহারকারী, পরমকারুণিক, পরমমৈত্রীবিহারী, পরমমুদিতা-বিহারী, পরমোপেক্ষাবিহারী, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদৃত, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদাপক, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদায়ক, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদাপনাভিরত, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদাপনাভিরতি-সমাদায়ক, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপক, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরত, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদায়ক, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপক, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরত, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদায়ক, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপক, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরত, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদায়ক, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপক, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরত, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদায়ক, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপক, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরত, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদায়ক, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপক, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরত, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদায়ক, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপক, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরত, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদায়ক, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপক, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরত, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদায়ক, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপক, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরত, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদায়ক, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপক, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরত, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদায়ক, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপক, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরত, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদায়ক, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপক, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরত, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদায়ক, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপক, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরতি-সমাদাপনাভিরত, পরমবোধিচর্য্যাচরণ-সমাদাপনাভিরতি

করা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মিত্রজার সহিত একমত হইয়া আমরাও ক্ষান্ত হইতে পারিতাম।

দেবপালের সহিত জয়পালের কি সম্বন্ধ, এবং ধর্মপালের সহিতই বা তাহার কি সম্বন্ধ, তাহা স্পষ্টাক্ষরে পরিব্যক্ত থাকিলে, আমরা বাঁচিয়া যাইতাম। এক শ্রেণীর দেবপাল ও জয়পালকে ধর্মপালাত্মজ বাক্‌পালের পুত্র বলিয়াই কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিতেছেন। মুঙ্গের-তাম্রশাসনে দেবপাল জয়পালকেই আপনার পিতা বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন। দেবপালের সহিত জয়পালের সম্বন্ধ।

মুঙ্গেরাধিপতি মহারাজাধিরাজ শ্রীদেবপাল, এবং ভাগলপুরাধিপতি মহারাজাধিরাজ শ্রীজয়পাল, বাক্‌পালের পুত্র ও দেবপালের পিতৃব্যপুত্র। রমাপ্রসাদ চন্দ ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের মতে, দেবপাল ও জয়পাল উভয়েই ধর্মপালের পুত্র, এবং তন্মধ্যে দেবপালই জ্যেষ্ঠ। বিলাতে রক্ষিত খাসিয়া পাহাড়ীয়ে সংরক্ষিত "ছান্দোগ্য-পরিশিষ্ট" নামক হস্তলিখিত পুঁথি দ্বারা এতদুভয়ের মতই সমর্থিত হইয়াছে বলিয়া প্রতিভাত হয়। উক্ত গ্রন্থে জয়পাল কর্ত্তৃক তাঁহার পিতা বাক্‌পালের শ্রাদ্ধ কার্য্যের উল্লেখ আছে। মাধাইনগরের তাম্রশাসনে, যে পদ দ্বারা জয়পাল ও দেবপালের সম্বন্ধ সূচিত হইয়াছে, তাহা 'সহোদর ভ্রাতা' ও 'পিতৃব্যপুত্র ভ্রাতা'—উভয় অর্থেরই সূচনা করে কি না, তাহাও বিবেচ্য; সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত যোগাভের ব্যক্তিগণ সে প্রশ্নের মীমাংসা করিবেন।

দেবপাল উৎকল-কুল-উন্মূলিত করিয়াছিলেন, এবং হূণ, দ্রাবিড় ও গুর্জ্জর রাজদেরও গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিলেন। এই সকল যুদ্ধ বিগ্রহ সম্বন্ধে আমরা বিশেষরূপে কোনও তথ্যই অবগত নহি। নালন্দা-তাম্র-লিপিতে দ্রাবিড়-রাজের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রমাপ্রসাদ চন্দ বাঙ্গালীর ইতিহাস বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়েই তাহা অতীব রাষ্ট্রকূট-নৃপতির প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন;—রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, উহা তৃতীয় গোবিন্দের উত্তরাধিকারী প্রথম অমোঘবর্ষকেই লক্ষ্য করিতেছে। তাঁহার প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস-বিষয়ক ইংরেজী পুস্তকের ৫৭ পৃষ্ঠায়, দেবপালের সহিত রাষ্ট্রকূট-নৃপতির সম্বন্ধ-সম্পর্কে তিনি অমোঘবর্ষের নীলকণ্ঠ-লিপি হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন,—তিনি অবশ্য-অবশ্য ইহা দ্রাবিড়-রাজের ও দ্রাবিড়-রাজ বলেন।

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] দেখাইয়া দিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible]

ইহার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহাতে ত্রিহুতের অধীন কলসপোতের গণ্ডিত্বের ভীরভূক্তি বা ত্রিহুতের একখানি গ্রাম-দানের কথা সন্নিবিষ্ট আছে।

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষপাদে, অথবা দশম শতাব্দীর প্রথমে নগে কান্যকুব্জের প্রতীহার-রাজগণ পশ্চিম হইতে বাঙ্গালায় পাল-রাজগণের অধিকার সঙ্কোচ করিতে থাকেন, এবং গয়া ও তৎসন্নিকৃষ্ট স্থানে প্রাপ্ত শাসনাদিতে প্রমাণিত হয় যে, কান্যকুব্জাধিপতি মহেন্দ্রপাল বা মহেন্দ্রায়ুধের রাজত্বকালে মগধের কিয়দংশ তাঁহার অধিকৃত ছিল। সুতরাং নারায়ণপালের রাজত্বকালের শেষভাগ বিশেষ মূল্যবান্ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। নারায়ণপাল-সম্বন্ধে, গয়াতে প্রাপ্ত যে দুইখানি শিলালিপির কথা বলিয়াছি, তাহাতে প্রমাণিত হইতেছে—তাঁহার রাজত্বকালের সপ্তদশ বর্ষে নিশ্চিতই মুঙ্গের, এবং সম্ভবতঃ ত্রিহুতের কিয়দংশ তাঁহার অধিকৃত ছিল। দিনাজপুর জেলার পুর্ব্ব-প্রান্তে যমসবারীহাটের সন্নিকটে রাদল-স্তম্ভ নামে যে সুপরিচিত স্তম্ভের উৎকীর্ণ লিপিতে প্রমাণিত হয়,—নারায়ণপালের প্রধান মন্ত্রী গুরব মিশ্র কর্ত্তৃক উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই গুরব মিশ্রের পিতা কেদার মিশ্র নারায়ণপালের পিতা শূরপালের, বা প্রথম বিগ্রহপালের প্রধান অমাত্য ছিলেন, এবং তাঁহার বৃদ্ধপিতামহ দর্ভপাণি দেবপালের মন্ত্রিত্ব করিতেন, এবং এই দর্ভপাণির পিতা দর্দ্দ ধর্ম্মপালের মন্ত্রী ছিলেন।—এইরূপে পালরাজগণের মন্ত্রিত্ব পদ চারি পুরুষ ধরিয়া একই বংশের অধিকৃত ছিল।

নারায়ণপালের উত্তরাধিকারী তদীয় পুত্র রাজ্যপাল তুর্দ্দ উপাধিধারী রাষ্ট্রকূট-রাজের কন্যা ভাগ্যদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। রমা-প্রসাদ চন্দ

রাজ্যপাল।

অনুমান করিয়াছেন,—এই তুঙ্গ বস্তুতঃ রাষ্ট্রকূট-রাজবংশের দ্বিতীয় কৃষ্ণের পুত্র জগতুঙ্গ। রাজ্যপালের সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছুই বিদিত নাই।

রাজ্যপালের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় গোপাল রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন। দুইখানি শাসনলিপি হইতে তাঁহার সম্বন্ধে তথ্যাদি জানা যায়।

দ্বিতীয় গোপাল।

পাটনার নিকটস্থ, প্রাচীন নালন্দার ধ্বংসাবশেষভূমি 'সরগাঁও'এ প্রাপ্ত লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়—গোপালের রাজত্বের প্রথম বর্ষে অনুম্লিখিতনামা এক জন রাজা পুরুষ সেই স্থানে প্রতিষ্ঠিত বাগীশ্বরী শ্রীমূর্ত্তিকে সুবর্ণপিণ্ড দ্বারা মণ্ডিত করিয়া দিয়াছিলেন। বুদ্ধ গয়ার মহাবোধি-মন্দিরের তোরণস্তম্ভে অপর যে শিলালিপিখানি প্রায় হইবর্ষ দিয়াছে, তাহাতে

কোনও অব্দের উল্লেখ না থাকিলেও, গোপালের রাজত্বকালে শক্তসেন নামক অনেক মূর্ত্তি কষ্টিপাথরে একটি বুদ্ধমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠালিপি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

পালবংশের অব্যবহিত পরবর্ত্তী নৃপতি গোপালের পুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপাল। বিক্রমপুরের মাহবঙ্গে, বিগ্রহপাল নামক জনৈক ভূপতির রাজ্যাঙ্কের ষড়বিংশবর্ষে লিখিত একখানি পুঁথি সুরক্ষিত আছে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্ভবতঃ লিপিতত্ত্বগত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া অনুমান করেন যে, এই বিগ্রহপালই দ্বিতীয় বিগ্রহপাল। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তিনি অন্যূন ২৬ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে আমরা কোনও তথ্য আমরা অবগত নহি। তাঁহার পর, তাঁহার পুত্র মহীপাল রাজা হন। দিনাজপুর জেলার বাঁগড়ে প্রাপ্ত একখানি তাম্রশাসনে বর্ণিত আছে—তিনি তাঁহার সকল শত্রুকে নির্জ্জিত করিয়া তাঁহার বিলুপ্ত পিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন।

গুর্জ্জরাজ মিহির-ভোজ বা প্রথম ভোজ খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দের মধ্যভাগে কান্যকুব্জ বিজয় করিয়াছিলেন, তাহা আলোচিত হইয়াছে। যদি নামা তারানাথের বর্ণনা-অনুসারে ধর্ম্মপালের রাজত্বকাল ৬৪ বৎসর বলিয়া ধরিয়া লই, তাহা হইলে, গৌড়াধিপতি ধর্ম্মপালের রাজত্বকালেই উল্লিখিত কান্যকুব্জ বিজয় সংঘটিত হইয়া থাকিবে।

তারানাথের আলোচনা।

প্রথম ভোজের পর, তাঁহার পুত্র মহেন্দ্রপাল বা মহেন্দ্রায়ুধ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ ও ৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ যে তাঁহারই রাজত্বকালের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহা ঐতিহাসিক প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। মহেন্দ্রপালের পর হইতে পরীহার-রাজবংশের সকল নৃপতির নামের শেষাংশ 'পাল' এবং তাঁহাদের অনেক নাম গৌড়ীয় পাল-রাজবংশের অনেক নামের সহিত অভিন্ন দেখা যায়, সুতরাং কোনটি যে প্রতীহার-রাজবংশের, এবং কোনটি যে বাঙ্গালার পালরাজবংশের, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। নিশ্চয়ই ৮৯৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই প্রথম ভোজের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। মহেন্দ্রপাল যে মগধের কিয়দংশ আপন অধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে।—এ বিষয়ে আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। ভোজের পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় ভোজ, এবং দ্বিতীয় ভোজের পর তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মহীপাল নৃপতি-পদ গ্রহণ করেন। কান্যকুব্জ-রাজ মহীপালের রাজত্ব ৯১৪ খৃষ্টাব্দে বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। অতএব, দ্বিতীয় ভোজের রাজত্বকাল ৯০৭ হইতে ৯১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ধরা

পুরাতন ও নূতন।

পুরাতন-বিদায়।

তুমি যে যাও গেয়ে, দিয়ে গেলে কি ?
বিদায় নিতে শিরে নামিয়া আঁখিনীরে,
চকিত ধীর ধীরে আনত-আঁখি !
কেবলি হেসে গেলে করুণ মিঠি—
হেমন্ত বনমাঝে গোপনে ফুল রাজে
বিতরি' মৃদু বাস সাঁঝেতে ফুটি'।
যেমন দীঘ হারা চকিত পাখী

জমে সে দিনগুলি। বিলাপি' একা,
তুমি কি সেই মত ভায়ে সরিৎ
কিবা, আজো সে মিগ্ধ নবীন নাম
ভেব না তোমারে সে ভুলায়ে রয়
নবীন নবা এসে পরাণে রাজে
বিদায়-গত বাসে। মিলন সব মাঝে
তেমনি কিবা আছে তাহাতে তুমি ?

নূতন-বরণ।

রাঙ্গা-শিরোপা পরিয়া শিরসে
কত দূর হতে আসিছ তুমি,
কত মিনতি যত করিয়া লঙ্ঘন,
জ্বলন্ত-যানে যাত্রী আরোহণ,
সিন্ধু-নদীর করিয়া সেবন
ম্লান চরণে আসিছ তুমি ?
তোমার লাগি কাঁটায় কানন,
তাহাতে সদা ভরেছি স্বপন,
তোমারই আশায় করি চয়ন,
ও ঐশ্বর্য্যের নিশ্চিন্ত তুমিও
কত অযুত ফুল সে ফুলল
তোমারই আশায় রয়েছ ঘুমি',
এত দূর হতে আসিছ তুমি ?
কত তোমারই তরুণ অঙ্গনে পরশে
সুখ যত রস কনক-রৌদ্র-নিবরে
সকল সুখের সুরার আধারে গভীর
সে নিজনে ও কর চুমি',
কত দূর হতে আসিছ তুমি ?
সন্ধ্যাসচ্চা যে দ্যুতি করে সন্ধান,
অনে ঘুঁছ করে দুখের দাগ,

স্বপন রচিতে কাহারে সন্ধান
কত সুহাইতে চয়ন চুমি।
কারে নিশিত থাকতে লুটাতে তুমি
কত দূর হতে আসিছ তুমি ?
সর্ব্বজ-তুমি, বারা নাহি যাও !
প্রাণে ঘায়ে-ঘায়ে আঘাতি' যাও,
চির-অনলস নিশি দিশি ধাও,
লয়ে দুই করে গরল, আঁখি',
এত দূর হ'তে আসিছ তুমি ?
মহাকাল-সৃষ্টি-কমলোত্থিত
চির-পুলকিত—নিত্য পুষ্পিত,
নীরব মুখর রহস্যান্বিত,
নব-রস-পূত তুমিও তুমি।
কত দূর হতে আসিছ তুমি ?
অন্তর-ভাবে ঝঙ্কার' সাথে
হৃদয়-বীণা নীরবে বাজাও—
দীপক ভৈরবী মেঘমল্লারে,
ঝরে ঝর-ঝরা ধরণী চুমি',
এস বন্দিত তোমারে নমি।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

সংগ্রহ।

সভাপতির অভিভাষণ।

[সাহিত্য-সভার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কর্তৃক পঠিত।]

মাননীয় সুধীবৃন্দ—

পুত্র যে বয়সে উপনীত হইলে, রীতিপ্রিয়তার আহার সহিত মিত্রবর অচলবুদ্ধির উপদেশ দিয়াছেন, সাহিত্য-সভা সেই বয়সে উপবীত হইয়াছে। * * আপনারা এতদিন ইহাকে যে পথে পরিচালিত করিয়াছেন, ইহা সেই পথেই চলিয়া শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করিয়াছে। সেই পথের সংস্কার করিয়া ইহা দৃঢ়তা ও একাগ্রতার সহিত কর্ত্তব্যসাধনে অগ্রসর হইবে। প্রথম যৌবনের সবেগ আবেগে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া কর্ত্তব্যবিচ্যুত হইলে, আপনারা সদুপদেশদানে ইহাকে সুপথে পরিচালিত করিবেন, পথিমধ্যে অশক্ত হইলে পথনির্দ্দেশ করিবেন। ইহা যেন কখনও আপনাদের সাহায্য ও সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত না হয়।

* * * *

অধুনা এক বিষয় চিন্তা সমগ্র বঙ্গদেশের—শুধু বঙ্গদেশ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের অধিবাসীর চিত্ত অধিকার করিয়াছে। তাহা বর্ত্তমান ভীষণ সমর। ইউরোপে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া ক্রমে সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। বিশ্ব শতাব্দীর এই কুরুক্ষেত্রের বিষয় চিন্তা করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে।

আমাদের মহামহিমান্বিত সম্রাট এই ভীষণ যুদ্ধে জয়ের পক্ষে—ধর্ম্মের পক্ষে—অস্ত্রধারণ করিয়াছেন। পৃথিবী শান্তির সুখময় ক্রোড়ে সুপ্ত ছিল। জার্ম্মানী সেই নীরবে ধূমে অগ্নি সংযোগ করিয়াছে। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে লোল জিহ্বা বিস্তার করিয়া বিষানল সমস্ত গ্রাস করিতেছে। শ্রাবণের ধারার ন্যায় নরশোণিত বর্ষিত হইয়াও সে অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিতে পারিতেছে না। সে জার্ম্মানীর উৎকট রাজলিপ্সা এই মহা অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহাতে তাহার সেই বাসনা চিরদিনের জন্য প্রশমিত হয়, আর জগতের শান্তিকে কলঙ্কিত না করে, তজ্জন্য সমস্ত সভ্যজগৎকে বদ্ধপরিকর হইয়া কার্য্য করিতে হইবে।—

ভারতের পক্ষে এই যুদ্ধ অবিমিশ্র দুঃখের কারণ নহে। এই যুদ্ধে ভারতবাসী তাহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠার রাজভক্তির পরিচয় দিবার অপূর্ব্ব অবসর পাইয়াছেন।

"প্রতিজ্ঞায় অটলতা, সাহসে দুর্জ্জয়,
বিঘ্ন কালে বীরে করে নিজ নিজ পথ।"—

কবির এই উক্তিকে অসার প্রতিপন্ন করিয়া দলে দলে বঙ্গীয় যুবক পৃথিবীর গর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতির সহিত যোগ সেনার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদের রাজার কার্য্যে, দেশের কার্য্যে, জগতের কার্য্যে, প্রাণ বিসর্জ্জন জন্য ছুটিয়াছে। প্রাণের মায়া উপেক্ষা করিয়া রণক্ষেত্রে মৃত্যুর মোহাবৃতির মধ্যে বঙ্গীয় সেনা অতুল্য সাহস সৈন্যবল বহন করিয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া আসিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতেছে। এ দৃশ্যে বঙ্গবাসীর মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, আমাদের হৃদয়ে কত আশা জাগিয়া উঠিতেছে।

ভগবানের নিকট প্রার্থনা, আমাদের সম্রাট এই যুদ্ধে জয় লাভ করুন। অন্যায়ের গর্ব্বোদ্ধত মস্তক ন্যায়ের চরণতলে লুণ্ঠিত হউক।

সাহিত্যের দিক্ হইতেও যুদ্ধের সম্বন্ধে ভাবিবার অনেক কথা আছে। এই যুদ্ধে পাশ্চাত্য জগতে এক ভীষণ আলোড়নের সূত্রপাত হইয়াছে—কেবল বাহ্য জগতের আলোড়ন নহে, অন্তর্জগতেরও আলোড়ন। যুদ্ধের অবসানে ইউরোপীয় সমাজকে কি ভাবে ও কি আদর্শে গঠিত করিতে হইবে, ইহাই এখন পাশ্চাত্য মনীষিমণ্ডলীর চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়াছে। পাশ্চাত্য জগৎ বুঝিয়াছে, বাহ্য উন্নতি—Material civilization হৃদয়ে লালসার উৎকট বহ্নির সৃষ্টি করে। সে লালসাকে সংযত না করিলে, তাহা

"হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।"

এই লালসা—মানুষকে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য করে—মানুষ-পাগল হইয়া যায়, পশুর ন্যায় অত্যাচার করে। কোটী কোটী নরনারী হৃদয়ের শোণিতপাত করিয়া কত যুগ ধরিয়া যে ধন সঞ্চয় করিতেছে, তাহারই আবার সেই প্রাণসম ধনকে মুহূর্ত্তের মধ্যে সমুদ্রের অতলজলে, ডুবাইয়া, অথবা জ্বালাইয়া পুড়াইয়া ছারখার করিয়া, আনন্দে অট্টহাস্যে করতালি দিয়া নৃত্য করিতেছে। যাহাতে এই পৈশাচিক কার্য্য অতি সত্বর সম্পাদিত হয়, তাহার জন্য কত অর্থব্যয়ে কত বিজ্ঞান উদ্ভাবিত হইতেছে! কোটী কোটী মুদ্রা প্রত্যহ ধূমে পরিণত হইয়া আকাশে মিলাইয়া যাইতেছে। যাহাতে দেশের লোকবৃদ্ধির জন্য কত চিন্তা করিয়া কত উপায়ের উদ্ভাবন করিয়াছে, তাহারই আবার কিরূপ সহজে নূতন লোকহত্যা করিয়া দেশকে শ্মশান করিতে পারা যায়, তাহার জন্য আয়োজন চেষ্টা করিতেছে। ইহাকে উন্মাদ না বলিয়া কি বলিব? আক্ষেপের বিষয় এই যে, ইহাদেরই নিকট আমরা সভ্যতা শিক্ষা করিতে যাই, ইহাদেরই আদর্শে আমাদের সমাজগঠন করিতে উদ্যত হই।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এক্ষণে বুঝিয়াছেন যে, তাঁহাদের সভ্যতা প্রকৃত মনুষ্যত্ব-বিকাশের অনুকূল নহে; তাহাতে পশুত্বের বিনাশ সাধিত না হইয়া বরং তাহার পুষ্টিই হইয়া থাকে। বাহ্য আবরণের মত তাহা পশুত্বকে ঢাকিয়া রাখে মাত্র। সেই আবরণ ছিন্ন হইলে তাহার প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠি। হিন্দু সভ্যতা মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ সাধন করিয়া তাহাকে দেবত্বে পরিণত করিতে চায়—পাশ্চাত্য সভ্যতার আমরা তাহার বিপরীত ফল ফলিতে দেখি। হিন্দু সভ্যতার সহিত পাশ্চাত্য সভ্যতার ইহাই প্রভেদ। পাশ্চাত্য সভ্যতার এই ভ্রান্ত পরিচয়ের ফলে, ক্রমে পাশ্চাত্য সাহিত্যেরও আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা।

হৃদয়ে দেবোদ্রেকের প্রতিকূল সমস্ত প্রভাব হইতেই হিন্দু শাস্ত্রকারগণ সমাজকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য-সভ্যতানুরাগী কেহ কেহ হিন্দুসমাজকে 'অসভ্য' বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। ইহা হিন্দু সমাজের পক্ষে গৌরব কি অগৌরবের কথা, বলিতে পারি না। আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকগণ অনেক রোগকে 'সংক্রামক' বলিয়া আমাদিগকে সাবধান করিয়া দেন। 'সংক্রামক' বলিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে যে কেহ স্পর্শ করে, সেই যে আক্রান্ত হয়, তাহা নহে। কিন্তু সাবধানতা অতি কঠিন, তাহা যে না মানে, জানিতে পারা যায় না, তাই চিকিৎসকের সাবধানতা।

চালিয়া চলিতে হয়। যিনি সংসারের পিচ্ছিল পথে চলিতে গেলে পদে পদে স্খলিতচরণ হন, হিন্দু শাস্ত্র তাঁহাকে বিশেষভাবে সাবধান ও সতর্ক করিয়া দিয়াছেন—কার্য্যের অনুরোধে আজকাল অনেককে অনেক অসভ্যদেশে অল্পবিস্তর কাল বাস করিতে হয়। সেই সকল দেশে নৈতিক কুষ্ঠরোগগ্রস্ত জাতিদিগের সহিত মিশিয়া তাঁহাদের অনেকেরই পরিণাম কিরূপ হইয়া থাকে, তাহা যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই বুঝিবেন, হিন্দু এত শুচিবায়ুগ্রস্ত কেন! চৈতন্যদেবের এক ভক্ত বীরলোকের নিকট হইতে ভিক্ষা লইয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহার মুখদর্শন করেন নাই। বুদ্ধদেব ভিক্ষুণী সম্প্রদায়ের সৃষ্টির বিরোধী ছিলেন। এ সমস্ত বিধিনিষেধের মুখ্য উদ্দেশ্য—দুর্ব্বল মনুষ্যকে নৈতিক ব্যাধির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ করা।

অনেকে মনে করেন, প্রাচীন হিন্দুরা বুঝি একেবারে বাহ্য উন্নতির প্রতি বীতরাগ ছিলেন। তাহা নয়। হিন্দুরা রাজ্যশাসন করিতেন—ধন উপার্জ্জন করিতেন; হিন্দু নৃপতি ও ধনিগণ ভোগবিলাসেও পরাঙ্মুখ ছিলেন না। কিন্তু এ সকলেরও একটি সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল। উৎকট লালসার বিকট পরিণামের কথা হিন্দুশাস্ত্র নানারূপে তাঁহাদের স্মৃতিপথে উদ্রিক্ত করিয়া দিত। হিন্দুর ভোগবিলাস তাঁহার পোষাকের মত ছিল—ইচ্ছা করিলেই তিনি তাহা উন্মুক্ত করিয়া দিতে পারিতেন—এমনকীর মত তাহা রক্তের সহিত মিশিয়া যাইতে পারিত না।

হিন্দুর সাহিত্য এই উচ্চ আদর্শেই গঠিত হইয়াছে। হিন্দু নৃপতি এক দিকে যেমন ভোগী ছিলেন, বীর ছিলেন, অপর দিকে তেমনই সর্ব্বস্ব দান করিয়া মৃৎপাত্রে আহার করিতেও ক্লেশ বোধ করিতেন না। বর্ত্তমান যুদ্ধের পরিণামে, ইউরোপে আমাদের এই আদর্শ, অন্ততঃ আংশিক ভাবেও অবলম্বিত হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। অথচ আমরা তাহা ত্যাগ করিয়া বিভ্রান্তির আদর্শে সমাজ-গঠন করিবার চেষ্টা করিতেছি।

কিন্তু যেখানেই আমরা প্রাচীন আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইতেছি, সেইখানেই অনর্থের সৃষ্টি হইতেছে। গুরুশিষ্য সম্বন্ধের কথাই বলি। গুরুর প্রাচীন আদর্শ ত্যাগের ফল। দোষ আবৃত করে বলিয়া শিক্ষয়িত্রী নাম হইয়াছে। গুরুর নিকট শিষ্য—

"শরীরকৈব বাচঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়মনাংসি চ।
নিয়ম্য প্রাঞ্জলিস্তিষ্ঠেৎ বীক্ষমাণো গুরোর্মুখম্।"

স্বয়ং গুরুনিন্দা করা দূরে থাকুক—

"গুরোর্যত্র পরীবাদো নিন্দাবাপি প্রবর্ত্ততে।
কর্ণৌ তত্র পিধাতব্যৌ গন্তব্যং চ ততোঽন্যতঃ।"

আর এখন গুরু-নিন্দার ত কথাই নাই, গুরু-প্রহার পর্য্যন্ত আমাদের দেশের ছাত্রদিগের গৌরবের বস্তু হইয়া দাঁড়াইতেছে। কেহ তাহাদের নিন্দা করিলে ইউরোপের ছাত্রদিগের উদাহরণ দিয়া সেই কার্য্যের সমর্থন করা হয়।

আমাদের দেশে কেহ কেহ স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধও পাশ্চাত্য আদর্শে গঠন করিতে চাহেন।

স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ।

আমাদের শাস্ত্রে স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলে—স্ত্রী কেবল ভোগের সাথী নহেন, তিনি ধর্ম্মকার্য্যের সহায়। স্বামী ও স্ত্রীর এক হৃদয়,

"সমানী ব্রিত্র বেবাঃ, সমানো ব্রাত্রানি বো।
সমাভারিবা সলাভ, সমু বেত্রী বধাসু বো।

[সমদেবতা আমাদের হৃদয়কে মিলিত করুন। সমদেবতারা মিলিত করুন। [illegible] করুন। বিধাতা মিলিত করুন। ফলদাত্রী সরস্বতী মিলিত করুন।]

"অন্নপাশেন মণিনা প্রাণস্যেণ বৃহ্মিনা।
বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে।"

[হে বধূ, অন্নিরূপ ব্যাপক ফাঁদ দিয়া, মহতুল্য প্রাণরূপ সূত্র দিয়া, সত্যরূপ গ্রন্থি দিয়া (আমিদের স্নেহ ও মন) তোমার হৃদয় ও মন এক সঙ্গেই বন্ধন করি।]

"যদেতৎ হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব।"

[তোমার এই যে হৃদয়, তাহাই আমার হৃদয়, এবং আমার এই যে হৃদয়, ইহাই তোমার হৃদয়।]

কিন্তু এই হৃদয়ের মিলনে এখন অনেকে সন্তুষ্ট নহেন। পাতিব্রত্য শব্দটাকে নিতান্ত "অথলিক"। তাঁহাদের আদর্শ—নারী স্ত্রী স্ব-স্ব-প্রধান হইবে; পরস্পর পরস্পরের প্রতিযোগিতা করিবে; একই গার্হস্থ্যের জন্য পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে ভোট সংগ্রহ করিয়া বেড়াইবে। ইহার ফলে ইউরোপে নারী তাঁহার স্বভাবসুলভ গুণরাজি হারাইতেছেন, তাঁহার কুমার বৃত্তি-সকল বিনষ্ট হইতেছে। মাতৃত্বের গৌরব এখন আর তাঁহার আকাঙ্ক্ষণীয় নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই বিষম ভাববিপর্যয়ে বিচলিত হইয়াছেন; আর আমরা সমাজে সেই বিপ্লব আনিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছি।

আর কত কথা বলিব! আমার এ সকল কথা নূতন নহে। ইতঃপূর্বে বহু যোগ্যতর ব্যক্তি এ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। নিজের ক্ষুদ্রশক্তি অনুসারে সাহিত্য-সভার বিগত কয়েকটি অধিবেশনে আমি আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে এই বিজাতীয় আদর্শের অনিষ্ট প্রয়াসের আলোচনা করিয়াছি। সুখের বিষয়, সে আলোচনায় কিছু ফল ফলিয়াছে। [illegible] বিরুদ্ধ পক্ষ আমার মস্তকে তিরস্কারের পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছেন। বাস্তবিকই আমি তাহা সুখেই বহিয়া মনে করি। এক মহাপুরুষ বিপক্ষ কর্তৃক প্রহৃত হইয়াও বলিয়াছিলেন—Strike but hear—প্রহার কর, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু আমার কথাগুলি শ্রবণ কর। আমিও তাই বলি। আমি স্তুতিতে কখনও আত্মবিস্মৃত হই নাই, নিন্দাতেও বিচলিত হইয়া কর্তব্যচ্যুত হইব না। আমার করযোড়ে প্রার্থনা—সাহিত্যকে বিজাতীয় আদর্শে পরিণত করিয়া ভুলিও না। আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখ। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে যে পরিবর্তন আবশ্যক, তাহা করিতে হইবে, পোষাক খানা ভাঙ্গিয়া তাহার পরিবর্তে বড় বড় জামালা বসাও, ক্ষতি নাই; কিন্তু দোহাই তোমাদের ঠাকুরদালান ভাঙ্গিয়া সেখানে বারুচী খানার প্রতিষ্ঠা করিও না। অর্ধোপার্জ্জন করিয়া বড় বড় হোটেলে খাইয়া আমরা সুখী হইব; কিন্তু বৎসরান্তে একবার মহামায়াকে বাড়ীতে আনিয়া দরিদ্র ভিক্ষুক প্রতিবেশীদিগকে পরিতোষসহকারে আহার করাইও। চিনির বিনিময়ে মাটী দিও না। বৈশিষ্ট্য হারাইলে জাতির জাতীয়ত্ব থাকে না। যদি কৃত্রিমতাই নব্য জগতের [illegible] হয়, তবে [illegible]

এই বাক্যহীনতার প্রসঙ্গে আমি এই স্থানে আমার নমস্য পূজনীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত সম্প্রদায়ের নিকট করযোড়ে একটি নিবেদন করিব। হিন্দুর শিক্ষা ও সভ্যতার ধারা তাঁহারাই এখন বজায় রাখিয়াছেন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ হিন্দু সমাজের আদর্শ ছিলেন। এখনও প্রাচীন হিন্দু আদর্শ অন্বেষণ করিতে হইলে, আমরা তাঁহাদের গৃহেই গমন করিয়া থাকি। কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে, তাঁহাদের অনেকের গৃহে এখন আর সে আদর্শ দৃষ্টিগোচর হয় না। একজন লোকচরিত্রাভিজ্ঞ ইংরাজ রাজনীতিক বলিয়াছিলেন, "টাকা দিয়া প্রত্যেক লোককেই কিনিতে পারা যায়।" ইংলণ্ডের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু আমাদের দেশে প্রাচীন কালে টাকা দিয়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কিনিতে পারা যাইত না। এখন তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন? ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহাশয়দিগের সরল সাধু জীবন এবং অনন্যসাধারণ আত্মস্পৃহা তাঁহাদিগকে জগতের বরণীয় করিয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে জীবন-সংগ্রাম দিন দিন গুরুতর হইয়া উঠিতেছে বটে, কিন্তু সেই পরিমাণে তাঁহাদিগকে আরও অধিক সাবধান ও সতর্ক হইতে হইবে। তাঁহারা আমাদিগের গুরু। কিন্তু অনন্যসাধারণ গুণ না থাকিলে জগতের মস্তক স্বতঃই তাঁহাদের চরণতলে লুণ্ঠিত হইবে কেন? দেশ-কালের প্রভাব অতিক্রম করা বড় কঠিন, সন্দেহ নাই; কিন্তু উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁহারা যে সমস্ত গুণ লাভ করিয়াছেন, তাহার বলে ইহা তাঁহাদিগের পক্ষে তত কঠিন নহে। বড় দুঃখে এই কথাগুলি বলিলাম; আশা করি, পূজনীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতমণ্ডলী আমাকে ক্ষমা করিবেন।

ব্রাহ্মণপণ্ডিত-মণ্ডলীর প্রতি নিবেদন।

সাহিত্যে ভাবের কথা বলিলাম, এইবার ভাষা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। এ সম্বন্ধে স্বপক্ষে বিপক্ষে বলিবার সমস্ত কথাই বলা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমি আর এ বিষয়ে বাহুল্য করিব না। সে দিন কোনও এক সংবাদপত্রে দেখিলাম, সম্পাদক মহাশয় এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আজকাল বাঙ্গালা ভাষায় পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন। পরীক্ষকদিগের মধ্যে, সাধু ভাষা ও প্রাদেশিক ভাষার পক্ষপাতী, উভয় সম্প্রদায়েরই লোক আছেন। পরীক্ষার্থী কোন্ ভাষায় তাহারা উত্তর লিখিবে? যে সকল পরীক্ষক প্রাদেশিক ভাষার পক্ষপাতী, তাঁহারাও বঙ্গদেশের সমস্ত প্রদেশের ভাষার সংবাদ রাখেন না। এরূপ স্থলে যদি তাঁহারা কলিকাতার মৌখিক ভাষাকেই আদর্শ করিয়া ছাত্রদিগকে নম্বর দেন, তাহা হইলে, মফস্বলের ছাত্রগণের ত সর্ব্বনাশ। style বা রচনাপদ্ধতির প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ দৃষ্টি আছে। ৪।১০এর মধ্যে কিছু নম্বর স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হয়। অতএব যদি তেহ লেখে—

সাহিত্যের ভাষা।

"ইয়োরোপীয় সভ্যতা আজ পর্য্যন্ত আমাদের গ্রামের বুকের ভিতর তার পিন ঢুকিয়ে দেয় নি। অর্থাৎ রেলের রাস্তা সে গ্রামকে দূর থেকে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে।"

কিংবা—

"মানুষে বর্ত্তমানকেই সব চাইতে অগ্রাহ্য করে। যাদের চোখ কান বোজা আর মন পঙ্গু, তারা এই নব সাহিত্যকে নবীন বলে মিলা ক'রবেন। তবে এর মধ্যে আরামের কথা এই যে বর্ত্তমানের কোনও ইতিহাস নেই, সুতরাং এখন থেকে বঙ্গ-সরস্বতীর ঘাড় থেকে ভূত নেমে যাবে।"

কিংবা—

"দিগন্ত থেকে দেখতে পাই মেঘগুলো নানা ভঙ্গীতে ফাঁপিয়ে উঠে চলেছে, যেন ছুটির দিনের আকাশে ছেলেমানুষের মুখ খুলে গেছে। বস্তু প্রায় কিছুই নেই কেবল আকার, কোথাও বড়ো কোথাও ছোটো নিজ নেই। নানা রকমের আকার—কেবল সোজা লাইন নেই। সৌখীন লাইনটা মানুষের হাতের কাজের। তার ঘরের দেওয়ালে, তার কারখানাঘরের চিমনিতে যখনি প্রথম এখেনায় সোজা খাড়া।"

—তাহা হইলে পরীক্ষকমহাশয়গণ কিরূপ নম্বর দিবেন? কলিকাতার 'সৌরেন্দ্রী', 'পৌরাণী', কিংবা কিছুদিন পূর্ব্বে 'নায়ক' পত্রে বিহারের মধ্য-বাঙ্গালা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র হইত বাঙ্গালা। উহা 'জবান'-মিশ্রিত যে অপূর্ব্ব ভাষার নমুনা প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই 'হিন্দী বোর্ড', আর চলিত সাধু ভাষা সমান আসন পাইবে কি?

সমস্যার কথা বটে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়কে এ সমস্যার মীমাংসা করিতে অনুরোধ করি।

যাহা হউক, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি এখন প্রত্যেক বাঙ্গালীর পরম শ্লাঘার বিষয় হইয়াছে। বৈষম্য গৃহবিচ্ছেদ ভাল নহে। তাহাতে উন্নতির ব্যাঘাত হইতে পারে। উন্নতির জন্য যে আয়োজন, তাহা স্থিরচিত্তে বিচারপূর্ব্বক একযোগে সেই অভাব মোচনের চেষ্টা করিতে হইবে। প্রচলিত সাহিত্যের ভাষা যদি তাহাকে প্রকৃতই 'পঙ্গু' করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা বর্জ্জন করিতে হইবে, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। কিন্তু কোনও পক্ষেরই কেবল বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া কোনও কাজ করিলে চলিবে না। বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে।

* * * *

বাহুল্যভয়ে এইখানেই এবন্ধের উপসংহার করিলাম। আমি ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া কোনও কথাই লিখি নাই। যাহা উচিত মনে করিয়াছি, যথাজ্ঞান যথাশক্তি তাহাই বলিয়াছি। নিজের পাণ্ডিত্যপ্রকাশ আমার উদ্দেশ্য নহে; কারণ, এই অতিস্বল্পভূমিষ্ঠ পরিসরে আমার পক্ষে সে চেষ্টা বৃথা। তবে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য আপনাদের ন্যায় আমারও প্রাণের জিনিস। এখন উন্নতির জন্য ভগবান্ আমাদের যতটুকু শক্তি দিয়াছেন, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার বিয়োগ করিতেছি। এই নীরস অভিভাষণও সেই উদ্দেশ্যেই রচিত। যাঁহাদের প্রীতিকর হইলে, শ্রম সার্থক জ্ঞান করিয়া কৃতার্থ হইব। সপ্রীতিকর হইলে পরস্কার করিবেন, তাহাও—

"বলমানে সব শির পাতি।"

বাঙ্গালা সাহিত্য।

[স্বর্গীয় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গালুরের ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে অনূদিত।]

প্রবন্ধলেখকগণের মধ্যে অতঃপর মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথাই প্রথম বিবেচ্য। তিনি বিস্তর কবিতা ও নাটকের প্রণেতা। বোধ হয়, আর কোন [illegible]

দোষ গুণ সম্বন্ধে এত মতভেদ দৃষ্ট হয় না। কোনও কোনও ভাববিহ্বল সমালোচক তাঁহাকে কালিদাসের সহিত তুলনীয় বলিয়া বিবেচনা করেন; আবার কেহ কেহ তাঁহাকে অতি নিকৃষ্ট লেখক বলিয়া তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। আমরা উক্ত দুই শ্রেণীর সমালোচকগণের মধ্যে কোনও শ্রেণীর সমালোচকের সহিত একমত হইতে পারি না। তাঁহার রচনায় বিশিষ্ট গুণ আছে, স্বীকার করি; কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা মহাকবিদিগের মধ্যে তাঁহাকে আসন প্রদান করিতে প্রস্তুত নহি। বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি নূতন পরিবর্ত্তন ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে অনেক কটু সমালোচনা সহ্য করিতে হইয়াছে; কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার ন্যায্য স্থান সেই দুই সকলের উপরে।

তাঁহার কাব্যগ্রন্থ—'মেঘনাদবধ', 'তিলোত্তমাসম্ভব', 'বীরাঙ্গনা', এবং 'ব্রজাঙ্গনা'। প্রথমোক্ত দুইখানি যে শ্রেণীর কাব্য, তাহা য়ুরোপে 'এপিক্' নামে ও ভারতবর্ষে 'মহাকাব্য' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দুইখানিই অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ রচনা এই প্রথম। দুইখানির মধ্যে 'তিলোত্তমা' প্রথমে রচিত; কিন্তু 'মেঘনাদবধ'ই দত্তসাহেবের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। যে রামায়ণ হইতে ভারতীয় বহু কবি রসসঞ্চয় করিয়া কৃতী হইয়াছেন, গ্রন্থের বিষয়টি সেই 'রামায়ণ' হইতেই গৃহীত—রাবণের সহিত রামের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে রাবণের পুত্রদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর ও যোদ্ধা মেঘনাদ রামানুজ লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক নিহত হন। আখ্যানবস্তুটি এই। কিন্তু দত্ত সাহেব বাল্মীকির নিকট গল্পটি অপেক্ষা অন্যান্য বিষয়ে অধিকতর ঋণী আছেন। তথাপি কাব্যখানি প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার নিজস্ব। বৃত্তান্তবর্ণী, পাত্রপাত্রীগণের চরিত্র-চিত্র, ঘটনাসংস্থান, এবং অবান্তর ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি অনেক অংশে দত্ত সাহেবের নিজের সৃষ্টি। উহাদের উদ্ভাবনে ও রূপপরিণতিতে দত্ত সাহেব উচ্চ অঙ্গের কলাকুশলতা প্রদর্শিত করিয়াছেন। আমাদের যেটুকু স্থান আছে, তাহাতে বিস্তারিতভাবে কাব্যখানির সমালোচনা করা অসম্ভব। সুতরাং আমরা কবির কলাকুশলতার যথাযোগ্য বর্ণনা করিতে, বা পাঠকগণকে তাহার উপযুক্ত পরিচয় প্রদান করিতে অক্ষম। কেবল বাল্মীকি নহে, হোমর ও মিল্টনের নিকটও তিনি অনেক বিষয়ে ঋণী; কিন্তু সকল-ভাবে তিনি উক্ত কবিগণের নিকট সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা পরিপাক করিয়া তিনি তাঁহার নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন, এবং সমগ্রভাবে বিবেচনা

করিলে, এই কাব্যগ্রন্থখানি আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান গ্রন্থ, সন্দেহ নাই। পাত্রপাত্রীগণের কল্পনা অতি সুপরিস্ফুট, এবং পাঠকের চিত্তমুগ্ধকর। ঘটনা-পরম্পরা যদিও অনেক স্থলে অতিলৌকিক, তথাপি অতি নিপুণ ও সহজ ভাবে সমাবিষ্ট হইয়াছে। রূপকাদি অলঙ্কারগুলি কোথাও মধুর, কোথাও করুণ, কোথাও বা রুদ্র-রসান্বিত। কল্পনায় ক্রীড়া অনুক্ষণ পরিবর্ত্তনশীল। ভাষা অত্যন্ত কবিত্বসম্পন্ন এবং শব্দচয়ন এরূপ সুন্দর যে, পরিস্ফুট ভাবগুলির সঙ্গে সঙ্গে তদনুকূল অন্যান্য ভাবও অনুরণিত হইতে থাকে। কবিতার চরণগুলি প্রচলিত সংস্কৃত প্রথা অনুসারে সকল স্থানে দুইটি দুইটি পংক্তিতে সমাপ্ত হয় নাই বটে, কিন্তু মিল্টনের কবিতার ন্যায় যতি বা বিরামের স্থানগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সন্নিবিষ্ট হওয়ায়, আমাদের মতে, পদগুলি অতি সুললিত ও সুখশ্রাব্য হইয়াছে, এবং আবেগময় ভাবপ্রকাশের অধিকতর উপযোগী হইয়াছে।

কিন্তু দত্ত সাহেবের রচনা একবারে নির্দ্দোষ নহে। উহাতে বিশ্রামের অভাব পরিলক্ষিত হয়। যেখানে ফুৎকারও অনাবশ্যক, সেখানে প্রবল ঝটিকা ভীষণ নিনাদে গর্জ্জন করে। যেখানে কোনও প্রয়োজন নাই, সেই স্থানে মেঘাড়ম্বর ও অজস্র বারিপাতে বন্যার সৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়; সমুদ্র অকারণ ক্রোধে স্ফীত হইয়া ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে, এবং সকলের অনর্থক বিরক্তির উৎপাদন করে। দত্ত সাহেবের ন্যায় মার্জ্জিতরুচি ও প্রতিভাবান লেখকের এরূপ বাগাড়ম্বর শোভা পায় না। একই রূপক ও শব্দঘটার বারংবার পুনরাবৃত্তিও তাঁহার একটি প্রধান দোষ, এবং পাঠকের পক্ষে বড়ই বিরক্তিজনক। অপরের ভাব আত্মসাৎ করা দোষটিও যে একবারে নাই, তাহা বলা যায় না। হোমর ও ভার্জিল হইতে স্থানে স্থানে চুরী আছে, এবং মিল্টন ও কালিদাস হইতেও ঐরূপ চুরী লক্ষিত হয়।

তাহার পর, ব্যাকরণের মর্য্যাদাও সকল স্থানে রক্ষিত হয় নাই। ইংরাজী পদ্ধতির অনুকরণে 'স্তম্ভিলা', 'স্বনিলা', 'নির্ঘোষিলা' প্রভৃতি ক্রিয়াপদের ঘন ঘন প্রয়োগেও আমাদের বৈরক্তির আপত্তি আছে। আমরা মেঘনাদবধ হইতে কোনও অংশ উদ্ধৃত করিলাম না; কারণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ পৃথকভাবে দেখিলে কাব্যখানির দোষগুণ সম্যক্‌রূপে উপলব্ধ হইবে না। সমগ্র কাব্যখানি সুন্দর, কিন্তু যেমন একখানি ইষ্টক দেখিয়া অট্টালিকার ধারণা হয় না; সেইরূপ এক একটি ক্ষুদ্র অংশ পাঠ দ্বারা কাব্যখানির সৌন্দর্য্য বিচার করা অসঙ্গত।

দত্ত সাহেবের অপর গ্রন্থাবলীর মধ্যে তিলোত্তমাসম্ভব সর্ব্বপ্রথমে লিখিত। ইহাও 'মেঘনাদবধে'র ন্যায় 'এপিক' বা মহাকাব্য হইলেও, উহা অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। বিষয়টি তিলোত্তমার জন্ম। তিলোত্তমা ব্রহ্মার সুন্দরতম সৃষ্টি। আর্য্যদেবতাগণকে সুন্দ-ও উপসুন্দ নামক দুই প্রবল পরাক্রান্ত অসুর ভ্রাতা স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করায়, উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ ঘটাইবার জন্যই তিলোত্তমার সৃষ্টি।

'তিলোত্তমা'র পর আমরা সানন্দে 'বীরাঙ্গনা' নামক আর একখানি কাব্যের বিষয় উল্লেখ করিব। মহাকাব্য বলিয়া পরিগণিত হইবার স্পর্দ্ধা না থাকিলেও, এই কাব্যখানি 'তিলোত্তমা' অপেক্ষা অধিকতর পরিপক্কতার পরিচায়ক। কতিপয় বীরাঙ্গনার স্বামীর প্রতি পত্রে লিখিত পত্রের আকারে ইহা পর্য্যায়ক্রমে রচিত। 'মেঘনাদবধে'র পরই ইহা রচিত হয়, এবং ইহাতেও 'মেঘনাদবধে'র ন্যায় সুন্দর রূপকাদি অলঙ্কার, ভাষার চমৎকারিত্ব, ছন্দের লালিত্য ও শ্রুতিমধুরতা আছে। 'ব্রজাঙ্গনা' একখানি ক্ষুদ্র অসমাপ্ত কাব্য। ইহা মিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। ইহাতে রাধার বিরহবেদনা বর্ণিত আছে। এ বিষয়ে পূর্ব্বে এত কবিতা রচিত হইয়াছে যে, নূতনত্ব-সৃষ্টি একপ্রকার অসম্ভব। কিন্তু দত্ত-সাহেব ইহাতেও অনেক নূতন ও সুন্দর ভাব সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, এবং অমিত্রাক্ষরের ন্যায় মিত্রাক্ষর ছন্দেও অনুরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছেন। বস্তুতঃ, তাঁহার মিত্রাক্ষর ছন্দের রচনা বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

তাঁহার সনেটগুলির আমরা বিশেষ প্রশংসা করি না, কিন্তু সেগুলিও অপ্রসিদ্ধতর গ্রন্থকারের যশোলাভের কারণ হইতে পারিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সনেটগুলি য়ুরোপে রচিত হয়। একটি ভার্সেলে লিখিত হয়। কতকগুলি দান্তে, আচার্য্য গোল্ডষ্টুকার, টেনিসন, ভিক্টর হুগো ও ইতালীকে সম্বোধন করিয়া লিখিত। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, সনেটগুলি বহু ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে প্রক্ষিপ্তভাবে রচিত।

নাট্যকার-রূপে দত্ত সাহেব তেমন কৃতিত্বলাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার লিখিত নাট্যগ্রন্থ—'শর্ম্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী' ও 'কৃষ্ণকুমারী'। প্রথমোক্ত নাটকখানি জনসাধারণের বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। আমাদের বিবেচনায় উহার মধ্যে কোনখানিই তাদৃশ উৎকৃষ্ট নহে। এ পর্য্যন্ত কোনও বাঙ্গালী লেখক নাটক-প্রণয়নে যথার্থ ক্ষমতা দেখাইতে পারেন নাই। এমন কি, আমাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাট্যকার বাবু দীনবন্ধু মিত্রও মনুষ্য-হৃদয়ের উচ্চতর

ভাবগুলি চিত্রিত করিতে গিয়া একবারে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। দত্ত সাহেব যখনই নাটক-লিখিতে বসেন, তখনই তাঁহার অবিসংবাদিত কবি-প্রতিভা তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। তাঁহার প্রহসনগুলি কিন্তু ভাল। তন্মধ্যে একখানি—'একেই কি বলে সভ্যতা?' বাঙ্গালাভাষায় অদ্বিতীয় গ্রন্থ। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি নিজগুণপ্রাচুর্য্য ব্যতীত অন্য কারণেও সমালোচনার যোগ্য।

আজি কালি বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র বহু পুস্তক প্রসব করিতেছে বটে, কিন্তু তন্মধ্যে অধিকাংশই কোনও খ্যাতনামা লেখকের অনুকরণমাত্র। বিদ্যাসাগর, টেকচাঁদ ঠাকুর, হুতোম, দীনবন্ধু ও এবং 'দুর্গেশনন্দিনী'-প্রণেতার অনুকারী অনেক হইয়াছে, কিন্তু বোধ হয়, 'একেই কি বলে সভ্যতা'র অনুকরণে যত পুস্তক রচিত হইয়াছে, তত আর কোনও গ্রন্থের আদর্শে রচিত হয় নাই। উক্ত গ্রন্থখানি একটি বিশেষ অভিপ্রায়ে লিখিত প্রহসন। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য অতিরিক্ত মদ্যপান ও তদানুষঙ্গিক দোষগুলি ব্যঙ্গসহকারে প্রকটিত করা। বটতলায় ছাপাখানা ও পুস্তকের দোকানগুলিতে মদ্যপানের দোষ সম্বন্ধে এক আনা বা দুই আনা মূল্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকের রীতিমত বন্যা উপস্থিত হইয়াছে। একটু বৃহৎ আকারের প্রহসনও বিস্তর প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে 'বুঝলে কি না' নামক গ্রন্থখানি জনসাধারণ কর্তৃক যথেষ্ট আদৃত হইয়াছে, এবং অনেকবার ভদ্রমহোদয়গণের বাটীতে অভিনীত হইয়াছে। উক্ত সমুদয় গ্রন্থই 'একেই কি বলে সভ্যতা'র নকলমাত্র। সুতরাং এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি কেবল বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট দুইখানি প্রহসনের অন্যতম বলিয়াই নহে, উহার অনুকরণে এতগুলি পুস্তক রচিত হইয়াছে বলিয়াও, উহার গৌরববৃদ্ধি হইয়াছে।

এই প্রশংসনীয় ক্ষুদ্র পুস্তকখানির অংশবিশেষ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া উদ্ধৃত করিলে, ইহার সৌন্দর্য্য সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে না। কারণ, ইংরাজীর শব্দসঙ্কুল উদ্ভট ভাষা এবং তর্কসভাদিতে ব্যবহৃত কৃত্রিম বাগাড়ম্বরেই উহার অর্দ্ধেক রস নিহিত আছে। নর্ত্তকী ও সুরাপানের আমোদে মত্ত 'জ্ঞানতরঙ্গিণী' নামক এক বৈজ্ঞানিক তর্কসভার গৃহে ইহার প্রধান দৃশ্য স্থাপিত। ইহাতে যেরূপ চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা অতীব ঘৃণাই। প্রধান কথা এই যে, অঙ্কিত চিত্রগুলি সত্যের অনুরূপ কি না। বাঙ্গালার লজ্জার কথা হইলেও, আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, চিত্রগুলি বাস্তবানুরূপ। সুরাপানে উত্তেজিত যে সমাজ-সংস্কারকের চেষ্টা ইংরাজী-বচন-সংমিশ্রিত দীর্ঘ বক্তৃতায়

পরিবর্ত্তিত হয়, তাঁহাদিগকে য়ুরোপীয়গণ প্রায়ই যথার্থ সভ্য ও শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে গণ্য বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু তাহা করা উচিত নহে। য়ুরোপীয় মিশ্রশ্রেণীর ফিরিঙ্গীর বেশভূষা-পরিধান ও বর্ব্বরোচিত ইংরাজী-ভাষার ব্যবহার যাঁহারা সভ্যতার চিহ্ন বলিয়া মনে করেন, ইহারাই যে সেই হাফ্‌ল অর্দ্ধশিক্ষিত বাবুদের প্রতিনিধিস্বরূপ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহারাই দলে দলে সদাগরী অফিসসমূহে বিচরণ করেন, এবং উচ্চ কর্ম্মচারীদিগকে চাকুরীর আবেদনপত্র দ্বারা উদ্ভ্রান্ত করিয়া থাকেন, সন্ধ্যাকালে কলিকাতার রাজপথসমূহে জনতাবৃদ্ধি করেন, মদ্যের বিপণীগুলি শোভিত করেন, এবং যখন টাউনহলে বাবু কেশবচন্দ্র সেন বক্তৃতা করেন, তখন তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডলীর অধিকাংশ আসন অধিকৃত করেন। যথার্থ শিক্ষালাভ তাঁহাদের কিছুমাত্র হয় নাই। ইহারা কোনও ইংরাজীস্কুলে কয়েক বৎসর মাত্র যৎসামান্য ইংরাজী শিক্ষা করেন, এবং নাবালকাবস্থা হইলে অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালেই জমিদারী আরম্ভ করেন। ধনবান হইলে ইহারা অসঙ্কোচে উক্ত বয়সেই গর্হিত আমোদ প্রমোদে ব্যাপৃত হন। এই শ্রেণীর লোকে দেশ প্লাবিত হইয়াছে, এবং দক্ষসাহেবের চিত্রটি বাস্তবানুরূপ বটে, কিন্তু যথার্থ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সহিত ইহাদিগকে একশ্রেণীভুক্ত করা উচিত নহে—তাঁহাদের তুলনা (ইংরাজী শিক্ষার সম্বন্ধে যাহাই বলা হউক না কেন) তুলনায় অল্প।

এইবার আমরা দীনবন্ধু মিত্রের বিষয় কিছু বলিব। ইনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাঙ্গালী নাট্যকার। একমাত্র উৎকৃষ্ট নাট্যগ্রন্থকার বলিলেও বলা যায়। তিনি সর্ব্বসমেত পাঁচখানি নাটক লিখিয়াছেন; তন্মধ্যে দুইখানি প্রহসন। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'নীলদর্পণে'র নাম বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত অন্য সকল গ্রন্থ অপেক্ষা য়ুরোপীয় জনসাধারণের নিকট অধিকতর পরিচিত। নীলবিষয়ক-সংক্রান্ত হইয়াই উহা এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে—নতুবা অন্য কোনও কারণে উহা এত প্রসিদ্ধি লাভ করিত না। যে বিচারালয় পক্ষপাতিতা ও চিত্তচাঞ্চল্য পরিহারপূর্ব্বক বিচার করিতে অসমর্থ বলিয়া স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়া শীঘ্রই বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই বিচারালয় কর্ত্তৃক লং সাহেব যখন দোষী বলিয়া দণ্ডিত হইলেন, তখন য়ুরোপীয় জনসাধারণের চিত্ত অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। উক্ত সময়ে 'নীলদর্পণ' একখানি অশ্লীল ও ইতরোচিত নিম্নাবাদে পূর্ণ অশ্লীল গ্রন্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছিল। আমরা উক্ত মতের সম্পূর্ণরূপে

অনুমোদন করি না, কিন্তু কাব্য হিসাবে আমরা এ গ্রন্থখানিকে অতি নিম্ন আসনের যোগ্য বিবেচনা করি। ইহার মূল্য যাহা কিছু ছিল, তাহা রাজনীতি ঘটিত, কাব্য বলিয়া নহে। আমরা এক্ষণে কাব্যকলার বিষয় লিখিতে বসিয়াছি,—রাজনীতির বিষয় নহে; সুতরাং এ পুস্তকের বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিব না।

দীনবন্ধু বাবুর অন্যান্য নাটকগুলির মধ্যে 'লীলাবতী'ই জনসাধারণের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমাদর লাভ করিয়াছে। কিন্তু যদিও আমরা ইহার অনেক সদ্গুণ আছে বলিয়া স্বীকার করি, তথাপি আমাদের বিবেচনায় 'নবীন-তপস্বিনী' অধিকতর প্রশংসার যোগ্য। শেষোক্ত গ্রন্থের অধিকতর দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু গুণের আধিক্যে তাহা আবৃত হইয়া গিয়াছে। সেক্‌পীয়রের Merry Wives of Windsor নামক নাটক হইতে ভাবটি লইয়া ইহা রচিত। গল্পটি একটি সুপরিচিত হিন্দু উপকথা। তাহার উপর এক জন হিন্দু ফলষ্টাফের প্রেমলীলার অলঙ্কার চড়ান। ফলষ্টাফ-স্থানীয় পাত্রটির নাম জলধর। সে এক জন রাজমন্ত্রী। তাহার দেহভার ও উদরের পরিধি কিঞ্চিৎ অসুবিধাজনক হইলেও, তাহার যৌবনসুলভ প্রেমপ্রবণতা কিছুমাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। তাহার ভালবাসার পাত্রী মালতী, কালীকান্ত নামক জনৈক সদাগরের যুবতী ও সুন্দরী স্ত্রী। মালতীর মল্লিকানাম্নী এক দূরসম্পর্কীয়া ভগ্নী আছেন। তাহার মন অতি পবিত্র হইলেও রসনাটি কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণ, এবং উহার ধার পরীক্ষা করিতে তিনি কখনই বিমুখ নহেন। মালতীর প্রতি জলধরের অনুরাগ ও প্রেম নিবেদনের কথা শুনিয়া, তিনি তাহাকে মালতী দ্বারা কয়েকটি কার্য্য পরিক্ষা প্রদান করেন, তাহাই নাটকখানির বিষয়ীভূত। প্রথমতঃ, মালতীর সহিত সাক্ষাতের ছলে জলধরের নিজস্ত্রীর সহিত মিলন সংঘটন করা হইল। মালতী-ভ্রমে জলধর তাহার নিকট নিজস্ত্রীর নিন্দা ও মালতীর প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল; কিছুক্ষণ পরেই কালীকান্ত আসিয়া পড়ায় জলধর পলায়ন করিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই স্ত্রীর নিকট সম্মার্জ্জনীর প্রহার সহ্য করিতে হইল। আর একটু হইলেই ক্রুদ্ধ কালীকান্তের নিকট মালতীবেশধারী দণ্ডিত হইত, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মপরিচয়-দান করিয়া সে অব্যাহতি পাইল।

দ্বিতীয় দৃশ্য, সদাগরের বাটী। সেইখানে জলধরের আশা পূর্ণ হইবে বলিয়া সে আশ্বাস পাইয়াছে। এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে লিপ্ত হইবার পূর্ব্বে জলধর

এই গভীর রসের গল্পটি আদৌ প্রশংসাযোগ্য নহে। কিন্তু তাহার গল্পটি অতি চোস্তদীপকভাবে রচিত হইয়াছে। জলধরের চরিত্রটি যদিও মূলতঃ সেক্সপীয়রের ফল্‌ষ্টাফ্ হইতে গৃহীত, তথাপি উহা সুসঙ্গত ও সজীব হইয়াছে, এবং কৌতুকপ্রিয়া অথচ কৌশলসম্পন্না চতুরা মল্লিকা দীনবন্ধুবাবুর অঙ্কিত নবীনা কুট স্ত্রী-চরিত্র। জলধরের কুৎসিতা ও সন্দিগ্ধচিত্তা স্ত্রীর চিত্রও অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। তাহার স্থূলকায় বৃদ্ধ স্বামীকে দেশশুদ্ধ সমস্ত যুবতী পাইবার জন্য লালায়িত, এবং ছলচাতুরীর দ্বারা বশীভূত করিবার চেষ্টায় আছে, এই দৃঢ় বিশ্বাস পাঠকের কৌতুক উৎপাদন করে।

ক্রমশঃ।

শ্রীময়ূখনাথ ঘোষ।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। চৈত্র।—অনুরূপার নানা ফুলে সাজি সাজাইয়া 'ভারতীর পূজার ব্যবস্থা হইতেছে। 'তাঁতাজিলের মৃত্যু' মেটারলিঙ্কের অনুবাদ। 'সমসাময়িক ভারতের নৈতিক অবস্থা' The Mazaliersএর অনুবাদ। 'ছদ্মহাড়া' Margaurite Audouxএর উপন্যাসের অনুবাদ। তা ছাড়া, (১) 'আমাদের শরীরের যুদ্ধের কথা', (২) 'কাশ্মীরী বাগ', (৩) 'বর্ত্তমান যুদ্ধে শিশু দেবা' ও (৪) 'গ্রীক আর্টের কথা'ও এক প্রকার অনুবাদ—সমস্কল। নিজের মালঞ্চে ফুল যখন দুর্লভ, তখন বাসিফুল ও যেটু ফুল না কুড়াইয়া, বিদেশের বাগান হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া সাজি সাজাইলে লাভ আছে। ইহার মধ্যে শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী 'আমাদের শরীরের যুদ্ধের কথা'য় বিষয়টিকে আয়ত্ত করিয়া সাধারণের বোধগম্য ভাষায় জলের মত বুঝাইয়া দিয়াছেন। সর্ব্বত্র ভাষাও সে বিশুদ্ধ করিয়া লেখা যায়, এবং সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য ওরুচতাগীর আবশ্যক নাই লইলেও চলে, চল্‌তী ও ব্যাকরণবর্জ্জিত ভাষার শ্রীযুতী রেজীনা গুহ 'ভারতীর পৃষ্ঠায় লেখিকা তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার 'কাশ্মীরী বাগ' ইংরাজি হইতে সঙ্কলিত।' কিন্তু শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'গ্রীক আর্টের কথা'র এরূপ কোনও উল্লেখ নাই। হেমেন্দ্রকুমার কি সমে-মমীনে অনুশীলন করিয়া মস্তিষ্ক হইতে কথা গুলি সংগ্রহ করিয়াছেন? তিনি নিজে কোটীলের মত চোর ধরিয়া বেড়ান। কে কোথায় কোন রচনায় এক্সানে কোটেশন দিয়া, অথবা না দিয়া, না বলিয়া, বেবাল্লুম পরের দ্রব্য চুরি করিয়াছে, তিনি তাহা ধরিয়া দেন। তিনি কিন্তু নিজে যে খানকে খান 'গ্রীক আর্টের কথার' আমদানী করিয়াছেন, তাহার কোথাও ত কোটেশন বা কোনও উল্লেখ দেখিলাম না। তথাপি কি তাঁহার নিজস্ব? শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর 'মাসকাবারী ও মন্তব্য' বেশ হইতেছে। সচরাচর এরূপ প্রবন্ধ যেরূপ অন্তঃসারশূন্য হয়, 'মাসকাবারী' সেরূপ নহে। অনেক বিষয়ে মতভেদ সত্ত্বেও আমরা 'মাসকাবারী' উপভোগ করিয়াছি। 'আনন্দ-মঠ' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি।—'মহীয়সী' বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ নামে তথাকথিত যে নীরস গল্প রচনা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত প্রকাশ করিয়াছেন। আনন্দ মঠ সম্বন্ধে বিবাদ

সমালোচনা সংক্ষেপে এই :—(১) 'রবিবাবু যেখানে individualএর চরিত্র ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেইখানে তিনি চমৎকার সফল হইয়াছেন, তাঁহার ভক্তির সঙ্গে পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু যেখানে মানুষের সমষ্টি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন, সেইখানেই সমস্তটা একটা কুয়াশার ভাব পাকাইয়া গিয়াছে, কোনও ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করিবার চেষ্টা আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না।...আনন্দমঠের সমস্ত 'আনন্দ'গুলিই যেন একরকমেরই। একটা প্রকাণ্ড ideaয় যে বিচিত্র মানবপ্রকৃতিকে revolutionএর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত ও কেন্দ্রীভূত করিয়াছে, তাহাদের ঐতিহাসিক পার্থক্য, তাহাদের বিচিত্র কর্ম্মপ্রবাহ, বিচিত্র ভাবপ্রবাহ, নানা শক্তির সংঘর্ষ, যে একটা প্রকাণ্ড ideaর আবর্ত্তে পড়িয়া একটা দিকে চলিয়াছে, বঙ্কিমবাবু তাহা দেখাইলেন নাই। কেন তিনি তাঁহার 'আনন্দ'গুলিতে স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য দিলেন না?' (২) 'অঙ্গলের মধ্যে এই স্বাধীনবৃত্তির যোগাও একটু সমাজের সহিত নাড়ীর সংযোগ দেখিতে পাই না।...কত অত্যাচার, উৎপীড়ন, কত বেদনা, কত নিষ্ফল প্রয়াসের ভিতর দিয়া এই বিপ্লবনীতি অঙ্কুরিত হইল, তাহার আভাসমাত্রও পাইলাম না।' রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার এই শেষ অংশটুকুর উদাহরণ Turgeneffএর Fathers and Children বা On the eve প্রভৃতি স্বদেশপ্রেমমূলক উপন্যাসে পাওয়া যায়। উহাদের সঙ্গে আনন্দমঠের যদি তুলনা করা যায়, তবেই রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার সূক্ষ্মদর্শিতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। কারণ, উপন্যাসে ব্যক্তির সমষ্টিগত রূপ নয়, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যগত বৈচিত্র্য ফুটাইয়া তোলাই দরকার। কিন্তু উপন্যাস হিসাবে আনন্দমঠের শ্রেষ্ঠতা নষ্ট, তাহার শ্রেষ্ঠতার অন্য কারণ। আনন্দমঠ সম্বন্ধে রবিবাবুর এই সমালোচনা বহুকাল পূর্ব্বেকার—আনন্দমঠ যখন প্রকাশিত হয়, তখন সুরেনাথবাবুর সহিত পত্রব্যবহারে এই সমালোচনা তিনি করিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের পরেও তাঁহার এই মত অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে কি না, তিনিবাবুর লেখা হইতে তাহা ঠিক জানা যাইতেছে না। কারণ, স্বদেশী-আন্দোলনে আনন্দমঠের 'বন্দে মাতরম্' বাঙালীর প্রাণে একটা নূতন প্রেরণা আনিয়াছে। এ তো উপন্যাস নয়, এ যে স্বদেশ-প্রেমের অপূর্ব্ব ভাগবত! বিপ্লবচেষ্টাকে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং ভূমিকায় নিন্দা করিয়াছেন; সুতরাং আনন্দমঠ পড়িয়া বাঙালীর মধ্যে যদি বিপ্লবচেষ্টা দেখা দিয়া থাকে, তবে তাহা সম্পূর্ণ অকৃত্রিম নিশ্চিত। আনন্দমঠের মধ্যে যে intensity, যে আবেগাতিশয্য আছে, তাহা লিরিকের উপযুক্ত। নাটক যদি লিরিক্যাল হয়, তবে এ উপন্যাসকে লিরিক্যাল উপন্যাস বলায় দোষ হয় নাই।' অবশেষে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'—বিনামার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন আর্ট বাণীর 'পোড়ারমুখী'। আমরা ভাতে পোড়া প্রথমে খাইয়া ইঁহারা শেষে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ফ্লিণ্ডেও এক জন বড় কবি—বোধ হয় সুইডবরগ—মোপাসার বড় ভক্ত ছিলেন। তিনি একবার মোপাসাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। মোপাসা তাঁহাকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করেন। কবি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া দেখিলেন, যথাসময়ে টেবিলে একটি শিশুর 'রোষ্ট' আসিয়া উপস্থিত। টেবিলের উপর একটা আস্ত পোকা-সিদ্ধ। হাত, পা, মাথা সব মজুত। স্থবির ও চক্ষু স্থির! মোপাসা বলিলেন, অনেক মাংস খাওয়া গিয়াছে; মানুষ ত খাইবার উপায় নাই। তাই প্যারিস হইতে এই চমৎকার শিশুটাকে অনেক মূল্য দিয়া আনাইয়াছিলাম। এটি মাংসেয় খুব কোমল। তুমি আমার অতিথি, তোমার সম্মানার্থ আজ এটাকে রোষ্ট করিয়া রাখিয়াছি।

এল! এই বলিয়া মোপাসাঁ চুপ্। বিয়া সেই মানবশিশুকে বানরের সব কাজই নিজের ঘাড়ে তুলিয়া লইলেন, কবির পাতেও পরিবেশন করিলেন। মোপাসাঁ বেশ খাইতে লাগিলেন। কিন্তু এই বীভৎস ব্যাপার দেখিয়া কবির যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা বলিবার নয়। 'ভারতী'র নৈবেদ্যে এই 'রিয়ালিষ্টিক' গল্পটি দেখিয়া আমাদের অবস্থাও তদ্রূপ হইয়া উঠিয়াছে। বহুকাল পরে 'ভারতী'র ভোজে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বশেষে 'পোড়ারমুখী'র পাল্লায় পড়িলাম। গল্পটির প্রথমে 'কমলের দুঃখের রিয়ালিজম্', শেষে বিলাতী প্লটের বোটকা গন্ধ। ভাগ্যে বাঙ্গালার থিয়েটার ছিল, তাই গল্পটি তরিয়া গিয়াছে। আদি-ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্য, সমগ্র দেশের শ্রদ্ধাভাজন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী কর্ত্তৃক পূজিত, সার ভাজার রবীন্দ্রনাথ গুরুমা 'ভারতী'র উপযুক্ত নৈবেদ্য বটে! 'রিয়ালিজম্' কালীঘাটে চিত্তরঞ্জনের ঠাকুরঘরে নারায়ণের সেবা করিতেছিল। সেখান হইতে সটান্ শুকিয়া থিয়েটে কুচ্ করিয়াছে; 'ভারতী'র মন্দিরে উঁকিঝুঁকি মারিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মকর ও কামিনী এখন সভ্য-সমাজে অনেক মহিলারও পরিচয় সৌভাগ্য লাভ করিবে। ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

প্রবাসী।—চৈত্র।—'বস্তুতান্ত্রিক কাব্যরসিক' নামক চিত্রখানি দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। চিত্রের নীচে লেখা আছে, 'চিত্রকর শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৌজন্যে।' ছবিখানির দানে 'সৌজন্য' থাকিতে পারে, আঁকার সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। চিত্রকরের বিরুদ্ধ পক্ষকে ভ্যাঙ্গচাইবার প্রবৃত্তির ও সুরুচির আমরা প্রশংসা করিতে বাধ্য, কিন্তু যে চিত্রপ্রতিচ্ছায় অভিব্যক্তি দেখিয়া আমরা শিহরিয়া উঠিয়াছি, তাহাকে দূর হইতে নমস্কার করিতে হানি কি? হাস্যরসের সম্ভাবনাটুকু রক্তাক্ত মন্ত্রণার উষ্ণ নিশ্বাসে শুকাইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে হয় ত খুব গভীর ও জটিল ভাবের হেঁয়ালি আছে। কিন্তু গগনের হেঁয়ালি ভাঙ্গিতে পারিলাম না। শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'দেশের সেবা' উল্লেখযোগ্য। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাচীন ভারতের রাজা মুকুট ও সিংহাসনের বর্ণন' নামক উপাদেয় প্রবন্ধটি 'মডার্ণ রিভিউ পত্রিকা'য় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের লিখিত Kings Crowns and Thrones in ancient and Medieval India with pen and Ink Sketches নামক প্রবন্ধ অবলম্বনে রচিত;—বিবিধ মৌলিক তথ্যপূর্ণ চারু বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালা দেশের নানা সংবাদপত্র হইতে চয়ন করিয়া 'দেশের কথা'র যে ডালি সাজাইয়াছেন, আমরা তাহা পড়িয়া উপকৃত হইয়াছি। মাসিকপত্রে দেশের বাণীকে ইহার পূর্ব্বে কেহ কেহ স্থান দিয়াছেন সত্য, কিন্তু আর কেহ এমন গুছাইয়া বলিয়াছেন, এবং এরূপ যুক্তিযুক্ত মন্তব্য সমর্থন করিয়া পাঠকের মনে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন, এমন ত মনে পড়ে না। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'শ্রদ্ধা-হোম' নামক 'কবিগুরু' প্রশস্তি—পৌড়ীগায়ত্রী ছন্দ' আমরা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু মানুষের সকল চেষ্টা সফল হয় না। 'চিদ্রসায়ন প্রচেতা', 'বাক্ তব বিশ্বম্ভর', 'পাখীরবীর পালন কবি' প্রভৃতি যেমন কটকটে, তেমনই কঠিন! তাহার উপর ছন্দে পৌড়ীর প্রভাব। নারায়ণের প্রতীক্ষা ভিন্ন উপায় নাই! 'প্রবাসী' বাদ-প্রতিবাদে পূর্ণ, এবং নানা তর্কের ও বিবিধ আলোচনায় আকীর্ণ। সুতরাং এটুকু গুরু-গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। স্বদেশের প্রসঙ্গে 'প্রবাসী'র অবদান ধন্যবাদার্হ। সংবাদপত্রে যে সকল বিষয়ের আলোচনা হয়, 'প্রবাসী' মাসিকপত্রে মন্তব্য সহ তাহার সমাহার করিতেছেন। ইহাতে কল্যাণের আশা করা যায়।

উদ্বোধনা। চৈত্র।—'বহুকালের একটি কথা' উল্লেখযোগ্য। 'চুম্বকে' শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মানসী ও মর্ম্মবাণীতে প্রকাশিত, শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত কর্ত্তৃক লিখিত ভাষা সম্বন্ধে দুই একটি কথার আলোচনায় যাহা লিখিয়াছেন, আমরা বাঙ্গালা আমার লেখকবিরুদ্ধকে তাহা পড়িতে বলি। 'বিধবার ৬ মাসের 'পাগ্‌লা'কে কেন ছাড়া হইল, বলিতে পারি না। শ্রীজীবাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'গ্রীষ্মরাত্রি' নামক কবিতায় দুই একটি মিষ্ট চরণ আছে। মামুলী পল্লীবর্ণনার প্রতিধ্বনি। আর ইহাতে কাব্যের অপরিহার্য্য উপাদান 'পুলক ভরা বাকুল প্রাণে' আছে। হাত পাকিবার পূর্ব্বেই বাঙ্গালা মাসিকের বারোয়ারীতে হাজির হন, অভিমান তাঁহাদিগকে রক্ষিত করিবে। শ্রীগজেন্দ্রনারায়ণ মৈত্র নামক আর এক জন কবি 'কর্ম্ম-অলস' নামক কবিতায় লিখিয়াছেন,—'ওরা, পূর্ব্বে' আমার প্রভাতে ভেঙেছে' ইত্যাদি। যতিপতি—সৃষ্টি ছাড়া ইমি 'যষ্টি'তে ও 'মুষ্টি'তে মিলাইয়াছেন। মিলিটারী বিল বটে। 'ওগো', 'এসো', 'প্রভু' 'পাতকী' এভৃতির ছড়াছড়ি করিয়াছেন। এত কাঁদুনীর অর্থ কি, কবি কাহাকে কেন এত ডাকিয়া মরিতেছেন, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তবে কবি অত্যন্ত বিনয়ী, এই কবিতায় আমরা তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন,—'ওগো, কর্ম্মবিহীন দিবস আমার নীরবে যেতেছে চলিয়া।' না, তাঁহার 'দিবস নিশ্চয়ই 'কর্ম্ম-বিহীন নয়। শুধু দিবস কেন, কাল্লাটি যে বহু দিবস ও রজনীর কর্ম্মফল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রতিভা। চৈত্র।—শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'বার্ণার্ড শ' তাঁহার পূর্ব্ব প্রবন্ধের পরিশিষ্ট। বিভিন্ন সমাজের চিন্তা, গতি ও বিবর্ত্তের বিবরণ জানা উচিত। যাহা প্রচলিত রীতি বা নীতির বিরুদ্ধ, যদি কোনও সমাজে তাহাই আলোচনার বস্তু হয়, তাহা হইলে, তাহার পরিচয় লাভ করিলে, অন্ত কোনও সমাজ ভাঙ্গিয়া পড়িবে, এমন কুপমণ্ডুকতার শঙ্কা প্রতিবাদের যোগ্য নহে। আমরা জগতের কথা দূরে থাকুক, ভারতের চিন্তা-বিবর্ত্তেরও কোনও সংবাদ রাখি না। উমেশ বাবুর মত কৃতবিদ্য ও চিন্তাশীল লেখকগণ বাঙ্গালীকে ইংরেজী সাহিত্যের ও প্রতীচ্য চিন্তার পরিচয় দিলে আমরা উপকৃত হইব। বার্ণার্ড শ চিত্রাঙ্কের উপযোগিতা বা আবশ্যকতা, বা বৈচিত্র্যকতা বিচার করেন না, এ কথা শুনিয়া যে পশুজীবন যাপন করিতে চাহিবে, কোনও সমাজই তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। 'ধর্ম্মস্থানের হিন্দু অধিবাসিগণ এবং তাঁহাদের প্রতি আমেরিকার কর্ত্তব্য' আমেরিকা-প্রবাসী শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর রক্ষিত কর্ত্তৃক লিখিত, এবং পানীমা মাসিকে প্রদর্শনীতে পঠিত ইংরেজী প্রবন্ধের অনুবাদ। প্রবন্ধটি আমরা সকলকে পড়িতে বলি। তিনি বলেন, নবদ্বীপের বর্ত্তমান অধিবাসীরা প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশীদের বংশধর। এখনও নবদ্বীপে হিন্দু অধিবাসী আছে। ওলন্দাজের শাসনে তাহারা মুহ্যমান হইয়া আছে। তাহাদের জন্য কিছু করা উচিত। পঞ্জাবের হিন্দু সভায় গত অধিবেশনে মনীষী সত্যচরণ শাস্ত্রীও এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। 'কিছু' করা উচিত বটে, কিন্তু প্রথমে সেই 'কিছু'র নির্দ্ধারণ আবশ্যক। যাহারা নিজেরই দোষে যাহারা পশু ও ঘৃণিত হইয়া আছে, নিজের জন্যই যাহারা সংঘবদ্ধ হইয়া কিছু করিতে পারে না, তাহারা সাগর-পারের ভাতিদের জন্য কিছু করিবার কামনা করিলেও, কাজে কিছু করিতে পারিবে কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় উপস্থিত হয়। আমাদের এ সংশয় মিথ্যা হউক। সমস্ত ভারতের চোখে এখনও ঘুমের ঘোর লাগিয়া আছে। সেই ঘোর কাটিয়ে আমরা জাগরণশক্তির সাক্ষাৎ পাইব, এবং তাহার উদ্বোধন করিয়া কর্ম্মজগতে সাফল্য লাভ করিব, ইহাই নবভারতের নূতন আশা। সে আশা কি পূর্ণ হইবে না? শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র সরস্বতীর 'ভক্তযোগ' উল্লেখযোগ্য। সম্পাদকের 'আইসলণ্ডের সাগা' পড়িয়া বাঙ্গালী পাঠক উপকৃত হইবেন।

সাহিত্য, ২৭শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

বেরাল-ছানা।

১

যদি কখনও দেওঘর দেখিয়া থাকেন, তবে সম্ভবতঃ আপনার দুই ১৩ নম্বরের বাটী মনে আছে? অম্বিকা বাবুর। মনে না থাকে, ক্ষতি নাই। বাটী দুইটী পরস্পরের সহিত সংলগ্ন। এমন কি, এক বাটীরই দুই অংশ। মধ্যে একটী দেওয়াল। প্রত্যেকের ভাড়া চল্লিশ টাকা। অথচ এমন অসুবিধা যে, এক অংশে জোরে কথা কহিলে আর এক অংশে শুনা যায়। ফুলের বাগান দুই বাটীরই এক। সম্মুখে খোলা মাঠের মত খানিকটা জমী।

প্রতি বৎসরেই দেখা যায় যে, ২ নম্বর ভাড়া হইলে ৩ নম্বরে শীঘ্র কেহ আসিতে চাহে না। এই জন্য অম্বিকা বাবু দুই ভাগেরই ভাড়াটিয়া না পাইলে বাটী ছাড়িয়া দিতে নারাজ হইতেন। এবার ডিসেম্বর মাস কাটিয়া গেল। মোটে এক জন ভাড়াটিয়া জুটিল।

নাম—প্রোফেসার জীবনচন্দ্র মিত্র এম্. এস্. সি; কাজেই প্রোফেসারকে ২ নম্বর বাটী ছাড়িয়া দিতে হইল। ৩ নম্বর খালি পড়িয়া ছিল। এতাদৃশ স্থানের নির্জ্জনতা ভাগ্যে ঘটিবে, তা জীবনচন্দ্র নিজেই মনে করেন নাই। প্রথম কারণ, তাঁহার বিবাহ হয় নাই। তাহারও যদি কারণ জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, স্ত্রীলোকদের গোলমাল তিনি অত্যন্ত ভয় করিতেন। দ্বিতীয় কারণ, তিনি ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে একখানা প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচনা করিতেছিলেন, এবং তাহার জন্য তিনি—কলেজ হইতে এক বৎসরের ছুটী লইয়া অবিরত মার্কিউরি গোলক ঘুরিয়া বেড়াইতেন। গ্রন্থখানি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। সুতরাং জায়গাটা নির্জ্জন হওয়াতে, এবং স্ত্রীলোকদের গোলমাল না থাকাতে তাঁহার খুব সুবিধা হইয়া গেল। এমন কি, তিনি গ্রন্থের উপসংহার দুই চারি দিনের মধ্যে আরম্ভ করিবেন, এই রকম ভরসায় উৎপত্তি হইল।

জীবনচন্দ্রের সঙ্গে কেবল তাঁহার "খোকা" অভিধেয় একটি দশ বৎসরের ভাগিনেয় আসিয়াছিল। খোকাকে বাসেরিয়া থাকাতে সে সমস্ত বৈকালে

জুলস্‌টর পরিধান করিয়া ও মাথায় 'কম্ফর্টর' বাঁধিয়া এক জোড়া পুরাতন চটী জুতার সাহায্যে ফুলের বাগানে ও মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইত, এবং অনিমেষনয়নে তাহার ন্যায় রুগ্ন পান্থদিগের প্রতি চাহিয়া থাকিত। জীবনচন্দ্র তাহাকে বড় ভালবাসিতেন, এবং তাহার ভাব পতিক দেখিয়া বুদ্ধদেবের জীবনচরিত লইয়া আহারের পর এক ঘণ্টা কাল পড়াইতেন। পরিচারকবর্গের মধ্যে কেবল এক জন বৃদ্ধ কাশীর পাচক ব্রাহ্মণ ও খর্ব্বকায় এক জন ভৃত্য ছিল।

অনেক সময় জীবনচন্দ্রের ইচ্ছা হইত যে, খোকার জন্য ভাল করিয়া সোনা মুগের দাইল ও অল্প চিনি দিয়া সন্দেশ প্রস্তুত করিয়া দেন। কিন্তু দুই তিন বার চেষ্টা করিয়াও তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সুতরাং বৃদ্ধব্রাহ্মণের অভ্যস্ত একই রকমের তরকারী এবং ছোট মাছের ঝোল, এবং একই রকমের ডাল দেওয়া দুগ্ধ দুই বেলা নিঃসহায়ভাবে চলিত। প্রোফেসার জীবনচন্দ্রের ক্ষুধাও যেমন অসামান্য, ক্ষুধাও যে তাহা অপেক্ষা কম অসামান্য, তাহা বলিতে পারা যায় না। সুতরাং মধ্যে মধ্যে তিনি তাঁহার সঞ্চিত বিস্কুটগুলি খোকার সহিত ভাগ করিয়া খাইতেন, এবং দরকার হইলে চা'র সহিত দুই চারি মুঠা ছোলাভাজা পার করিয়া দিতেন।

কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। জানুয়ারী মাস শেষ হইতে না হইতে ৩ নম্বরের ভাড়াটিয়া জুটিয়া গেল। জীবনচন্দ্র সত্রাসে সমস্ত কপাট বন্ধ করিয়া কেবল বাহিরে যাইবার একটি দ্বার উন্মুক্ত রাখিলেন। খোকা ফুলের বাগানের একটা নিভৃত কোণে দাঁড়াইয়া ভাড়াটিয়া পরিবারের মধ্যে কোনও রুগ্ন ছেলেপুলে আছে কি না, তাহা লক্ষ্য করিতে লাগিল। যত দূর জানা গেল, ভাড়াটিয়াদের মধ্যে স্ত্রীলোকের পাল ছিল না। হয় ত এক জন স্ত্রীলোক থাকিতে পারে, কিন্তু সে বড় বাহিরে আসিত না। তবে কাশীর শব্দ শুনিয়া বুঝা যাইত যে, বাটীতে এক জন বৃদ্ধ লোক আসিয়াছিল। ক্রমে চাকর ও ব্রাহ্মণ ও খোকা সকলে মিলিয়া দেখিতে পাইল যে, তিনি হ্যাট কোট পরিধান করিয়া, এবং দুই জন দরওয়ান সঙ্গে লইয়া, এবং লাল মেরুণোর গাউন পরিবৃতা একটি বয়স্থা বাসিকার হাত ধরিয়া, খুব প্রাতঃকালে এবং খুব সন্ধ্যাকালে হাওয়া খাইয়া দুই ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিতেন। বোধ হয়, তাঁরা খুব বড়লোক।

দৌভাগ্যের বিষয়, তাহাদের মধ্যে কেহ ২ নম্বরের দিকে আসিত না; এমন কি, তাহাদের চাকর ব্রাহ্মণ (বোধ হয় তাহাদের সঙ্গে এক জন বাবুর্চ্চীও ছিল, সুতরাং যত দূর জানা সম্ভব) ২ নম্বরের অধিবাসীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে

চাহিত না। সুতরাং জীবনচন্দ্রের একমাত্র আতঙ্ক দূর হইয়া গেল। তবে একটা উৎপাত ছিল। প্রায় সমস্ত দিনই পার্শ্বের বাটীতে (৩ নম্বরে) ছেলে মেয়ে ঠাক্ ঠাক্ নানাবিধ শব্দ অবিরত চলিত। হয় ত গৃহমার্জ্জনের শব্দ, কিংবা খেলা-দৌড়ির শব্দ, কিংবা বাসনের শব্দ, কিংবা জলখাবার তৈরীর শব্দ, কিংবা মধ্যে মধ্যে একটা গুণ্ গুণ্ শব্দ, কিংবা দুই একবার সরল ও মধুর হাস্য। ইহাদের বিরাম ছিল না। এগুলি জীবনচন্দ্র নির্ব্বিবাদে সহিয়া থাকিতেন। কিন্তু একটা শব্দ তাঁহার অসহ্য হইয়া পড়িল, তাহা অনবরত একটা বেরাল-ছানার 'মিউ' 'মিউ' শব্দ।

বোধ হইত, তাহার ক্ষুধা না থাকিলেও কেহ জোর করিয়া খাওয়াইত, এবং বোধ হয়, তাহার পক্ষে সেটা কষ্টকর হওয়াতে সে স্ত্রীস্বরে ডাকিত।

২

'তাই ত, বড় মুস্কিলে পড়া গেল। এর চেয়ে কল্‌কেতার ট্রামের আওয়াজ ঢের ভাল ছিল। বেরাল-ছানার এ রকম ভীষণ তীক্ষ্ণ আওয়াজে শীঘ্রই এ বাসা ছেড়ে দিতে হবে।'

প্রোফেসার জীবনচন্দ্র এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া তাঁহার 'ভূতত্ত্ব' গ্রন্থের উপসংহার আরম্ভ করিলেন। খোকা তার 'বুদ্ধদেবের জীবনচরিত' লইয়া বসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে খোকা বলিল, 'মামা বাবু! সেই বেরাল-ছানাটা ডাক্‌ছে।'

প্রোফেসার। ওটা জুটলো কোথা থেকে?

খোকা। ঐ বাড়ীতে মেম সাহেবের মত যে মেয়েটা থাকে, তার।

প্রোফেসার। বেরালটা অত চেঁচায় কেন?

খোকা ৩ নম্বরের বাটীর ইতিহাস এত দূর সংগ্রহ করিয়াছিল যে, কাহাকে বলিবে, ঠিক পাইত না। সে হঠাৎ মামাবাবুর প্রশ্ন শুনিয়া প্রাণপণে তাহার অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিল।

'মেয়েটা যখন তখন বেরাল-ছানার গাল টিপে খাবার খাওয়ায়, সে খেতে না পেরে তাই স্বরে চেঁচায়।'

প্রোফেসার। ভয়ানক অত্যাচার!

খোকা। শুধু তাই নয়, সেটাকে হারিয়ে যাবার ভয়ে কিংবা পাছে অন্য বাড়ী ভুলে যাবার ভয়ে দড়ি বেঁধে দিয়ে চেপে রাখে, তাই সে সহ্য কর্ত্তে পারে না।

প্রোফেসার। জীবের স্বাধীনতার উপর নৃশংসভাবে হস্তক্ষেপ—নিষ্ঠুর অত্যাচার! ভায়ত্বর্ম্ম এই ক'রে মাটী হয়ে গেল।

খোকা। বুদ্ধদেব বোধ হয় এই জন্য পালিয়ে গিয়েছিলেন?

জীবনচন্দ্র খোকার সমালোচনা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, বুদ্ধদেবের জীবন-চরিতে যে খানিকটা পড়িয়াছে; অতএব বলিতে বাধ্য হইলেন—'অনেকটা বটে।'

তাহার মন্তব্য মাতুলের মনোমত হইয়াছে দেখিয়া খোকা আরও একটু মন্তব্য প্রকাশ করিল, 'মামাবাবু! আর একটা কারণ আছে। মেয়েটার মা নেই। মা না থাকলে ছেলে পুলে নিষ্ঠুর হয়।'

এ মন্তব্যটা বৃদ্ধলোকের মত হইয়াছে মনে করিয়া খোকার মুখ ভয়ে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। জীবনচন্দ্রের পৃথিবীতে মা ছাড়া আর স্নেহের কিছুই ছিল না, সুতরাং কথাটা শুনিয়া তাঁহার মনে অতিশয় করুণার সঞ্চার হইল, এবং খোকার সমালোচনা খুব গভীর হইয়াছে দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'খুব সত্য কথা।'

খোকা স্বীয় বুদ্ধির প্রাগ্রভ্য অনুভব করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

প্রোফেসার। এখন এটাকে থামানো যায় কি ক'রে?

খোকা। আমি ওদের বাড়ীতে গিয়ে বলব যে, বেরাল-ছানার আওয়াজে আমাদের পড়াশুনার ব্যাঘাত হয়।

প্রোফেসার। আমাদের সে কথা বল্‌বার কোনও অধিকার নাই। তুমি এটা শিখে রাখ। যদি কেউ ইচ্ছে ক'রে কারো অনিষ্ট করে, অথচ তার কাজে তার নিজের আনন্দ হয়, তবে তার বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়ানোর কোনও দাবী দাওয়া নাই। তুমি যদি আজ জ্বরে প'ড়ে কাতর হয়ে ডাক, তবে তারা কখনো বল্‌বে না,—'ওগো! তোমাদের ছেলের শব্দে আমাদের বিরক্তি বোধ হচ্ছে'। আমাদের উঠে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নাই।

খোকা লজ্জিত হইয়া রহিল।

৩

তখন রাত্রি। শীতকালের দীর্ঘ নীরব রাত্রি। জীবনচন্দ্র একাকী নিজের ঘরে গিয়া গ্রন্থের 'উপসংহার' লিখিতে আরম্ভ করিলেন। পার্শ্বের বাটীতে মাঝে মাঝে শব্দ হইতে লাগিল—'মিউ মিউ!'

প্রোফেসার জীবনচন্দ্র সহিয়া গেলেন। মেয়েটির মা নাই। মা না থাকিলে মাতৃস্নেহের স্মৃতি নিষ্ঠুর মনের মধ্যে জাগিতে থাকে। সেই স্মৃতিটুকু দিয়া স্নেহহারা নিষ্ঠুর কোনও জীবের উপর বর্ষিত হয়। এটা খুব স্বাভাবিক। জীবন-চন্দ্র 'উপসংহারে' লিখিতে লাগিলেন—'ভূতত্ত্বেও আমরা প্রকৃতীদেবীর অসাধারণ পুত্রবাৎসল্য দেখিতে পাই। বোধ হয়, যেন যুগযুগান্তের সন্তানগণকে লইয়া

আবিষ্কারী ভূগর্ভের স্তরে স্তরে অধিষ্ঠিতা। যখন মানবীরূপে প্রকৃতি ভূপৃষ্ঠে আবির্ভূতা হন, তখন এই বিচিত্রভাব অধিকতর প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। জনিক আবর্ত্তনে বন্য পশু গৃহপালিত হইয়া পড়ে, বনের পাখী পিঞ্জরাবদ্ধ হয়, বনের ফুল উদ্যানের শোভা বর্দ্ধন করে—'

এমন সময় খুব নিকটে একটা শব্দ হইল—'মিউ!' খুব নিকটে! এমন কি, জীবন বাবুর চেয়ারের পশ্চাদ্ভাগে। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন যে, একটা অতিশয় ক্ষুদ্র শুভ্র লোমশ হৃষ্ট পুষ্ট নধর ও সুন্দর বিড়ালশিশু তাঁহার পশ্চাদ্দেশ হইতে ধীরে ধীরে তাঁহার টেবলের উপর উঠিয়া পড়িল। ক্রমে তাঁহার ভূতত্ত্বের 'উপসংহারে'র উপর বসিল! জীবনচন্দ্র সভয়ে ডাকিলেন, 'খোকা!'

খোকারও অবিলম্বে প্রবেশ।

জীবনচন্দ্র। কি সর্ব্বনাশ! সেই বেরাল-ছানাটাই বোধ হয় কোনও রকম ক'রে এখানে এসে পড়েছে!

খোকা বাক্যব্যয় না করিয়া তাহাকে কোলে লইল।

বলা বাহুল্য যে, বিড়ালশাবক কোনও প্রকারে নির্জ্জন নিশীথে গৃহত্যাগ করিয়া বুদ্ধদেবের ন্যায় পলাইবার যোগাড় করিয়াছিল, কিন্তু একটা সংসারারণ্য ছাড়িয়া যে অন্য একটাতে আসিয়া পড়িবে, এ রকম সে ভাবে নাই। এবং বলা বাহুল্য যে, এই নূতন সংসার দেখিয়া সে মোটেই ভীত হয় নাই, বরং খোকার বক্ষ হস্তে পড়িয়া সে গোটাকতক ক্ষুদ্র মৎস্য উদরস্থ করিয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণলোচনে যশ মানিয়া গেল। এ রকম ক্ষিপ্রভাবে অবস্থার পরিবর্ত্তন জীবনচন্দ্র কোনও জৈবিক ইতিহাসে পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। তিনি স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন—

'বেরালটা আর ট্যাচাচ্ছে না'!

খোকা। বোধ হয় চুনোমাছ খেতে ভালবাসে। আমি ত আর জোর ক'রে খাওয়াইনি! এত রাত্তিরে আমি একে হিমে বের'তে দেব না।

প্রোফেসার জীবনচন্দ্র আপাততঃ প্রতিবাদ করা শ্রেয় বিবেচনা করিলেন না। সকলকেই স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। সবলে বিড়াল-শিশুকে তাহার প্রভুর নিকট এত রাত্রিতে পাঠাইয়া দেওয়ার বিশেষ কোনও প্রয়োজন তিনি দেখিতে পাইলেন না। বিশেষতঃ তাহার পলায়ন যে ও বাটীতে লক্ষিত হইয়াছিল, তাহার কোনও কোলাহল কিংবা সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। বোধ হয়, সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তিনি খোকাকে বলিলেন, 'আচ্ছা, সকালে ফিরিয়ে দিও। ওর গলার সঙ্গে একটা কি চক্-চক্ কচ্ছে না?'

খোকা। ওটা পিতলের চেন। দেখুন—একটা লকেট!' খোকা লকেটের মুখ খুলিয়া দেখিল যে, তাহার মধ্যে খুব ছোট একখানি 'ফটো', তার নীচে আরও ছোট করে লেখা—'সরলা বসু'।

খোকা। এ সেই মেয়েটার 'ফটো'।

জীবনচন্দ্র তাচ্ছীল্যভাবে সেটাকে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলেন। 'একটা কাজ আমাদের ভাল হয় নাই। যদি এ চেন ও লকেট্‌টা সোনার হয়, তবে!'

খোকা। আমরা ত আর চুরী করে নেব না! কাল্ সকালে চেন-শুদ্ধো রেয়াল্‌ছানা ফিরিয়ে দেব।

জীবনচন্দ্র মনে মনে তর্ক করিয়া দেখিলেন যে, ইহাতে অন্যায় কিছুই নাই। এক রাত্রিতে কোনও জিনিস কুড়াইয়া পাইলে তাহার মালিককে অনুসন্ধান করিয়া ফিরাইয়া দেওয়া একরকম অসম্ভব। বিশেষতঃ, বিড়ালশাবকের তীব্র স্বরের নিবৃত্তি তাঁহার পক্ষে অশেষ শান্তির কারণ হইয়া পড়িয়াছিল।

আবার তিনি 'উপসংহার' লিখিতে বসিলেন। রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর। অন্ধ মন্ত্রির ন্যায় এ রাত্রি তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইল না। বিড়াল-শিশু স্বাধীন। তিনিও তাহার স্বাধীনতার আশ্রয়ে ক্রমে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

প্রাতঃকালে বেলা আট্‌টার সময় খোকা অল্‌ষ্টর পরিধান করিয়া চা খাইতে বসিয়াছে। আগন্তুক বিড়াল-শিশু পার্শ্বে অবস্থিত হইয়া তাহা দেখিতেছে। জীবনচন্দ্র প্লেটে ছোলাভাজা লইয়া চর্ব্বণ করিতেছেন। বিড়াল-শিশু নিরুদ্ধ। তাহার উপর আজ কোনও দৌরাত্ম্য নাই। সে ইচ্ছা করিলে চলিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু যাইবার ইচ্ছা নাই। বোধ হয়, সে আর একটা অভিনব সংসারের সুখ সম্ভোগ করিতেছিল।

বিড়াল-শিশুর পক্ষে আজ নূতন কি? বোধ হয়, তাহার পুরাতন জীবনের সঙ্গে অদ্যকার জীবন একটু ভিন্ন। এ ঘরবাড়ী নূতন। ইহার অধিবাসী নূতন। এখানে বালিকা নাই, বৃদ্ধ নাই, অত্যাচার নাই। এখানে যুবা, বালক, ও করুণা তাহাকে বিরিয়া। সে তাহাদের ভাবগতিক দেখিতেছিল; কখনও নেত্র বিস্ফারিত করিয়া অতিশয় কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া জীবনচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিতেছিল। কখনও পণ্ডিতের ন্যায় সকল ভাবগুলি গ্রহণ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিতেছিল।

বিড়াল-শিশুর ভাবের সঙ্গে জীবনচন্দ্রের ভাবেরও বোধ হয় একটু সম্বন্ধ ছিল। জীবনবাবু ভাবিতেছিলেন যে, বিড়ালের আজ তত স্ফূর্ত্তি নাই। উহার

নাই। তাহার জীবনে যেন কিসের একটা অভাব। হয় ত তাহার পূর্ব্বের বন্ধু ও আদর মনে করিয়াই অভাব বোধ হইতেছে। যে দুটি কোমল শুভ্র করতল তাহার ক্ষুদ্র কোমল দেহ বেষ্টন করিয়া থাকিত, আজ তাহার অভাব। যে মাতৃস্নেহটুকু সেই করতল বাহিয়া তাহাকে দুগ্ধ পান করাইত, তাহার অভাব। জীবনচন্দ্রের মনে করুণা বর্ষিত হইতে লাগিল। তিনি সাদরে বিড়ালশিশুকে কোলে লইয়া চা খাইতে লাগিলেন।

এমন সময় বাতায়নের সম্মুখে একটি বালিকা আসিয়া উপস্থিত হইয়া বিড়াল-শিশু জীবনের কোলে ঈষৎ কম্পিত হইয়া ডাকিল—'মিউ!'

এই যে 'মিউ', ইহার মধ্যে বিষম সমস্যা। জীবনের সমস্যা।

বালিকা বলিল, 'খোকাবাবু, আমার বেরাল-ছানা ছেড়ে দাও।'

খোকা। আমি ওকে আনি নাই, মামা বাবুকে জিজ্ঞাসা করুন। উনি আপনি এসেছে।

জীবন। তোমারই নাম সরলা—নাম সরলা—না?

[জীবনচন্দ্র বিড়াল-শিশুর পদদেশের লকেট একবার খুলিয়া আবার বন্ধ করিলেন।] 'এ বেরালটা বোধ হয় রাস্তা ভুলে এসেছিল। আমরা তাড়িয়ে দিয়েছি। কোনও কষ্ট হয় নি। তবে এখানে তেমন যত্ন আদর হয় নি, তার জন্য কিছু মনে করিও না। তোমার বেরাল তুমি স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পার।'

ইহা বলিয়া জীবনচন্দ্র প্রথমে একটু ধীরভাবে, এবং তাহার পর একটু চঞ্চল ভাবে বিড়ালশিশুকে লইয়া বাতায়ন পার করিতে দিবার চেষ্টা করিলেন। সরলা বাতায়নের পার্শ্বে আসিয়া বিড়াল-শিশুর পশ্চাদ্ভাগের পা দুখানি ধরিয়া আকর্ষণ করিল।

৪

কিন্তু বিড়ালশিশু সরলার নিকট গেল না। সে জীবনবাবুর হস্তে তাহার নখর বিদ্ধ করিয়া প্রাণপণে তাঁহাকে ধরিয়া থাকিল। ক্রমে সরলা তাহাকে বড়ই টানিতে লাগিল, নখরও তত গভীরভাবে বিদ্ধ হইতে লাগিল। অবশেষে জীবনবাবুর হাত ফুটিয়া শোণিত বাহির হইল। সরলা তাহা দেখিয়া ভয় পাইয়া বিড়াল-শিশুকে ছাড়িয়া দিল।

বিড়াল স্বাধীনতা পাইয়া আবার ডাকিল, 'মিউ!'

সরলা। কি নরাধম বেড়াল-ছানা! আপনি ওকে ছুঁড়ে ফেলে দিন, আমি গলা টিপে মেরে ফেলব।

জীবনচন্দ্র বুঝিলেন যে, সরলার 'ন্যায্য' শব্দের অর্থ 'অকৃতজ্ঞ', এবং বুঝাইয়া বলিলেন, 'একটা হত্যাকাণ্ড করবার দরকার নেই। বরং ভুলিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা কর।'

সরলা তাহার অঞ্চল হইতে খানকতক ক্ষুদ্র গুঞ্জা বাহির করিয়া বিড়াল-শিশুকে দেখাইল, 'এই নে—খা!'

কিন্তু বেরাল-ছানা সম্পূর্ণভাবে লোভ সংবরণ করিয়া জীবন বাবুর কোলে মুখ লুকাইল।

জীবন। এটা একটা মহা জঞ্জাল। তুমি আপাততঃ চেন ও লকেটটা নিয়ে যাও, আমি পরে একে কোনও রকমে রেখে আস্‌ব।

কিন্তু সরলা বলিল, 'না! ও যখন আমাকে চায় না, তখন আমিও ওকে চাই নে।'

জীবনচন্দ্র বুঝিলেন যে, সরলার ঘোর অভিমান হইয়াছে। হইবারই কথা। নিজ সন্তান অকৃতজ্ঞ হইলে কাহার না অভিমান হয়? জীবনচন্দ্রের বোধ হইল যে, সরলার নয়নকোণে দুই এক বিন্দু অশ্রু ঝরিতেছিল।

নিরুপায় হইয়া জীবনচন্দ্র বলিলেন, 'এই বেরালছানা লইয়া একটা আপদে পড়েছি। আমি ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে একখানা বই লিখ্‌ছি, বোধ হয়, তা জান না। সব শেষ হয়েছে, কেবল উপসংহার লিখ্‌তে এই ৮ নম্বরের বাড়ীতে দিন কতক থাক্‌ব—মনে করেছিলেন। কিন্তু এটার শব্দে আমার উপসংহারটা প্রায় নষ্ট হয়ে এসেছে। মনে করেছিলেম, আজ কালের মধ্যে চলে যাব, কিন্তু বিধাতার বিধান, বেরাল-ছানাটাই এসে উপস্থিত হয়েছে, এখন যেতে চায় না। আমি নিষ্ঠুরতার পক্ষপাতী নই। নয় ত, ছুঁড়ে ফেলে' দিয়ে বিপদ চুকে যেত।'

সরলা বিড়াল-শিশুর অবস্থা, নিজের অবস্থা ও ভূতত্ত্বের কথা, মুহূর্ত্তের মধ্যে মনে মনে আলোচনা করিয়া হাসিয়া ফেলিল, এবং হাসিয়াই আবার লজ্জিত হইল, এবং লজ্জিত হইয়া বলিল, 'আপনি ওটাকে দিন দুই রাখুন, এখন টানাটানি কর্‌লে মরে যাবে।'

জীবন। তা ভিন্ন আর উপায় নাই। ওটা খায় কি?

সরলা। কিছুই খায় না, তবে খেয়াল বেশী। কখনও গুঞ্জা খেতে চায়, কখনও অল্প একটু দুধ ও তার সঙ্গে ভাত, কখন একটু মাছের ঝোল।

জীবন। কাঁটা বেছে দিতে হয়?

সরলা। নিশ্চয়! তা না হলে অতটুকু ছেলে খাবে কি ক'রে?

কথাটা বলিয়াই সরলার কপোল রক্তবর্ণ হইল। জীবনের 'কাঁটা বাছা'র আগ্রহটুকু সরলার ভাল লাগিয়াছিল। সরলার 'ছেলে'র সাধটুকু জীবনের কি ভাগে নাই? উভয়ের অন্তরের ভাবের ঘাত-প্রতিঘাতে উভয়ের জীবনে ব্যবধান কমিয়া গেল।

জীবন। তবে আমি ওকে তোমার মত ভালবাস্‌তে পারব কি না সন্দেহ।

সরলা। কোনও দরকার নেই! আমি ত এত ভালবেসেছিলেম, কিন্তু ওর মায়া দয়া কৈ। স্বচ্ছন্দে আমাকে ছেড়ে আসে।

জীবন। আমার বল্‌বার মানে যে, আমার ভূতত্ত্ব লিখ্‌তেই সময় কেটে যায়। তবে খোকা ওর অনেকটা যত্ন করবে। মায়া দয়ার কথা বুঝ্‌তে পারা বড় শক্ত। ভূতত্ত্ব না পড়্‌লে ঠিক বুঝা যায় না। এই যে পৃথিবী, এ সকলকেই খেতে দেয়, অথচ একে যত্ন কেউ করে না। এর মধ্যে মস্ত একটা দয়া মায়ার স্থান আছে। এর বুক খুঁড়ে আমরা জল খাই, একে চাষ করে' আমরা শস্য নিই, এর মাটি নিয়ে আমরা ঘর তৈরী করি, এর নদনদী পাহাড় বন ও উপবন দিয়ে আমরা সংসার গড়াই, কিন্তু পৃথিবী যে রোজ জীর্ণ শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, তাহার জন্য আমাদের মনে কি একটু মায়া হয়? আমরা বলে' থাকি, জন্মভূমি আমাদের জননী, কিন্তু জন্মভূমিকে আমরা যত্নে কোথায় রাখি! ভূমি জীর্ণ শীর্ণ অনাথার মত কঙ্কালসার হয়ে পড়্‌ছে। তার উপর মায়া কৈ? তার একটা নদী, একটা বন, এমন কি, একটা গাছ গেলেও এক সময় তার সন্তানদের প্রাণে লাগ্‌ত। এখন তাকে খুঁড়ে, বেঁধে, আগুনে পুড়িয়ে, কেটে কুটে একাকার ও ছারখার করছি। আগে আমরা জননীকে কত যত্ন করেছি। কুটীর বেঁধে, হরিণশিশু নিয়ে, স্বভাবজাত ফল মূলের সাহায্যে জীবনধারণ ক'রে, জল, আকাশ, বায়ু ও বন উপবনের মধ্যে তাঁর শোভা দেখেছি। তাঁরই কাছে বিশ্বের জ্ঞান লাভ করেছি। আমরা কি অকৃতজ্ঞ নরাধম নয়?

জীবনের কথা সরলার বড় মধুর বোধ হইতেছিল।

এ সব কথা আপনার ভূতত্ত্বের মধ্যে আছে?'

জীবন। নিশ্চয়। শীঘ্রই বেরুবে। কেবল ছাপ্‌বার দেরী। উপসংহারটা হয়ে আস্‌ছিল, সেই সময় এই বেরাল-ছানার উপদ্রব। যাই হোক্, তুমি ওতে কিছু মনে করো না। এই বেরাল-ছানা আমাকে একটা নূতন শিক্ষা দিয়েছে, সেটা আমি আগে জান্‌তাম না।

সরলা। কি?

জীবন। সেটা উপসংহারে প্রকাশ করব।

৫

সরলা বাড়ী ফিরিয়া গেল। সরলার পিতা বৃদ্ধ রামচরণ বসু একাকী বারান্দায় বসিয়া হেকেলের 'ইভল্যুশন অফ্ ম্যান্' (মানবের ক্রমবিকাশ) নামক গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন।

সরলা। পিতার গলা জড়াইয়া ধরিল, বলিল, 'বাবা, আমার বেরাল-ছানা ও বাড়ীর জীবনবাবুকে দিয়েছি।"

বসুজা মহাশয় অবাক হইয়া বলিলেন, 'সে কি?' তাঁহার অবাক হইবার কারণ ছিল। প্রথমতঃ, জীবন বাবু কে, তাহা তিনি জানিতেন না। দ্বিতীয়তঃ, সরলার জীবনের যত সাধ ও ভালবাসা ঐ বেরালছানাকে জড়াইয়া। সুতরাং পৃথিবী দ্বিধা হইলেও বসুজা মহাশয় এত আশ্চর্য্য হইতেন না।

সরলা তাহা কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারিয়া সলজ্জে বলিল, 'একেবারে দিইনি, আপাততঃ দু দিনের জন্য দিয়েছি। বেরালটা ২ নম্বর বাড়ীতে চলে গিয়েছিল, এখন আসতে চায় না, তাই আমি বলেছি, 'থাক্'।

বসুজা। জীবনবাবু কে?

সরলা। তিনি কলেজের প্রোফেসার, খুব লেখাপড়া জানেন, 'ভূতত্ত্ব' লিখছেন। ছাপা হলে তাঁর একখানা বই আমি কিনব।

বসুজা মহাশয় সরলার মধ্যে আজ একটু নূতন ভাব দেখিতে পাইলেন। ঠিক সে ভাবটা কি রকম, তাহা হঠাৎ বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু নূতন কোনও লক্ষণ দেখিলেই বসুজা মহাশয় ভয় পাইতেন। সরলার মাতার বুক বড় দুর্ব্বল ছিল। ডাক্তার বলিত, কোনও রকম 'ইমোশন্' হইলে প্রাণের ভয়। বাস্তবিক তাহাই ঘটিয়াছিল। ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া সরলার মাতা 'হার্ট ফেল্' হইয়া মারা গিয়াছিলেন। সেই অবধি কোনও রকম ভাবের আধিক্য দেখিলে বসুজা মহাশয় চিন্তান্বিত হইয়া পড়িতেন। সরলার বিবাহের সম্বন্ধে কোনও কথা উঠিলে বসুজা মহাশয় বলিতেন, 'না, আরও বড় হউক, সংসারের একটু বুঝিতে না পারিলে বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। জগৎ এখন এক রকম ধর্ম্মবিহীন। স্বামী তাহার দারিদ্র্য বুঝে না।'

বসুজা মহাশয়ের হঠাৎ মনে হইল, তাঁহার জীবনবাবুর সহিত আলাপ করা উচিত। তিনি ধুতি ও চাদর পরিধান করিয়া ২ নম্বর বাটীতে চলিয়া গেলেন। জীবনচন্দ্র বৃক্ষের নীচে বসিয়া তাঁহার উপসংহার লিখিতেছিলেন। বৃদ্ধকে দেখিয়া নমস্কারপূর্ব্বক বলিলেন, 'আসুন!'

বসুজা। আমার আসাতে আপনার বিরক্ত হইবার কথা, কিন্তু আমার এতদিন না আসাই অন্যায় হয়েছিল। আমি ৩ নং বাড়ীতে থাকি।

জীবন। বরং আমি নিতান্ত অনুগৃহীত হয়েছি। আমি বরাবরই আপনার সঙ্গে দেখা করব—মনে করেছিলেম, কিন্তু সময় পাই নাই। একখানা বই লিখ্‌ছি।

বসুজা। কলিকাতায় জীবন মিত্তিরের নাম খুব শুনতে পাই। আপনি এক জন প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিদ্। কিন্তু এত কম বয়স, তা জান্‌তেম না।

জীবনচন্দ্রের সুন্দর, সরল, জ্ঞানপূর্ণ, সংযত যৌবনের মুখখানি দেখিয়া বসুজা মহাশয় অতিশয় প্রীত হইলেন।

'আমিও এক সময় বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলাম, বোধ হয় জানেন। অধ্যাপকের জীবন অতিশয় দায়িত্বের, অতিশয় চিন্তা ও সঙ্কল্পের, অতিশয় প্রেমের এবং আত্মোৎসর্গের;—তাহাই আমাদিগের গৌরব।'

জীবন। আপনার 'ক্রম-বিকাশ-বাদ' আমি খুব মন দিয়া পড়িয়াছি, আপনি ক্রমবিকাশের মধ্যে ভক্তির কোনও কথা বলেন নাই কেন?

বসুজা। আমার বোধ হয়, জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে ভক্তির হ্রাস দেখা যায়। যখন আধুনিক সামাজিক জীবনের দিকে তাকাই, তখন ভক্তির অধঃপতনই দেখি। পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, গুরুভক্তি, সকলেরই যেন ক্রমে অভাব দেখিতেছি। স্নেহ, দয়া ও ক্ষমা প্রভৃতি ক্রমে লয় পাইতেছে। তাই আমার মনে হয় যে, বিকাশের একটা দ্বৈতভাব আছে। একবার এটা, একবার ওটা ফুটিয়া উঠে। দুটো এক সঙ্গে হয় না। ধর্মজগতের দিকে তাকাইলে তাহা অনেকটা বুঝা যায়।

জীবন। কিন্তু আমি দেখ্‌ছি যে, মূলে যখন একটা, তখন ভক্তের মতই জ্ঞান এসে পড়বে। জ্ঞান ভক্তি অন্বেষণ করে, ভক্তি জ্ঞান অন্বেষণ করে, যেন অসীম পথে মাঝে মাঝে এক ভাই অন্যকে হারায়, কিন্তু ভেবে দেখ্‌লে দুটোরই সঙ্গে সঙ্গে বিকাশ হয় বলে' বোধ হয়। ভূতত্ত্বের এক একটা ঘোর অগ্ন্যুৎপাতে দেখা যায়, যেন পৃথিবীর হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে জ্ঞানাগ্নির বিকাশ হয়; আবার সেটা শীতল হয়ে মাতৃকোলে হিমালয়ের মত মস্তকে তুষার-ধারণ করিয়া বসে। তাহা তুষারগলিত হয়ে স্নেহধারা প্রবাহিত হয়। জননী যখন সন্তান প্রসব করে, তখন সে ভবিষ্যতের ভক্তি ও জ্ঞানপিণ্ড ছাড়া আর কি? ভক্তি না পাইলে, স্নেহ না পাইলে মানব আত্মহত্যা করে। যত জ্ঞান বাড়ে, তখন জ্ঞান যাহার

তাহারই ভক্তিরসে সে আকৃষ্ট হয়। তখন সংসারের দিকে তাহার করুণা ও মমতা ছুটে। মায়াই জ্ঞান ও ভক্তির প্রমাণ।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বৃদ্ধজনে বসিয়া বসুজা মহাশয়ের সহিত জীবনের অনেক কথোপকথন হইল। জীবনচন্দ্রের দীর্ঘ বাসের মধ্যে পূর্ণচন্দ্রের মত মুখখানি দেখিয়া বসুজার মনে হইল, জীবনের হাতে সরলাকে দিয়া তিনি সুখে মরিতে পারিবেন।

৬

আজ সকাল হইতে খোকা ৩ নং বাটীতে সরলার নিকট বসিয়া বুদ্ধদেব পড়িতেছিল। সরলা তাহা শুনিতে শুনিতে নানাবিধ মুখখানার তরকারী করিতেছিল।

হঠাৎ বুদ্ধদেবের কথা মনে হওয়াতে সরলা বলিল, 'এই খাবারগুলো তোমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাও!'

খোকা। মামাবাবু কেবল আমাকেই খেতে বল্‌বেন। তিনি কেবল তোমা তাহা খেয়ে থাকেন।

সরলার মনে দুঃখ হইল।

জীবন বাবু সেই সময় বিড়াল-শিশুকে লইয়া সরলার রান্নাঘরে উপস্থিত হইলেন। সরলার কোনও মতলব ছিল না; তথাপি বক্ষের কোণ ঈষৎ টানিয়া অবগুণ্ঠিতা হইল। কেন?

জীবন বাবু বিড়াল-শিশুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'দেখ, তোমার পুরাণো বাড়ী দেখ, এমন সুন্দর বাড়ী ছাড়তে তোমার সাধ হ'ল কেন?'

খোকা। মামাবাবু! আমি এইমাত্র পড়ছিলেম যে, পরের দুঃখ দেখে বুদ্ধদেব তাঁর বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছিলেন।

জীবন। তার সঙ্গে আর এটার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ আছে, তা ঠিক বুঝা যায় না। বেরাল-ছানা আমার দুঃখ কি তোমার দুঃখ জানিত, তা কি ক'রে বলব? সরলা! তুমি কি কচ্ছ?'

সরলা। ছোলা ভাজ্‌ছি।

জীবন। তুমি তোমার বেরাল-ছানাকে একবার কোলে কর, আমি খানিক ক্ষণ ছোলা ভাজি। তবে আমি ঠিক ভাজতে জানি না।

সরলা। আমি আর ওকে কোলে করব না।

জীবন। তুমি সেদিন বলেছিলে—ও তোমার ছোট ছেলে। আমাকে

মুখিনের অন্ন তার নিয়েছিলে। আমি যথাসাধ্য ওকে যত্ন করেছি, কিন্তু কিন্তু বোধ হয় ওর মায়াটা তোমারই উপর বেশী।

সরলার পূর্ব্বস্মৃতির সঙ্গে স্নেহের পূর্ণ উচ্ছ্বাস উঠিয়া তাহার লজ্জা ভাসিয়া দিল। সরলা দৃষ্টি অবনত করিয়া মধুরস্বরে বলিল, 'দাও।'

জীবনচন্দ্র সেই অবনত সরলার অপূর্ব্ব সুন্দর মুখশ্রীর মধ্যে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের অটুট কোমল মাতৃস্নেহ সম্পূর্ণভাবে দেখিতে পাইলেন।

আর সেই 'দাও' কথাটা জীবনের জীবনে কি রকম লাগিয়াছিল?

জীবনচন্দ্র ভাবিলেন, ভূতত্ত্বের মধ্যেও এই বিরাট অধিকার-ব্যাপক বিশ্ব-জননীর মহাব্যাপ্তিভিবাঞ্ছী বিশ্বপিতার দিকে অবিরাম-ধারায় ছুটিতেছে। জীবন ভাবিল, 'কি দিব, সরলা? এই বিড়াল-শিশুর ন্যায় বিশ্বগোলকও তোমার নিকট হার! আমার এই সামান্য হৃদয়টুকু দিয়া কি তোমার অসীম প্রেমের ঋণ শোধ দিতে পারি? তুমি আজ্ঞা এই প্রেম লালন পালন করিয়া বিশ্বরূপে প্রকটিত কর, আমি তাহার মধ্যে সুখদুঃখের সমভাব দেখিয়া আনন্দময় হই।'

আজ বিড়াল-শিশুর যেটুকু অভাব ছিল, তাহার পূরণ হইয়া গিয়াছিল, বোধ হয় সে একটা সমবাদী সুরে 'মিউ' ধ্বনি করিয়া সরলার কোলে ছুটিয়া গেল।

সরলা বলিল, 'আজ এর মনটা ভাল আছে।'

জীবন। আমারও মনটার আর কমে গেল। এখন তুমি আমাকে ছোলা ভাঙ্গিতে শেখাও।

সরলা খুব সাবধানে জীবনচন্দ্রকে ছোলা ভাঙ্গার বিজ্ঞান বুঝাইয়া দিল। জীবনচন্দ্র অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়া সেই প্রক্রিয়াগুলি দেখিতে লাগিলেন।

ছোলাভাঙ্গা শেষ হইলে জীবন এক মুঠা লইয়া খাইলেন। ক্রমে ছোলাভাঙ্গা-গুলি নিঃশেষিত হইতে চলিল। জীবন বাবু বলিলেন, 'এমন সুন্দর কখনও খাই নাই।'

সরলা আদরে বলিল, 'আমি দুটো খেয়ে দেখ্‌ব।'

জীবন। সর্ব্বনাশ! আমিই যে সব নিঃশেষ ক'রে ফেলছি।

সরলা। তা হোক। থালে যা আছে, তাই আমার পক্ষে অনেক।

জীবনচন্দ্র একটা হাতে লইয়া বলিলেন, 'এইটুকু—আগে খেয়ে দেখ।'

সরলার তাহা লইতে গিয়া হাত দুইতে পড়িয়া গেল। জীবনচন্দ্র আবার একটা লইয়া বলিলেন, 'এবার তোমাকে খাইয়ে দেব, তুমি বড় অসাবধান।'

সরলা বলিল, 'না, আগে আমার হাতে দাও, আমায় ছেলেকে খাওয়াই। তার পরে যা থাকবে, আমি খাব।'

জীবন। আমি সেগুলি খাইয়ে দেব।

সরলা অতি ধীরে বলিল, 'আচ্ছা।'

বিনোদ ভাবিল, 'ভূতত্ত্বের উপসংহারে বুঝাইতে হইবে যে, সন্তানের মায়াটাই পূর্ব্বে। স্বামী কেবল জ্ঞাতা। মায়া জিনিসটা অজ্ঞের। জ্ঞানই আনন্দ।'

খোকা তখন দ্বারে বসিয়া অতিশয় মনোযোগসহকারে বুদ্ধদেবচরিত পাঠ করিতেছিল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাস।

২

ভট্ট কলহণদেবের কর্ণাটক-শব্দানুশাসন নামক গ্রন্থে তৃতীয় ইন্দ্রের মিত্র সামন্ত নরসিংহ কর্ত্তৃক পলায়নপর মহীপালের পশ্চাদ্ধাবন, এবং গঙ্গার সঙ্গমক্ষেত্রে স্বীয় অশ্বস্নানের বিষয় বর্ণিত আছে; রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাই উদ্ধৃত করিয়া অনুমান করিয়াছেন—তৎকালে গুর্জ্জর-প্রতীহার সাম্রাজ্য সুদূর ভাগীরথী পর্য্যন্ত, এবং ভাগীরথীর সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি দিনাজপুর-প্রস্তরলিপির উপর নির্ভর করিয়া ইহাও ধরিয়া লইয়াছেন যে,—নারায়ণপালের মৃত্যু হইতে গৌড়পতি প্রথম মহীপালের সিংহাসনারোহণ পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তর-বাঙ্গালা প্রদেশ মৌদ্গল্য-বংশোদ্ভব নরপালগণের শাসনাধীন ছিল।

প্রতীহার-সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি।

ইহা প্রকৃত হইলে, কেবল মধ্য-বাঙ্গালা, এবং হয় ত পূর্ব্ব-বাঙ্গালার কতক অংশ বাঙ্গালার পালরাজগণের অধিকারভুক্ত থাকিবার কথা। কিন্তু পালরাজবংশের দ্বিতীয় গোপালের রাজ্য যে মগধের কিয়দংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং সম্ভবতঃ নালন্দা ও গয়াও তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেরূপ প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেন—রাষ্ট্রকূট-রাজ তৃতীয় ইন্দ্র কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ-রাজ মহীপাল পরীবার যখন পরাজিত ও বিতাড়িত হয়েন, সেই সময় গৌড়েশ্বর দ্বিতীয় গোপাল মগধরাজ্যের পুনরুদ্ধার করিয়া থাকিবেন। কিন্তু মহীপাল পরী-

পালরাজগণের অধিকারভুমি।

হার যখন হর্ষ চান্দেল্লর সহায়তায় কান্যকুব্জের পুনরুদ্ধার সাধন করেন, তখন হয় ত তৎকালে গৌড়রাজবংশের কর-বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এই উপস্থিত সিদ্ধান্ত একটা দুর্ব্বল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠাপিত বলিয়া বোধ হয়।

শব্দানুশাসনে যে গঙ্গা-সঙ্গমের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা গঙ্গার যমুনা-সঙ্গমের, যা তাঁহার যমুনা-সঙ্গমের প্রতি লক্ষ্য করিতেছে, তাহা নিশ্চিতরূপে জানিবার উপায় নাই। তাহার অর্থ যাহাই হউক, তাহার ভিতর যে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের অধিকার আছে, তাহাও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। ৯৫৪ খৃষ্টাব্দের, যশোবর্ম্মা চান্দেল্লর যে শিলালিপির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে যশোবর্ম্মা গৌড়জনগণকে লতার ন্যায় ছেদন করিবার অসিরূপে, এবং মৈথিলগণের (অর্থাৎ ত্রিহুতের অধিবাসিগণের) শক্তিনিধনকারী রূপে, বর্ণিত হইয়াছেন। ১০০২ খৃষ্টাব্দের আর একখানি চান্দেল্ল-শিলালিপিতে যশোবর্ম্মার উত্তরাধিকারী বজ্রদেব অঙ্গ (বর্ত্তমান দক্ষিণ পূর্ব্ব বিহার প্রদেশ) এবং রাঢ় (অর্থাৎ পশ্চিম বাঙ্গালা) আক্রমণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। যে সকল প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে ইহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয় যে, কান্যকুব্জের পরীহার-রাজগণের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে জেজাকভুক্তির যে চান্দেল্লরাজবংশ প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহারাই রাষ্ট্রকূটগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার নিমিত্ত পরীহাররাজের সহিত সখ্যস্থাপন করিয়াছিলেন, এবং গৌড়ের পালরাজবংশ তাঁহাদিগের চিরাচরিত নীতি অবলম্বন করিয়া, পরীহার-রাজের প্রতিকূলে রাষ্ট্রকূটগণের সহিত মৈত্রীবদ্ধ হওয়ায়, চান্দেল্ল-রাজের সঙ্গে তাঁহাদের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। যশোবর্ম্মা চান্দেল্লর প্রস্তরলিপিতে "মিথিলেশ্বর" উল্লেখ দেখিয়া এরূপ মনে হয় যে, তাঁহার রাজত্বকালে ত্রিহুত গৌড়ের পালরাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল, অথবা তাহা তাঁহাদিগের মিত্ররাজগণের বা সামন্ত-নৃপতিগণের শাসনাধীন ছিল।

তাহার পর, উত্তর-বাঙ্গালায় কাম্বোজাক্রমণের কথা। দিনাজপুর জেলার বাণগড়ের ভগ্নস্তূপের ভিতর যে প্রস্তরলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাতে দেখিতে পাই,—কাম্বোজবংশ-সম্ভূত জনৈক নৃপতি একটি শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই শিলালেখে প্রতিষ্ঠার অব্দ কাম সংখ্যার সাঙ্কেতিক সূত্রাকারে লিখিত হইয়াছে।—তাহার অর্থ সপ্তাতঃ ৮৮৮ সংখ্যা; ইহাকে শকাব্দ বলিয়া অনুমান করিয়া লইলে, ৯৬৬ খৃষ্টা-

উত্তর-বাঙ্গালায় কাম্বোজ-আক্রমণ।

পাইতেছি। যে মোঙ্গলীয় জাতির আক্রমণের ফলে, কাম্বোজ-রাজবংশের—এই মন্দির-প্রতিষ্ঠাতার উদ্ভব-বংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহা যে নিশ্চিতই ইহার পূর্ব্বে ঘটিয়া থাকিবে, ইহাও স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। রামচরিতে দৃষ্ট হয়, উহা নারায়ণপালের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা হইতেই রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—উত্তর-বাঙ্গালার সমগ্র ভূভাগই নারায়ণপালের অবিসংবাদিত অধিকারে ছিল, এবং বাণগড়-মন্দিরলিপি হইতে তিনি ইহাও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দের শেষভাগে সমগ্র উত্তর-বাঙ্গালা প্রদেশ মোঙ্গলীয় রাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল। এই সিদ্ধান্তদ্বয়ের কোনটিই প্রমাণের দ্বারা কিয়ৎপরিমাণেও নিশ্চয়রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। মঙ্গলবাড়ী হাটের নিকট যাদব-স্তম্ভের অবস্থানভূমি, এবং কাম্বোজাম্বয়জ নৃপতির মন্দির-লিপির বাণগড়,—উভয়ই দিনাজপুর জেলায়, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাদিগের ব্যবধান অতি দীর্ঘ—প্রায় ২৫ মাইল; যাদব-স্তম্ভ দিনাজপুর জেলার পূর্ব্ব-সীমান্তের সন্নিকটে, এবং বাণগড় ঐ জেলার প্রায় কেন্দ্রস্থলে গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত, পুনর্ভবা নদীর তীরে। সুতরাং লিপিলম্ভ-প্রতিষ্ঠার সময়, বাণগড়ে কাম্বোজ-রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত থাকা একেবারে অসম্ভব নাও হইতে পারে। পক্ষান্তরে, এই কাম্বোজ-রাজগণের রাজ্য যে কতদূর বিস্তৃত ছিল, তাহার কোনও প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হই নাই। মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা কাম্বোজরাজের গৌড়পতি আখ্যা হইতে, গৌড়ে তাঁহার অধিকার বহুবিস্তৃত ছিল বলিয়া প্রমাণিত হইলেও, সমগ্র উত্তর-বাঙ্গালায় যে তিনি শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন,—এরূপ প্রমাণিত হয় না। সাময়িক হিসাবে, বাণগড়ের অবস্থান-ক্ষেত্র যে-রূপ ভূবিন্যাসযুক্ত ছিল বলিয়াই প্রতিভাত হয়। পরবর্ত্তিকালে, মুসলমানগণ যখন ধীরে ধীরে জয়-বিজয় করেন, তাহাদের প্রথম আমলে এই স্থানে মুসলমানগণের একটী সীমান্ত-ঘাঁটী স্থাপিত হইয়াছিল। বাণগড়-মন্দির-লিপি সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে,—উত্তর-বাঙ্গালায় এক কাম্বোজ-রাজবংশ ছিল, এবং বাণগড় তাঁহাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল, উহা তাহাই প্রমাণিত করিতেছে; এবং সম্ভবতঃ তিব্বত বা তুর্কীস্থান হইতে মোঙ্গলীয় অপর এক বা একাধিক জাতি আসিয়া যে উত্তর-বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়াছিল, উহাতে তাহারও ইঙ্গিত প্রাপ্ত হই।—লিপির নির্দ্ধারিত অব্দকাল যদি ভ্রমাত্মক না হয়, তাহা হইলে, ও আক্রমণ নিশ্চয়ই খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর প্রথমভাগে সংঘটিত হইয়া থাকিবে। এই সকল অভিযানকারী যে একটিমাত্রই জাতী হইয়া

করিয়াছিল, এবং হিন্দুধর্ম্মকেই আপনাদের ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল,—তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ আক্রমণ যে ঘটিয়া থাকিবে,—তাহা বিস্ময়কর নহে, এবং সে আক্রমণ সম্বন্ধে কোনও নিশ্চিত তথ্য যে আমাদিগের জ্ঞানগোচর হয় নাই—তাহাও বিস্ময়কর নহে। ভিন্সেণ্ট স্মিথ লিখিয়াছেন,—হিন্দু লেখকগণ বর্ব্বর জাতির আক্রমণ-বর্ণনে বিশেষ অনুৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবং রাজসভার যে সকল লেখক শাসন বা প্রশস্তির রচনা করিতেন, তাঁহারা যে এবম্বিধ ঘটনা বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিবেন না—ইহাও স্বাভাবিক।

গৌড়পতি মহীপালের ভাগ্যপ্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে,—তিনি অনধিকারী কর্ত্তৃক বিলুপ্ত পিতৃরাজ্যের উদ্ধার-সাধন করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে,—তাঁহার সিংহাসনে আরোহণ করিবার সময় পাল-বংশের ভাগ্যলক্ষ্মী অধঃপতিত ছিল; কিন্তু এই অবনতির হেতু কি, তাহা আমরা ঠিক অবগত নহি। পশ্চিম দিক হইতে পরীহার ও চান্দেলগণের আক্রমণ, এবং উত্তর দিক হইতে মোঙ্গলীয় জাতিসমূহের আক্রমণ—এই উভয় আক্রমণের ফলে পাল-বংশের অধঃপতন সংঘটিত হওয়া বিশেষ সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিব্বত ও ভুটান হইতে আক্রমণের পক্ষে বাঙ্গালা অবারিত ছিল। দৃষ্টান্তস্থলে, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভুটানবাসিগণ কর্ত্তৃক কুচবিহার-আক্রমণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ, ভুটানীগণ কুচবিহার স্বাধিকারে লইয়া কয়েক বৎসর কাল তাহার শাসনকার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন; কিন্তু কুচবিহারের মহারাজ ইংরাজের শরণাপন্ন হওয়ায়, তাঁহাদিগের সহায়তায় ভুটানীগণ পরাজিত হইয়াছিলেন। ভুটানীগণ তখন তিব্বতের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন, এবং তিব্বতের মধ্যবর্ত্তিতায় ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে এক সন্ধি-পত্র স্বাক্ষরিত হইল,—কুচবিহার ইংরাজ-রাজের করদ-মিত্র-রাজ্যরূপে কুচবিহারের মহারাজের হস্তে প্রত্যর্পিত হইল, এবং ভুটান-পর্ব্বতমালায় সানুদেশে-স্থিত বিস্তৃত সমতল প্রদেশ ভুটানের অধিকারে রহিয়া গেল। অবশেষে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে, শেষ ভুটান-যুদ্ধে ব্রিটিশ রাজ তাহাও স্বাধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছেন, এবং তাহা এক্ষণে জলপাইগুড়ি জেলার পশ্চিম দুয়ার (Western Duars) নামে পরিচিত।

মহীপাল।

বাঙ্গালার প্রথম পালরাজগণের রাজত্ব-কাল নিঃসন্দিগ্ধরূপে নিরূপিত হইবার উপায় না থাকিলেও, তাহাদিগের পৌর্ব্বাপর্য্য-প্রদর্শনের নিমিত্ত নিম্নে অন্ধ-সংবলিত নাম-তালিকা প্রদত্ত হইল; তাহাতে বপন হইতে আরম্ভ করিয়া গুর্জ্জর, প্রতীহার, বা

পালরাজগণের রাজত্ব-কাল।

পরীহার্য রাজগণের, তৃতীয় গোবিন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া রাষ্ট্রকূট-রাজগণের এবং ধর্মপাল হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালার পালরাজগণের নাম ও তাঁহাদের শাসন-প্রশস্তির লিপি-প্রমাণ-গত অক্ষাদি, এবং তাঁহাদিগের রাজ্যপ্রাপ্তির আনুমানিক কাল (কারণ, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রমাণের অভাবে অনুমান ব্যতীত উপায়ান্তর নাই) লিপিবদ্ধ হইল।

রাখা তারানাথ লিখিয়াছেন,—ধর্মপাল ৬৪ বৎসর এবং দেবপাল ৪৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। নারায়ণপাল যে অন্যূন ৫৭ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার রাজত্বের সপ্তদশবর্ষে সম্পাদিত তাম্রশাসন হইতে প্রাপ্ত হই। লিপির তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলেই সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইবে—তারানাথের উক্তি-অনুসারে যদি আমরা ধর্মপাল ও দেবপালের রাজত্বকালের শান্তি নির্দ্ধারিত করিয়া ৮০০ খৃষ্টাব্দকে ধর্মপালের রাজ্যাভিষেক-কাল বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা হইলে, সম্ভবতঃ গৌড়েশ্বর ধর্মপালের রাজত্বকালেই মিহির ভোজ কর্ত্তৃক পরিচালিত প্রতীহারগণ কান্যকুব্জ বিজয় করিয়া থাকিবে ;—দেবপাল যদি প্রতীহারগণের সহিত কোনও যুদ্ধ করিয়া থাকেন, তবে তাহা মিহির ভোজের সহিত, অথবা তাঁহার উত্তরাধিকারী মহেন্দ্রপাল, বা দ্বিতীয় ভোজের সহিত করিয়া থাকিবেন ; কদাচ রাজভ্রাতের সহিত করেন নাই ;—যদি ও রাখালদাস সেইরূপই অনুমান করিয়াছেন ; এবং সম্ভবতঃ ৯১৬ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্র কর্ত্তৃক কান্যকুব্জের মহীপাল পরীহারের যে পরাজয় ও নির্ব্বাসন সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা গৌড়ের প্রথম বিগ্রহপাল বা প্রথম শূরপালের, অথবা নারায়ণ পালের রাজত্বকালে ঘটিয়া থাকিবে। এরূপ হইলেও, গৌড়পতি প্রথম মহীপালের রাজ্যাভিষেক-কাল খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষের দিকে আসিয়া পড়িবে ; এবং তাঁহার ও নারায়ণ পালের ভিতর তিনটি রাজক-কালের ব্যবধান থাকায়, দিনাজপুর জেলায় ৯৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-কর্ত্তা ভোজ-রাজবংশকে তিনি উত্তর-বাঙ্গালা হইতে উৎখাত করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া যে সিদ্ধান্ত উপস্থিত হইয়াছে, তাহার সহিতও অসামঞ্জস্য ঘটিবে না।

অন্য দিক দিয়া দেখিতে গেলে, ক্রমান্বয়ে পিতাপুত্ররূপী দুইটি পাল-নৃপতির পক্ষে যথাক্রমে ৬৪ বৎসর ও ৪৮ বৎসর রাজত্ব কথা, একেবারে অঘটন না হইলেও, কিয়ৎপরিমাণে অসম্ভব ; এবং এই অসম্ভাব্যতা বিবেচনা করিয়াই স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তারানাথের উক্তি অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

তারানাথের উক্তি ছাড়িয়া দিলেও, ধর্মপাল যে, অন্ততঃ ৩২ বৎসর কাল, এবং দেবপাল ৩৩ বৎসর কাল রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা শাসনাবলীর দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। অতএব, নিম্নের তালিকায় প্রদত্ত বাঙ্গালার পাল-রাজগণের বিকল্পিত অঙ্ক গ্রহণ করিয়া রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় অনুমান করিতে পারা যায় যে,—গৌড়পতি দেবপাল পরীহার-রাজ রামভদ্রের এবং নারায়ণপাল প্রথম ভোজের সমসাময়িক ছিলেন। ইহার সহিত, পূর্ব্বে উল্লিখিত, বিনাভের গাদুঘরে সংরক্ষিত পুঁথির বর্ণনানুযায়ী গৌড়পতি দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকাল ২৬ বৎসর বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও, গৌড়েশ্বর প্রথম মহীপালের খৃষ্টীয় দশম শতাব্দের শেষ দিকে গৌড়ের সিংহাসনে অধিরোহণই সম্ভব বলিয়া প্রতিভাত হইবে।

পাল-রাজগণের নাম	রাজ্য-প্রাপ্তির আনুমানিক কাল—খৃষ্টাব্দ	প্রতীহার বা পরীহার রাজগণের নাম	লিপিপ্রমাণ-মূলক কাল—খৃষ্টাব্দ	রাষ্ট্রকূট রাজগণের নাম	লিপিপ্রমাণ-মূলক কাল—খৃষ্টাব্দ
গোপাল	৮০০	বৎস	...	তৃতীয় গোবিন্দ	৭৯৪-৮২৩
দেবপাল	৮৩৪ বা ৮৪০	নাগভট্ট	...	প্রথম অমোঘবর্ষ	৮১৪-৮৭৭
		রামভদ্র			
প্রথম বিগ্রহপাল বা প্রথম শূরপাল	৮১২ বা ৮৮০	মিহির ভোজ বা প্রথম ভোজ	৮৩৩	দ্বিতীয় কৃষ্ণ বা কৃষ্ণরাজ	৯০২-৯১১
নারায়ণপাল	...	মহেন্দ্রপাল বা মহেন্দ্রায়ুধ	৮৯০-৯০৭	তৃতীয় ইন্দ্র	৯১৩-৯১৭
রাজ্যপাল	৯৩০ বা ৯০০				
দ্বিতীয় গোপাল	...	দ্বিতীয় ভোজ	৯০৭-৯১৪		
দ্বিতীয় বিগ্রহপাল	৯৫০	মহীপাল	৯১৭		
প্রথম মহীপাল	৯৭০				

শ্রীবিমলাচরণ মৈত্রেয়।

---

* কলিকাতার চৈত্য লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত অনারেবল এফ্, ই, মোনাহানি মহোদয় প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

বঙ্গ-সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি।*

"সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি"র আলোচনার পূর্ব্বে উহার উৎপত্তির কাহিনী একটু স্মরণ করিতে হইবে। আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দিগের অনুসন্ধানের ফলে ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, খৃষ্টীয় অষ্টম কি নবম শতাব্দীতেও বাঙ্গালা ভাষার প্রচলন ছিল। সে বাঙ্গালা এখনকার বাঙ্গালা অপেক্ষা অবশ্য অনেক স্বতন্ত্র, সে বাঙ্গালা এখনকার বাঙ্গালী অতি কষ্টেই বুঝিতে পারে। "চসারে"র ইংরাজী হইতে এখনকার ইংরাজীর যতটা পার্থক্য, তৎসাময়িক কাহ্নুর গীত হইতে আমাদের ভক্তকবি রামপ্রসাদ বা নীলকণ্ঠের গীতে প্রায় ততটাই প্রভেদ। এই কাহ্নুর গীত এবং অপরাপর "সহজ-মতা"বলম্বী সাধকগণের সঙ্গীত বাস্তবিক আমাদের এই বাঙ্গলা ভাষার বেদীস্বরূপ। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যেরাও খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে অনেক দোঁহা গীতিকা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সিদ্ধাচার্য্যগণের সঙ্গীতসমূহ সে সময়ের লেখা ও সেকালের লোকের লিখিত টীকার সহিত পাওয়া গিয়াছে। কাজেই বলিতে হয় যে, সহস্র বৎসরের পূর্ব্বেকার প্রচলিত বঙ্গভাষার প্রকৃত নমুনা বা নিদর্শন আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। উহাতে পার্শী কথার লেশ নাই, বড় বড় সমাস-বহুল সংস্কৃত শব্দাদি একেবারেই নাই। হাজার বছর আগে আমরা ঘরে বাহিরে কোন্ ভাষা ব্যবহার করিতাম, তাহারই আভাস বা পরিচয় আমরা পাইয়াছি। ইহার পরে গোবিন্দচন্দ্রের গীত। সে গীতের প্রচুর পরিবর্ত্তন ঘটিলেও, উহা সেই মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বের লেখা। তখন লোকে কি ভাবে সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়া যাইত, তাহার একটা ছবি এই গোবিন্দচন্দ্রের গীতে লক্ষ্য করা যায়। অতঃপর মুসলমান-আক্রমণের সময়ে রামাই পণ্ডিতের "শূন্যপুরাণ" প্রণীত হয়। উহাতে "নিরঞ্জনের উষ্মা" নামে যে ছড়া আছে, তাহাতে মুসলমান-আক্রমণের বর্ণনা প্রস্ফুট হইয়া আছে। খৃষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দী হইতে এই মুসলমান-আক্রমণের সময়, অর্থাৎ বার শত শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার যতখানি পুষ্টি বা বিবৃতি ঘটিয়াছিল, তাহাতে আমার বোধ হয়, বৈদেশিক প্রভাব একেবারেই ছিল না; কিন্তু তাহার উপাদান-বিভাগে সহজ-ধর্ম্মমত, নাথপন্থীদিগের ধর্ম্মমত ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক মত বিশেষ-ভাবেই বিবৃত রহিয়াছে। এই সব দেখিলে ইহা একরূপ নিঃসন্দেহেই সিদ্ধান্ত

---

* পাবনাপুরের বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

বলা যায় যে, জনমণ্ডলীর মধ্যে ধর্ম্মমত প্রচার করিবার উদ্দেশ্যেই প্রথমতঃ বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি হয়। বৌদ্ধেরা—বিশেষতঃ "সহজিয়া" সম্প্রদায় দেশের আপামর সাধারণকে ধর্ম্মের কথা বা বৃত্তান্ত শুনাইবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছিলেন; সে ব্যস্ততা বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যগণের রচিত দোঁহা ও গীতিকায় এখনও স্পষ্ট বোধগম্য হয়। ধর্ম্মমত-প্রচারার্থই যখন আমাদের এ ভাষার উৎপত্তি, তখন বুঝিতে হইবে,—আমাদের বাঙ্গালা ভাষা মূলতঃ ও মুখ্যতঃ সম্যক্‌রূপেই Democratic বা লোকমতানুগামী! এই সময়ের বাঙ্গালাতে রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ নাই; পুরাণসমূহের উল্লেখ নাই; আছে কেবল বৌদ্ধ সন্ন্যাসের মত, নাথপন্থী যোগিগণের মত, এবং সহজ-ধর্ম্মমূলক সাধারণ নীতি কথার আবৃত্তি।

ইহার পর মুসলমান-বিপ্লব। পাঠানগণ এ দেশে আসিলে বাঙ্গালার বৌদ্ধ সমাজে যে কি ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা এখন আমরা কল্পনাতেও আনিতে পারি না। পাঠানগণ প্রথমেই বৌদ্ধ বিহার, মন্দির প্রভৃতি নষ্ট করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের ধরিয়া ঘোর নির্য্যাতন করিতে লাগিলেন। অনেকের অনুমান যে, বস্তুতঃ বাঙ্গালার বৌদ্ধগণই হিন্দুদিগের প্রতি বিদ্বিষ্ট হইয়া, বক্তিয়ার খিলিজি ও তাঁহার অনুচর পাঠানগণকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। রমাই পণ্ডিতের "শূন্যপুরাণ" পাঠ করিলে এ অনুমান যেন কতকটা দৃঢ়ই হয়। কিন্তু পাঠানদিগের আক্রমণের পর পরিণামে বাঙ্গালার হিন্দুগণই একটু আগিয়া উঠিলেন। আদিশূরের আমলের হইতে লক্ষ্মণসেনের সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় নবাগত কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারের জন্য তেমন বিশেষ কোনও চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা রাজার আশ্রয়ে থাকিতেন, অনবরত যাগ-যজ্ঞ করিতেন, এবং নিজ নিজ আভিজাত্য রক্ষার জন্য সততই সচেষ্ট ও সাবধান থাকিতেন। কিন্তু লক্ষ্মণ সেনের অধঃপতনান্তে ও পাঠানগণের অভ্যুদয়ের সময়ে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণগণ বুঝিলেন—আর পূর্ব্ববৎ উদাসীন থাকিলে চলিবে না; নিজেদের চিরাচরিত ধর্ম্ম ও কর্ম্মপদ্ধতির বহুল প্রচার লোক-সমাজে না করিলে নয়। পূর্ব্বগামী সিদ্ধাচার্য্যগণ, নাথ-পন্থের যোগিগণ, এবং 'সহজিয়া'রা যে পন্থা অবলম্বন করিয়া নিজেদের ধর্ম্মমত বাঙ্গালার লোক-সমাজে প্রচার করিতেন, বাঙ্গালার ব্রাহ্মণগণ তখন সেই পন্থা অবলম্বন করিলেন; এবং ফলে গড়িয়া উঠিল 'মনসার গান', 'চণ্ডীর গান', 'শিবায়ন' প্রভৃতি জাতীয়

সংস্কৃতের অনুগামী করিয়া লিখিতে হইতে লাগিল। সিদ্ধাচার্য্যেরা যে বাঙ্গালা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্র বা অলঙ্কারের কোনও প্রাধান্যই ছিল না। ব্রাহ্মণগণই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা ভাষায় রামায়ণ-মহাভারত লিখিবার সময়ে সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ মান্য করিয়া পুরাণাদির আক্ষরানুবাদেরই রচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তবু বাঙ্গালীর খাঁটী বাঙ্গালী-ভাব কৃত্তিবাসের রামায়ণে, কাশীদাসের মহাভারতে ও মুকুন্দরামের চণ্ডীতে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ করিল; সংস্কৃত ভাব, সংস্কৃত অলঙ্কার, সংস্কৃত সাহিত্যের বিশিষ্টতা বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রকট হইল। এই সময়ে হইতেই বঙ্গভাষা সংস্কৃত সাহিত্যের নিকট হইতে অজস্র ঋণ করিলেন।

অপর পক্ষে, মুসলমানগণ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের শাসন-পদ্ধতি এ দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, আরবী-পার্শীরও পঠন-পাঠন সুরু হইয়া গিয়াছিল। ফলে, এই ব্রাহ্মণপুষ্ট, নবোন্মেষিত অভিনব বঙ্গসাহিত্যে ফার্শী ও আরবী ভাষার দ্বিতীয় প্রাধান্যও প্রতিষ্ঠিত হইল। কেবল ইহাই নহে, যে সময়ে বঙ্গে বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টি ও উন্নতি হইতেছিল, সে সময় পঞ্জাবে ও যুক্তপ্রদেশ বা পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দী ও ব্রজভাষারও উন্মেষ ঘটিতেছিল। বৈজু বাওরা হইতে তুলসীদাস, শ্যামদাস, বিহারীদাস প্রভৃতি বড় বড় হিন্দী কবিরা মহাকাব্য-প্রণয়নে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা রামলীলা ও ব্রজলীলার বর্ণনা করিতেছিলেন, এবং সে সকলের মাধুরীচ্ছটায় ও সুধাধারে উত্তর-ভারত পরিপূর্ণ ও পরম প্রমত্ত হইয়া উঠিল। সে সাহিত্য-সম্পদের সমাদর মোগল-পাঠান বাদশাহগণ পর্য্যন্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন;—আলাউদ্দীন হইতে আকবর পর্য্যন্ত দিল্লীশ্বরগণ হিন্দী কবি ও কাব্যের যথেষ্ট আদর-মর্য্যাদা করিতেন; হিন্দী ভাষা তাই ভারতের সর্ব্বত্রই সম্মানিত ও সমাদৃত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই আদরের প্রবাহ-বেগ আসিয়া এ দেশেও আমাদের ভাষার অঙ্গে তরঙ্গ তুলিয়াছিল। তৎকালিক বাঙ্গালা ভাষাও তাই হিন্দীর কাছে অনেকটা ঋণী। শুধু ঋণীই নহে,—হিন্দীর অনেক গান বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত হইয়া নরোত্তম দাস ও গোবিন্দদাসের পদাবলী-রূপে আমাদের সাহিত্যের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। এইখানে বলিয়া রাখা ভাল,—এই হিন্দী ভাষাও বিশ্ব-সাহিত্যের আদিজননী সংস্কৃত ভাষারই লিখি-নিবেধ মানিয়া চলিত, এবং ক্রমশঃ সংস্কৃতশব্দ-বহুল হইয়া উঠিয়াছিল। কাজেই, তখনকার হিন্দীর সঙ্গে তখনকার বঙ্গভাষার বেশ একটু ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যের ভাব হইয়াছিল। ক্রিয়াপদের কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনেই হিন্দী দোঁহা

ও চৌপদী বা 'চৌপায়ী' বাঙ্গলায় পরিণত হইয়া যাইত। কৃত্তিবাসের রামায়ণে আমরা তুলসীদাসের অনেক পদ দেখিতে পাই; এবং ঘনরামের "ধর্ম্মমঙ্গলে"র বহু স্থল নরহর কবির যুদ্ধ-বর্ণনার আকারাম্বয়যাত্র।

ইহার পর, পতিতপাবন মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের যুগ। এই সময় বঙ্গভাষা ভাগীরথীর মত দুই কূল পরিপ্লাবিত করিয়া, তরঙ্গভঙ্গে হেলিয়া দুলিয়া, নাচিতে নাচিতে, অনন্তের অভিমুখে একাগ্রভাবে ছুটিয়া গিয়াছে। ভাষার সে শব্দ-সম্পৎ, সে ভাব-গাম্ভীর্য্য, সে বর্ণনা-বৈচিত্র্য, সে সুমধুর ও অনাবিল রস-বিলাস সত্যই যেন বর্ষার প্রবীণা নদীর ন্যায়। তাহাতে তরল সলিলের কল্লোল কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিতেছে; তাহার সেই তেজ, তেমন গৌরব, তদ্রূপ গরিমা ও মহিমা অন্যত্র আর কোনও কবিসম্প্রদায় ঘটাইতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন,—"কাব্য ও নাটকই চৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রাণ, অলঙ্কারের রস ও ভাবই তাহার দেবতা। নয় রস, বিয়াল্লিশ ভাব, ও আটটি সাত্ত্বিক ভাব লইয়াই বাঙ্গালী বৈষ্ণবদের কীর্ত্তন-পদকর্ত্তারা দেখিতেন—এই এই ভাবের গান আছে, এই এই ভাবের গান নাই; যাহা নাই, তাহা নূতন করিয়া রচিয়া তাঁহারা কীর্ত্তনে জুড়িয়া দিতেন। অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, এক গানে এক জন যে ভাব দিয়াছে, আর এক জন তাহাতে অন্য ভাব লাগাইল,—এইরূপে নানা ভাবে, নানা রসে সঙ্কীর্ত্তনের গান হইতে লাগিল; তাহার পর অনেক গান, অনেক পদ জমিয়া গেল; সেই পদ ও গান সংগ্রহ করিয়া 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হইল।" ইহা গেল শ্রীচৈতন্য-ধর্ম্মের একটি দিক। ইহার আরও একটি দিক আছে;—শাস্ত্রী মহাশয়, কেন জানি না, সে-দিকের কোনও সন্ধান বা পরিচয় দেন নাই; তাহা শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের পরিচয়ের দিক। জয়ানন্দের "চৈতন্যমঙ্গল", কৃষ্ণদাস কবিরাজের "চৈতন্য-চরিতামৃত" ও "চৈতন্য-ভাগবত" প্রভৃতি গ্রন্থনিচয় এই পরিচয়ের দিকটি পূর্ণ করিয়াছে। ইহার প্রত্যেকটি এক একখানি মহাকাব্য। ভাবে, রসে এবং সেই সময়ের তুলনায় এ সকলের ভাষায় এগুলি অপূর্ব্ব, অনুপম—অতুল। এই সকল পুস্তকের সাহায্যে দেশে সমাজে, চৈতন্য-ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছিল; এবং এতদ্দ্বারা, "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" এই বিশ্ব-জগতেই দিব্য চৈতন্য সঞ্চারিত হইয়াছে। বাঙ্গালায় এই সব গ্রন্থের প্রভাবে তৎকালে বিধর্ম্ম বা অধর্ম্মের ধ্বংস বা সংঘাত ঘটিয়াছিল;

ধর্ম্ম-প্রচারের গ্রন্থ বলিয়াই এই সকল গ্রন্থের প্রায় সকলগুলিরই ভাষা সরল, সতেজ, এবং অত্যন্ত প্রসাদ-গুণ-বিশিষ্ট। বৈষ্ণব ধর্ম্ম বাঙ্গালা ভাষাকে সত্য সত্যই এইরূপে এক প্রাণশক্তি-প্রভাবে উদ্বুদ্ধ ও সঞ্জীবিত করিয়া তুলিল। সে ভাষার তড়িৎ-স্পন্দনে বাঙ্গলার আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সকলেই নব ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছে। এই অবসরেই বাঙ্গালা ভাষা একটা অপরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল, শৌর্য্যে ও মাধুর্য্যে তাহা একটা নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতি প্রাপ্ত হইল।

এইখানে প্রসঙ্গতঃ বৈষ্ণব সাহিত্যেরই একাংশ—যাহা পদাবলী সাহিত্য নামে পরিচিত, তৎসম্পর্কে আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অতি সামান্যভাবেই যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখমাত্র করিয়া যাইব। মহাকবি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ব্যতীত অপরাপর যাবতীয় পদকর্ত্তাই শ্রীচৈতন্য প্রভুর সমসাময়িক বা তৎপরবর্ত্তী। উৎকল কবি সদানন্দ মহাপ্রভুকে "হরিনাম মূর্ত্তি" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন;—বস্তুতঃ, এমন ভাবে এক কথায় প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের যথার্থ ও যোগ্য পরিচয় আর কেহই প্রদান করিতে পারেন নাই। যে ভাব অম্লান দিব্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া গৌরাঙ্গ-রূপে এ ধরণী ধন্য করিবার জন্যই আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই ভাব চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির অপরূপ পদাবলীতে সর্ব্বপ্রথমে স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া, পরে শ্রীচৈতন্যের চরণস্পর্শে প্রমত্তবেগে, উদ্দাম তরঙ্গ-ভঙ্গ বিস্তার-পূর্ব্বক সেই অনন্ত, অপার সহাপারাবারের ক্রোড়ে গিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। বৈষ্ণব পদাবলী এ বিশ্ব-সংসারে প্রকৃত কবিত্ব-ভাণ্ডারের এক অবিনশ্বর ও চিরন্তন অমূল্য সম্পৎ। বঙ্গভাষা অন্যবিধ সাহিত্য-ঐশ্বর্য্যে বিশ্বের অপরাপর সাহিত্যের নিকটে নানা ভাবেই নতি স্বীকার করিতে প্রস্তুত বটে; কিন্তু, প্রকৃত কবিত্ব-বৈভবে অর্থাৎ—ঐশ্বরিক প্রেমের তন্ময় বর্ণন-নৈপুণ্যে ও অনাবিল ও বিচিত্র রস-বিন্যাসে এ সাহিত্য অখিল সংসারের অনুপম মুকুটমণিরূপে বিরাজিত হইবার যোগ্য।

অতঃপর, বঙ্গভাষার সৌষ্ঠব যুগ আসিল। রাজ-সভায় ইহার আদর হইল। পার্শীনবীশ ও সংস্কৃতজ্ঞ সুধী ব্রাহ্মণগণ এই ভাষাকে সংস্কৃত ও সমার্জ্জিত করিতে উদ্যত হইলেন; ভাষাসুন্দরীও যেন কতকটা বিলাসিনীর বেশ ধারণ করিল। এই সৌষ্ঠব সাহিত্যের যুগে ভারতচন্দ্রই মহাকবি। ইনিই বাঙ্গালাভাষাকে প্রথম চাঁচিয়া ছুলিয়া, মাজিয়া ঘষিয়া, অপূর্ব্ব মাধুরীতে পরিণত করিলেন। শীলতার অভাব সত্ত্বেও, বিশেষ ভাবে

ভাষার হিসাবে, ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" ও "বিদ্যাসুন্দর" এই দুইখানি গ্রন্থই সাহিত্য-শ্রীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ভারতচন্দ্র কবিতা লিখিতে যাইয়া, ভাষাকে উপরে যে কারিগরি ফলাইয়াছেন,—যে অপূর্ব্ব ভাবভঙ্গির, কলা-কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন, সত্য সত্যই তাহা বিচিত্র, বিস্ময়াবহ ও অনুপম। ভারতের সেই 'গাঙ্গা-ঘষা' ভাষাই আজিও আমাদের আদর্শ,—এখনও কবিকুলে কিংবা সাহিত্যিক-সমাজে তাহাই সুপ্রচলিত। কিন্তু এ সময়ে আরও একটি ব্যাপার ঘটিল। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ বৌদ্ধসিদ্ধাচার্য্যদের মত সরল, সোজা ভাষায় সঙ্গীত রচনা করিয়া, ভাষাকে আর একটা বিরাট বৈভব দিয়া গেলেন। প্রায় শত বৎসর পরেও, রামপ্রসাদের গান এখনও বাঙ্গালীর নিকটে পুরাতন হয় নাই। এখনও সে ভাষা বাঙ্গালীর অব্যবহার্য্য নহে। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ বাঙ্গলাভাষাকে রাজপ্রাসাদ হইতে দরিদ্রের পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত সুলভ মুক্তাফলের মত, নির্ব্বিচারে ছড়াইয়া দিলেন। উহাদের প্রভাবে ক্রমান্বয়ে পাঁচালীওয়ালা, কবিওয়ালা, নিধুবাবু ও রাজরায়, হরঠাকুর ও মধু কান বাঙ্গালাভাষাকে লইয়া যথার্থই যেন "হরির লুট" খেলিয়া গেলেন। ভাষার এতটা প্রচার, এতটা বিস্তৃতি, এতটা গৌরব, এতটা সমাদর বাঙ্গালার আর কখনও হইয়াছিল কি না, সন্দেহ। খ্রীষ্টান্দ হইতে আরম্ভ পর্য্যন্ত রামপ্রসাদের মালসী গীতের স্রোত বহিয়া চলিল। হরঠাকুরের কবিগান সকলেই উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। বলিয়া রাখা উচিত যে গোড়াতেও যাহা ছিল, গত উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা-সময়েও তখনকার সেই ভঙ্গী অব্যাহত রহিল। গোড়ার ধর্ম্ম-প্রচার উপলক্ষে সংযম-সাধন শিখাইবার জন্য বাঙ্গালাভাষার বিকাশ,—শেষে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের সময়ে, হরুঠাকুর ও দাশুরায়ের যুগেও বাঙ্গালা ভাষা ধর্ম্মপ্রচারার্থ, যোক্ষ-শিক্ষার্থেই নিয়োজিত হইয়াছিল। ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" শক্তি-সাধনা-প্রচারের পুস্তকমাত্র; উহা কাব্যও বটে, পুরাণও বটে। রামপ্রসাদের গান নিছক তার্থাদেরই নদীভেদের মত; কেবল সংযম-সন্ন্যাস, সাধনা ও যোগ ও ভক্তি শিখাইবার উদ্দেশেই, কবির স্বাভাবিক স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগে বিরচিত।

অষ্টম শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত—এই এক হাজার বৎসরে বাঙ্গালা ভাষার মূল প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটে নাই; এই হাজার বৎসর ব্যাপিয়া বাঙ্গালার ভাষার পুষ্টি ও বিস্তৃতি বঙ্গ-সাহিত্যের অভ্যুদয় ও প্রচার, লোকশিক্ষার জন্যই হইয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে তখনও যা কৌল ধর্ম্ম

দাঁড়াইয়াছে। ইহা এক হিসাবে এখন সম্পূর্ণ সখের সামগ্রী। কাজেই এখন ইহার লক্ষ্য কেবল আত্ম-তৃপ্তি, বা চিত্ত-বিনোদন। ইহা এখন বিচিত্র কলা-কৌশলে পর্য্যবসিত হইয়াছে, সত্য; কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর ইহার কোনও স্থির উদ্দেশ্য বা বাঁধা-ধরা লক্ষ্য নাই। যে প্রণালীর মধ্য দিয়া রামায়ণ মহাভারত ফুটিয়া উঠিয়াছে, যে প্রণালীর মধ্য দিয়া "অন্নদামঙ্গল" প্রভৃতি রচিত হইয়াছে, বাঙ্গালা সাহিত্যের সে পুরাতন প্রণালী এখন আর নাই। তাই বাঙ্গালা সাহিত্য এখন কেবল আত্ম-তৃপ্তি বা মনস্তুষ্টির একটা উপায়-বিশেষ হইয়া পড়িয়াছে। এখন ইহা বিশেষ প্রতিভাষিত কবি বা লেখক ব্যতীত সাধারণ সাহিত্যিকের পক্ষে সাধারণতঃ য়ুরোপীয় ভাব ও সিদ্ধান্তসমূহ আমদানী করিবার অন্যতম পন্থা মাত্র। এই কারণেই, বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য এখন অনেকাংশে বিশেষত্ববর্জ্জিত। এ ভাষায় যাহার যেমন ইচ্ছা, আজ যে তেমনই লিখিয়া যাইতেছে। ইহা যেন এখন অনেকটা না-ওয়ারিস নাবালকদের মত একান্তই উচ্ছৃঙ্খল ও যথেচ্ছাচারী।

কিন্তু তা' বলিয়া ইহা যে অবিমিশ্র দুর্লক্ষণ বা সাহিত্যের পক্ষে অত্যন্ত আনিষ্টকর, তাহা অনেকে স্বীকার নাও করিতে পারেন। ভাষার পুষ্টি আজ যতই কেন বিচিত্র বা অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল হউক না, এক হিসাবে তাহার শত দোষ থাকিলেও, প্রকৃতপক্ষে ইহাই যে ভাষার অদম্য প্রাণ-শক্তির পরিচায়ক, এবং ইহাতে যে উদ্দাম ও অনিবার্য্য যৌবনোচ্ছ্বাসেরই প্রমাণ প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে, এ সম্বন্ধে সকলকেই আজ একমত হইতে হইবে। সাহিত্যের এই বর্ত্তমান অবস্থা ভাল না মন্দ, বিবেচক যোগ্য জন তাহার বিচার করুন। আমি আজ এ ক্ষেত্রে শুধু বর্ত্তমান সাহিত্যের প্রকৃত প্রকৃতিটির নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হইব।

ইংরাজের রাজ্যে আমাদের দেশে প্রথমতঃ মুদ্রা-যন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়; সঙ্গে সঙ্গে অতি সস্তায় কাগজও বিকাইতে আরম্ভ করে। এই দুইটার প্রভাবে বাঙ্গালায় আজ অজস্র পুস্তক প্রণীত হইতেছে। কিন্তু পূর্ব্বে যখন মুদ্রা-যন্ত্র ছিল না, এত কাগজের প্রচলন ছিল না; যখন বাঙ্গালার সাহিত্য একপ্রধান

ছিল, কীর্ত্তন ও পাঁচালী উহার প্রধান অঙ্গ ছিল, তখন বাঙ্গালীর ব্যাপ্তি বা প্রসার যেন এখন অপেক্ষা এক হিসাবে একটু অধিকই ছিল। ভাল গায়কে এক একটা মজলিসে দশ হাজার শ্রোতার সম্মুখে এক একটা পালা গান করিত; গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, পর্ব্বাহে উৎসবে কীর্ত্তন ও পাঁচালী গীত হইত, এই গানের সাহায্যে তখন বাঙ্গালার জনসাধারণ নূতন নূতন কাব্যের, নূতন নূতন পালার, নূতন নূতন কীর্ত্তনের ও পদের সন্ধানই পাইত। ভাল গান, ভাল পদ, ভাল পালা, তখন বাঙ্গালার বহু নরনারীর কণ্ঠস্থ ছিল। সে হিসাবে, এ দেশে "মেঘনাদবধ", "ব্রজাঙ্গনা", "কুরুক্ষেত্র", "রুদ্রসংহার" কিংবা বিশ্ব-বিখ্যাত "গীতাঞ্জলি"রও তাদৃশ সম্প্রসার বা সার্ব্বজনীন প্রতিষ্ঠা অদ্যাপি হয় নাই। এখন পুস্তকের বাহুল্য সত্ত্বেও বাঙ্গালার জনসাধারণ আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের তেমন ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় পাইতেছে না। এই পরিচয়ের অভাবে বঙ্গীয় সমাজে আধুনিক সাহিত্যের তেমন প্রভাব নাই। একে ত এ সাহিত্য ইংরাজির অনুকরণে গঠিত হইতেছে বলিয়া, বাঙ্গালী জাতির স্বভাবের অনুকূল নহে; তাহার উপর অপরিচয় হেতু জনসাধারণ ইহাকে এখনও নিজের বলিয়া গ্রহণ করে নাই। রামপ্রসাদের গান, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও বলরাম দাসের পদ, কৃত্তিবাসের রামায়ণ প্রভৃতি যেরূপ অনায়াসে ও যে ভাবে বাঙ্গালীর মর্ম্মে যাইয়া মিলিয়া যায়, বা আপনার করে, সে ভাবে "মেঘনাদবধ" ও "ব্রজাঙ্গনা"র পদ, কিংবা জগন্নাথ কৃত রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান বাঙ্গালীর প্রাণকে স্পর্শ অথবা আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। কারণ, এ সব আধুনিক-সাহিত্য-উপভোগের প্রধান ও প্রথম অবলম্বনই হইল—ঐ ইংরাজী-শিক্ষা। যাহারা ইংরাজী জানে না, ইংরাজি সাহিত্যের পরিচয় রাখে না, তাহারা এ সাহিত্যের মহিমা ও তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। ইহার উপর, কোনও কোনও শিক্ষাভিমানী আধুনিক বাঙ্গালী সম্পাদকের আসনে সমাসীন হইয়া, বাঙ্গালা ভাষাটাকে এমন ভাবে পড়িয়া তুলিতেছেন, ইংরাজি Idium বা Epigram গুলি এমন "লিটরেল" সাহেবী "চঙে" ভাষায় আমদানী করিতেছেন যে, এখনকার সেরূপ বাঙ্গালা পড়া বুঝিতে হইলে, আগে তাহাকে ইংরাজিতে তর্জ্জমা করিয়া, তবে তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হয়। এ অধিকার, এ ক্ষমতা, বা এরূপ বৈধ্য ও প্রবৃত্তি বাঙ্গালায় শতকরা বোধ হয় পঞ্চম জনেরই নাই। সুতরাং, এ সাহিত্যের যথার্থ আস্বাদনে বাঙ্গালার প্রায় চৌদ্দ আনা নর-নারীই বঞ্চিত। কি দুর্ভাগ্য!

সুরসিক ইন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন যে, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের কণ্ঠ রাশি,—একেবারেই শূন্য-গর্ভ, এবং রমণীর কক্ষেই শোভা পায়! কথাটার মধ্যে ব্যঙ্গ বা অত্যুক্তি আছে বটে, কিন্তু ইহা সত্য, তাহা বোধ করি অনেকেই অস্বীকার করিবেন না।

ঘরের আলমারীতে সুন্দর সুন্দর "মোরাক্কো" বা সিল্কে বাঁধা বইগুলি তাকে তাকে সাজানো আছে; তাহা দেখিতে ভাল, দেখাইতেও ভাল। কিন্তু তাহা দ্বারা নরনারীর অন্তর্ভাবের, রুচির, অথবা স্বভাবের কোনও কল্যাণই সাধিত হয় না, বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবনের প্রবাহ-ভঙ্গীরও কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। পূর্ব্বে বলিয়াছি—আমাদের এই বর্ত্তমান বাঙ্গালা গদ্যের স্রষ্টা হয় রামমোহন, নয় বিদ্যাসাগর; এবং ইহার পোষ্টা, বা সংস্কারক, পরিচালক বা সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু ইঁহারা যে ভাষা চালাইয়াছেন, আজও তাহা বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনের ভাষা হয় নাই। রাস্তায়, বিচারালয়ে যে বাঙ্গালার প্রচলন আছে, তাহা বঙ্কিমের বাঙ্গালা নহে; রেলেঘাটা, হাটখোলা, বা ব্যবসায়-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে যে ভাষা চলিতেছে, তাহাও বঙ্কিমী—বিদ্যাসাগরী বাঙ্গালা নহে; আমরা ঘরে পুত্র-পরিবারের সঙ্গে যে বাঙ্গলায় কথা কহি, সভায় বৈঠকখানায় বা বন্ধু-বান্ধবের সহিত যে বাঙ্গালায় আলাপ করি, সে বাঙ্গালাও বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিমের নহে। কাজেই, বলিতে হয়—এখনও আমাদের এ বাঙ্গালা গদ্য বা পদ্য-সাহিত্য আমাদের প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রায় তেমন কোনও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে নাই। কখনও তাহা পারিবে কি না, অথবা আদৌ তাহা সর্ব্বাংশে বাঞ্ছনীয় বা আবশ্যক কি না, তদ্বিষয়েও সাহিত্যিক-সম্প্রদায়ের মধ্যেই ঘোরতর মতদ্বৈধ আছে। এ সম্পর্কে আমার স্বীয় সিদ্ধান্ত বা বিশ্বাস এই প্রবন্ধেই যথাস্থানে যথাকালে বিবৃত্ত করিব।

কিন্তু পূর্ব্বে যে সাহিত্য প্রচলিত ছিল, অর্থাৎ সেই পুরাতন বাঙ্গালা ভাষা—সর্ব্বথাই ধর্ম্মপ্রাণ ছিল। সে সাহিত্যের দ্বারা এ জাতির চরিত্র গঠিত হইয়াছে; তদ্দ্বারা এ জাতির মানসিক গতিটাই স্বধর্ম্মের একটা স্বতন্ত্র প্রণালীতে চালিত ও প্রবাহিত হইয়াছে। বলিতে কি, আজিও সেই সাহিত্যেরই প্রভাব আমাদের জাতীয় চরিত্রে প্রবল ভাবে ক্রিয়া করিতেছে।

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু, তবু হিয়া জুড়ন না গেল।"

—এই পদটি শুনিবামাত্রই এখনও বাঙ্গালী তেমনই করিয়া শিহরিয়া, চমকিয়া

উঠে। তাই, এখনও রামায়ণ-গান শুনিতে গিয়া বাঙ্গালীর অশ্রু ঝরে, এবং আজিও কীর্ত্তনের কালে, মৃদঙ্গের গ্রামন্ত তালে বাঙ্গালীর চিত্ত আত্মহারা হইয়া নৃত্য করিতে থাকে। এই ধর্ম্মের বেদী হইতে নামিয়া আসিয়া, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য ও বাঙ্গালী কবি ভাল কাজ করিয়াছেন, না মন্দ কাজ করিয়াছেন, তাহার বিচার করিবার এখনও সময় হয় নাই। তবে সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন যে, ঐ আদর্শ বা ঐ পদবী পরিহার করিবার ফলে আজ বাঙ্গালা সাহিত্য অনেকপরিমাণে স্ব-ধর্ম্মভ্রষ্ট, অসামাজিক, এবং শুধু ইংরাজি-শিক্ষিতগণেরই সাম্প্রদায়িক সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বস্তুতঃ, সাহিত্যের স্থায়িত্ব, তাহার ব্যাপ্তি ও প্রভাবের উপরেই নির্ভর করে। যে ভাষা ও সাহিত্য যত অধিক ব্যাপ্ত, সে ভাষা ও সাহিত্য তত্ই দীর্ঘকালস্থায়ী হয়, এবং তাহার প্রভাবও সেই অনুপাতে প্রগাঢ় হইয়া থাকে। আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকগণের আবিষ্কার হইতে জানা গিয়াছে যে, আপান হইতে ভূদূর মিশর পর্য্যন্ত, মাদাগাস্কার হইতে অষ্ট্রেলিয়ার কোণ পর্য্যন্ত, কোনও এক বিস্তৃত অতীত যুগে মাতামহী সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বিশেষভাবে বিস্তীর্ণ ছিল। মঙ্গোলিয়ার উর্গা নগরে গোবি-মরুভূমির ভূগর্ভমধ্য হইতে বিস্তৃত লোকালয়ের ভগ্নাবশেষের স্তর-বিন্যাসে আজ সংস্কৃত পুঁথি-পত্রের অসংখ্য নিদর্শন—বহুবিধ চিত্ররাশি আবিষ্কৃত হইতেছে। বালি, জবক, সুমাত্রা, জাবা প্রভৃতি স্থানসমূহে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের এই অতি-প্রসার হেতু, উহার সহিত ধর্ম্মের ও ধর্ম্মভাবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জন্য এখনও উহা ভারতবর্ষে এতটা সজীব ও সমাদৃত রহিয়াছে। য়ুরোপীয় উপস্থিত এই মহাসমরের গতি দেখিয়া ফরাসী লেখক জীন মেসোমিন বলিয়াছেন যে, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আধুনিক য়ুরোপের প্রায় সর্ব্বত্রই যে সব সখের সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা আর কোনও মতেই স্থায়ী হইতে পারিবে না। কারণ, সে সাহিত্য সমাজের প্রাণের কথা, মর্ম্মের নিগূঢ় ব্যথা অকপটে প্রকাশ করে নাই। সে সাহিত্য সম্যক্‌রূপেই সখ—সৌভাগের পোষাকী সাহিত্য। সখ-সৌভাগ যতদিন থাকে, ততদিন ও সখের সাহিত্যও টিকে; কিন্তু সুখ-সম্ভোগ-স্বস্তি, এই সব ক্ষণভঙ্গুর সখ-সৌভাগের সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হইয়া যায়;—সমাজে একটা বিপ্লব বা ওলট্-পালট্ ঘটিলেই, সে সাহিত্য মিলাইয়া বা তলাইয়া যাইবেই। শুনিতেছি, আজকাল য়ুরোপের বহু প্রাজ্ঞ ও মনীষী নাকি এ কথাটার সত্যতা নূতনভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন;

দেখা যাক্, এ যুদ্ধের অবসানে, য়ুরোপের খৃষ্টান সমাজ নূতন ভাবে সংগঠিত হইলে উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য সে সমাজের উপরে কতখানি আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে। বাঙ্গালার ইংরাজি-যুগের এই আধুনিক সাহিত্য ইংলণ্ডের উনবিংশ শতাব্দীর Secular Literature—' (ব্যবসাদারী সাহিত্যের) উপর প্রতিষ্ঠিত;—Shelley, Byron, Keats, Browning, Wosdsworth ও Tennyson,—ইহাঁদের ভাব ও ভাষা সংস্কৃত আবরণে ঢাকিয়া বহুলপরিমাণে বাঙ্গালায় আমদানী করা হইয়াছে। যদি মূল না টিঁকে, তবে যাহা নকল, তাহা হাজার মনোমোহন হইলেও টিঁকিবে কি? বিবেচ্য বিষয় বলিয়াই প্রসঙ্গতঃ এ কথাটার এতটা আলোচনা করিতে আমি বাধ্য হইলাম।

ক্রমশঃ।

শ্রীদেবেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী।

বাঙ্গালা সাহিত্য।

২

'লীলাবতী' অপেক্ষাকৃত উচ্চরসঃকামী গ্রন্থ। ইহার আখ্যানবস্তু বাস্তবাতিগ, জটিল, এবং উহার সংগঠনে চিত্তবিভ্রমকারিণী কল্পনার আতিশয্য লক্ষিত হয়। এই গ্রন্থখানি সবিস্তারে সমালোচনা করিবার আমাদের স্থান নাই। আমরা কেবল এইটুকু অভিমত প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম যে, যেমন 'নবীনতপস্বিনী'তে দীনবন্ধুবাবু সর্ব্বোৎকৃষ্ট হাস্যরসিক বলিয়া আপনাকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, সেইরূপ 'লীলাবতী'তে বাঙ্গালা লেখকগণের মধ্যে তিনি যে রসিকতায় অদ্বিতীয়, তাহা প্রতীয়মান হয়। এ বিষয়ে টেকচাঁদ বা হুতোম তাঁহার নিকটবর্ত্তীও হইতে পারেন নাই। 'নীলদর্পণ' এক্ষণে তাহার পূর্ব্বাধিকৃত উচ্চাসন হইতে বিচ্যুত হওয়ায়, 'লীলাবতী'ই পাঠক-সমাজে গ্রন্থকারের সকল পুস্তক অপেক্ষা অধিকতর প্রচার লাভ করিয়াছে,—কিন্তু আমাদের বিবেচনায়, গ্রন্থকার এই গম্ভীর রসের নাটক অপেক্ষা হাস্যরসপ্রধান নাটক ও প্রহসনাদিতেই অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

দীনবন্ধুবাবুর দুইখানি প্রহসনের সমালোচনাই এক্ষণে অবশিষ্ট আছে। 'বিয়ে-পাগ্‌লা বুড়ো' নামক প্রহসনে একটি সচরাচর দৃষ্ট বাতিকের সুনিপুণ ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। রাজীব-মুখুয্যে নামক এক বৃদ্ধ বিবাহের জন্য

অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে। 'পেঁচোর মা' নামক এক কদাকারা কুৎসিতা জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করিবার পরামর্শ দিয়া লোকে তাহাকে ক্ষেপায়। কয়েক জন স্কুলের ছাত্র বৃদ্ধকে প্রবঞ্চনা করিবার সঙ্কল্প করিল। এক জন কৃত্রিম ঘটক বৃদ্ধের নিকট প্রেরিত হইল। বিবাহের সমস্ত আয়োজন হইয়া গেল; বিবাহ হইবে, স্থির হইল। বালকগণের মধ্যে এক জন সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্ট বালককে কন্যার বেশভূষায় সজ্জিত করা হইল, এবং কতিপয় প্রতিবাসী কন্যার পুরুষ ও স্ত্রী বন্ধুরূপে সজ্জিত হইল। কৃত্রিম বিবাহ হইয়া গেল, এবং রাজীব বালকগণের সহিত আমোদ আহ্লাদ করিয়া রজনী যাপন করিল। পরদিন প্রাতে যখন দেখিল, পার্শ্বস্থ কন্যা 'পেঁচোর মা' ভিন্ন আর কেহই নহে, এবং সে একটি শূকর-সন্তানকে গোষাপুত্র বলিয়া বৃদ্ধের কোলে দিতে চাহিল, তখন বৃদ্ধের মনের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

অপর প্রহসন—'সধবার একাদশী' নিপুণতরভাবে লিখিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উহা এরূপ অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট যে, আমরা উহার কোনও অংশও উদ্ধৃত করিতে, বা উহার সম্যক্ বিশ্লেষণপূর্ব্বক বিস্তৃত সমালোচনা করিতে অক্ষম। বিশেষতঃ, গ্রন্থকারের রসিকতাতেই তাঁহার রচনার মনোহারিত্ব প্রধানতঃ নিহিত থাকায়, তাহা ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া দেখান একবারে অসম্ভব। কারণ, যে সকল বাঙ্গালা শব্দ ও ভাবের সাদৃশ্যের উপর উক্ত রসিকতার ভিত্তি স্থাপিত, তাহা বিদেশীয়গণের বোধগম্য নহে।

৬

অন্যান্য কতিপয় লেখকের বিষয় এখনও বলা হয় নাই, কিন্তু স্থানাভাববশতঃ আমাদিগকে এ প্রস্তাব সংক্ষেপে সমাপ্ত করিতে হইতেছে। রঙ্গলাল বাবু স্বীয় কবিতা দ্বারা স্বদেশীয়গণের নিকট উচ্চ যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু আমরা বলিতে বাধ্য যে, তিনি এরূপ যশোলাভের উপযুক্ত কার্য্য অতি অল্পই করিয়াছেন। তাঁহার 'পদ্মিনী', 'কর্ম্মদেবী' এবং 'সুরসুন্দরী' নামক তিনটি কবিতা টডের 'রাজস্থান' হইতে সংগৃহীত তিনটি রাজপুত-রমণীর গল্প মাত্রাকারে লিখিত। 'পদ্মিনী'খানিই বোধ হয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই লেখক ভারতচন্দ্রের পথাবলম্বনকারিগণের শ্রেণীভুক্ত, যদিও ভারতচন্দ্রের মত তাঁহার রচনায় অশ্লীলতা দৃষ্ট হয় না। বাস্তবিক, তাঁহার লেখায় যাহা কিছু ভাল, তাহা প্রধানতঃ কতকগুলি দোষের অভাবমাত্র।

বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যদিও তাদৃশ যশস্বী হইতে পারেন নাই, তথাপি

সকলের অপেক্ষা অনেক উচ্চদরের কবি। তাঁহার 'ইন্দ্রের সুধাপান' ড্রাইডেনের Alexander's Feastএর একটি সজীব অনুকরণ।

উপন্যাসলেখকগণের মধ্যে 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়ে'র লেখক বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষের বিষয় এই পত্রে ইতঃপূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর লেখকগণের মধ্যে এক জন মাত্র লেখকের কথা এ স্থলে বলা প্রয়োজন বোধ হয়। তিনি বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইঁহার 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপাল-কুণ্ডলা' এবং 'মৃণালিনী' সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমাদৃত বাঙ্গালা গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে। বোধ হয়, অন্যরূপ সমালোচনা অপেক্ষা উক্ত তিনখানি উপন্যাসের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম ও অনায়াসে বর্ণনীয় 'কপাল-কুণ্ডলা'র উপাখ্যানভাগ সংক্ষেপে বিবৃত করিলেই ভাল হইবে।

নবকুমার নামক এক ব্রাহ্মণযুবক গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে হিজলীর নিকটস্থ বিজন সাগরতীরে নদিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন। ঐ স্থানের একমাত্র অধিবাসী এক জন 'কাপালিক'। কাপালিকগণ এক অদ্ভুত সম্প্রদায়। তাহারা প্রচণ্ড ও ভীষণ তান্ত্রিক প্রণালীতে পূজা করে। শ্মশানঘাট তাহাদের মন্দির, এবং তাহাদের অনুষ্ঠানগুলি অতি বীভৎস ও পৈশাচিক। কাপালিকের নিকট নবকুমার আহার ও আশ্রয় পাইলেন। তাঁহার প্রয়োজনাদির ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার বিকটদর্শন আশ্রয়দাতা প্রত্যাগমনের আশ্বাস দিয়া নবকুমারের পান-পাত্র লইয়া অন্যত্র যাত্রা করিলেন। দিনের পর দিন গত হইল, কিন্তু কাপালিক ফিরিলেন না। অবশেষে নবকুমার বসিয়া বসিয়া বিরক্ত হইয়া যে পথহীন অরণ্যে কাপালিকের গুহা অবস্থিত, তাহার মধ্য দিয়া নিজেই নির্গমনের পথ আবিষ্কার করিয়া কোনও লোকালয়ে গমন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল। তিনি একবারে পথহারা হইলেন, এবং তাহার পর যে ঘটনা ঘটিল, তাহা পুস্তকখানি হইতেই নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; কারণ, উহার বর্ণনা দেশীয় পাঠকগণের নিকট বিশেষ আদর লাভ করিয়াছে।

"কিছু দূর আসিয়া আশ্রম কোন্ পথে রাখিয়া আসিয়াছেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। গম্ভীর জলকল্লোল তাঁহার কর্ণপথে প্রবেশ করিল; তিনি বুঝিলেন যে এ সাগরগর্জ্জন। ক্ষণকাল পরে অকস্মাৎ বনমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন যে সম্মুখেই সমুদ্র। অনন্তবিস্তার নীলাম্বুমণ্ডল সম্মুখে দেখিয়া উৎকটানন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হইল। সিকতাময় তটে গিয়া উপবেশন করিলেন। কেনিল, নীল, অনন্ত সমুদ্র। উভয় পার্শ্বে যতদূর চক্ষু যায় ততদূর

পর্য্যন্ত তরঙ্গভঙ্গ-প্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখা; স্তূপীকৃত বিমল কুসুমদামমণ্ডিত মালার ন্যায় সে ধবল ফেনরেখা হেমকান্ত সৈকতে ন্যস্ত হইয়াছে; কাননকুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলঙ্কারভরণ—নীলজলমণ্ডলমধ্যে সহস্র স্থানে সফেন তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল। যদি কখনও এমত প্রচণ্ড বায়ুবহন সম্ভব হয় যে, তাহার বেগে নক্ষত্রমালা সহস্রে সহস্রে স্থানচ্যুত হইয়া নীলাম্বরে আন্দোলিত হইতে থাকে, তবেই সে সাগরতরঙ্গক্ষেপের স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে। এ সময়ে অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণে নীলজলের একাংশ দ্রবীভূত স্বর্ণের ন্যায় অলিতেছে। অতি দূরে কোন ইউরোপীয় বণিক্‌জাতির সমুদ্রপোত শ্বেতপক্ষ-বিস্তার করিয়া বৃহৎ পক্ষীর ন্যায় জলধিহৃদয়ে উড়িতেছিল।

"কতক্ষণ যে নবকুমার তীরে বসিয়া অনন্যমনে জলধিশোভা দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তদ্বিষয়ে তৎকালে তিনি পরিমাণবোধ-রহিত। পরে একেবারে প্রদোষতিমির আসিয়া কাল জলের উপর বসিল। তখন নবকুমারের চেতনা হইল যে আশ্রম-সন্ধান করিয়া লইতে হইবে। * * গাত্রোত্থান করিয়া সমুদ্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিলেন। ফিরিবামাত্র দেখিলেন, অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! সেই গম্ভীরনাদিবারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি! কেশভার,—অবেণীসংবদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্ফলম্বিত কেশভার। * * অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না—তথাপি মেঘবিচ্ছেদনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল লোচনে কটাক্ষ, অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর, অথচ জ্যোতির্ম্ময়; সে কটাক্ষ, এই সাগরহৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণলেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল।"

যে যুবতীর এইরূপ অনতিস্পষ্ট অথচ গম্ভীর বর্ণনা করা হইয়াছে—তিনি কপালকুণ্ডলা। সেকালে যে সকল পোর্ত্তুগীজ জলদস্যুপোত দাসসংগ্রহের জন্য বাঙ্গালাদেশের সাগরতীরস্থ গ্রামসমূহ লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইত, তাহারই মধ্যে ঝটিকাতে ভগ্ন একখানি পোত হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করা হয়। কাপালিক কি অভিপ্রায়ে তাঁহাকে নিজ আশ্রমে রাখিয়া লালনপালন করিয়াছিলেন, তাহা কপালকুণ্ডলা জানিতেন না। কাপালিকের নিকট তিনি কালী দেবীকে ভক্তি করিতে শিখিয়াছিলেন, কিন্তু কাপালিক সুযোগ পাইলেই কালীর নিকট যে সকল নরবলি দিতেন, তাহা দেখিয়া কপালকুণ্ডলার অন্তরাত্মা ভয় ও ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইত। দুই জনে কাপালিকের গুহায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এবং

ইহা বুঝা গেল যে, নবকুমারকে বলি দেওয়া হইবে। অঘোরঘণ্টের কাপালিক তাঁহাকে দারুস্তম্ভে বন্ধন করিয়া তদণ্ডেই বলি দিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, কিন্তু কপালকুণ্ডলা বলিদানের খড়্গ লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। কাপালিক খড়্গান্বেষণে গমন করিলে তদবসরে কপালকুণ্ডলা নবকুমারের বন্ধন ছেদন করিয়া তাঁহার সহিত পলায়ন করিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহারা এক দেবমন্দিরে উপস্থিত হন। নবকুমার কপালকুণ্ডলার প্রতি গভীর প্রেমাসক্ত হন, এবং কপালকুণ্ডলা বিবাহ কি বস্তু তাহা অবগত না থাকায়, নবকুমারকে বিবাহ করিতে কোনও আপত্তি করিলেন না। মন্দিরের পূজারী তাঁহাদের অনুরোধে উভয়ের বিবাহক্রিয়া সম্পাদিত করেন। পূজারী তাঁহাদিগকে মেদিনীপুরে যাইবার পথও দেখাইয়া দিলেন। মেদিনীপুর হইতে উভয়ে নবকুমারের বাসস্থান সপ্তগ্রামে অনায়াসে উপনীত হইলেন।

এই বিবাহ নবকুমারের প্রথম বিবাহ নহে। তিনি পূর্ব্বে আর একবার বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন কন্যাটি নিতান্ত শিশু। পিতার সহিত মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হওয়ায় কন্যাটি পিতার সহিত দেশত্যাগ করিয়া যায়, এবং বিবাহের পর স্বামী ও স্ত্রীর আর পরস্পর সাক্ষাৎ হয় নাই। নবকুমারের সপ্তগ্রামে ফিরিবার পথে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। এক জন দুনচিতা ও অতিসম্ভ্রান্ত পদবীর মুসলমান রমণী নবকুমারের নিকট কিঞ্চিৎ উপকার প্রাপ্ত হন, এবং নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারেন যে, নবকুমারই তাঁহার স্বামী। ইনি নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী—এক্ষণে লুৎফ উন্নিসা নামে প্রসিদ্ধ। ইহার রূপ ও বচনমাধুরী আগ্রার সম্রাটের সভায় রাজপুরুষগণের মধ্যে তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছে, এবং অতুল প্রভাব ও অসদ্ব্যবহারের অধিকারিণী করিয়াছে। তাঁহার পিতা আকবর বাদশাহের প্রিয়পাত্র হইয়া উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি নবকুমারের নিকট যে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ কপালকুণ্ডলাকে কয়েকখানি মহামূল্য অলঙ্কার দান করিলেন। নির্ব্বোধ বালিকা উহার মূল্য বা প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে না পারিয়া পথে প্রথম ভিক্ষুককে উহা অর্পণ করিলেন। লুৎফ উন্নিসা সম্রাটতনয় সেলিমকে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে এক ষড়যন্ত্রের সহায়তা করিবার জন্য উড়িষ্যায় গিয়াছিলেন; সম্প্রতি তথা হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। তাঁহার দুষ্কর্ম্মের শাস্তি এক্ষণে অনন্তাবিতরূপে দেওয়া গিয়াছে। যে রমণী ইতঃপূর্ব্বে গর্ব্ব করিতেন যে, তাঁহার প্রস্তরনির্ম্মিত

স্বয়ং বাদশাহ বা তাঁহার পারিষদবর্গের মধ্যে কেহ স্পর্শ করিতে পারে নাই, তিনি এক্ষণে তাঁহার পূর্ব্বস্বামী—এই সৌম্যমূর্ত্তি দরিদ্র ব্রাহ্মণ পথিকের নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন। আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি দেখিলেন, সেলিম রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট। তাঁহার নিকট বঙ্গদেশে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সপ্তগ্রামে আসিয়া তিনি একখানি বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন, এবং নবকুমারের ভালবাসা পাইবার জন্য আশা পাতিলেন। যখন তিনি দেখিলেন, কপালকুণ্ডলার প্রতি নবকুমারের প্রেম তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের অলঙ্ঘ্য অন্তরায়স্বরূপ বিদ্যমান, তখন সেই প্রেম বিনষ্ট করিবার জন্য এক দুঃসাহসিক উপায় অবলম্বন করিলেন।

কপালকুণ্ডলা এক্ষণে বৎসরাধিককাল নবকুমারের বাটীতে বাস করিতেছেন। তান্ত্রিক-অধ্যুষিত কপালকুণ্ডলা নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া এক্ষণে তাঁহার নাম মৃন্ময়ী রাখা হইয়াছে। তাঁহার বনচারিণীর মত স্বভাবও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু এ পরিবর্ত্তনে তিনি সুখী হন নাই। নবকুমার তাঁহাকে সতৃষ্ণ অন্তরে ভালবাসেন, কিন্তু সে ভালবাসার প্রতিদান পান নাই। মহাদেবী কালীই তাঁহার সমস্ত অন্তর অধিকার করিয়া আছেন, এবং তাঁহার পূজাতেই তিনি উন্মত্তবৎ নিযুক্ত থাকেন। তিনি নবকুমারের জন্য আবশ্যক হইলে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁহাকে ভালবাসেন না, এবং অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকা তাঁহার অসহ্য। নবকুমারের আদেশ অবজ্ঞা করিয়া তিনি একদিন রাত্রিকালে গোপনে বহির্গত হইয়া এক সখীর জন্য পতিপ্রেমলাভের ঔষধ সংগ্রহ করিবার জন্য জঙ্গলে গমন করেন। একটী পুরাতন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষের নিকট গিয়া তিনি দুই জনের কথোপকথন শুনিতে পাইলেন, এবং তাঁহার বোধ হইল, তাঁহারই সম্বন্ধে কথা হইতেছে। তাহাদের মধ্যে এক জন (দেখিয়া বোধ হইল ব্রাহ্মণ যুবক) তাঁহাকে দেখিতে পাইল। তখন তিনি ভয়ে পলায়ন করিলেন। পলাইতে পলাইতে দেখিলেন, এক জন তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছে। বাটী পঁহুছিয়া দ্বার রুদ্ধ করিবার পূর্ব্বেই তিনি চিনিতে পারিলেন, ঐ ব্যক্তি পূর্ব্বপরিচিত বিশালকায় কাপালিক।

কাপালিক নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার পলায়নের পর তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছিল, কিন্তু পথিমধ্যে পড়িয়া যাওয়ায় তাহার বাহু ভগ্ন হইয়া যায়। সে যখন অকর্ম্ম অবস্থায় শয্যায় পড়িয়া ছিল, তখন কালী তাহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া কপালকুণ্ডলাকে তাঁহার নিকট বলিদান দিবার আদেশ করিলেন। যখন তাহার

হস্তপদ পুনরায় কার্য্যক্ষম হইল, তখন সে দিবারাত্রি কপালকুণ্ডলার অন্বেষণ করিতে লাগিল, এবং অবশেষে তাঁহার সন্ধান পাইল। কিন্তু বলিদানের বেদিকার নিকট লইয়া যাইবার জন্য অপরের সাহায্য আবশ্যক। সুযোগ অন্বেষণ করিতে করিতে স্বীয় কার্য্যোদ্ধারের জন্য ব্রাহ্মণ যুবকের বেশধারিণী লুৎফউন্নিসার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল, এবং তাঁহার সহিত কথোপকথনের সময়েই কপালকুণ্ডলা আসিয়া পরামর্শের বিঘ্ন উৎপাদন করে। দুই জনের মধ্যে মতের ঐক্য হইল না। লুৎফউন্নিসার অভিপ্রায়, কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটান, কিন্তু কোনরূপ হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হইতে তিনি সম্মত হইলেন না। কাপালিকের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লক্ষ্য করিয়া লুৎফউন্নিসা স্থির করিলেন, কপালকুণ্ডলাকে সকল কথা বলিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করিবেন, এবং এইরূপে তাঁহার মনে কৃতজ্ঞতা উৎপাদন করিয়া নিজকার্য্যসিদ্ধির চেষ্টা করিবেন। তদনুসারে পরদিন পথে কপালকুণ্ডলা একখানি পত্র কুড়াইয়া পাইলেন। তাহাতে ব্রাহ্মণবেশধারী তাঁহাকে পুনরায় বনে আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়াছে, এবং দেখা হইলে অনেক গুরুতর রহস্য-উদ্ঘাটনের অঙ্গীকার করিয়াছে। অন্য কোনও হিন্দু কুলবধূ এরূপ অনুরোধ রক্ষা করিত না, কিন্তু কপালকুণ্ডলা করিলেন, এবং তাহাও অপরের অজ্ঞাতসারে নহে।

পূর্ণিমারাত্রে যখন কপালকুণ্ডলা বাটী হইতে বহির্গত হন, তখন নবকুমার দেখিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মনে এ পর্য্যন্ত কোনও সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই—যদিও সহজেই এরূপ সন্দেহ উদ্দীপ্ত হইতে পারিত। পরদিন রাত্রিতে তিনি সতর্ক ছিলেন, এবং দেখিলেন, কপালকুণ্ডলা পুনরায় বাটী হইতে নির্গত হইলেন। নবকুমারের উদ্বেগবৃদ্ধির আর একটি কারণ ঘটিয়া; লুৎফুন্নিসার পত্রখানি অলক্ষিতভাবে গৃহতলে পড়িয়া গিয়াছিল। নবকুমার সেখানি তুলিয়া লইয়া পাঠ করিলেন, এবং কপালকুণ্ডলার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। গৃহ হইতে বাহির হইতে না হইতে দেখিলেন, কাপালিক সম্মুখে দণ্ডায়মান। লুৎফউন্নিসার নিকট বিফলমনোরথ হইয়া দুর্দ্দান্ত কাপালিক এক্ষণে নবকুমারের মনে সন্দেহ উদ্দীপিত করিয়া তাঁহারই সহায়তা-লাভে সচেষ্ট হইল। সে নবকুমারকে নিজের ভূপতিত্ব সূচনা ও স্বপ্নে কালীদর্শন, এবং ভবানীর আদেশের কথা বিবৃত করিল, এবং কপালকুণ্ডলা নষ্টচরিত্রা ও অবিশ্বাসিনী হইয়াছে, এই কথা সদর্পে ঘোষণা করিয়া তাঁহাকে বলিদান করিবার জন্য সহায়তা প্রার্থনা করিল। নবকুমার এতদ্বিষয়ে প্রমাণ চাহিলে, কাপালিক তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করিল।

ইতঃপরে নূরুন্নউন্নিসার সহিত কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ হইয়াছে। তিনি কপালকুণ্ডলাকে কাপালিকের কথা ও তাহার ভীষণ অভিপ্রায় জ্ঞাত করাইলেন, এবং নিজের পরিচয় ও জীবনকথা ও উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিলেন; এবং কপালকুণ্ডলা যদি তাঁহার স্বামীকে কোনও কথা না বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া যান, তবে তিনি তাঁহাকে বিস্তর ধন দান করিবেন, এবং কোনও দূরদেশে সুখে বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কপালকুণ্ডলা এ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিতেন; কারণ, স্বামীর প্রতি তাঁহার যথার্থ অনুরাগ ছিল না। কিন্তু যখন ভবানীর আদেশের কথা একবার তাঁহার কর্ণগোচর হইল, তখন সে আদেশপালন ভিন্ন অন্য অভিলাষ তাঁহার মনে স্থান পাইল না। তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, এবং অদূরে কাপালিক ও নবকুমারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। কারণ, তাঁহারা প্রথম হইতেই তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। কাপালিক নবকুমারকে সুরাপান করাইয়া উন্মত্তপ্রায় করিয়াছিল। সুতরাং নবকুমার কাপালিকের অভিপ্রায়-অনুসারে কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সকলেই বলিদানের স্থানে উপস্থিত হইলেন। স্থানটি শ্মশানভূমি। গৃধ্রশ্রেণী, অর্দ্ধদগ্ধ নরদেহাবলি, এবং ইতস্ততঃ বিকীর্ণ কপাল ও অস্থির স্তূপ প্রভৃতি শ্মশানের যাবতীয় বীভৎস দৃশ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর তান্ত্রিকমতে পূজার সমস্ত আয়োজন হইল। নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে বলিদানের পূর্ব্বে স্নান করাইবার জন্য নদীতীরে লইয়া গেলেন। সে স্থানে কপালকুণ্ডলা তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহভঞ্জন করিলেন। তখন নবকুমার তাঁহাকে প্রত্যাগমন করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কপালকুণ্ডলা ভবানীর ইচ্ছা পূর্ণ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। পরস্পরে বাদানুবাদ চলিতেছে, এবং নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে বলপূর্ব্বক ফিরাইবার জন্য হস্তপ্রসারণ করিয়াছেন, এমন সময়ে কপালকুণ্ডলার পদতলস্থ তীরভূমি ভগ্ন হইল, এবং তিনি নিম্নস্থ গভীর নদীতে পতিত হইলেন। নবকুমারও তৎক্ষণাৎ নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। উভয়েই কিয়ৎক্ষণ অদৃশ্য হইলেন। অবশেষে কাপালিক নবকুমারকে টানিয়া কূলে উঠাইলেন, কিন্তু কপালকুণ্ডলাকে আর দেখা গেল না, এবং তাঁহার বিষয় আর শুনাও গেল না। এই স্থানেই গল্প শেষ হইয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালী পাঠকগণ বড়ই দুঃখিত হইয়াছেন; কারণ, তাঁহারা পরিশেষে সকলের মিলন ও চিরকাল সুখে বাস, এইরূপ চিরপ্রথানুযায়ী উপসংহারেরই

'মৃণালিনী' সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থ, এবং অনেকে এইখানিকেই বঙ্কিমবাবুর সর্ব্বাপেক্ষা প্রণয়শূন্য পুস্তক বলিয়া বিবেচনা করেন।

কিন্তু এই স্থানেই বাঙ্গালা সাহিত্যের এই অসম্পূর্ণ বিবরণ শেষ করিতে হইবে। এই সাহিত্য অনেক বিষয়ে নিষ্তেজ, নিকৃষ্টভাবাপন্ন ও মূল্যহীন হইলেও, ইহার মধ্যে এমন বস্তু আছে, যাহা হইতে ভবিষ্যৎ উন্নতির যথেষ্ট আশা করা যাইতে পারে। ইহার প্রকৃতি প্রধানতঃ অনুকরণপ্রবণ, কিন্তু গ্রীস্ ভিন্ন অপর কোন্ দেশের সাহিত্য তরুণ বয়সে আত্মনির্ভরতা ও মৌলিকতা দেখাইয়াছে? সৌন্দর্য্য এবং সত্যের আকর সেই পবিত্র দেশ (গ্রীস্) হইতে কণ্ঠধ্বনি উত্থিত হইয়া য়ুরোপের পশ্চিমাঞ্চলস্থ জড়ভাবাপন্ন মনুষ্যসমাজকে পুনঃ পুনঃ উদ্বোধিত করিয়াছে। ল্যাটিন কবিদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাসম্পন্ন ও প্রকৃতিপ্রণোদিত কবি হরেস্ গ্রীস দেশ হইতে শিক্ষিত কোনও নূতন আকারের কবিতা প্রচারিত করিতে পারিলে, তাহাকেই মৌলিকতার চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তৎকালে 'অনুকারী' শব্দ কেবল ল্যাটিন গ্রন্থকারগণের অনুকরণকারীর প্রতিই প্রযুক্ত হইত। কোনও গ্রন্থকে অত্যুৎকৃষ্ট আখ্যা দিলে, তাহা গ্রীক গ্রন্থের অনুকরণ বলিয়া বুঝা যাইত। রোমরাজ্যের পতনের পর য়ুরোপ যে মহানিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল, সেই নিদ্রা হইতে পুনরুত্থানের পর য়ুরোপ প্রথমে গ্রীক ও ল্যাটিন গ্রন্থকারগণের অনুকরণ ও অনুবাদেই আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে। দান্তে কি অনুকরণদোষশূন্য ছিলেন? ইহা প্রভৃতিতঃ অসম্ভব বোধ হইতে পারে যে, এ দেশের লোক য়ুরোপীয় ভাবসমূহ কখনও যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে। একপ মনে হইতে পারে যে, আমরা শত চেষ্টায় কেবল এইটুকুমাত্র সান্ত্বনা লাভ করিতে পারি যে, উক্ত ভাব সকল আমাদের বোধগম্য হইয়াছে বলিয়া বৃথা ভাণ করিয়া উহার বাহ্যিক চাকচিক্যমাত্র গাত্রে লেপন করিতে সমর্থ হইব। কিন্তু সকল বস্তুই একদিনে লাভ করা যায় না। একালে ইহাও ভূয়োরূপে অসম্ভব বোধ হইতে পারিত যে, ল্যাটিন ধর্ম্মমণ্ডলীর মধ্যে যে সামান্য বিদ্যাবুদ্ধি অবশিষ্ট ছিল, তাহা হইতে, এবং পুরাকালের ইতিবৃত্তের অনুশীলন হইতে পাশ্চাত্য কেল্‌টিক ও টিউটনিক জাতিগণের মধ্যে একণে পরিদৃশ্যমান জ্ঞানবিটপী শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত হইবে। আপাততঃ বোধ হইতে পারে বটে যে, বাঙ্গালী জাতি কর্ম্মক্ষেত্রে যেমন, চিন্তাক্ষেত্রেও তেমনই—যথার্থ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে স্বভাবতঃ অক্ষম। কিন্তু য়ুরোপে জ্ঞানচর্চ্চার পুনরুজ্জীবন কোমল ও রমণীয়স্বভাব

ইটালীয়ানদিগের দ্বারাই আরব্ধ হইয়াছিল। অতএব, এরূপ কল্পনা অসঙ্গত নহে যে, বাঙ্গালী জাতি—যাঁহাদিগকে 'স্পেক্টেটর্' এসিয়াখণ্ডের ইটালীয়ান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন—এক্ষণে য়ুরোপীয় ভাবসমূহ এ দেশে রোপিত করিয়া, এবং ভবিষ্যতে উত্তর ভারতবর্ষের অধিকতর কার্য্যক্ষম এবং উদ্ভাবনী-শক্তি-সম্পন্ন জাতিগণ যাহাতে উহা সহজে গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়, তাহার পথ প্রশস্ত করিয়া একটি মহৎ কার্য্য সাধিত করিতেছে।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

প্রেম?

আরবী ইরাকের মরুভূমি শস্যশ্যাম করিয়া টাইগ্রীসের আবিল স্রোত বহিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বদিকে নদীর কূলে সৌধের পর সৌধ নদীকূলের মুখ সুন্দর করিয়াছে। এই আমারা সহর তুর্কীর রাজ্যচ্যুত সুলতান আবদুল হামিদের কীর্ত্তি—তিনিই এই বাণিজ্যকেন্দ্রে সুন্দর সহররচনা করেন। চৈত্রের অপরাহ্ণে রবিকরে সহর উজ্জ্বল। নদীবক্ষে নৌকার পর নৌকা;—কেহ স্থির, কেহ গতায়াত করিতেছে। কূলে ঘাটের কাছে উজ্জ্বল-বর্ণরঞ্জিত রেশমী-কাপড় পরা ইহুদী রমণীরা প্রবাহসঞ্চালিত সমীরণ সেবন করিতে আসিয়াছে;—কেহ অবগুণ্ঠিতা, কেহ অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা, কেহ অনবগুণ্ঠিতা। রাজপথে কাবা-পরা, মাথায় রুমাল দেওয়া আরবরা গতায়াত করিতেছে। আরব রমণীরা বোরকা নামক কাল ঢাকায় সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া যাইতেছে। লোক গর্দ্দভের পৃষ্ঠে মশক চাপাইয়া জল লইয়া যাইতেছে। আর মধ্যে

---

* মূল ইংরাজী প্রস্তাবটি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ১০৪ সংখ্যক 'কলিকাতা রিবিউ' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেকালে উক্ত ত্রৈমাসিকের প্রবন্ধলেখকগণের নাম মুদ্রিত হইত না। বলা বাহুল্য, অনুদিত প্রবন্ধটির নিম্নেও বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাক্ষর ছিল না। সেই জন্যই বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধে স্বরচিত গ্রন্থাদিরও আলোচনা করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। বহু বৎসর পরে, 'কলিকাতা রিবিউ' পত্রের প্রকাশকগণ "Selections from the Calcutta Review" নাম দিয়া পুরাতন কলিকাতা রিবিউয়ের নির্ব্বাচিত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রণের সঙ্কল্প করেন। সেই সময়ে তাঁহারা যে 'অনুষ্ঠানপত্র' বাহির করেন, তাহাতে আফিসের কাগজপত্র দেখিয়া প্রবন্ধগুলির রচয়িতৃগণের নাম নির্দ্ধারিত করিয়া প্রকাশিত করেন। আমরা এই অনুষ্ঠান-পত্র হইতে জানিতে পারিয়াছি যে, এই প্রবন্ধটি বঙ্গীয় সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েরই রচিত।—অনুবাদক।

[illegible] অধিকাংশই ইংরাজ সৈনিকের গন্তব্যস্থান—মৈমনসিংহে নিয়মিত যাতায়াত [illegible] আর সঙ্গীণ অপরাহ্নের রবিকরে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। নদীর তীরে পত্রবহুল বাড়িঘর গাছগুলা লাল মুলে ভরিয়া গিয়াছে। সমস্ত সহরে যেমন গরমের ছাট, তেমনই একটা অস্বাভাবিক গুমটের ভাব—এমন কি, সন্ধ্যাসমাগমেও লোকের কোলাহল নাই, লোকে নীরবে বসিয়া ঘুম ঘুম ভাবে কফি পান করিতেছে। কেন না, সহর এখন একটা বিরাট রণক্ষেত্র। দূরের মনে ইংরাজের যুদ্ধ চলিতেছে। ইরাকের এই ভাগ বাগদাদী হস্তচ্যুত হইতেছে—তাই বর্বরগুলি অবরোধে নষ্ট করিতে অনিচ্ছুক তুর্কীরা বন্দুক [illegible] ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল—প্রথম বড় যুদ্ধ হইয়াছিল কুট-এল-আমারায়। সেখানে ইংরাজের প্রথম পরাজয়, তুর্ক-কর্ত্তে ইংরাজ বাহিনীর আত্মসমর্পণ। এখনও যুদ্ধ চলিতেছে। আমারায় নদীর দুই ধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাসপাতাল—আহত সৈনিকে পূর্ণ। আমারায় সম্পূর্ণ সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত।

নদীর পশ্চিমপারে একটা হাসপাতাল-তাঁবুতে বসিয়া ভেজা সিং লিখিতেছিল। ভেজা সিং শিখ যুবক। বৃদ্ধ পিতার অমতে যৌবনসুলভ-চাপল্যচালিত হইয়া সেনাদলে নাম লিখাইয়া সুবেদার হইয়া যুদ্ধে আসিয়াছিল। আবার যুদ্ধে আহত হইয়া সে আমারায় হাসপাতালে আসিয়াছিল; সেইখানেই হাসপাতালে পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়াছিল। কিন্তু সামরিক নিয়মে সে দেশে ফিরিতে পারে নাই। ফিরিতে তাহার ইচ্ছাও ছিল না। কারণ, পিতা ব্যতীত সংসারে তাহার আর কোনও আকর্ষণ ছিল না। সে যে তাহার অমতে চলিয়া আসিয়াছিল, সে জন্য তখন তাহার মনে অনুশোচনার উদয় হইয়াছিল। আবার আহত হইয়া সে হাসপাতালে আসিয়াছে—যুদ্ধে তাহার সাহসের জন্য সে প্রশংসিত হইয়াছে। কিন্তু সে প্রশংসায় আনন্দের সে উৎফুল্ল হইতে পারে নাই—পিতার মৃত্যুশোক তাহার পক্ষে বিষম বেদনার কারণ হইয়াছিল। এবারও তাহার ক্ষত শুরু হইয়াছে—কিন্তু বেদনা যাই হউক না, তাই আজকের পরদিন আবার পরীক্ষা করিয়া অস্ত্রোপচার করিবেন। তাহাতে যদি সে আরোগ্যলাভ করে, তবে সে সৈনিকের কাযে যাইবে, নহিলে তাহাকে অক্ষম বলিয়া দেশে ফিরিয়া পাঠান হইবে। সে জন্য তাহার ভাবনা ছিল না। সৈনিকের কাযে তাহার এখন আর কোনও আকর্ষণ ছিল না—কর্ত্তব্যচ্যুত হইতেও তাহার তেমনই কোনও ভাবনা [illegible] না সে বিশ্ব যুদ্ধ-বিদ্রোহের ভাড়নায় সৈনিক হইয়া আসিয়াছে,

...ত্তে পরস্পরে চোখিত হইয়া মুখ দেখিতে পাইতেছিল। অথচ দুজনের ... কোন আকর্ষণ নাই। সে যখন মনে করিত, শূন্য গৃহ তাহার ... —তাহাকে যাইয়া সংসার পাতিতে হইবে, তখন তাহার মনে ঘৃণার ... ও অবসাদের উদয় হইত। এই যে অবস্থা—যখন জীবনে আকর্ষণ ... না, অথচ মৃত্যুর আহ্বানও আসে না—যখন কাযে মন বসে না, ... কাজ করিতে হয়—যখন জীবনের কোনও লক্ষ্য থাকে না, অথচ লক্ষ্য ... কাজে জীবনযাপন করিতে হয়—যখন স্নেহপ্রেমভালবাসার কোনও ... বন্ধন থাকে না, অথচ মানবহৃদয় সে অবলম্বনের সন্ধান না করিয়া পারে ... —সে অবস্থা বড়ই কষ্টকর। এই অবস্থায় কেদার সিং পীড়িত হইয়াছিল। ... সাধারণ সিপাহীর মত নিরক্ষর ছিল না; সে আপনার মাতৃভাষা ... ভাল জানিত; ইংরাজীতেও অজ্ঞ ছিল না;. পূর্ব্ববার ইংলণ্ডে থাকিবার সময় সে আরবী ভাষা শিখিবার চেষ্টা করিয়াছে, এবং তাহার ... অনেকের গল্প শুনা সহিস বর্ণপরিচয় পুস্তকে লব্ধ বিদ্যার বিস্তারসাধন করিয়াছে। গতবার সে যখন ইংলণ্ডে আসিয়াছিল, তখন শীতকাল ... —সে এত কষ্ট অনুভব করে নাই। এবার ইরাকের দারুণ গ্রীষ্মে সে ... প্রতিপদে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিতেছিল।

কেদার সিং বাহিরে চাহিয়া দেখিল—দূরে ফিকা সবুজ খেজুর বাগানের ... উপরে সূর্য্য ডুবিয়া যাইতেছে—আকাশের খানিকটা রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। সে উঠিয়া বাহিরে গেল; তাহার পর ধীরে ধীরে নদীর তীরে আসিয়া ফুল ধরিয়া ... দক্ষিণ দিকে চলিল। কিন্তু সে অধিক দূর যাইতে পারিল না—... অনুভব করিল। সেই স্থানে একটা ছোট বাগান ছিল—কতক ... খেজুর গাছ ও লতিয়ের গাছ মুলে জন্মিয়া গিয়াছে। সে একটা গাছের ... বসিয়া পড়িল। তাহার কাছেই একটা ছোট ঘাট—যোরকায় দেহ আবৃত ... করিয়া আরব রমণীরা দীর্ঘপথ কাদুপাত্র ভরিয়া জল লইয়া যাইতেছে—তাই ... গাধার পৃষ্ঠে তুলাইয়া লইতেছে। কেদার সিং দেখিতে লাগিল। ... হয় হয়, এমন সময় দুই জন রমণী ঘাটে জল লইতে আসিল—প্রথমা যুবতী, ... দ্বিতীয়া বৃদ্ধা। বৃদ্ধা যোরকার অবগুণ্ঠনভাগ নামাইয়া জল লইয়া ... যাইতে পাইয়া ব্যস্তভাবে যোরকা তুলিয়া মুখ ঢাকিয়া ... করিয়া ... তাহাতে এমন পরিচয় দেখিয়া কেদার সিং ... —তাহার ... ছিল না। সে তখন, তাহার অন্তরের ...

পরিধানে একটি লাল কাপড়ের পীরাণ ও একটি লাল ডোরাকাটা কাপড়ের ঘাঘরা; বোরকা দক্ষিণ স্কন্ধে-রক্ষিত; হস্তপদ অলঙ্কারশূন্য—কেবল দক্ষিণ নাসারন্ধ্রের আবরণে একটি নাকছাবি বিদ্ধ; ঘনকৃষ্ণ কেশ স্কন্ধের উপর কর্ত্তিত; মস্তকে একখানি রঙ্গীণ রুমাল। তাহার যেন ব্যস্ততা ছিল না—সে পাত্রে জল ভরিয়া নদীকূলে বসিয়া রহিল—তাহার পর অঞ্জলি ভরিয়া জল লইয়া মুখ ধৌত করিল; তাহার পর উঠিয়া গান করিতে করিতে ফিরিয়া চলিল—

ঘিরিয়া তোমার দু'খানি চরণ
রুনু রুনু-রুনু নূপুর বাজে;
চলেছ ছড়ায়ে হাসির কিরণ,
আমিনা, মানস-ভুলান সাজে!
কুসুম-কলিকা আননে তোমার
ফুটিয়া উঠিছে মধুর গান;
জান না এখন ভাবনার ভার—
হাসিখেলাভরা সরল প্রাণ।
আসিবে প্রণয়—পরশে তাহার
মিলাবে অধরে মধুর হাসি,
থেমে যা'বে গান, ও মুখে তোমার,
কাঁপিবে হৃদয়—সুখের রাশি।

তেজা সিং গানের ভাষা বুঝিতে পারিল না; কারণ, কুর্দ কিশোরী কুর্দ গান গাহিতেছিল—আরবী নহে। কিন্তু তাহার সরল সুরের তরল মাধুরী যেন সেই সান্ধ্য শোভায় নূতন মাধুরী দান করিতেছিল। কিশোরী বামস্কন্ধে জলপাত্র লইয়া যাইতেছিল; তাহার দক্ষিণস্কন্ধস্থিত বোরকা পরিয়া পড়িয়া গেল। সে পাত্রটি নামাইয়া বোরকা তুলিয়া লইবে বলিয়া পাত্রটি নামাইতে না নামাইতে তেজা সিং যাইয়া সেটি তুলিয়া দিয়া বলিল,—"এই যে তোমার বোরকা।" কিশোরী হাসিয়া সেটি লইয়া বলিল, "আল্লা তোমার মঙ্গল করুন।" তাহার পর তাহার খাকী রঙ্গের সৈনিকের পোষাক দেখাইয়া বলিল, "তুমি ত ফিরিঙ্গীর সৈনিক—আরবী শিখিলে কোথায়?"

তেজা সিং বলিল, "এখানেই; কিন্তু তুমিও ত আরব নহ!"

কিশোরী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন করিয়া বুঝিলে?"

"আরব-রমণী বোর্‌কা স্কন্ধে লইয়া যায় না—মেঘে চন্দ্রের মত বোর্‌কায় আপনার সৌন্দর্য্য ঢাকিয়া রাখে।"

"তাহা বটে—আমি কুদ্র; তবে বাল্যাবধি এই স্থানে থাকিয়া আরবী শিখিয়াছি। তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?"

"হিন্দুস্থান।"

"সে কোথায়?—সাগরের পারে?"

"তাহাই বটে—কিন্তু ফিরিঙ্গীর দেশের মত দূর নহে।"

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। সন্ধ্যা হইলেই প্রহরী পথে পরিচয় চাহিবে, এবং সঙ্কেত-বাক্য বলিতে না পারিলেই কিশোরী বিপন্না হইবে বুঝিয়া, তেজা সিং বলিল, "সন্ধ্যা হইল, তুমি বাড়ী যাও।" তাহার পর কিশোরী দুই পদ অগ্রসর হইলে সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি প্রত্যহ এই ঘাটে জল লইতে আস?"

কিশোরী হাসিয়া বলিল, "হাঁ। কিন্তু প্রত্যহ আমার বোরকা পড়িয়া যায় না—পড়িয়া গেলেও প্রত্যহ হিন্দুস্থানের কোনও অপরিচিত লোক কুড়াইয়া দেয় না।"

কিশোরী চলিয়া গেল। যে দেশে দশ বৎসর বয়স হইলেই মেয়েরা সেই কার আবরণে অঙ্গ আবৃত করে, সে দেশে এই কুদ্র কিশোরীকে এমন সরল ও সরস ভাবে স্বচ্ছন্দে আলাপ করিতে দেখিয়া তেজা সিং বিস্মিত হইল—তাহাকে ঘনশ্যাম লক্ষ পত্রের মধ্যে একটি আনার-কলি (দাড়িম্বের ফুল) বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে তাহার মনে যে অন্য কোনও অনুভূতির উদ্ভব হইয়াছে—এমন সে বুঝিতে পারিল না। তবে সে রাত্রিতে বহু আহতের কাতরতাব্যঞ্জক আর্ত্তনাদের মধ্যে বিনিদ্র তেজা সিং তাহার নয়নসমক্ষে যেন কিশোরীর সন্ধ্যালোকরঞ্জিত হাস্যোজ্জ্বল মুখচ্ছবি দেখিতে লাগিল।

২

পরদিন অস্ত্রোপচারের পর যখন তেজা সিং সংজ্ঞালাভ করিল, তখন অপরাহ্ণ। সে চক্ষু মেলিতেই উজ্জ্বল আলোক তাহার পক্ষে কষ্টকর বোধ হইল। সে ডাক্তারকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "অস্ত্রোপচার শেষ হইয়াছে?" ডাক্তার বলিলেন, "হাঁ।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিলেন, তাহার পক্ষে চারি পাঁচ দিন শয্যাত্যাগ নিষিদ্ধ। আপনার দৌর্ব্বল্যে সে-ও বুঝিল, সে ইচ্ছা করিলেও উঠিতে পারিবে না। ডাক্তার তাহাকে একটু বলকারক ঔষধ ও পথ্য দিয়া বলিলেন, "ঘুমাইবার চেষ্টা কর।" তেজা সিংহের রক্তস্রাবদুর্ব্বল, জ্ঞানহারী

চোখে কাজর দেহ অবসন্ন হইয়াই ছিল—তাহার তন্দ্রাবেশ আসিতেছিল। সেই তন্দ্রায় সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল—সুদূর ভারতবর্ষে তাহার সেই গৃহ—তাহার মাতার মৃত্যুশয্যা—আর টাইগ্রীসের তীরে সন্ধ্যালোকসমুজ্জ্বল সেই কুর্দ কিশোরী। কোনও স্বপ্নের সহিত কোনটার সম্বন্ধ ছিল না—যেন বায়স্কোপের চিত্রমালার মধ্যে এক একখানি চিত্র বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যাইতেছে।

তাহার পর দিনে দিনে তাহার দেহের দৌর্ব্বল্য প্রশমিত হইতে লাগিল। সে কিছুতেই সেই কিশোরীর স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছিল না; পরন্তু কালের স্পর্শে তাহা নিষ্প্রভ না হইয়া দিন দিন সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বলই হইতে লাগিল। দীর্ঘ দিন—দীর্ঘতর রাত্রি—রোগশয্যার কোনও কাজ নাই; দেহের কোনরূপ কাযের অভাবে মনের কায যেন বাড়িয়া উঠিয়াছিল—অনিচ্ছাতেও মনে চিন্তা আসিত; আর সেই চিন্তার কেন্দ্রে কুর্দ কিশোরী দেখা দিত। সে আপনিই মনে করিত—সে কি ভূতাবিষ্ট হইল। কোথায় সে ভারতের শিখ—আর কে এই একান্ত অপরিচিতা কুর্দ কিশোরী? ঘটনাক্রমে এক দিন বিদেশে তাহার সঙ্গে দেখা হইয়াছে—সম্ভবতঃ জীবনে আর দেখা হইবে না—হইলেই বা কি? কিন্তু হয় ত আর কখনও দেখা হইবে না, এই আশঙ্কায় উত্তেজনাতেই যেন আবার তাহাকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল। প্রতিদিন দিন যত শেষ হইয়া আসিত, তেজা সিংএর চঞ্চল হইত—শয্যায় পড়িয়া চক্ষু মুদিয়া ভাবিত—এখন হয় ত সে ঘাটে জল লইতে আসিতেছে। সে মানস-নয়নে দেখিতে পাইত, কিশোরী প্রান্তর পার হইয়া শূন্য পাত্রটি বামকরে ঝুলাইয়া দোলাইতে দোলাইতে হরিণীর মত দ্রুতগতিতে খেজুর বনের মধ্য দিয়া ঘাটের কাছে আসিতেছে—তাহার শূন্য পাত্রে জল ভরিয়া সেটি স্কন্ধে লইয়া তীরের মত সুগঠিত সরল দেহে সেই পথে ফিরিয়া যাইতেছে—অস্তগমনোন্মুখ রবির কর তাহার মুখের রক্তাভা গাঢ়তর করিয়াছে। ঘাটে যাইবার ও ফিরিবার পথে সে কি একবার তেজা সিংহের সন্ধানে আপনার উজ্জ্বল চক্ষুর চকিত দৃষ্টি চারি দিকে চালিত করিয়াছে?—তাহাকে দেখিতে না পাইয়া সে কি হৃদয়ের এক প্রান্তে একটু হতাশাদংশন-বেদনা অনুভব করিয়াছে—তাহার একটি দীর্ঘশ্বাস কি কমলার ফুলের গন্ধে আমোদিত সান্ধ্য সমীরণে মিশাইয়া গিয়াছে? তেজা সিং দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিত। সে প্রত্যহই ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিত, "আমি একটু বেড়াইতে পারি কি? আর ত এমন করিয়া শুইয়া থাকিতে পারি না!"

পরদিন ডাক্তার ভেজাকে বেড়াইবার অনুমতি দিলেন। দিনান্তের পশ্চিম দিক্‌চক্রবালের মেঘে বর্ণের বৈচিত্র্য বিকাশ করিবার পূর্ব্বেই সে উঠিয়া কাবুর বাহিরে আসিল। তখনও তপ্ত ভূমি হইতে অগ্নিশ্বাস উঠিতেছে—তখনও রাজপথের ধূলি হইতে রবিকর প্রতিফলিত হইয়া চক্ষুকে পীড়িত করিতেছে। দুর্ব্বলদেহ ভেজা সিং নদীর দিকে অগ্রসর হইল—তাহার চরণ কম্পিত হইতেছিল। তাহার এক জন পরিচিত সৈনিক জিজ্ঞাসা করিল, "এত রৌদ্রে কোথায় যাও?" সে উত্তর দিল না।

পথে দুইবার বিশ্রামার্থ বসিয়া তেজা সিং সেই বাগানে আসিল; সেই গাছতলায় বসিল। এতক্ষণ তাহার কেবল আশঙ্কা হইতেছিল, তাহার যাইতে বিলম্ব হইতেছে, কিশোরী হয় ত আসিয়া জল লইয়া চলিয়া যাইবে। এখন তাহার মনে হইতে লাগিল—অপরাহ্ণ কি এত দীর্ঘ, যেন আর শেষ হয় না! সারা দিনে অনেক ফুল ঝরিয়া তরুতলে ধূলির উপর পড়িয়া ছিল। তেজা সিং অন্যমনস্কভাবে এক একটি তুলিয়া নখে ছিন্ন করিতে লাগিল—আর প্রান্তরের পথে চাহিতে লাগিল। গ্রাম হইতে কত রমণী আসিয়া জল লইয়া গেল—সবই আরব, বোরকায় ঢাকা—কিন্তু সে কিশোরী আসিল না। তেজা সিং আপনাকে আপনি বুঝাইতে লাগিল, হয় ত তাহার আজ জল লইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যুক্তিতে মনের আকাঙ্ক্ষা মিটে না। তাহার পর সে ভাবিল, হয় ত সাত দিন আসিয়া আসিয়া সে হতাশ হইয়া মনে করিয়াছে, হিন্দুস্থানবাসী অপরিচিত সৈনিক আর আসিবে না। এই কথা মনে করিতেই তেজা সিং হৃদয়ে বেদনার চাঞ্চল্য অনুভব করিল। কিন্তু সেই সময় সে দূরে খেজুর-বাগানের পারে কিশোরীকে দেখিতে পাইল। সে দূরে তাহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল—বোধ হয়, নিতান্ত অপ্রত্যাশিত স্থানে শত কিশোরীর মধ্যেও তাহার বাসনাভিভূত নয়ন তাহাকে চিনিতে পারিত। তেজা সিং আপনার বক্ষে স্পন্দন-শব্দ শুনিতে পাইতে লাগিল।

কিশোরী তেজা সিংহের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল; জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ত সাত দিন আইস নাই!"

তেজা সিং বলিল, "কেন, তুমি কি আমাকে খুঁজিয়াছিলে?"

"হাঁ।"

"কেন?"

"তুমি আসিবে বলিয়া।"

"কেমন করিয়া জানিলে? আমি ত বলি নাই যে, আসিব।"

"তুমি বল নাই; কিন্তু তোমার কথার আওয়াজ তাহা গোপন রাখিতে পারে নাই। তুমি যে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি প্রত্যহ এই ঘাটে জল লইতে আসি কি না—তাহাতেই আমি বুঝিয়াছিলাম, তুমি আসিবে।"

"কিন্তু আমি ত আসি নাই।"

"নিশ্চয় কোন কারণে আসিতে পার নাই। আসিবার হুকুম পাও নাই বুঝি?"

"কিন্তু আমি আসি—ইহা কি তোমার ইচ্ছা!"

কিশোরী বলিল, "হাঁ।"

তেজা সিং জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

কিশোরী একটু ভাবিল, তাহার পর অত্যন্ত সরলভাবে উত্তর দিল, "তাহা ত বলিতে পারি না।" বলিয়াই সে আবার তেজা সিংহের দিকে চাহিল—তাহার নয়ন বিস্ময়ে বিস্ফারিত ও শঙ্কায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "এ কি! তোমার মুখে যে রক্ত নাই। তোমার কি হইয়াছে?"

তেজা সিং অঙ্গাবরণ-বস্ত্র সরাইয়া ঔষধলিপ্ত, বস্ত্রাবৃত বাম বাহু দেখাইল।

কিশোরীর নয়নে বেদনার ভাব ফুটিয়া উঠিল; কিন্তু সে প্রথমেই বলিল, "এই জন্য আসিতে পার নাই।" যেন তাহার অনুপস্থিতির এই কারণ জানিয়া সে স্বস্তি পাইল। তাহার পর সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?"

তেজা সিং তাহার আঘাতের বিবরণ বিবৃত করিল। সে দুইবার যুদ্ধে আহত হইয়াছে জানিয়া কিশোরী বলিল, "হিন্দুস্থানের লোক ত খুব যোদ্ধা! কিন্তু তোমরা ইংরাজের সঙ্গে পার নাই—না?"

"না।"

"এবার তুর্কীও কি পারিবে না?"

তেজা সিং বলিল, "তাহাই ত বোধ হয়।"

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "কত দিনে তুমি সারিয়া উঠিবে?"

তেজা সিং বলিল, "ডাক্তারও তাহা বলিতে পারে না।"

তেজা সিং বুঝাইয়া বলিল, "প্রথমবার অস্ত্র করিয়াও সে আরোগ্য লাভ না করায় আবার অস্ত্র করিতে হইয়াছে—সারিবে কি না, বলা যায় না।"

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "যদি না সারে?"

তেজা সিং বলিল, "তাহা হইলে আমাকে দেশে ফিরিয়া পাঠাইবে।"

তাহার মনে হইল, সে কিশোরীর নয়নে শঙ্কার ভাব লক্ষ্য করিল।

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "দেশে যাইতে তোমার খুব আনন্দ হইবে?"

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া তেজা সিং বলিল, "না।"

"কেন?"

"দেশে আমার কেহ নাই।"

"কেহ নাই?"

"না।"

"তবে যাইবে কেন?"

"নহিলে কোথায় যাইব?"

কিশোরী একটু ভাবিয়া বলিল, "তাহাই বটে। যাইবার স্থান না থাকিলেও একটা স্থানে যাইতে ও থাকিতেই হয়। তাহাই বটে—।"

সে যেন আপনার মনে এই সব কথা বলিতেছিল। তেজা সিং তাহার দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া সে বলিল, "আমারও তাহাই।"

তেজা সিং জিজ্ঞাসা করিল, "কেন—তোমার কি কেহ নাই?"

"না"—বলিয়া কিশোরী বলিল, "সে অনেক কথা; আজ আর বলিবার সময় নাই।"

তেজা সিং চাহিয়া দেখিল, সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে।

কিশোরী জল লইয়া চলিয়া গেল; যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কালও বেড়াইতে আসিবে?"

"হাঁ।"

তেজা সিং চাহিয়া দেখিল, কিশোরী সেই খেজুর-বাগানের মধ্য দিয়া, মাঠ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। সে ধীরে ধীরে হাঁসপাতাল-ভাঙ্গুলে ফিরিয়া গেল। এত দিন তাহার কোনও বিষয়ে কৌতূহল ছিল না—আকর্ষণ ছিল না, এখন সে ভাবের পরিবর্ত্তন হইতেছিল; তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, কিশোরী একটি রহস্য—সে রহস্য ভেদ করিতে পারিলে সে জীবনে আনন্দের সন্ধান পাইতে পারিবে। বালু-তলে বারি আছে জানিলে তৃষ্ণার্ত্ত যেমন আবেগে বা যতন করিতে ব্যাকুল হয়, সে কিশোরী রহস্য ভেদ করিতে তেমনই ব্যাকুল হইল।

৩

দুই সপ্তাহ ভেজা সিং হাঁসপাতালে চিকিৎসিত হইল। সাধারণ নিয়মে আরোগ্যের পরই তাহাকে অন্য হাঁসপাতালে পাঠাইতে হইবে। এই পক্ষকাল সে প্রতিদিন অপরাহ্নে ঘাটের কাছে বাগানে যাইয়া বসিত; আদিলাও প্রতিদিন দর্শন লইতে আসিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে গল্প করিত। উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা দিন দিন বাড়িতেছিল। উভয়েই উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল। কিশোর কিশোরীর আকর্ষণ নয়ন হইতে মনে পঁহুছিতে বিলম্ব হয় না, তাহার পর মনের সেই আকর্ষণ হয় মোহে স্বপ্নে শেষ হইয়া যায়, নহে ত চিরজীবনের স্বপ্নে পরিণতি লাভ করে। তেজা সিংহের দুর্ব্বল দেহে স্বাস্থ্য যত ফিরিয়া আসিতেছিল, সে ততই বাসনার প্রাবল্য অনুভব করিতেছিল—আকর্ষণ ততই দৃঢ়—ভালবাসা ততই গাঢ় হইতেছিল। আদিলার কথায়, চাহনিতে, ব্যবহারে সে তাহারও হৃদয়ে সেই আকর্ষণের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিয়া যে আনন্দ অনুভব করিত, তাহা বলাই বাহুল্য। এক এক বার সে মনে করিত, সে ভাল করিতেছে না; তাহাকে ত কয় দিন পরেই আবার যুদ্ধে যাইতে হইবে—লড়িতে অন্যত্র যাইতে হইবে। তবে পক্ষকালের এ স্বপ্ন লইয়া সে কি করিবে—কেন সে এ স্বপ্ন দেখিতেছে? কিন্তু ইচ্ছা করিলেও সে আপনাকে নিবৃত্ত করিতে পারিত না। সে ভবিষ্যতের জন্য বর্ত্তমানকে ত্যাগ করিতে পারিত না—

আজ আমি আছি, আছে বিচিত্র এ ধরা,
কে জানে নিয়তি কাল লইবে কোথায়?

বর্ত্তমান যদি সুখের পাত্র পূর্ণ করিয়া তাহার মুখে ধরে, পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিতে দোষ কি? তাহার নিয়তি যদি দুই জনকে দুই দিকে লইয়া যায়—আদিলা তাহাকে ভুলিবে; সে তাহার স্মৃতি সম্বল করিয়া দীর্ঘ জীবনপথ পর্য্যটন করিবে। এ সব যৌবনের স্বপ্ন—যুবকের যুক্তি। কিন্তু এই সময়ই তাহার আপনার কার্য্যের বন্ধন তাহার কাছে পীড়াদায়ক মনে হইত। যদি সে সৈনিকদল ছাড়িয়া যাইতে পারিত! আদিলারও কেহ নাই—মাতৃহীনা আদিলার পিতা এই যুদ্ধেই তুর্কপক্ষে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিয়াছেন—সে এক দূর-সম্পর্কীয়া আত্মীয়ার গলগ্রহ হইয়া উদয়াস্ত গৃহকার্য্য করিয়া ও তিরস্কার সহ্য করিয়া দিন কাটাইতেছে। সে সব দুঃখ হাসিয়া উড়াইয়া দেয় বটে; কিন্তু সে দুঃখিনী। সেও ত সংসারে সকলবন্ধনবিহীন, যদি সে মুক্তি পাইত, তবে—

কে বলিবে? তাহার ধর্ম্ম উদার বক্ষে মুসলমানকন্যাকে স্থান দিতে কাহাকে বাধে। কিন্তু আজ সে কথা মনে করিয়া লাভ কি?

এইরূপে দেখিতে দেখিতে এক পক্ষ কাটিয়া গেল। এক পক্ষ যে এত অল্প সময়, তেজা সিং বা আদিলা কেহই পূর্ব্বে তাহা জানিত না। কিন্তু পক্ষকাল যত শেষ হইয়া আসিতেছিল, তেজা সিং ততই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইতেছিল। এমন কি, সে তাহার দুশ্চিন্তাভাব আদিলার কাছেও গোপন রাখিতে পারে নাই। প্রেম প্রেমিকের নয়নে তাহার মনের ভাব ধরিতে পারে। আদিলা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত—"তুমি কি ভাব?" সে সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু আদিলার কাছে ধরা পড়িত। শেষে এক দিন আদিলা অভিমানভরে বলিল, "তুমি যখন আমার কাছে সত্য কথা বল না, তখন আমি আর তোমার সঙ্গে কথা কহিব না। কুর্দ্দ বাতাসের স্বাধীনতা, সূর্য্যের সপ্রকাশভাব, পাহাড়ের অটলতা, আর প্রণয়ে দৃঢ়তা ভালবাসে।" তখন তেজা সিং বলিল, এই বার তাহাকে অন্যত্র যাইতে হইবে।

আদিলা হাসিয়া বলিল, "ইহাই তোমার ভাবনা? কুর্দ্দরা ইহাতে ভাবে না, মেঘ যেমন এক স্থানে থাকিতে পারে না—মানুষও তেমনই এক স্থানে থাকিতে পারে না। কুর্দ্দরমণী তাহার স্বামী বিদেশে গেলেও কাঁদে না; সে বিষয়ে একটা গান আছে, আমার দেশে মেয়েরা সদা সর্ব্বদা সে গান গাহিয়া থাকে।"

তেজা সিং বলিল, "যে দিন এই দাড়িমের বাগানে দাড়িমের ফুলের মধ্যে তোমাকে প্রথম দেখিয়াছিলাম, সে দিন তুমি কি সেই গান গাহিতেছিলে?"

"সে ত আমার মনে নাই" বলিয়া আদিলা গাহিল—

স্বামী। "গিরি পারে বহু দূরে—যহু দূরে যেতে চাই;
যা'ব কি যা'ব না আমি, প্রিয়া মোর, বল তাই।

স্ত্রী। সহায় হবেন বিধি যদি তুমি দূরে যাও—
দাঁড়ায়ে দেখিব আমি, তুমি ফিরে ফিরে চাও।
র'ব চেয়ে দাঁড়াইয়া রৌদ্রদীপ্ত নভতলে—
তুমি মিশে যাবে দূরে—সুদূরে পশ্চিমাচলে।
আমি কি কাঁদিব শুধু গৃহকাষ ছাড়ি মম?
কি হ'বে বরষি অশ্রু অসহায় পিশুসম?
পারসী, খ্রীষ্টান, তুর্ক—তা'রা কাঁদে, ভয় পায়;
আমারে চুমিয়া তুমি যাও যেথা মন চায়।"

তাহার পর সে আরবী ভাষায় তাহার স্বদেশের গানের অর্থ তেজা সিংহকে বুঝাইয়া দিয়া হাসিয়া বলিল, "বুঝি পারসী, খৃষ্টান, তুর্ক, ইহাদের মত হিন্দুস্থানীরাও কাঁদে?"

তেজা সিং বলিল, "কিন্তু তোমার ত গৃহকার্য্য নাই!"

আদিলা হাসিয়া গাছের গায়ে লুটাইয়া পড়িল—যেন বসন্তপবনে কুসুমিতা লতা লুটাইয়া গেল—তাহার পর বলিল, "আমার গৃহকার্য নাই। তুমি হইলে এক দিন সে কায করিতে পারিতে না; এই দাজলার * জলে ডুবিয়া মরিতে। স্নানের উপর আবার তিরস্কার—হাতে হাতে পুরস্কার আছে।"

আদিলার সরল হাসির প্রবাহে তেজা সিংহের সঙ্কোচের বাঁধ ভাসিয়া গেল। সে বলিল, "কিন্তু সে ত আর যে তোমাকে 'চুমিয়া' বিদেশে যাইবে, তাহার গৃহকার্য নহে।"

আদিলার কর্ণমূল পর্য্যন্ত লজ্জায় রক্তাভ হইয়া উঠিল; সে তাহার সরল ও উজ্জ্বল দৃষ্টি মৃত্তিকাসংলগ্ন করিল। তাহার পরই সে আবার হাসিয়া বলিল, "কিন্তু যে আমাকে কায আর তিরস্কার অকাতরে দেয়—সে যে দিন তিন জনের কায আমাকে দিয়া করাইতে হয়, সে দিন আদর করিয়া চুমা খায়।"

তেজা সিং হাসিয়া বলিল, "সেই চুমায় তোমার আশা মিটে ত?"

"গ্রীষ্মের রৌদ্রে যেমন মরুভূমির আশা মিটে।"

এমনই ভাবে যখন দিন কাটিতেছিল, তখন ডাক্তার যখন বলিলেন, তিনি আরও সাত দিন তেজা সিংকে তাঁহার হাঁসপাতালে রাখিবেন, তখন সে যে আনন্দিত হইল, তাহা বলাই বাহুল্য। যে জীবনে গৃহে সুখ পায় নাই, সে যদি পান্থশালায় সুখের সন্ধান পাইয়া থাকে, তবে সে কি সেই পান্থশালায় যত দিন পারে থাকিতে চাহে না? এই যে সাত দিন—এ ত সাত যুগের সমান। জীবনে কত সময় এক দিন সারা জীবনের অপেক্ষা অধিক মূল্যবান বোধ হয়।

দেখিতে দেখিতে সে সাত দিনও কাটিয়া গেল। যে দিন প্রাতে ডাক্তার তাঁহার সম্বন্ধে শেষ মত ব্যক্ত করিবেন, তাহার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় আদিলার কাছে বিদায় লইবার সময় তেজা সিং তাহাকে যে কথা বলিল। আদিলা আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, "যে আল্লা সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি

---

* আরবরা টাইগ্রীসকে দাজলা বলে। পারসী ও কুর্দ 'তীর' (বাণ) হইতে য়ুরোপীয়রা টাইগ্রীস করিয়াছে।

তোমার মঙ্গল করুন।" তাহার পর সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি কাল যাইতে পারিবে না?"

"কাল পারিব। আদিলা, আমি চলিয়া গেলেও কি তুমি আমাকে মনে রাখিবে?"

"রাখিব! যে মরুভূমিতে বাস করে, সে কি প্রস্রবণকে ভুলিতে পারে?"

বলিষ্ঠ তেজা সিংহের যৌবনাবেগ তাহার বিচার-বিবেচনার শক্তিকে পুরাভূত করিতেছিল। তাহার মনে প্রবল বাসনা জন্মিতেছিল—সব ভুলিয়া জীবন-মরণ বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ সব ভুলিয়া এই প্রেমের প্রবাহে ভাসিয়া যায়। আজ একবার আদিলাকে বক্ষে ধরিয়া তাহার অধরে আপনার অধরের তৃষ্ণা মিটাইয়া লয়। কিন্তু সে আপনাকে নিবৃত্তি করিল। কাল প্রাতে তাহাকে বিদায় লইতে হইবে—মধ্যে এক রাত্রির ব্যবধান—আদিলা হায়া অন্ধকার রঙ্গীর ব্যবধান। আত্ম স্বার্থপরের মত আদিলার জীবনের সুখ নষ্ট করিবার অধিকার তাহার নাই। সে প্রবল চেষ্টায় আপনাকে সংযত করিয়া বিদায় লইল।

সে রাত্রিতে তেজা সিং ঘুমাইতে পারিল না।

৪

পরদিন প্রাতে ডাক্তার বিশেষ যত্নসহকারে তেজা সিংহের আহত বাহু পরীক্ষা করিলেন; তাহার পর বলিলেন, "তোমার অস্ত্রের ক্ষত মিলাইয়া গিয়াছে; কিন্তু বাহুর দৌর্ব্বল্য যায় নাই—এ দৌর্ব্বল্য আর যাইবে না।" তাহার পর তিনি বলিলেন, "তুমি দুঃখিত হইও না—আঘাতযন্ত্রণা যেমন ধীরভাবে সহ্য করিয়াছ, এ সংবাদও তেমনই ধীরভাবে সহ্য করিও—তোমাকে সৈনিকের কায ছাড়িয়া দেশে যাইতে হইবে।"

দুঃখিত! এ যে তাহার পরম আনন্দের সংবাদ—এ যে তাহার মুক্তির বার্ত্তা! সে তাহার লক্ষ্যহীন জীবনে যে নূতন লক্ষ্যের সন্ধান পাইয়াছে, এ যে সেই লক্ষ্যের সন্ধানপথের সহায়। সে যে এ সংবাদ পাইবার আশাও করিতে পারে নাই; ইহা এমনই অতর্কিত—অপ্রত্যাশিত।

তখনও বেলা দশটা বাজে নাই। অপরাহ্নের যে অনেক বিলম্ব! তেজা সিং আদিলাকে এ সংবাদ না দিয়া স্থির হইতে পারিতেছিল না। অপরাহ্ন পর্য্যন্ত বিলম্ব তাহার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর বোধ হইতেছিল।

সে দিন তেজা সিং অন্য দিন হইতে অধিক বেলা থাকিতে নদীর কূলে যেই

গাগারে গেল। কিন্তু তাহাকে অন্য দিনের মত অপেক্ষা করিতে হইল না। আদিলাও বুঝি সংবাদের জন্য চঞ্চল হইয়া বিলম্ব সহ্য করিতে পারে নাই।

তেজা সিং বলিল, "আদিলা, আমাকে সেনাদলে যাইতে হইবে না!"

আদিলার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

কিন্তু তেজা সিং যখন বলিল, "কিন্তু আমাকে দেশে পাঠাইয়া দিতেছে।" তখন অকালজলদোদয়ে দিনের আলোক যেমন নিবিয়া যায়, আদিলার মুখের আনন্দালোক তেমনই নিবিয়া গেল। সে আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, "প্রভো তোমার মঙ্গল করুন।" তাহার স্বরে বেদনা বাজিয়া উঠিল। তেজা সিংহের মনে হইল, সে আদিলার নয়নে অশ্রু দেখিতে পাইল। তাহার পুনরাগতস্বাস্থ্যসবল দেহের যৌবন তাহাকে চুম্বনে সে অশ্রু মুছাইয়া দিতে প্ররোচিত করিল। কিন্তু তাহার যুক্তি তাহাকে নিবারিত করিল। তবে আজ সে জীবনের ভবিষ্যৎ নক্সা ছকিয়া আনিয়াছিল—যদি আদিলা সম্মত হয়। সে ত মুক্ত—এখন সে জীবনে নূতন পথ রচিতে পারে।

তেজা সিং আদিলাকে সেই কথা বলিবে, এমন সময় আদিলা বলিল, "কিন্তু দেশেও তোমার কোনও আকর্ষণ নাই?"

"না।"

"তবুও সেই তোমার দেশ—সেই তোমার পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতিপূত তীর্থ। হে চিরপরিচিত অপরিচিত, আরবের এই মরুভূমিতে কয় দিন যাহার সঙ্গে তোমার দেখা হইয়াছে, তাহাকে ভুলিতে তোমার কয় দিন লাগিবে?"

"মৃত্যু ব্যতীত কেহ তাহাকে ভুলাইতে পারিবে না।"

উভয়েই নীরব হইয়া রহিল। কথা তখন নিষ্প্রয়োজন—উভয়ে উভয়ের মনের ভাব বুঝিয়াছিল। বাসনা ও বেদনা উভয়কেই সমভাবে পীড়িত করিতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে তেজা সিং বলিল, "কিন্তু আমি ইরাকে থাকিতে পারি।"

মরুমধ্যে তৃষ্ণাশুষ্ককণ্ঠ পথিক সহসা স্বচ্ছ সলিলের প্রবাহ দেখিলে যেমন আনন্দিত হয়, আদিলা তেমনই আনন্দিতা হইল; জিজ্ঞাসা করিল "পার?"

"পারি—যদি আদিলাকে পাই।"

আদিলার মুখ লজ্জায় রাঙ্গা হইল। কিন্তু সে পরক্ষণেই বলিল, "আদিলা আপনি আপনাকে দিয়াছে; কিন্তু তবুও তুমি তাহাকে পাইবে না—তুমি ত মুসলমান নহ।"

এমন সরল উত্তর তেজা সিং পাইবার আশা করে নাই। তাহার আশা লঙ্ঘিত হইল। তখন সে বুঝাইতে লাগিল, তাহার ধর্ম্মে সে আদিলাকে দীক্ষিতা করিবে।

আদিলা বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "তাহা হইতে পারে না।"

তেজা সিং বলিল "কেন, আদিলা?"

"যে যুদ্ধে বাবার মৃত্যু হয়, সেই যুদ্ধে যাইবার সময় তিনি আমাকে বলিয়া গিয়াছিলেন, 'বিপদে সম্পদে সুখে দুঃখে আমি যেন কখন আল্লাকে না ভুলি।'"

তেজা সিংহের আশা উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। ভগবান এক; দেশ ভেদে ধর্ম্মভেদে তিনি ভিন্ন ভিন্ন নামে উপাসিত। এই সব কথা সে আদিলাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল। আদিলা মুগ্ধ হইয়া তাহার কথা শুনিতে লাগিল—কেন না, তেজা সিংহের কথা তাহার ভাল লাগিত; কিন্তু সে কিছুই বুঝিল না। তেজা সিংহের কথা শেষ হইলে সে বলিল, "আমি এ সব বুঝি না; কিন্তু তুমি বুঝ। যদি সকলেই এক আল্লার উপাসক, তবে তুমি কেন কুদেষ্টি আল্লার ভজনা কর না?"

তেজা সিং এতক্ষণ যাহা বলিয়াছে, তাহার পর এ কথার আর উত্তর নাই। সে নির্ব্বাক হইল। স্ত্রীবুদ্ধির সরলতার নিকট তাহার যুক্তি তর্ক পরাভব মানিল। কিন্তু পুরুষ পরাভূত হইলেও পরাভব মানিতে চাহে না। আত্মাভিমান তাহাকে প্রাধান্যলাভে প্রয়াসী করে বলিয়াই সে মনে করে, স্ত্রীলোক পুরুষের ইচ্ছার অনুসরণ করিবে, পুরুষ স্ত্রীলোকের ইচ্ছার অনুসরণ করিবে না। প্রকৃতির বিধানে পুরুষ সবল বলিয়া সে আপনার প্রাধান্য ভাহার অধিকার বলিয়া মনে করিয়াছে—জগতে সকল জাতির মধ্যে ইহা কিন্তু হয়! তাই তেজা সিং বুঝাইতে লাগিল, দেশে তাহার বাড়ী আছে; তাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারিবে। স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিলে তাহার পক্ষে দোষ হানি কথা অসুবিধাজনক হইবে।

কিন্তু মরুভূমির কুটীরবাসিনী আদিলা এ সব বৈষয়িক ব্যাপার বুঝিল না। সে বুঝিয়াছিল, প্রেম আর প্রেম। উন্মুক্তগগনচারী বিহগদম্পতী কি আশ্রয়ের কথা ভাবিয়া পরস্পরকে ভালবাসে—পরস্পরের সন্নিহিত হয়? তবে তাহার প্রেমিক এত ভাবনা ভাবিতেছে কেন? এই ভাবনায় তাহার সরল হৃদয়ে ব্যথা বাজিল!

তর্কে তাহাকে পরাভূত করিতে অসমর্থ হইয়া তেজা সিং আদিলাকে বলিল,

মানসিক নিষেধে তাহাকে স্বদেশে যাইতে হইবে। তিন মাসের মধ্যে সে [illegible] আসিবে। এই তিন মাস আদিনা যেন ভাবিয়া দেখে—বুঝিয়া দেখে, সে [illegible] গ্রহণ করিতে পারে কি না।

আদিনা বলিল, "আমি তোমার পথ চাহিয়া থাকিব—কেন না, ধর্ম্ম তোমারি নিকট হইতে দূরে রাখিলেও প্রেম আমাকে তোমার কাছে আ [illegible] কিন্তু, বন্ধু, তুমিও ভাবিয়া দেখিও—ধর্ম্মের যে ব্যবধান তুমি কেব ব্যবধান বলিয়া বুঝাইয়াছ, তাহা অতিক্রম করিতে পার কি না।"

তেজা সিং তাহার গৃহ চিনিতে চাহিয়ে আদিনা বলিল, "গৃহ [illegible] হইবে? যে নদীকূলে আমি প্রথম তোমার দেখা পাইয়াছি, সেই [illegible] আমি তোমার পথ চাহিয়া থাকিব।"

ইরাকের সামরিক ব্যবস্থা একটা বিরাট যন্ত্র—সহসা কোনও অতি [illegible] তাহার কোনও অংশ ভাঙ্গিয়া না গেলে সে কলের সব কাষ নিয়ন্ত্রি [illegible] থাকে—কখন কোনও নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। ডাক্তার তে [illegible] মনিক-সূর্য্যের অনুপযুক্ত স্থির করিবামাত্র তাহার প্রত্যাবর্ত্তনের ব্যবস্থ আপত্তি হইয়াছিল। দুই দিন পরেই তাহাকে হাঁসপাতাল হইতে পাঠা [illegible] হইল। তেজা সিং আরবের ইরাকে আপনার হৃদয় রাখিয়া [illegible] ফিরিয়া গেল।

১

ভারতবর্ষে যাইয়া তেজা সিং কেবল আমারায় ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হ [illegible] দুষ্কাষ্ঠ লৌহ কি স্থির থাকিতে পারে? যুদ্ধের জন্য লোকের অস্থ [illegible] ব্যবস্থা বন্ধ হইয়াছিল—সব জাহাজ সরকারী বন্দোবস্তে সরকার [illegible] তাই দরখাস্ত করিয়া ভারত হইতে আবার ইরাকে আসিতে তেজা [illegible] হইল। নহিলে তিন মাস কেন, দুই মাস না যাইতেই সে আ [illegible] উপনীত হইত। দেশে আসিয়া সে যেন ভিত্তিতে পারিতেছিল না। নিষ্ঠুর ভাব যেন তাহার কাছে 'মুখচাপা'র মত বোধ হইতেছিল কেবল সেই ভাব দূর করিয়া সেই শ্মশানে উত্থান-প্রতিষ্ঠার—আ [illegible] করিয়া সেই কেন্দ্র হইতে সেই নিরানন্দ গৃহে আনন্দালোক বিক [illegible] দেখিতেছিল। সেই গৃহ আবার গৃহিণীর ব্যবস্থায় সুন্দর সংস [illegible] আবার মিষ্ট কণ্ঠস্বরে মুখরিত হইতে পারে। সে—সেই গৃহে [illegible] রের অধিকারী, যে সুখ কখনও পাইবে না মনে করিয়াছিল, সেই সু [illegible]

জমীজমার লাভের অংশ আদায় করিয়া গৃহসংস্কার সম্পন্ন করিয়া সে বেবলা ইরাকে ফিরিতে ব্যস্ত হইতে লাগিল। আত্মীয় কুটুম্ব প্রতিবেশী সকলেই তাহার পিতৃবিয়োগে ও সৈনিকবৃত্তিপরিত্যাগের কারণে তাহার সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সকলেই তাহাকে আপনার গৃহে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন—সকলেই তাহাকে বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে উপদেশ দিতে লাগিলেন—কারণ, বিবাহ না করিলে মানুষ সংসারে নিতান্তই বেতের পৈশাচের মত ভাসিয়া বেড়ায়। কেহ কেহ তাহার বিবাহের সম্বন্ধও দেখিতে লাগিলেন। তেজা সিং তাঁহাদিগকে বলিল, তাহাকে আবশ্যক কার্যে আর একবার ইরাকে যাইতে হইবে—সে শীঘ্রই ফিরিয়া আসিয়া সংসার পাতার সদুপদেশ শিরোধার্য্য করিবে—এখন নহে।

সে কি জন্য ইরাকে যাইতে চাহে, কত দিনের জন্য যাইতে চাহে, ইত্যাদি নানা প্রশ্নের ও অনেক লেখালিখির পর দ্বিতীয় বারের শেষে তাহার যাইবার আদেশ আসিল। সে সেই ছাড় লইয়া পঞ্জাব হইতে করাচী বন্দরে উপনীত হইল, এবং তথায় জাহাজের জন্য সপ্তাহ কাল অপেক্ষা করিয়া জাহাজ পাইল।

তৃতীয় মাসের মধ্যভাগেই সে বসোরায় উপনীত হইয়া আবার আমারায় যাত্রা করিল। যখন জাহাজের উপর হইতে সে আমারার সৌধশ্রেণী দেখিতে পাইল, তখন কি আনন্দে—কি আশায়—কি আকাঙ্ক্ষায়—কি আশঙ্কায় তাহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল! আদিলা যে তাহার আগমনপ্রতীক্ষা করিয়া আছে, সে বিষয়ে তাহার সন্দেহমাত্র ছিল না; কিন্তু তবুও মনে হইতেছিল, যদি সে আর তাহাকে দেখিতে না পায়?

মধ্যাহ্নের পরই তেজা সিং সেই বাগানে উপস্থিত হইল। গাছে আম্র ফুল নাই—কিন্তু গাছ ফলে পূর্ণ; এই ফলেই ফুলের পরিণতি। তাহার আশাও এমনই সাফল্যে পরিণতি লাভ করিবে ত? তাহার হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা উচ্ছ্বসিত হইল—করিবে; কিন্তু কোথায় ক্ষীণ স্বরে আশঙ্কার অমঙ্গল-বাণীও ধ্বনিত হইল; কে বলিতে পারে? একবার তাহার মনে হইল, সে বলিয়াছিল, তিন মাসে সে ফিরিয়া আসিবে—এখনও তিন মাস পূর্ণ হয় নাই, এখনও সময় হয় নাই বলিয়া হয় ত আদিলা আসিবে না। কিন্তু তখনই সে আদিলার বিদায়কথা স্মরণ করিল—"নদীকূলেই আমি তোমার পথ চাহিয়া থাকিব।"

ক্রমে তাহার নিকট অতি দীর্ঘ প্রতীয়মান দিনও শেষ হইয়া গেল। যেন পৃথিবী ব্রত করিয়া আপনার দিনের কাজ সারিয়া সূর্য্য পশ্চিম-দিগন্তে যেন

অনলজ্বালা বাধিয়া নিষ্প্রভ হইয়া অস্তধর্মনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। গ্রাম হইতে দুই চারি জন করিয়া আরব-রমণী ঘাটে জল লইতে আসিতে লাগিল। তাহারা জল লইয়াই চলিয়া যাইতে লাগিল। শেষে সূর্য্য যখন অস্ত গিয়াছে, কিন্তু দিনের শেষ আলো মিলিয়া যায় নাই, তখন তেজা সিং বাগানের পরপারে তাহার ঈপ্সিতাকে দেখিতে পাইল—আদিলা আসিতেছে।

তেজা সিং অগ্রসর হইয়া বলিল, "দেখ, আমি আসিয়াছি।"

আদিলার মুখে ও চক্ষুতে আনন্দ বিকশিত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "মেঘ কি চাতকের পিপাসা না মিটাইয়া থাকিতে পারে?"

"না। মধুমক্ষিকাই ফুলকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না।"

উভয়ে এক বৃক্ষতলে বসিল। তেজা সিং ভারতবর্ষ হইতে আদিলার জন্য অলঙ্কার আনিয়াছিল; তাহা আদিলাকে পরাইয়া দিল। আদিলা কোনরূপ সঙ্কোচ প্রকাশ করিল না; কেবল বলিল, "তুমি ত অনেক টাকা খরচ করিয়াছ?"

তেজা সিং বলিল, "কিন্তু আমার যাহা কিছু, সবই ত আমি তোমাকে দিতে চাহি।"

কথায় কথায় সন্ধ্যা হইল। প্রকৃতির হিসাবে ভুল হয় না, জমা খরচ মিলিয়া যায়। তাই ইরাকে রৌদ্রতপ্ত দিবসের দুঃসহ তাপ সন্ধ্যা হইতে না হইতে দূর হইয়া যায়, সান্ধ্য সমীরণে শরীর স্নিগ্ধ ও মন প্রফুল্ল হয়। সেই স্নিগ্ধ সমীরণে বাগানে গাছের পাতা কাঁপিতে লাগিল—আকাশে চন্দ্রের আলোক। তেজা সিং ও আদিলা নদীর কূল ধরিয়া কিছু দূর গেল। সহসা আকাশের দিকে চাহিয়া আদিলা বলিল, "অনেকটা রাত্রি হইয়াছে।" সে হাসিয়া বলিল, "আজ অনেকটা তিরস্কার পুরস্কার মিলিবে। কিন্তু সে জন্য আমার আর ভয় হয় না।" সে নিতান্ত বিশ্বাসভরা প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে তেজা সিংহের দিকে চাহিল। তাহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, সেও মুক্তির দ্বারে পৌঁছিয়াছে। সেও তেজা সিংহের মত প্রেমের, সংসারের স্বপ্ন দেখিতেছিল।

তেজা সিং সঙ্গে চলিল। জল লইয়া আদিলা প্রান্তর পার হইয়া গ্রামে গেল। তাহার গৃহদ্বার হইতে তেজা সিং বিদায় লইল।

কিন্তু তাহার পর তেজা সিং যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি স্থির করিলে?" তখন আদিলা বলিল, "আমি ত আর নূতন কিছুই স্থির করিলাম না; তুমি কি স্থির করিলে?" তেজা সিং এবার সংসারের

তেজা সিংহের যুক্তি ভাহার স্বপক্ষে; তাই সে প্রতিদিনই আদিলাকে বুঝাইত—মনে করিত, বুঝাইলে ভাহার মতপরিবর্ত্তন করাইতে পারিবে। কিন্তু তাহার হিসাবেই ভুল হইয়াছিল। সে স্থানে বিশ্বাসে ও যুক্তিতে বিরোধ হলে, তথায় বিশ্বাস যদি সরল ও দৃঢ় হয়, তবে যুক্তির পরাভব অনিবার্য্য। কেন না, বিশ্বাস হৃদয়ের—যুক্তি মস্তিষ্কের। তেজা সিংহের যুক্তি কিছুতেই আদিলার বিশ্বাসকে পরাভূত বা বিচলিত করিতে পারিল না। তেজা সিংহের প্রেম প্রবল না হইলে সে আদিলার এই অবিচলিত ভাবে বিরক্ত হইত। কিন্তু তাহার প্রেম সে বিরক্তির পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।

এমনই ভাবে এক মাস কাটিয়া গেল। অপরিচিত হিন্দুস্থানবাসীর সহিত আদিলার ঘনিষ্ঠতা গোপন ছিল না। সে ঘনিষ্ঠতা বিবাহে পর্য্যবসিত হওয়াই স্বাভাবিক—তাহাতে বিলম্বহেতু গ্রামের লোক তাহা লইয়া অপ্রিয় আলোচনা করিতে লাগিল—আদিলার আত্মীয়-স্বজনে তাহার পক্ষে বাস আরও কষ্টকর হইয়া উঠিল। শেষে একদিন তেজা সিংহের যুক্তির উত্তরে সে বলিল, "তুমি আমাকে প্রবঞ্চনা না দিয়া আমাকে মারিয়া ফেল। আমি সুখে মরিব। তুমিই বলিয়াছ, দুই ধর্ম্মে ব্যবধান কথার ছলনা—তোমার প্রেম কি তোমাকে সে ব্যবধান টুকুও অতিক্রম করাইতে পারিল না?" তাহার কণ্ঠস্বরে তিরস্কারের ও অভিমানের ঝঙ্কার ছিল। কিন্তু কথা শেষ না হইতেই সে ঝঙ্কার বেদনায় ও করুণায় কোমল হইয়া অনুনয়ে পরিণত হইল। তাহার দুই চক্ষু হইতে অবিরল অশ্রু ঝরিতে লাগিল! তেজা সিংহের প্রেমে তাহার অচল বিশ্বাস বিচলিত হইয়াছিল—বেদনায় তাহার বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল।

আদিলার অশ্রুর প্রবাহে তেজা সিংহের সব দ্বিধা ভাসিয়া গেল। সত্যই ধর্ম্মের ব্যবধান কথার ছলনা—সে ইচ্ছা করিয়া আপনার জীবন মরুভূমি করিবে না, আদিলার পক্ষে সংসার বেদনায় কণ্টকাকীর্ণ করিতে পারিবে না। আদিলার সরল বিশ্বাসেরই জয় হইল।

৬

তেজা সিংহের সহিত পরদিন আদিলার বিবাহ হইবে। সে দিন অপরাহ্ণে তাহারা আবার সেই বাগানে মিলিত হইয়াছে। দুই জনে কত কথা হইতেছে। বিবাহের পর তাহারা ভারতবর্ষে যাইবে; ভাল লাগে, তথায় থাকিবে; নহিলে ইয়াকে ফিরিয়া আসিবে—তেজা সিং অর্থোপার্জ্জনের ব্যবস্থা করিয়া আসিবে। ভবিষ্যতের উজ্জ্বলতাই হৃদয় আনন্দে পূর্ণ। তেজা সিং স্বদেশের কল্পনা করিয়া

ভুলিয়া গিয়াছে—চিরাগত সংস্কার ত্যাগ করিতে তাহার হৃদয়ে যে বেদনা বাজিয়াছিল প্রেমের ভেরীতে—সুখের আশায় তাহা দূর হইয়াছে। সে আজ সুখী। আর আদিলা? তাহার সুখের সীমা নাই।

কথায় কথায় আদিলা জিজ্ঞাসা করিল, "হিন্দুস্থানে তোমাকে কি বলে?"

তেজা সিং বলিল, "শিখ।"

"শিখ!"—এমন বিকৃত কণ্ঠে আদিলা সে কথা উচ্চারিত করিল যে, তেজা সিংহের মনে হইল, দূরে আততায়ীর ছুরিকাহত কাহারও কণ্ঠ হইতে সে স্বর উঠিয়াছে। সে চাহিয়া দেখিল, আদিলার মুখে যেন মৃত্যুর পাণ্ডুরবর্ণ ব্যাপ্ত—সে মুখ রক্তলেশশূন্য। সে এই পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই আদিলা দুই করে মুখ আবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ কাঁদিয়া সে যেন প্রকৃতিস্থ হইল। সে অশ্রুসিক্তনয়নে তেজা সিংহের দিকে চাহিয়া বলিল, "বন্ধু, অভাগিনীর সুখের স্বপ্ন শেষ হইয়াছে। ঐ যে সূর্য্য ডুবিতেছে—উহা কাল আবার উঠিয়া পৃথিবীর অন্ধকার ঘুচাইবে; কিন্তু আমার জীবনের এ অন্ধকাররাত্রি আর প্রভাত হইবে না।"

শঙ্কাকম্পিতকণ্ঠে তেজা সিং জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে, আদিলা?"

"শিখ সৈনিকের অস্ত্রে পিতার জীবনান্ত হইয়াছিল শুনিয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—সেই দিন হইতে শিখ আমার শত্রু।"

"কিন্তু আমার ত কোন অপরাধ নাই—আমি ত তোমার জন্য আমার শিখ ধর্ম্মও ত্যাগ করিয়াছি।"

"কিন্তু তুমি শিখ।"

"আমার প্রেমও কি তোমার প্রতিজ্ঞা পরাভূত করিতে পারিবে না?"

"না।"

তেজা সিংহের মনে হইল, যেন সহসা কে তাহার বক্ষে শাণিত অস্ত্র বিদ্ধ করিয়া বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দিল। সে যাতনাব্যঞ্জকস্বরে বলিল, "আদিলা! আদিলা! কিন্তু আমি যে তোমার জন্য আমার ধর্ম্ম পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছি?"

আদিলা কাতরদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "আর আমি যে আমার সর্ব্বস্ব তোমাকেও ত্যাগ করিতেছি। আমার মত দুঃখ কাহার?"

বাসনার প্রবল উত্তেজনায় তেজা সিং সব ভুলিয়া গেল—সে আপনার দুই বাহুপাশে আদিলাকে বদ্ধ করিয়া নিবিড় আলিঙ্গনে বক্ষে ধরিয়া অজস্র চুম্বনে তাহার মুখ প্লাবিত করিয়া দিল। আদিলা তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি

করিস না—তাহার কোমল, তপ্ত দেহ যেন সে আলিঙ্গনে এলাইয়া পড়িল। সে মনে করিল—এই মুহূর্ত্তেই তাহার জীবনের সার্থকতা—এই মুহূর্ত্তের স্মৃতি সম্বল করিয়াই তাহাকে বেদনাভার বহিয়া দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হইবে। অজস্র চুম্বনে যখন তেজা সিংহের প্রবল উত্তেজনা আপনাকে ব্যয়িত করিল, তখন আদিলা আপনাকে তাহার শিথিল আলিঙ্গন হইতে মুক্ত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে কাতর ভাবে তেজা সিংহের দিকে চাহিয়া বলিল, "বন্ধু, তুমি মুক্ত—জীবনে তুমি সুখী হও। যদি পার, মরুভূমির এই তুচ্ছ কণ্টককে কখনও কখনও স্মরণ করিও। সে তোমাকে কখনও ভুলিবে না—কুল-রমণী কখনও দুইবার ভালবাসে না।"

সন্ধ্যার অন্ধকারে সে বাগান পার হইয়া চলিয়া গেল।

পরদিন তেজা সিং গ্রামে সন্ধান লইয়া জানিল, প্রত্যূষেই আদিলা কুল-স্থানে তাহার কোন আত্মীয়ের সন্ধানে চলিয়া গিয়াছে।

* * * * * *

ইহার তিন মাস পরে একদিন অমৃতসহরের শিখ মন্দিরের দ্বারী প্রভাতে দেখিল, মন্দিরদ্বারে এক ব্যক্তির মৃতদেহ পড়িয়া আছে। বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া তেজা সিং আত্মহত্যা করিয়াছে।

আর তাহারও পাঁচ মাস পরে—যখন ইরাকের দাড়িম্ব-কানন আবার রক্ত কুসুমে ভরিয়া গিয়াছে, তখন—তেজা সিংহের নাম লিখিত একখানি কাগজ অঙ্গাবরণ হইতে বাহির করিয়া এক বিদেশিনী অমৃতসহরে তাহার সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছিল। অনেকেই তাহার ভাষা বুঝিতে পারে নাই—সে কাহাকেও আত্মপরিচয় দেয় নাই। আদিলার প্রেম কি তাহার প্রতিজ্ঞাকে পরাভূত করিয়াছিল?

১১, টাইগ্রীস ষ্ট্রীট,
আমারা,
২রা বৈশাখ, ১৩২৪।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

নদীয়ার পুরা-কাহিনী—বেৎনা।*

বেৎনা একটি গ্রামের নাম। গ্রামটী নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। ব্রাহ্মণ, সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দু ও বহু মুসলমানের এখানে বাস ছিল। গ্রামটী অতি প্রাচীনও বটে। পূর্ব্বে এই গ্রামে বহু ভিলীজাতীয় লোকের বাস ছিল। বেৎনার বাস

* বাঙ্কিপুরের দশম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

হেতু তাঁহারা সমাজে বেৎনাই তিলী নামে খ্যাত। এক্ষণে বেৎনায় আর এক ঘরও তিলী নাই। ম্যালেরিয়া বা মহামারীতে অপর জাতির সংখ্যাও কমিয়া গিয়াছে।

গ্রামের দক্ষিণে কুঠীর মাঠ নামে একটি মাঠ আছে। একটি নীল-কুঠীর ভগ্নাবশেষও তথায় দৃষ্ট হয়। এই কুঠী কোম্পানীর আমলে ইংরেজ নীলকরগণ স্থাপন করেন। কুঠীর মাঠ ভেদ করিয়া একটি জলপ্রবাহ পূর্ব্বমুখে গিয়া হাঁসখালীর নিকট চূর্ণী নদীতে মিলিয়াছে। অপর মুখ কয়েকটী গ্রামের প্রান্ত দিয়া বহিয়া পশ্চিমে কৃষ্ণনগরের দক্ষিণাংশে অঞ্জনা নাম্নী ক্ষুদ্র নদীতে পড়িয়াছে। অঞ্জনা এক্ষণে স্থিরসলিলা—বিল্ রূপে পরিণত। উক্ত জল প্রবাহও এক্ষণে ভরাট হইয়া গিয়াছে। কেবল বর্ষাকালে তাহার খাদে জল জমিয়া দুই এক মাস মনে পূর্ব্বভাব জাগরূক করে। লোকে এখন ইহাকে ঝোর (নির্ঝর) বলে।

উল্লিখিত জলপ্রবাহের উভয় কূলে পুরাকালে যে কোনও সমৃদ্ধিশালী নগর বিদ্যমান ছিল, এক্ষণে তাহার প্রচুর প্রমাণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখন এখানে কোনও স্তূপ বা প্রস্তর বা প্রস্তরস্তম্ভ দেখা যায় না। নগরটী কতকাল হইল ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, ধ্বংসের পর কত মাস, কত বর্ষ, কত শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, কত স্থানে কত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। এখন কেবল লোক-বসবাসের নিদর্শনস্বরূপ নির্ঝরের উভয় দিকের মাঠ বহুদূর পর্য্যন্ত পুরাতন 'খোলা খপরায়' সমাচ্ছন্ন। লাঙ্গলের মুখে নানা মৃৎপাত্র, কুম্ভকারের ছন্নভাগ ও অপর গৃহসামগ্রীর ভগ্নাংশ মৃত্তিকামধ্য হইতে উঠিতে দেখা গিয়াছে। ঝোরের দক্ষিণাংশের পাহাড় উচ্চ। বর্ষার জল-স্রোতে ঐ পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়ায় কূপের চিহ্নস্বরূপ উপরি উপরি তিন চারিখানি পাট্ সাজান দেখা গিয়াছে।

ঝোরের উত্তরাংশের মাঠে কৃষকেরা ধান্ নিড়াইবার সময় অনেকে অনেক জিনিস্ পাইয়াছে। এক জন বড় মটরের আকারের একটি গোলাকার পদার্থ পায়। সে তাহা বাড়ী আনিয়া ধুইয়া দেখে যে, সেটি খাঁটী উজ্জ্বল সোনা—মধ্যে ছিদ্র আছে। সেটী যে নথের ঠোশ, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্বেত, কৃষ্ণ, গাঢ় হরিৎ ও কিঞ্চে লোহিতবর্ণের 'তস্‌বীহ-দানা'র * ন্যায় গোলাকার ও রত্নাকৃতি প্রস্তরখণ্ডও অনেক পাওয়া গিয়াছে। আমরা এইরূপ ৫টী পাথর সংগ্রহ

* মুসলমানদিগের জপমালার নাম 'তস্‌বীহ-দানা'।

করিয়াছে। ঠিক এই ধরণের কতকগুলি পাথর, বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে কৃষ্ণনগর অধিবেশনে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেগুলি তিনি কোনও প্রাচীন কীর্ত্তি হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন।

আর এক জন কৃষক একটি বাদামের আকারের ছোট পাথর পায়। ইহার রং কমলালেবুর রঙের ন্যায় সুন্দর, এবং ইহার উজ্জ্বল্যও আছে। এটীর উপর কারসী অক্ষরে 'শাহ্ বকবুল আলী' নাম খোদিত আছে। যাদবাবু বলিলেন মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে যাঁহারা পরম ধার্ম্মিক, তাঁহারাই শাহ্ উপাধি পাইয়া থাকেন। সুতরাং এই প্রস্তরখানি যে কোনও মুসলমান সাধু পুরুষের খাটীর পাথর, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এই প্রস্তরখানিও আমাদের নিকট আছে।

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, এখানে প্রাচীন কালে একটি বৃহৎ নগর ছিল। কালের গতিতে সে নগরের 'নাম নকুশা' কালই মুছিয়া দিয়াছে; এখন অতি বৃদ্ধেরাও তাহার অস্তিত্বের কথা বলিতে পারে না। কেহ পিতা পিতামহের মুখে তাহার গল্পও শুনে নাই। তবুও এই প্রাচীন ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরটী যে মুসলমানপ্রধান ছিল, তাহা উক্ত আটীর পাথর, এবং 'তস্বীহ্ দানা'গুলিতেই প্রমাণিত হইতেছে। তদ্ভিন্ন লোকে 'আল্লামাওলা' ও 'মজ্জিদওলা' নামে বোরের দুই পার্শ্বে দুইটি স্থানের নির্দ্দেশ করে। 'আল্লামা' আরবী শব্দ,—অর্থ, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন অতি বিদ্বান্ ব্যক্তি। বোধ হয় কোনও শাস্ত্রজ্ঞ মুসলমান সাধুর বাস হেতু ঐ স্থানের নাম 'আল্লামাওলা' হইয়া থাকিবে। 'আল্লামাওলা'কে লোকে এখন 'আল্লামিজ্জি-ওলা' বলে। 'মজ্জিদওলা' সমাধি বা গোরস্থান। এই দুইটী স্থানও মুসলমান প্রাধান্যের বিশেষ পোষকতা করিতেছে।

যখন মোহাম্মদ বখ্তিয়ার খিলিজী নদীয়া জয় করিতে আগমন করেন, তখন তাঁহার সঙ্গে বহু মুসলমান আসিয়াছিলেন। বখ্তিয়ার নদীয়া জয় করিবার পর, স্বীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন তাঁহার বহু মুসলমানগণ তাঁহার অধীনে বঙ্গরাজ্যে অবস্থান করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন; এবং বখ্তিয়ারের ইচ্ছানুসারে স্থানে স্থানে নগরপত্তন করিয়া, তাঁহারা বসবাস করিয়াছিলেন। এই বেতনা গ্রামে কুঠীর মাঠের ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরটি তাহাদের অন্যতম হইতে পারে। কৃষ্ণনগরের তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, দে-পাড়া গ্রামের নিকট, নিধাদঘর গ্রাম, শুরের নিকট মিকাপুর গ্রাম দুইটিও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত। নিধাদঘর

এখন উৎসন্ন—এই গ্রামের নীচেও পূর্ব্বে জলপ্রবাহ ছিল। স্থলপ্রবাহের ধারে মঙ্গলের মধ্যে সেই প্রাচীন যুগের একটি বৃহৎ পাকা মস্‌জিদ জীর্ণাবস্থায় ছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জমীদার বিপ্রদাস পাল চৌধুরী তাহা ভূমিসাৎ করাইয়া, মুসলমানেরা আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিঞাপুরকে হিন্দুরা মধ্যপুর বা যাহাই বলুন না কেন, উহা বখ্‌তিয়ারের আমলে স্থাপিত মিঞাপুর ব্যতীত আর কিছুই নহে। এখানে পূর্ব্বে ৩৬০ ঘর মিঞার বসতি ছিল, ইহা আমরা অভিবৃদ্ধের মুখে শুনিয়াছি।

বেৎনা গ্রামের এক মাইলের মধ্যে ইটাবেড়িয়া নামক গ্রামের একটি মাঠে, খননকালে পুরাতন ইট বাহির হইয়াছিল। এক জন কৃষক কতকগুলি ইট তুলিয়া ব্যবহার করিয়াছিল, ইহা আমরা শুনিয়াছি। ইহারই নিকট কুলবেড়িয়া গ্রামের মাঠের কয়েক বিঘা আবাদের ক্ষেতে গৌড়ের ন্যায় পুরাতন ইট ছড়ান আছে, ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এই স্থানের চারি দিকে কতকগুলি পুকুরও ছিল; তাহার চিহ্ন এখনও আছে। আমাদের দৃঢ় ধারণা, এই সকল স্থান খনন করিলে, অনেক ঐতিহাসিক সম্পদ আবিষ্কৃত হইতে পারে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের শুভ দৃষ্টি কি সে দিকে পড়িবে না?

বেৎনা গ্রাম কৃষ্ণনগরের পূর্ব্বে তিন মাইলের মধ্যে অবস্থিত। যদি কেহ এ স্থান দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে কৃষ্ণনগর—হাঁসখালী রোডের ধারে দক্ষিণপাড়া গ্রামে গেলেই সহজে বেৎনায় পঁহুছিতে পারিবেন।

শান্তিপুর, নদীয়া। মোজাম্মেল হক্‌।

মৌর্য্য-চন্দ্রগুপ্ত।

মহাবীর আলেকজাণ্ডারের ভারতীয় সাম্রাজ্য মেঘের প্রাসাদের ন্যায় অচিরকালমধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। গ্রীক লেখক জষ্টিন লিখিয়াছেন, চন্দ্রগুপ্ত (Sandrachotus *) আলেকজণ্ডারের ভারত-পরিত্যাগের পর গ্রীক-বিদ্বিজ

* অন্ধকার গুহায় আলোক পতিত হইলে তদভ্যন্তরস্থ সমস্ত বস্তু মুহূর্ত্তমধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। তদ্রূপ, গ্রীক সাহিত্যে ও ভারতীয় চন্দ্রগুপ্ত অভিন্ন প্রতিপন্ন হওয়াতে, অনেক অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারতীয় ঘটনা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্তের সময় অবলম্বন করিয়া তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও

সংঘের স্বাধীনতা-পাশ উন্মোচন করিয়া দেন, কিন্তু অবিলম্বেই এই সকল স্থানের অধিবাসীদের সে স্বাধীনতা দাসত্বে পরিণত করেন। কারণ, তিনি যে সকল প্রজাতন্ত্রকে বৈদেশিক পরাধীনতা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহারা তাঁহার নিজের আধিপত্যের অধীন হয়। নীচকুলে এই নরপতির অভ্যুদয় হইয়াছিল, দেবতার কৃপায় তিনি রাজ্যলাভ করেন। কারণ, তিনি ঔদ্ধত্যবশতঃ আলেকজাণ্ডারের সাতিশয় বিরক্তিভাজন হন। আলেকজাণ্ডার তাঁহাকে বধ করিবার আদেশ দেন। [কি সূত্রে চন্দ্রগুপ্ত আলেকজাণ্ডারের নিকট ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা জষ্টিন লিপিবদ্ধ করেন নাই। আমরা প্লুটার্কের গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি যে, আলেকজাণ্ডার শতক্রতীরে যখন ভারতজয়ভোগ সমাপ্ত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্কল্প করিলে নবীন যুবক চন্দ্রগুপ্ত (Sandrachotus) তাঁহার সমীপে উপনীত হইয়া বলেন, অগ্রবর্ত্তী দেশে অতি সহজেই আপনার বিজয়লক্ষ্মী উচ্ছীন হইতে পারিবে। কারণ, এই দেশের অধিপতি দুশ্চরিত্র, এবং অন্ত্যজ জন্মের জন্য প্রজাকুলের সাতিশয় অবজ্ঞা ও ঘৃণার পাত্র। আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনুমান এই যে, নবীন যুবক যে ভাষায় এই মত পরিব্যক্ত করেন, তাহাই আলেকজাণ্ডারের প্রবল বিরক্তির কারণ হইয়াছিল।] চন্দ্রগুপ্তের বধের জন্য আদেশ প্রদত্ত হইলে, তিনি পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করেন। এই পলায়নকালে একদিন তিনি পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রামার্থ শয়ন করেন। এই কালে একটা বৃহদাকার ব্যাঘ্র সে স্থানে উপস্থিত হয়, এবং তাঁহার শরীরের ঘর্ম্ম লেহন করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু তাঁহাকে কোনও প্রকার আঘাত না করিয়াই চলিয়া যায়। এই অদ্ভুত ব্যাপারে তাঁহার হৃদয়ে দুরাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। তিনি দস্যুদল সংগ্রহ করিয়া ভারতীয়দিগকে সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধারসাধন জন্য প্রবুদ্ধ করেন। অতঃপর আলেকজাণ্ডারের সেনাপতিদের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। চন্দ্রগুপ্ত একটি বৃহৎ বলশালী হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অগ্রবর্ত্তী হন, এবং খ্যাতিলাভ করেন। এই ভাবে ক্ষমতা লাভ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক অধিপতি সেলুকাসের সময়সময়ে রাজত্ব করেন। গ্রীক-লিখিত বিবরণে চন্দ্রগুপ্তের যে বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে, তাহা প্রদত্ত হইল।

চন্দ্রগুপ্ত মগধের অধিপতি ছিলেন ; তিনি ভূপ্রথিত সম্রাট, তাঁহার কীর্ত্তি-

---

পরবর্ত্তী অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার মূলত্ব পরিমাণসাধ্য হইয়াছে, এবং গ্রীক বিবরণের লিখিত পরবর্ত্তী বিবরণের সামঞ্জস্যবিধানের উপায় হইয়াছে। বস্তুতঃ, চন্দ্রগুপ্তের গ্রীক-লিখিত সমস্ত অনুসন্ধান করিয়া এই ঘটনাগুলী অনেক স্থানের ও ঘটনার সংশোধন করিয়াছেন।

রূপ ইতিহাসের পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার প্রথম জীবনের ঘটনাবলী বিচিত্র ও কৌতূহলোদ্দীপক। আমরা এই বিবরণ পরিষ্কার করিবার জন্য তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নন্দ-বংশের বিবরণের উল্লেখ করিতেছি। মহারাজ নন্দ মুদ্রা রাণীর গর্ভজাত ছিলেন। তিনি পরাক্রমশালী অধিপতি ছিলেন, কিন্তু নিষ্ঠুরতা ও দুরাকাঙ্ক্ষাই তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। মহারাজ নন্দ মুদ্রা রাণীর গর্ভজাত বলিয়া আর্য্যশাস্ত্রানুসারে নিজেও শূদ্র ছিলেন, ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রথমা রাণীর গর্ভে আট পুত্র জন্ম পরিগ্রহ করেন। এই আট পুত্র ও মহারাজ নন্দ 'নব নন্দ' নামে খ্যাত হন। মহারাজ নন্দের দ্বিতীয়া রাণী মুরা শূদ্র অপেক্ষাও অধম কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে চন্দ্রগুপ্ত নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। পুরাণশাস্ত্রে রাণী মুরার নাম নাই, চন্দ্রগুপ্ত যে মহারাজ নন্দের পুত্র ছিলেন, তৎসম্বন্ধেও কোনও উল্লেখ নাই। মুদ্রারাক্ষস নামক নাটকে চন্দ্রগুপ্তকে নন্দবংশজাত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু তিনি যে নন্দের পুত্র, তৎসম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট নির্দ্দেশ নাই। পুরাণশাস্ত্রে ও মুদ্রারাক্ষসে ঐরূপ নির্দ্দেশ না থাকিলেও, আমরা বিষ্ণুপুরাণের টীকার উপর নির্ভর করিতেছি। বিষ্ণুপুরাণে চন্দ্রগুপ্তকে মৌর্য্য-বংশের প্রথম-পুরুষরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই অংশের টীকায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে, চন্দ্রগুপ্তের মাতার নাম হইতে তদীয় বংশের মৌর্য্য নামকরণ হইয়াছিল; তাঁহার মাতার নাম মুরা, তিনি মহারাজ নন্দের অন্যতম মহিষী ছিলেন।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের উদ্ভব যে রূপেই হইয়া থাকুক, ইহা নিশ্চিত যে, তিনি চাণক্য কৌটিল্য নামক ব্রাহ্মণের সাহায্যে নন্দ-বংশের ধ্বংসসাধন করিয়া রাজপদ লাভ করেন। এই রাজ্যলাভকালে উত্তর-ভারতের জনৈক রাজা তাঁহাদিগের সহায়তা করেন। মিত্রদ্বয় তাঁহাকে রাজ্যের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিয়া পুরস্কৃত করিবেন, প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কার্য্যউদ্ধারের পর সন্ধি ভঙ্গ করিলেন, এবং সমস্ত দাবীর নিরসন জন্য রাজাকে হত্যা করেন। ইহাতে নিহত রাজার পুত্র মলয়কেতু কুপিত হইয়া প্রতিশোধ লইবার মানসে গ্রীক ও অন্যান্য সৈন্যের সহায়তায় বিপুলবিক্রমে মগধ রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু শত্রুর কৌশলে সম্মিলিত সেনার মধ্যে ঈর্ষা ও কলহ উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে। তখন মলয়কেতু অন্যচিত্তে হীনভাবীকারপূর্ব্বক পলায়ন করেন।

এই পর্য্যন্ত বিবরণ পাঠ করিলে, আমাদের মনে দুইটী প্রশ্ন উপস্থিত হয়।

প্রথম, কি জন্য চন্দ্রগুপ্ত সুদূর পঞ্জাবে আলেকজাণ্ডারের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বদেশের ধ্বংসসাধন করিয়া মগধ রাজ্য হস্তগত করিবার মত তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন? দ্বিতীয়, কি জন্য চাণক্য কৌটিল্য ব্রাহ্মণকুলসুলভ উপস্করণ পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজনীতিক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া নন্দবংশের ধ্বংসাধন জন্য চন্দ্রগুপ্তের সহায়তা করিয়াছিলেন?—

আমরা এই দুই প্রশ্নের উত্তর দিতেছি। কিন্তু এতৎসম্বন্ধীয় উত্তর ইতিহাসসম্মত প্রামাণিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভবপর নহে। জনশ্রুতি ও মূলস্থ গ্রন্থলিখিত বিবরণের উপরই নির্ভর করিতে হইবে। আমরা বৃহৎকথা, দক্ষিণাপথের একখানি অমুদ্রিত পুঁথি * এবং মহাবংশে লিখিত বিবরণ অবলম্বন করিয়া আমাদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিব। এই তিন গ্রন্থের বিবরণে অনেক অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইলেও, বৃহৎকথা ও দক্ষিণাপথের পুঁথির বিবরণ মূলতঃ এক। মহাবংশ-ধৃত চাণক্যের বিবরণ মূলতঃ ঐ দুই গ্রন্থের অনুগামী, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের বিবরণের মূলকথা অন্যরূপ। আমরা পরস্পরবিরোধী বৃত্তান্ত সকলের সামঞ্জস্যবিধান করিয়া এইরূপ নির্দ্ধারণ করিতে পারি যে, চন্দ্রগুপ্ত মহারাজ নন্দের দ্বিতীয়া রাণীর পুত্র ছিলেন; বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের উৎপীড়ন করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাদের ধ্বংসসাধন জন্য কৃতসংকল্প হন, এবং চাণক্য অতিশয় অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া তাহার প্রতিশোধ লইবার মানসে তাঁহার উত্তরসাধকরূপে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করেন। চাণক্যের অবমাননা ও লাঞ্ছনার কারণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি অসাধারণ ধীশক্তিশালী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্যের অভাব ছিল। একদা চাণক্য রাজপ্রসাদ-আকাঙ্ক্ষায় রাজসভায় গমন করিয়া উচ্চ আসনে উপবেশন করেন। এই সময় রাজা তথায় প্রবেশ পূর্ব্বক প্রথমে ভগ্নহৃদয়তঃ তাঁহাকে কদাকার দেখিয়া অপ্রীত হন। তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের আসনে উপবিষ্ট দেখিয়া ক্রোধে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন। অতঃপর তিনি চাণক্যকে কটুবাক্যে তিরস্কার করিয়া রাজসভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। চাণক্য এই ভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠেন, এবং মস্তকস্থিত শিখার বন্ধন উন্মোচন করিয়া শপথ করেন,—"উদ্ধত ও মূর্খ নন্দবংশের ধ্বংস করিব, আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত এই শিখা আর বন্ধন করিব না।"

অসাধারণ কূটনীতিবিশারদ চাণক্যের এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইয়াছিল।

* Hindu Tales নামে ইহার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

উৎকট সাধনায় নন্দবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। চন্দ্রগুপ্ত মগধ সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়া মৌর্য্য উপাধি গ্রহণ করেন। বিষ্ণুপুরাণের টীকাকারের মতে, চন্দ্রগুপ্তের মাতা মুরা হইতে মৌর্য্য উপাধি নিষ্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বোক্ত হস্তলিখিত পুঁথিতে মুরা ও চন্দ্রগুপ্তের কথা অন্য আকারে প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা এখানে সে বিবরণ প্রদান করিতেছি।

মহারাজ নন্দের দুই মহিষী ছিলেন। প্রথমা মহিষীর নাম ছিল সুনন্দা, দ্বিতীয়ার নাম ছিল মুরা। মুরা শূদ্রকুলজাতা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার দেহকান্তি মনোহর ও চরিত্র মধুর ছিল। একদা মহারাজ নন্দ মহিষীদ্বয় সহ মিলিত হইয়া এক জন সাধু সন্ন্যাসীর সেবা করেন। মহারাজ নন্দ সাধুর পদ প্রক্ষালন করিয়া সেই জল মহিষীদ্বয়ের গাত্রে ছিটাইয়া দেন। ইহার নয় ফোঁটা প্রথমা রাণীর কপালে, এবং এক ফোঁটা দ্বিতীয়া রাণীর কপালে পতিত হয়। মুরা এই জলবিন্দু অতি শ্রদ্ধাসহকারে দেহে লিপ্ত করেন। তাঁহার ব্যবহারে সন্ন্যাসী প্রীত হন। অতঃপর মুরার গর্ভে এক গুণবান পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ঐ পুত্র মৌর্য্য নামে খ্যাত হন। প্রথমা মহিষী একটী মাংসপিণ্ড প্রসব করেন। প্রধান মন্ত্রী রাক্ষস ঐ মাংসপিণ্ড নয় খণ্ডে বিভক্ত করিয়া একটি তৈলপাত্রে রাখিয়া দেন; এবং তাহা হইতে নয় পুত্র উদ্ভূত হয়। রাজা বৃদ্ধ বয়সে এই নয় পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। তৎকালে মৌর্য্য সৈনাপত্য প্রাপ্ত হন। মৌর্য্যের শত পুত্র ছিল। তাঁহার এক পুত্রের নাম চন্দ্রগুপ্ত। চন্দ্রগুপ্ত অসাধারণ গুণশালী ছিলেন। এই কারণ নব-নন্দ ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাদিগকে হত্যা করেন, কেবল চন্দ্রগুপ্তের প্রাণবায়ু বহির্গত হয় নাই। এমন সময়ে সিংহল দেশের রাজার নিকট হইতে একটি পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ আগত হয়। এই সিংহ মোমে নির্ম্মিত ছিল। কিন্তু নির্ম্মাণকৌশলে তাহাকে জীবন্ত বলিয়া বোধ হইতেছিল। সিংহলদেশীয় রাজা লিখিয়াছিলেন,—যদি আপনার কোনও পারিষদ পিঞ্জরের মুখ না খুলিয়া সিংহকে দৌড় করাইতে পারেন, তবে তাঁহাকে আমি তীক্ষ্ণধী বলিয়া স্বীকার করিব। নব-নন্দ স্থূলবুদ্ধিবশতঃ এই লিপির মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে অসমর্থ হইলেন। তখন আসন্নমৃত্যু চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন,—আমার জীবন রক্ষা করিলে এই কাজ করিতে পারি। নব-নন্দ সম্মত হইলে তিনি একটি লৌহশলাকা উত্তপ্ত করিয়া, তদ্দ্বারা সিংহের গাত্র স্পর্শ করিলেন। অচিরে মোম-নির্ম্মিত সিংহ গলিয়া গেল।

নবনন্দ তাঁহাকে প্রাণদান করিলেন। অতঃপর চন্দ্রগুপ্ত একদিন এক জন ব্রাহ্মণের দর্শনলাভ করেন। ব্রাহ্মণ তৎকালে বলপূর্ব্বক কুশস্তম্বের উচ্ছেদ করিতেছিলেন, কারণ কুশাগ্রে তাঁহার পদতল ক্ষত হইয়াছিল। এই সময় হইতে উভয়ের মধ্যে সৌহৃদ্য জন্মে। এই ব্রাহ্মণের নাম ছিল বিষ্ণুগুপ্ত। তাঁহার পিতার নাম ছিল চাণক। এ জন্য তিনি চাণক্য নামে পরিচিত ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্যের মধ্যে সৌহৃদ্য স্থাপিত হইবার পর, চাণক্য নবনন্দের হস্তে পূর্ব্ববর্ণিতরূপ দারুণ লাঞ্ছনা ও অপমান ভোগ করেন। ইহার ফলে তাঁহাদের সৌহৃদ্য প্রগাঢ় হয়। দুই জনে সাধনা করিয়া নন্দবংশের ধ্বংস-সাধন করেন।

বিষ্ণুপুরাণের টীকার সহিত উক্ত বিবরণের অনৈক্য থাকিলেও, মহারাজ নন্দের দ্বিতীয়া মহিষী মুরা হইতে মৌর্য্য-বংশের উদ্ভব লিখিত হইয়াছে। কিন্তু মহাবংশে অন্যরূপ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

কপিলবাস্তুর শাক্য-রাজ্য শত্রুর আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, কতিপয় শাক্য সামন্ত হিমালয়ের কোনও বিজন প্রদেশে প্রস্থান করিয়াছিলেন। তথায় অবস্থান-পূর্ব্বক তাঁহারা এক সুন্দর নগর নির্ম্মাণ করিয়া এক নূতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। দূর হইতে শাক্য জাতির এই নবনির্ম্মিত রাজ্য বিচিত্র ময়ূরসদৃশ মনোভিরাম ছিল বলিয়া লোকে ইহাকে ময়ূর-নগর নামে অভিহিত করে। ময়ূরনগরবাসী শাক্য জাতি মোরিয়া বা মৌর্য্য নামে সমগ্র জম্বুদ্বীপে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। কিন্তু কালক্রমে মৌর্য্য জাতির ভাগ্যলক্ষ্মী চঞ্চলা হইলেন। কোনও এক প্রবল পরাক্রমশালী নরপতি ময়ূরনগরের সমৃদ্ধির বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অগণিত সেনা সহ উক্ত রাজ্য আক্রমণ করিলেন, এবং সেই যুদ্ধে বহুসংখ্যক মৌর্য্য নিহত হইলেন। এই সময় মৌর্য্য রাজমহিষী গর্ভবতী ছিলেন। গর্ভস্থ সন্তানের রক্ষার নিমিত্ত তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কৌশলক্রমে তাঁহারা ময়ূরনগর হইতে পলায়নপূর্ব্বক পুষ্পপুরে (পাটলিপুত্রে) আগমন করিলেন, এবং তথায় অবস্থান করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে রাজমহিষী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। পাছে মৌর্য্যরাজবংশধর জীবিত আছে জানিয়া বিপক্ষদল পুত্রের প্রাণসংহার করে, এই আশঙ্কায় মহিষী পুত্রকে একটি পাত্রে রক্ষাপূর্ব্বক জনৈক রাখালের গোশালার নিকটে গোপনে রাখিয়া দিলেন। শিশুর রোদন শ্রবণ করিয়া রাখাল উক্ত স্থানে আগমন-পূর্ব্বক তাহার সুন্দর রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া স্নেহরসে আপ্লুত হইল। সে

সেনার যুদ্ধনিপুণতার শাসন করিতে লাগিল, এবং নন্দবংশের রাজত্বের শেষ হইল ৩২৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে। চন্দ্রগুপ্ত রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া ভারতের ভূমিপথে পরিভ্রমণ করেন। তিনি নন্দবংশের অত্যাচার-উৎপীড়নে ব্রতী ছিলেন, এবং তজ্জন্য এক জন উপযুক্ত রাজপুরুষের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত উপযুক্ত পাত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেন। তাঁহার ললাটে রাজটীকা প্রদত্ত হইল।

এই সকল বিভিন্ন বিবরণের মধ্যে বিষ্ণুপুরাণের উক্তিই গ্রাহ্য। একাধিক স্থলে চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশজাত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। কোনও গ্রন্থেরই সেলুকস্-দুহিতার সহিত চন্দ্রগুপ্তের বিবাহের বিবরণ বা আভাস দেওয়া হয় নাই। কিন্তু ইহার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। চন্দ্রগুপ্তকে নন্দবংশজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও, তাঁহার মগধরাজ-রক্ত সম্বন্ধে আপেক্ষিকতা প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যায়। অর্থাৎ, চন্দ্রগুপ্ত বৈদেশিক সম্রাটের নির্য্যাতন-কালেই জন্ম গ্রহণ করেন।

ক্রমশঃ চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের সাহায্যে রাজপদ লাভ করিয়া প্রবলপ্রতাপে রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি মগধ সাম্রাজ্যের সঙ্গে বিপুল সৈন্যবলেরও অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে এই সৈন্যবল বর্দ্ধিত হয়। সেলুকসের তিন হাজার রণহাতী সৈন্য, নন্দ রাজের বহু হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক ও এবং বহুসংখ্যক রথ ছিল। এই বিপুল সৈন্যের সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র উত্তর-ভারতে বিজয়-পতাকা উড়ীন করেন; বোধের পর বেলা তাঁহার করতলস্থ,—পদানত হয়। ঐ ইতিহাসিক কালে সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান সার্ব্বভৌম সম্রাট্। তাঁহার বিজয়িনী শক্তির মহিমায় বঙ্গোপসাগর হইতে আরব সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত বুলিয়ান ভূখণ্ড এক সূত্রে গ্রথিত হইয়াছিল।

যে সময় চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার অপরিমিত বাহুবল ও চাণক্য কৌটিল্যের মহাপ্রাণ ভারতবাসীর পঠনের জন্য মহাসাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন, তখন ধীরে ধীরে এক জন গ্রীক-বীর পূর্ব্বদিক্ ও মধ্য-এসিয়ায় এক অতিমহৎ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া পার্থিবকুলে বরেণ্য হইয়াছিলেন, এবং ভারতবর্ষও নবীন গ্রীক অধিকারে উদ্ধারসাধনে ব্রতী হইয়াছিল।

এই বীরপুরুষের নাম সিলুকাস নিকেটর। নিকেটর শব্দের অর্থ—বিজেতা। সমাধীর শিলালিপি হইতে, তাঁহার ভূবিজয়ে সহায়-

---

১ সেলুকস্-দুহিতার বৃত্তান্ত।

জ্যের অধিকার লইয়া গ্রীক সেনাপতিবৃন্দের মধ্যে ঘোর আত্মদ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময় এসিয়ায় আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য দুই জন গ্রীকবীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছিলেন। এক জনের নাম এণ্টিগোনাস; অপর জনের নাম সেলুকাস। উভয় পক্ষের বহু ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর অবশেষে সৌভাগ্যলক্ষ্মী এণ্টিগোনাসের প্রতি প্রসন্ন হন। তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীর সমস্ত ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করিয়া তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করেন। কিন্তু সেলুকাস কতিপয় বৎসরের মধ্যেই পুনর্ব্বার শক্তিশালী হইয়া উঠেন, এবং অচিরে ব্যাবিলনে আধিপত্য স্থাপন করেন। সেলুকাস নিকাটর সিরিয়ার নরপতি বলিয়া বিদিত ছিলেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমগ্র পশ্চিম ও মধ্য এসিয়ায় তাঁহার বিজয়-লব্ধ আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল। তদীয় রাজ্যের পূর্ব্ব দিকে ভারত-সীমা বিস্তৃত ছিল। এই কারণ তিনি স্বভাবতঃই ভারতবর্ষের অধিকারলাভে লোলুপ ছিলেন। তিনি ৩০৫ খৃঃ পূঃ অব্দে বিপুল বাহিনী লইয়া সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হন। তিনি স্বীয় প্রভু আলেকজাণ্ডারের ন্যায় যুদ্ধের পর যুদ্ধে বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া, বিজয়গৌরবে দ্রুতগতিতে ভারতবক্ষ বিমর্দ্দিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু এবার মহাবীর্য্যশালী চন্দ্রগুপ্তের অলোকসামান্য বাহুবলে গ্রীক সৈন্যের পথ কণ্টকাকীর্ণ হইয়াছিল। সে কণ্টকে আহত হইয়া তাহারা বলক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। গ্রীক নায়ক সেলুকাস অকীর্ত্তিকর সন্ধি স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করেন। এই সন্ধি অনুসারে গ্রীকরাজ-দুহিতা চন্দ্রগুপ্তের সহিত পরিণীতা হন। বর্ত্তমান হিরাট, কাবুল, কান্দাহার প্রভৃতি স্থান তাঁহার হস্তগত হয়। চন্দ্রগুপ্ত রাজ্য ও রাজদুহিতার বিনিময়ে গ্রীক অধিপতিকে পাঁচ শত রণহস্তী উপঢৌকন দেন। এই সময় হইতে মেগাস্থিনিস গ্রীকদূত-রূপে চন্দ্রগুপ্তের সভায় অবস্থিতি করেন। সেলুকাসের ভারত হইতে প্রস্থানের পর চন্দ্রগুপ্ত ছয় বৎসর জীবিত ছিলেন। সেলুকাসের ভারত-অভিযানের পূর্ব্বে তিনি বার বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং, তাঁহার রাজত্ব অষ্টাদশ বৎসর কাল স্থায়ী ছিল। এই সময়ের মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত প্রবল উৎসাহ, অটল অধ্যবসায়, ধীরতা ও রণকৌশলের বলে পঞ্জাব ও সিন্ধু দেশ হইতে গ্রীক সৈন্যের উচ্ছেদসাধন করেন; সেলুকাসের গর্ব্ব খর্ব্ব করেন, এবং বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড স্বাধিকার-ভুক্ত করেন। চন্দ্রগুপ্ত আপন অলোকসামান্য অবদানে পৃথিবীর রাজকুলে বরেণ্য হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমরত্ব লাভ করিয়াছে। এরূপ সুবিশাল সাম্রাজ্যের শাসন সংরক্ষণ

অর্থাৎ যে তীক্ষ্ণ রাজনীতিজ্ঞতা, কঠোর তেজস্বিতা ও বিপুল শক্তিশালি আবশ্যক, চন্দ্রগুপ্ত সেই সকল সম্পদের অধিকারী ছিলেন।

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে চন্দ্রগুপ্তের শাসনবিবরণ মেগাস্থিনিসের 'ইণ্ডিকা'য় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তাঁহার দরবারে অবস্থিত গ্রীকরাজদূত মেগাস্থিনিসের লিখিত বিবরণে আমরা চন্দ্রগুপ্তের মানসিক সম্পদ ও রাজবৈভবের চিত্র দেখিতে পাইতেছি।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

বিক্রমপুর। এই সংখ্যার প্রথমেই লর্ড রণাল্ডসের একখানি ছবি আছে! 'মঙ্গলাচরণ' একটি গল্প। ইহার বিশেষত্ব এই যে, প্রসিদ্ধ যোগী শ্রীসোঽহং স্বামী ইহার রচয়িতা। সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসীর মনেও স্নেহের ছবি জাগিয়া আছে। 'তত্তস্ত কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়ঃ' স্নেহের পক্ষেও খাটে। শ্রীসোঽহং স্বামীর 'স্মার্ত্তের বৈধব্যবিধান' আমরা বাঙ্গালীকে মন দিয়া পড়িতে বলি। সোঽহং স্বামী স্মার্ত রঘুনন্দনের ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়াছেন। পায়রার খোপে ভাম ঢুকিলে যেমন হয়, সেইরূপ অনেক ঝট্-পট্ শব্দ শুনিতে পাইব। শ্রীমুকুলচন্দ্র দের 'পানের কথা' অত্যন্ত উপভোগ্য। ইনি 'কথা ভাষার চরমে উঠিয়াছেন। 'মিঃ হারার প্রকাণ্ড হাবেলীর ভেতর আমরা ডেরা-ডাণ্ডা ফেলে গট্ হয়ে বসে গেছি।' তাহার পরেই—'এ একটা কোটের "প্রবেসোধছবি" অথচ রঙ্গীন রঙ্গমহল।' আবার, বিস্তর দাসদাসী—সবাই তটস্থ, এক পায়ে আটপহর খাঁড়া।' 'খাঁড়া' বোধ হয় 'পাড়া'। 'কিছু চাইতে হয় না, আবশ্যকীয় আসবাব পত্র আপনি এসে হাজির।' এখন প্রশ্ন এই যে, 'দরকারী'কে নির্ব্বাসিত করিয়া, 'আবশ্যক'কে ডাকিয়া আনিয়া, তাহার ঘাড়ে একটা 'ঈয়'-রূপ সঙ্গীন চড়াইয়া দিবার কারণ কি? সংস্কৃত আবশ্যককে ভ্রষ্ট করিবার হেতু কি? 'এক ঢিলে দুই পাখী মারা'ই কি ইহার উদ্দেশ্য? মুকুল-চন্দ্রের রচনায় অনেক নূতন শব্দ আছে—'মনটা বিলক্ষণ "তরতাজা" হ'য়ে উঠেছে।' 'চার' হইতেছে 'চারি' কেন? মুকুলচন্দ্র জাপানের ছবি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—'ছবিটাকে দুচারি "আঁচর" দেটে দিবি, ফুটিয়ে তোলে।' আর আমাদের কলিকাতার ছবি—জাপানের তুলনায় নেহাৎ হেলেমেয়ে ভর্ত্তি গোছের।' অবনীন্দ্রনাথের ভারতীয় চিত্রকলা পড়িলেই ইহার মর্ম্ম। 'এক-মারা বিদ্যা বটে। মুকুল শিখিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ 'এমনই দয়া করে কাছে টেনে নিয়েছেন, তাই গুরুদেবকে পাওয়ার মত পেয়েছি। আমার জীবন ধন্য হয়ে গেছে।' এখন মাথাটা ঠিক থাকিলে হয়। শ্রীকুলচন্দ্র দে 'খাণ্ডব' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের বন্দনা করিয়াছেন; নমুনা—'ধন্য পেয়ার্ স্নীবাবট্!' হকুমার, সুকোমল 'পেলব' শব্দটি মাঠে নয়, বাটে মারা কেন? 'কালিদাস' শিরীষের বিশেষণে 'পেলব' ব্যবহার করিয়াছিলেন—

হইলেও তাহার দেহযন্ত্রের নাশ হইতে পারে। পাকস্থলী বলবান্ হওয়ায় দেহ পুষ্ট হইতেছে। কিন্তু মস্তিষ্ক বয়সানুরূপ বর্দ্ধিত হওয়ায় যন্ত্রের আপেক্ষিক দুর্ব্বলতা ঘটিতেছে। মস্তিষ্কের আপেক্ষিক দুর্ব্বলতা কি হয়? রক্তের মধ্যে যে সকল শ্বেতবর্ণ রক্তকীট আছে, তাহারা শরীরের চলাচল করে; মস্তিষ্কের কোষ সকল দুর্ব্বল; সুতরাং ঐ রক্তকীট উহাদিগকে খাইয়া ফেলে, অথবা অন্য প্রকারে নষ্ট করে। মস্তিষ্ক পদার্থ ধ্বংসমুখে পতিত হয়। সুতরাং পরিণামে মৃত্যু নিশ্চিত হইয়া থাকে। কেবল মস্তিষ্কেরই এইরূপ হয়, তাহা নহে। সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ নানা সময়ে নানা কারণে শরীরের নানা অংশে দুর্ব্বলতা উৎপন্ন হয়। তখনই ফ্যাগোসাইট প্রভৃতি রক্তকীট (যাহারা এককোষ জীব, অমর, তাহারা) আমাদিগের দেহযন্ত্র সকল মূলোপরি নষ্ট করিতে হয়। রক্তকীট সকল একরূপ নহে; কেহ অন্য পীড়ার বীজকে দেহে প্রবেশ দেয় না, অথবা প্রবেশ করিলে তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিবার প্রাণপণে চেষ্টা করে। কেহ বা দেহরক্ষক রস প্রস্তুত করিয়া পীড়া দমন করে। তাহারা এমন সুহৃৎ, তাহাদিগেরই কেহ কেহ দেহযন্ত্র সকলকে দুর্ব্বল পাইয়া ফেলিতে ত্রুটী করে না। যে কারণেই হউক, দেহযন্ত্রে পচন ধরিলেই উহাদিগের ফলাহার উপস্থিত হইল। সুতরাং উহাদিগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে না পারিলে, মৃত্যু নিশ্চিত; পারিলে নিশ্চিত। এ বিষয়ে পরে আরও বিশদ করিয়া বলিবার চেষ্টা করিব। বার্দ্ধক্যের প্রতিরোধ কি অমর অথবা অত্যন্ত দীর্ঘায়ুঃ করা যায়? এ প্রশ্নের আলোচনার পূর্ব্বে আরও কয়েকটী বিষয় সংক্ষেপে বলা আবশ্যক হইবে।

শ্রীশশধর রায়।

"(1) The ... Phagocytes, macrophages which exist every where ... the higher anatomical elements would destroy and devour them ... whether ... vitality diminishes ... to be born, for example ... Phagocytes ... would ... organic the higher elements ... succeeding themselves.—*Metchnikoff's Life and Death*, p. 30-31.

... ...

'পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং
শিরীষপুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিণঃ।'

এক দিন প্রমথ চৌধুরী [এখন সবুজ পত্রের চাবী] বলিয়াছিলেন, সেকালে সংস্কৃত শব্দের অর্থে যে shades ছিল, এখন আমরা তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছি। কোমল ও পেলব উভয় শব্দই এখন কোমল অর্থেই ব্যবহৃত হয়। কালিদাস যদি লিখিতেন 'পদং সহেত ভ্রমরস্য কোমলং', তাহা হইলেও ভুল থাকিত। কালিদাসের রচনায় অপ্রচলিত শব্দ নাই বলিলেও চলে। অথচ তিনি পেলব অপেক্ষা অধিক প্রচলিত ও শ্রুতিমধুরবিশিষ্ট কোমল শব্দ পরিত্যাগ করিয়া শিরীষের বিশেষণে 'পেলব' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। হয় ত যাহা কোমলতর, তাহাই পেলব। শিরীষ এত সুকুমার যে, 'কোমলে' তাহার কোমলতা ব্যক্ত হয় না—হয় ত তাই তিনি পেলব ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই পেলব আজ 'বাটের' বিশেষণে ব্যবহৃত হইল। 'অপূর্ব্ব কি ভবিষ্যতি।' শুনিয়াছি, এক কিশোরী 'সীতার বনবাস' পড়িয়া স্বামীকে 'মদনাহদয়েষু' বলিয়া চিঠি লিখিয়াছিল। তার পর 'মুক্তাখচিত মুক্ত মাঠ।' 'মুক্তার' সঙ্গে 'মুক্তর' যেন অনুপ্রাস হইয়া গিয়াছে। কবি কল্পনায় মাঠে মুক্তা ছড়াইয়া দিয়াছেন, মালা ছিঁড়িয়া কি না বলিতে পারি না। 'মুক্তি উঠিল বাঁশীর কুঞ্জ'—মুক্তি কি, তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না। তিনি [রবি বাবুর একটি বিশেষণ দিয়াছেন,—'গীমপ।' অর্থাৎ, গীঃ অর্থাৎ বাণীই যাঁর রূপ। ইহা অপ্রস্তুত প্রশংসা। বাকাই রবিবাবুর রূপ নয়। তিনি অনেক ভাবের চৌধুরী হাকাইয়াছেন। তাঁর শেষ সর্ব্ব শেষের' বাহাদুরটুকু পাঠকদিগকে উপহার দি—'কানাডার ভাজে নাহি দিবে ধরা।' এই অনুপ্রাস-সৃষ্টির বাহাদুরী কাহার? কবির? না, কানাডার ভাকার? 'মনের বাঁশী' গল্পটির নাম অযথা হইয়াছে। 'খেওয়া-ঘাটে শ্রীনৃ-দ্রেচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর একটি কবিতা। রবি বাবু বলেন 'খেয়া'। ইনি বলিতেছেন, 'খেওয়া'। সমগ্র কবিতার মধ্যে ইহাতেই নূতনত্ব দেখিলাম। শ্রীনিবারণচন্দ্র মজুমদারের 'লতাকস্তুরী' নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। লেখক বলেন, 'লতাকস্তুরীর চাষও পাট অপেক্ষা কম মূল্যবান হইবে বলিয়া মনে হয় না।' ঠিক পাটের মতই ইহার চাষ করিতে হয়। অভিজ্ঞগণ পরীক্ষা করুন। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন 'কালবৈশাখী'তে প্রশ্ন করিয়াছেন, 'কি সুরে আজ সুর করি পাগলা হাওয়ার গান?' প্রশ্নের উত্তর পাইবার পূর্ব্বেই তিনি উপযোগী সুরটি জমাইয়া তুলিয়াছেন। শ্রীপদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের 'কাছাড়ের বিক্রমপুর' সুখপাঠ্য। কাছাড়ে একটি বিক্রমপুর আছে। লেখক সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত 'গোধূলির তারায়' লিখিয়াছেন, কোনও বিরহিণী নারী

'নিতি সাঁঝে জ্বালি দীপ পথ চেয়ে রয়
বঁধিত আসিবে ভবে?'

সন্ধ্যা-তারাটি সেই দীপ! দ্বারাপথ দিয়া বাইক চড়িয়া বন্ধিত আসেন কি না, তাহা অপ্রকাশ। sublime-কে ridiculous করিলে বদ্ধ কবিতা হয় না।

উদ্বোধন। বৈশাখ।—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মাইতির 'সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়' প্রবন্ধ পাঁচ মূলের সাঁচির। ইহার মূল বক্তব্য খুঁজিয়া পাইলাম না। শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবীর 'বৈরাগী' কালীর চরণে নিবেদিত। প্রত্যাবর্ত্তন? এ ধরণের কবিতা প্রিয়ম্বদা বোধ হয় পূর্ব্বে লেখেন নাই। 'শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ

অবশ্য শ্রীযুক্ত অনেকগুলি গল্প আছে। 'শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের মেমোরিয়াল' প্রবন্ধে 'মেমোরিয়াল' ও 'কারমাইকেলের পত্র মুদ্রিত হইয়াছে। এই কারমাইকেলের পত্র হইতে আমরা একটু উদ্ধৃত করিলাম—

"বিশ্বনিয়ন্তার দরবারে মিশন সম্বন্ধে আমার কয়েকটি কথা যে কোনরূপে তাহার সঙ্কোচশীলতার কারণ হইয়াছে, ইহা শুনিয়া আমি বড়ই দুঃখিত হইলাম। মিশন ও মিশনের সভ্যগণের উপর অভিযোগ আনা আমার উদ্দেশ্য ছিল না; * * আমি জানি, মিশনের কাজ রাজনীতিক-অভিপ্রায়-শূন্য, এবং ইহার জনসমাজের সেবাকার্য্য সম্বন্ধে আমি ভাল ছাড়া আর কিছুই শুনি নাই।

"শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ মিশনের যাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য, তাহার সহিত আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে।"

সন্দেশ। বৈশাখ।—'সন্দেশ' পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিল। চারি কোটী বাঙ্গালীর মাতৃভূমি বাঙ্গালায় শিশুপাঠ্য সাহিত্যে 'সন্দেশ' ভিন্ন আর কোনও মাসিক নাই। 'সন্দেশ' আমাদের সবেধন নীলমণি'। সন্দেশ চিরজীবী হউক। এই সংখ্যায় দেখিতেছি, শ্রীসুকুমার রায় 'সন্দেশে'র সম্পাদক হইয়াছেন। আশা করি, তাঁহার চেষ্টায় 'সন্দেশ' আরও উৎকর্ষ লাভ করিবে। এই সংখ্যায় প্রথমেই যে ছবিখানি আছে, তাহার বর্ণনা ও ছাপা, দুই-ই সুন্দর। স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের 'গ্রামের গান' শিশুদের উপযোগী। 'এক বহুরের রাজা' নামক গল্পটি চলনসই। শ্রীকুলদারঞ্জন রায় মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে 'অকীর্ত্তিচন্দ্রের গল্পটি শিশু পাঠকদের উপহার দিয়াছেন। শ্রীহরিনয় রায়ের 'সুনের কথা' বেশ হইয়াছে। 'গ্যালিলিও' উল্লেখযোগ্য। স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর 'কাঁকড়া' পড়িয়া সন্দেশের পাঠকগণ আনন্দের সহিত শিক্ষা লাভ করিবে। অল্পবয়স্ক পাঠকদের জন্য উপেন্দ্র বাবু সহজ ভাষায় গল্পের ছলে চিত্তাকর্ষক করিয়া বৈজ্ঞানিক বিষয় লিখিতে পারিতেন। এ বিষয়ে তাঁহাকে অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালীর উপকারপুরুষের জন্য তিনি সাহিত্যে যাহা করিয়া গিয়াছেন, সেজন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। শিশু সাহিত্যের সমৃদ্ধিবিধানেই তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন; তাহাদের জন্য লেখা, তাহাদের জন্য আঁকাই তাঁহার ব্রত ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে শিশু-সাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। রায়-পরিবারের অনেকেই তাঁহার পদাঙ্কের পথিক হইয়াছেন। আমার কথা বটে। 'চীনে পট্‌কা' নামক গল্পটি পড়িয়া ছেলে মেয়েরা এক-হাসিবে। 'ঘোড়ার জন্ম' আর একটি উপাদেয় বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ। আশা করি, বাঙ্গালা দেশে 'সন্দেশ' উপযুক্ত সমাদর লাভ করিবে।

উপাসনা। বৈশাখ।—এই সংখ্যায় উপাসনার শীর্ষে ছাপা হইয়াছে,—'Under the distinguished patronage of the Hon'ble Maharaja Sir Manindra Chandra Nandy K. C. I. E.'—মহারাজের নাম যখন ছাপা হইল, তখন 'উপাসনা' যেন তাঁহার নামের উপযুক্ত হয়। শ্রীনলিনীকুমার চক্রবর্ত্তীর 'নববর্ষ' নামক কবিতাটি কোন গুণে 'উপাসনা'য় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিল? নববর্ষ 'দ্যুলোকের রাণী এসেছে ভূলোকে'—এ তত্ত্ব অবশ্য নূতন। গল্পটি আছে,—'সম্পাদক শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্. এ. প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার।' ও ব্যাপার হইলে কোনও কথা ছিল না, কিন্তু প্রেমচাঁদ এমন কবিতা-কাণ্ড হইতে পারে, তাহা জানিতাম না। 'প্রান্তিনাশের' উপাসনার কবিতা ছাপা হয়। সম্পাদক

এক জন সমালোচক, সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে সমীক্ষা ও পরীক্ষা করিয়া বেড়ান নিজের কাগজে কাণা খোঁড়া হাবা বোবা কবিতার হাট বসাইতে তাঁহার লজ্জা হয় না? শ্রীবিমলকুমার সরকারের 'ইণ্ডাস্থিয়ানের মহাপশ্চিম প্রদেশ' উল্লেখযোগ্য। শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের 'তারি' অত্যন্ত কাঁচা রচনা। 'সমাজ প্রসঙ্গে' শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজে সদাচারের সমর্থন করিয়াছেন। হিন্দুরা তাঁহার সমর্থন করিবে। শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'অমূল্য জীবন' সামুদ্র কবিতাটির ভাব নূতন। ষষ্ঠ ও শেষ চরণে যতিভঙ্গ হইয়াছে। 'রহস্যময়ীর জীবনকথা' চলিতেছে। 'কালীদাস রায়ের 'কবির জাতি' ও 'চাতক' 'পাকা ঘুঁটী কাঁচাইবার' উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 'নিষ্ফলের মাষ্টার' একটি চলনসই গল্প। 'বিশ্ববাণী' প্রবন্ধে নব্য বাঙ্গালীর উচ্ছ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। লেখক শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত 'কোটেশনে'র প্রতি বড় নির্দ্দয়। 'নাস্য পন্থা' হইতে দুইটি বিসর্গ কোথায় ফেলিয়া দিয়াছেন! তার পর, 'মা হিংস নীতি'। রবীন্দ্রনাথ জাপানীদিগকে বলিয়াছিলেন, 'তোমরা ইউরোপের সভ্যতার মজিও না।' 'আজ ইউরোপ ভাল করিয়াই প্রমাণ করিতেছে,—তাহাদের এত সাধের সভ্যতা পূর্ণগাত্রায় বিফল হইয়াছে।' কলিক তার 'অক্সফোর্ড রিভিউ' নামক খৃষ্টান-মণ্ডলী হইতে প্রকাশিত 'এপিফেনী' নামক পত্রে এক জন লেখক 'রবি বাবুর এই বক্তৃতা পড়িয়া' 'কয়েকটি সারালো ও ধারালো কথার অবতারণা করিয়াছেন।' অতুল বাবু তাহার সারসংগ্রহ ও সমর্থন করিয়াছেন। 'এপিফেনী'র লেখক বলিতেছেন,—

'মানিলাম ইয়ুরোপীয় সভ্যতা বিফল হইয়াছে; মানিলাম ইয়ুরোপীয়রা দেশপ্রেমের নামে দিগ্বিদিক পিশাচ-লীলা করিতেছে * * মানুষের কায়িক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য চরমব্যবস্থা করিয়াও বর্ত্তমান ইয়ুরোপীয় ও মার্কিন সভ্যতা যে আসলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে, তা আমরা একশোবার স্বীকার করিতেছি। সভ্যতার বিফলতা বুঝিতে যদি এই ধরি যে, মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ অনুসারে জীবন ধারণ হইতেছে না; জাতিতে জাতিতে সদ্ভাবে থাকিয়া মহামানবের চরমবিকাশের সহায়তা হইতেছে না; জাতির মধ্যে শ্রেণী, দল ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরে পরস্পরের সুখ-সুবিধার মুখ চাহিতেছে না; তাহা হইলে অস্বীকার করা যায় না যে বর্ত্তমান প্রতীচ্য সভ্যতা বিফল হইয়াছে। * * * কবি রবীন্দ্রনাথ ভাববাজ্যের এক জন নায়ক, তাঁর উক্তির তলে তলে যদি এই ইঙ্গিত থাকে যে (সম্ভবতঃ তাই-ই) ভারতীয় বা এসিয়ার যে কোন প্রাচীন সভ্যতা সার্থক হইয়াছে, আর ইউরোপীয় সভ্যতা নিরর্থক ও বিফল হইয়াছে, তাহা হইলে আমাদের একটু ঝগড়া করিতে হয়। আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে গোটাকতক কথা শুনাইব। (ক) যুদ্ধ কি ভারতবর্ষের স্বর্ণযুগেও হয় নাই? (খ) কুরুক্ষেত্র সমরটা কি একটা পৈশাচিক কাণ্ড নয়? * * বর্ত্তমান যুদ্ধে যে ঘোর নির্দ্দয়তা, নৃশংসতা ও পশুত্বের অভিনয় কবি দেখিতেছেন, তাহা কি তাঁহারই দেশের সত্যযুগের যুদ্ধে ঘটে নাই? তার পর আধুনিক ভারতসভ্যতা—প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত যত যুদ্ধ, যত যুদ্ধ, ইহার এক ভারতে হইয়াছে এমন বোধ হয় সমগ্র ইয়ুরোপেও হয় নাই। ব্রাহ্মণ সভ্যতাকে নাকি জগতের সর্ব্ব সভ্যতার সেরা বলিয়া গর্ব্ব করা হয়—আজ ৪০০০ বছর ধরিয়া এই সভ্যতার একচ্ছত্র আধিপত্যের ফলেও আজ ভারতবর্ষে ৫ কোটীর অধিক অস্পৃশ্য পারিয়া জাত বর্ত্তমান। জাপানের প্রাচীন সভ্যতাও কি এই ভাবে বিফল হয় নাই? বিগত যুগে জাপানের আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলা, দুর্দ্দশা,

জাতিতে জাতিতে বিরোধ, ঈর্ষা, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কাটাকাটি মারামারি, প্রবল কর্ত্তৃক দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার, সমাজের অত্যাচার, ধর্ম্মের অত্যাচার প্রভৃতি, এ সব কি আধুনিক জগৎ অস্বীকার করিতে পারেন? যদি সে সভ্যতা বিফলই না হইবে, তবে জাপান পশ্চিমের কাছে সভ্যতা ধার করিলেন কেন? * * শুধু জাপানে কেন? গ্রীস্, রোম, মীশর, আসীরিয়া, ইয়ুকোপ আমেরিকা সর্ব্বত্রই সেই এক কথা—এক কাহিনী। কোথাও সভ্যতা সফল হয় নাই।

সভ্যতা কোনো যুগে কোনো দেশবাসীকে দেবতা করিয়া তুলে নাই। মানুষের পশুভাব সর্ব্বদেশে চেষ্টা, সব সভ্য জাতিতেই দেখা যায়; কাজেই যুদ্ধ অনিবার্য্য। যুদ্ধ হইলেই তাহে নির্দ্দয়তা, মিথ্যাচার, নৃশংসতা, প্রবঞ্চনা, সবই ঘটিয়া থাকে। শুধু ইয়ুরোপ সে অপরাধে অপরাধী নহে। তার পরের কথা এই, বর্ত্তমান যুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ কি শুধু পশুত্বেরই চরম অভিনয় দেখিতে পাইলেন? মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব আছে, তার কি কোনো বিকাশ তিনি এ ক্ষেত্রে দেখিতে পাইতেছেন না? এই মহাসমর যে একটা অগ্নি-পরীক্ষার মত, ইহার ভিতর দিয়া ইয়ুরোপের শুভ-বুদ্ধি ক্রমশঃ যে ভ্রান্তি ত্যাগ করিয়া সত্যের দিকে যাইতেছে, তাহা দেখিলেন না? এক দল যেমন এক দলের টুঁটি ছিঁড়িতেছে, তেমনি এক দল যে প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া আহত ও আর্ত্তের সেবা করিতেছে; * * রবীন্দ্রনাথ যদি একবার সমর-ক্ষেত্রের সীমানায় বেড়াইতে যাইতেন, তাহা হইলে মানুষের মধ্যে দেবতারও সাক্ষাৎ আবির্ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইতেন।'

দেখা যাক, রবীন্দ্রনাথ বা তাঁহার শিষ্য সম্প্রদায় 'এপিফেনী'র কি উত্তর দেন। 'আলোচনী'র 'বাংসরি ভারী সাহিত্য' উল্লেখযোগ্য।

অর্ঘ্য। বৈশাখ।—স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'নবেল' নামক প্রবন্ধে তাঁহার বিশ্লেষণী প্রতিভার পরিচয় আছে। শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'পরাজয়' নামক-গল্পটি স্খলিখিত। এই সংখ্যায় আছে গুরু স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি চিঠি ছাপা হইয়াছে। বঙ্কিমবাবু সহবাস-সম্মতি আইনের আন্দোলনের সময়ে ঠাকুরদাস বাবুকে এই চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন।—

'সমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন

'আপনার পত্র পাইয়া বিশেষ আপ্যায়িত হইয়াছি। আপনি আমার নিকট সুপরিচিত এবং আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ।

'বিবাহিতাদিগের সম্মতির বয়ঃক্রম সম্বন্ধে যে আন্দোলন হইতেছে, আমি ইহাকে কতকটা বৃথাড়ম্বর মনে করি। আমি যত দূর জানি, এ দেশীয়া বালিকারা দ্বাদশ বৎসরের পূর্ব্বে সচরাচর রজস্বলা হয় না। এবং হরি মাইতির ন্যায় পাষণ্ড বড় বিরল। সুতরাং এ বিষয়ের কোন আইনের প্রয়োজন আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। তবে, ইহাও বক্তব্য, যে দ্বাদশ বৎসরের সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে বালিকাদিগের স্বামিসংসর্গ অবিধেয়, এবং ইহা আমাদিগের দেশের প্রাচীন ব্যবস্থাবিরুদ্ধ। তাহার নিষেধ জন্য, যদি কোন আইন হয়, তাহাতে আমি ক্ষতি দেখি না। ঈদৃশ আইন বিদ্যমান প্রাচ্য দেশাচার বিরুদ্ধ হইবে না, কাজেই তাহাতে কোন আপত্তি উত্থাপিত করাও আমার মত নহে। এক্ষণে আইনমতে সম্মতিদানের [বয়স ?] দশ বৎসর; দশ বৎসরের স্থানে বার বৎসর হয়, ইহা আমার অনভিমত নহে। কিন্তু বার বৎসরের অধিক হওয়া কোনক্রমে উচিত নহে।

'বাল্যবিবাহের আমি পক্ষপাতী। কিন্তু বাল্যবিবাহ অর্থে বাল্যকালে বয়ঃস্থ অনুচিত সঙ্গতি বুঝি না। তাহার পক্ষপাতী নহি।

'কোন কোন বালিকা দ্বাদশ বৎসর পরিপূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই রজস্বলা হইয়া থাকে। তাহাদের সম্বন্ধে কোন শাস্ত্রোক্তি যে লঙ্ঘিত হইবে না, এমন কথা বলা যায় না। "শুক্লাভিসারিকা ন্যায়" ইত্যাদি মনুবাক্য ইহার উদাহরণ। কিন্তু এই সকল বিধি অনেক সময়েই রক্ষিত হয় না, দেখা যায়। রক্ষা করিতে গেলে কোন বধূই আর বাপের বাড়ী যাইতে পারে না। যে সকল শাস্ত্রোক্তি লোকে সমাজগৃহীত নয়, তাহার জন্য গণ্ডগোল করা বৃথা।

'আমার মতে আইন হইবার প্রয়োজন নাই। হইলেও বিশেষ কোন ক্ষতি নাই। ইতি

১৮ই আশ্বিন। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।'

আয়ুঃ।

যে যতকাল বাঁচে, তাহাই তাহার আয়ুঃ। আয়ুঃ চেতনেরও আছে; অচেতনেরও আছে। যেমন মানুষের মোটামুটি একটা আয়ুষ্কাল আছে, একখণ্ড লৌহেরও তেমনই আছে। লৌহখণ্ডও কালক্রমে খণ্ড খণ্ড হইয়া গুঁড়া হইয়া যায়। ঐরূপ হইবার কারণ আছে। মানুষেরও মৃত্যু ঘটিবার কারণ আছে।

আমরা এই প্রবন্ধে অচেতনের আয়ুঃ সম্বন্ধে আলোচনা করিব না। চেতন পদার্থের মধ্যেও উদ্ভিদের আয়ুঃ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিব না। কেবল প্রাণি সম্বন্ধে, বিশেষতঃ মানব জাতি সম্বন্ধে, সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আমাদিগের উদ্দেশ্য। আয়ুঃ কিসের উপর নির্ভর করে? দেখাই যাউক। কেবল এই দুইটী বিষয়ই সংক্ষেপে বিবেচনা করা যাউক।

প্রথমেই দেখা যাইতেছে, ব্যক্তির ও জাতির আয়ুঃ সম্পূর্ণ পৃথক্। কেহ ৬০ বৎসর বাঁচিয়াছে, হয়ত ৭০ বৎসর বাঁচিবে; কিন্তু মানবজাতি কোনও বিশেষজ্ঞের মতে এক লক্ষ বৎসরের কম বাঁচিয়া নাই। সুতরাং এই প্রভেদ ব্যক্তির আয়ুঃ এবং জাতির আয়ুষ্কালের মধ্যে যে প্রভেদ, তাহা সর্ব্বাগ্রে স্মরণীয়।

তাহার পর, অতিনিম্নশ্রেণীস্থ জীব হইতে সর্ব্বোচ্চজাতীয় জীবের দেহ-গঠন একবার দেখিয়া লওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে, মৃত্যুর (সুতরাং আয়ুঃ) কারণ বুঝা যাইতে পারে।

সমস্ত জীবকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এককোষ জীব, এবং বহুকোষ জীব। এককোষ জীব একটীমাত্র কোষ দ্বারা গঠিত; বহুকোষ জীব বহুকোষ দ্বারা গঠিত। ম্যালেরিয়া জ্বরের কীটাণু, রক্তকীটাণু, শুক্রকীটাণু প্রভৃতি অন্যান্য ক্ষুদ্র জীবের দেহে একটীমাত্র কোষ; কিন্তু কেঁচো, পিপীলিকা, সর্প, মানুষ—ইহাদিগের দেহে বহু কোষ, এবং বহুবিধ কোষ দেখা যায়।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, এককোষ জীব প্রাথমিক; তাহা হইতে বহুকোষ জীব উৎপন্ন হইয়াছে। এককোষ জীবের ঐ একটীমাত্র কোষ বিখণ্ডিত হইয়া পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; তাহাতে দুইটী জীব উৎপন্ন হয়। উহারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ণাবয়ব হইলে, প্রত্যেকে দ্বি-খণ্ডিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ চারিটী জীব হয়। এইরূপে এককোষ জীবের বংশরক্ষা হয়।

এককোষ জীবের দেহকোষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীববস্তুর দানাতে পূর্ণ। ঐ দানাগুলি প্রধানতঃ অম্লজান, উদজান, যবক্ষারজান ও অঙ্গার দ্বারা গঠিত। তৎসহ তরলপদার্থ মিশ্রিত থাকে। তাহাতে উহা প্রায় স্বচ্ছ, পিচ্ছিল পদার্থে পরিণত হয়। ইহাই প্রাথমিক জীববস্তু। ইহার সরল-গঠন কালে বিবর্ত্তনবশে জটিল হইয়া উঠে।

ঐ এককোষ খণ্ডিত হইয়া বহুকোষ হইলে যখন উহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না, তখন বহুকোষ জীব হয়। যেমন কেঁচো। কিন্তু এইরূপ হইলে কোষস্থ জীব-বস্তুও অন্য প্রকার হইয়া উঠে। জীব যতই উন্নত হইতেছে, ততই তাহার কোষগুলিও জটিল ও নানাবিধ হইতেছে। এককোষ জীবের জীববস্তু বিবর্ত্তনবশতঃ ক্রমে মাংস, মাংস-পেশী, স্নায়ু, মজ্জা, উপাস্থি, অস্থি প্রভৃতি রূপে পরিণত হয়। মাংস, অস্থি ইত্যাদিও কোষ-সমষ্টি, কিন্তু সে কোষ এককোষ জীবের কোষ হইতে কত বিভিন্ন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এককোষ জীবের একটি কোষ বহুধা বিভক্ত হইয়া, এবং বহুবিধ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া, বহুকোষ জীবের শারীরিক জটিলতার উৎপাদন করিয়াছে। তথাপি, বহুকোষ জীবের দেহস্থ সমস্ত কোষই যে জটিলতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা নহে। শুক্রকোষ, রক্ত কণা যে-সকল শ্বেতবর্ণ এবং লালবর্ণ জীব ভাসিতেছে, তাহারা এখনও এককোষ; এবং এককোষ জীবের কোষের ন্যায় সরলই আছে, জটিলতা প্রাপ্ত হয় নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এককোষ জীবের দেহ-কোষটী দ্বিখণ্ডিত হইয়া দুইটী জীব, উহারা দ্বিখণ্ডিত হইয়া চারিটী জীব উৎপন্ন হয়। এই ভাবে পুরুষপরম্পরায় উহাদিগের বংশবৃদ্ধি হয়। কাটিল, পৃথক হইল, অপর জীব হইল; মরিল কৈ? মরিল কে? তাহার মৃতদেহ কৈ? এই অবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়া পণ্ডিতগণ বলেন যে, এককোষ জীবের মৃত্যু নাই। জীবদেহ যতকাল একটীমাত্র কোষে গঠিত হইত, ততকাল জীব-শ্রেণীতে মৃত্যু প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু যে অবধি এককোষ জীব বিবর্ত্তনবশে বহুকোষ এবং বহুবিধ-কোষযুক্ত হইয়া উঠিল, সেই অবধি জীব-শ্রেণীতে মৃত্যুও আসিয়া উপস্থিত হইল।

উপরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, স্বাভাবিক মৃত্যু এককোষ জীবের নাই। তবে, অস্ত্রে বধ করিলে সকল জীবই মরে। সে অন্য কথা।

এক্ষণে আর একটী কথা বিবেচনা করা আবশ্যক। যে একটী কোষ কাটিয়া

হইতে জীব হইল, তাহার কোনও অংশই নিষ্ফল হইল না। সমস্ত অংশই পরবর্তী দুইটী জীব গঠিত হইল। আবার, ঐ দুই জীবের দেহকোষের কোনও অংশ নিষ্ফল হইল না। উহাদিগেরও প্রত্যেক অংশই পরবংশ চারিটি জীব উৎপন্ন করিল। কিন্তু বহুকোষ জীবের তাহা হয় না। মানুষের কথা বিবেচনা করুন। মানবদেহের কি প্রত্যেক কোষের প্রত্যেক অংশ হইতে পরবংশ গঠিত হয়? না, তাহা নহে। মানবের পরবংশ শুক্র-শোণিত হইতে গঠিত হয়। উহারা মানবদেহের একটী বিশেষ স্থান হইতে উৎপন্ন হয়। উহা ব্যতীত মানবদেহের অন্য কোনও স্থানের কোষ দ্বারা পরবংশ গঠিত হয় না। হস্ত, পদ, নাসিকা, জিহ্বা ইত্যাদির কোষ হইতে কখনই মানবের পরবংশ গঠিত হয় না। সুতরাং এককোষ ও বহুকোষ জীবের মধ্যে এই একটী গুরুতর প্রভেদ স্মরণ রাখা আবশ্যক। এককোষ জীবের দেহ-কোষের প্রত্যেক অংশই পরবংশ গঠিত করে; কিন্তু বহুকোষ জীবের দেহস্থ কোনও একটী বিশেষ কোষ হইতে পরবংশ গঠিত হয়; অন্যান্য সমস্ত কোষই পরবংশ-গঠনে অসমর্থ।

যদি আমরা পরবংশ-গঠনকারী কোষকে, অর্থাৎ যে কোষ হইতে বংশরক্ষা হয়, তাহাকে বংশরক্ষক কোষ বলি; এবং দেহের যে সমস্ত (অন্যান্য) কোষ বংশরক্ষা করে না, কেবল বর্ত্তমান পুরুষের (১) দেহ রক্ষা করে, তাহাদিগকে যদি দেহরক্ষক কোষ বলি;—তবে দেখা যাইতেছে যে, যাহাদিগের (২) দেহ-কোষের সমস্ত অংশই বংশরক্ষক কোষ, তাহাদিগের মধ্যে মৃত্যু নাই; কিন্তু যাহাদিগের (৩) বংশরক্ষক কোষ ও দেহরক্ষক কোষ পৃথক, তাহাদিগের দেহ মরে। কিন্তু তাহাদিগেরও বংশরক্ষক কোষ মরে না। কারণ, তদ্দ্বারা অপত্য নির্ম্মিত হয়। তাহাদিগের বংশরক্ষক কোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অপত্যরূপে পরিণত হয়। অতএব কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, এককোষ জীবের সমস্ত অংশই বংশরক্ষক কোষ, দেহরক্ষক কোষ পৃথক নাই; সুতরাং মৃত্যুও নাই। বহুকোষ জীবের বংশরক্ষক কোষ ও দেহরক্ষক কোষ পৃথক হইয়া যাওয়ায়, দেহরক্ষক কোষ চিরকাল দেহরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না; সুতরাং দেহ মরে; কিন্তু তাহাদিগের বংশরক্ষক কোষ মরে না। বহুকোষ জীবের দেহে মৃত্যু আসিয়াছে,

(১) Individual.

(২) যেমন এক কোষ জীবের।

(৩) যেমন বহু-কোষ জীবের।

সে মৃত্যু আসে নাই, নিঃশেষ কেহই হয় না। বিবর্তনবাদ অনুসারে কোনও না কোনও আকারে সকল জীবই বর্ত্তমান আছে। যাহারা মরিয়া বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহারা সেই আকারে বিলুপ্ত হইয়াছে, অন্য আকারে তাহাদিগের পরবর্ত্তী বংশধরগণ জীবিতই আছে। বংশরক্ষক কোষের ধারা অনন্ত; ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হওয়া পর্য্যন্ত এ ধারার শেষ নাই। সুতরাং বুঝা গেল, দেহ মরে, বংশ মরে না। এই হিসাবে দেহকে বংশরক্ষক কোষের অস্থায়ী আধারমাত্র বলা যায় (৪)। দেহের কর্ম্মই যেন বংশরক্ষক কোষের আধার হওয়া। বংশরক্ষা কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইয়া গেলেই উহার জীবিত থাকাও অনাবশ্যক হইয়া উঠে। পিপীলিকার পুংজাতীয়গণ বংশরক্ষার কার্য্য-অন্তেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়; কিন্তু স্ত্রীজাতীয়গণকে ডিম্ব প্রসব করিতে হইবে, সুতরাং তাহারা তখন মরে না। ধান গাছ, বেল গাছ, কলাই প্রভৃতি ফলোৎপন্ন হইলেই মরিয়া যায়। সকল জীবেরই বংশরক্ষাই প্রধান কার্য্য। এই কার্য্যের সহিত আয়ুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু বংশরক্ষা করিতে নারীরক্ষাও প্রায় সকল স্থলেই আবশ্যক; সুতরাং আহারের অভাব স্ত্রীজাতির সহিতও আয়ুষ্কালের গুরুতর সম্বন্ধ আছে।

এক্ষণে বিভিন্ন জীবের আয়ুষ্কাল বিবেচনা করা যাউক। কথায় বলে:—

"২২ বলদা, ১৩ ছাগলা,
দশের (১০) উর্দ্ধ না যায় হেংলা (৫)
নরা গজা বিশে শ' (১২০)
কাক ১০০, শকুনি ৫০০।"

অর্থাৎ, ঐ সকল প্রাণীর ঐ সকল আয়ুষ্কাল। ইহা অভ্রান্ত সত্য নহে, কিন্তু মোটের উপর একরূপ ঠিক। নিম্নের তালিকায় নানা জন্তুর ঊর্দ্ধসংখ্যার আয়ুঃ লিখিত হইল; স্ত্রী-পুং-ভেদে আয়ুর যে প্রভেদ হয়, তাহাও প্রদর্শিত হইল।

	পুংজাতীয়	স্ত্রীজাতীয়
১। পিপীলিকা, বোল্তা, মৌমাছি (৬)	বংশরক্ষান্তে মৃত্যু। কয়েক সপ্তাহমাত্র	তিন হইতে ৫।৬ বৎসর

(৪) The bodies of the higher animals which die may from this point of view be regarded as something temporary and non-essential, destined merely to carry for a time and nourish the unicellular eggs.

—*Ray Lankester.*

(৫) কুকুর।

(৬) ইহারা প্রতিকালে অধিকে আরও অল্পায়ুঃ হয়।

৯।	ম টি, ৬০ ইত্যাদি	[illegible]	[illegible]
১০।	হাম্পেরি টীকা (ভেক্সিনেশন)	ঐ	[illegible]
	৩ মাস হইতে ৬ বৎসর বয়স্ক শিশুকে দেওয়া যাইতে পারে।	৩ মাস হইতে ৬ বৎসর	[illegible]
	ইনফ্লুয়েঞ্জা, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি	[illegible]	
		দুই বার হইতে ১ বৎসর	
৩।	কর্ণ (ইয়ৎ)	১ দিন	[illegible]
৪।	আমাশয় ইত্যাদি	একটি সপ্তাহ হইতে ৩ সপ্তাহ	
৫।	চোখের রোগ ইত্যাদি চোখে পোকা।	৩টি সপ্তাহে হইতে ১ মাস।	
১০।	বসন্ত	১মাসের পরে। পুনঃপুনঃ ক্রমিক ভিন্নভাবে হইতে পারে।	
১৩।	কুইনো	৬ বৎসর	১ বৎসর
১২।	প্লেগ।	১০ "	[illegible]
১৩।	টাইফাস	১৩ "	[illegible]
১৪।	মূর্ছা, ডিপ্থিরিয়া, ডুপিং	১০ "	[illegible]
১৫।	ডোকিস	৭২ "	[illegible]
১৬।	[illegible]	৬০ "	[illegible]
১৭।	[illegible]	৩৫।৫০	[illegible]
১৮।	ডিপ্থেরিয়া, স্কারলেট, অন্যান্য রোগের (৭)	১০০	
১৯।	৩ বৎসরের পূর্বে [illegible]	২১০	[illegible]
২৫	৩ বৎসরের পর (টিকাদান)	৩০	[illegible]
২৬।	ঘট, অন্যান্য	[illegible]	

[illegible]

১৮।৩।১১ হইতে ২০ নম্বরের দীর্ঘায়ুঃ অপেক্ষাকৃত একটু অধিক দীর্ঘায়ুঃ
১৮ নম্বরের পুংগণ দীর্ঘায়ুঃ

এই তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, আয়ুঃ আকৃতির উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করে না। শূকর ভেক অপেক্ষা কত বড় জন্তু; কিন্তু শূকরের আয়ুঃ ২০ বৎসর, ভেকের আয়ুঃ ৪০ বৎসর। ঘোড়া বাজ হইতে অনেক বড়, তথাপি ঘোড়ার আয়ুঃ বাজের অর্দ্ধেক। সুতরাং দেহের আয়তনের উপর আয়ুঃ নির্ভর করিতেছে না। তথাপি একটী কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। কোনও জন্তুর দেহ বড় হইলে তাহার যৌবনকালপ্রাপ্তির বিলম্ব হয়; সুতরাং পরবংশ উৎপন্ন করিতেও বিলম্ব হয়; সুতরাং পরবংশকে প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করিতেও বিলম্ব হয়। তৎপরে ঐ জন্তুর স্বাভাবিক মৃত্যুর সময় আগত হয়। এই নিমিত্ত ঐ বৃহৎকায় জন্তু দীর্ঘায়ুঃ হওয়া সম্ভব। পরবংশ-গঠন ও রক্ষা করাই জীবের কর্ম্ম। সুতরাং ঐ সকল জীব দীর্ঘায়ুঃ না হইলে জীবনের স্বাভাবিক উদ্দেশ্য উত্তমরূপে সিদ্ধ হয় না। হস্তীর কথা স্মরণ করুন। হস্তী বৃহৎকায়; উহার পূর্ণযৌবন সমাগত হইতে ৩০।৪০ বৎসর আবশ্যক। মদার পূর্ণ যৌবন সমাগত হইতে ২।৩ দিন মাত্র আবশ্যক। সুতরাং তাহার অপত্য-উৎপাদন করিয়া জীবন শেষ হইতে এক সপ্তাহই প্রচুর। কিন্তু হস্তীর ৩০।৪০ বৎসর পরে কিংবা ৫০ বৎসর পরে অপত্য-উৎপাদনের সময় হয়। সুতরাং তাহার জীবন দীর্ঘায়ুঃ হওয়াই প্রয়োজন। কিন্তু কেবল আয়তনের দ্বারা আয়ুঃ নিয়মিত হয় না। তাহা শূকর ও ভেকের দৃষ্টান্ত হইতেই প্রতীয়মান হইয়াছে। Swan শুদ্ধ একজাতীয় হংস ৩০০ বৎসর বাঁচিতে পারে; কিন্তু অতি বৃহৎ হস্তীও তত দীর্ঘায়ুঃ নহে। সুতরাং প্রথম কথা বুঝিলাম, দৈহিক আয়তনের সহিত আয়ুর প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই।

পূর্ব্বে কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করিতেন যে, পূর্ণ যৌবনকালের সহিত বর্দ্ধিত-কালের সম্বন্ধ আছে; কেহ বা মনে করিতেন। মানব ২০ বৎসরে যৌবন প্রাপ্ত, সুতরাং ১০০ বৎসর বাঁচে; (?)। কিন্তু এরূপ অনুপাত স্থির করিলে দুই চারিটী জীবের সহিত মিলিতে পারে; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহা মিথ্যা হইবে।

উপরের তালিকা এবং অন্যান্য দৃষ্টান্ত হইতে আর একটী কথা জানা যায়। স্নায়ুমণ্ডলীর ক্ষিপ্রতা, বেগ, অথবা চঞ্চলতার উপরেও আয়ুঃ প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করে না। জন্তু দ্রুতবেগে চলুক, অথবা দীরগতিতে চলুক; শ্বাস-যন্ত্র দ্রুতবেগে, অথবা ধীরে কর্ম্ম করুক; পাকস্থলী দ্রুত অথবা মন্দগতিতে পরিপাক

পদ্মাবতীর পুণ্যপুরী।

পীতাম্বর পালিত পীরোজপুরের পল্লী-পাঠশালায় পড়াইতেন। পীতাম্বর পুত্র পরেশ, পরেশের প্রসূতি-পতির পরলোক-প্রাপ্তির পূর্ব্বেই পরলোকে পঁহুছিয়াছেন। পরেশের পরিবারে পিতৃষসা ও পত্নী পদ্মাবতী। পদ্মাবতী প্রচুরপরিমাণে পিতৃধন পাইলেন। পরেশ, পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফলে পতিপরায়ণা পরমসুন্দরী পরহিতৈষিণী পদ্মাকে পত্নীরূপে পাইয়াছেন। পদ্মাবতী প্রতিদিন পরমানন্দে পতিপদ-পূজা—পরিজন-পরিচর্য্যায় প্রবৃত্তা। পশুপালনেও পদ্মা পরম প্রীতা। পথের পথিকও পদ্মার প্রিয়পাত্র। পদ্মার পবিত্র প্রকৃতিতে পাচক-চুলেরা, পরিচারিকারা, প্রতিবেশিনীরা পর্য্যন্ত পরিতুষ্ট। পর পর সুন্দর পাঁচটী পুত্র—প্রভাত, প্রভাস, প্রকাশ, প্রসাদ, প্রতাপ। পদ্মাবতী এই পাঁচটীর পালন পক্ষে প্রচুর পরিশ্রমেও প্রীতি পাইতেন। পদ্মার প্রতিপালনে পুত্রদের প্রকৃতিও প্রীতিপ্রদ। পুত্রগণের পাঠ ও প্রকৃতির প্রতি পদ্মার প্রখর পর্য্যবেক্ষণ। পরেশের ও পদ্মাবতীর প্রাণপণ পরিশ্রমে পুত্র পাঁচটী প্রথম পারিতোষিক পাইতেন। পর পর পাঁচটী পুত্রই প্রসিদ্ধ পণ্ডিত; প্রথম পুত্র প্রভাত প্রেসিডেন্সীর প্রফেসার; প্রভাস প্লীডার; প্রকাশ প্রসিদ্ধ পত্রিকার পরিচালক; প্রসাদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষায় প্রথম; প্রতাপ প্রেসিডেন্সীতে পড়িতেছে।

পদ্মাবতী পুত্র পাঁচটীর পরিণয়-প্রস্তাব পতির পদপ্রান্তে পঁহুছাইলেন। পরেশনাথ পত্নীর প্রস্তাবে প্রীতিপ্রকাশপূর্ব্বক পুত্রগণের পরিণয়-প্রস্তাব-পত্রিকা পাঁচ দিকে পাঠাইলেন। পদ্মার পুত্র পাঁচটী পণ্ডিতপ্রবর, পয়সাও প্রচুর; পরেশের প্রকৃতি পবিত্র ও প্রশান্ত; পরের পয়সার প্রতি পৃহাপরিশূন্য। প্রসিদ্ধ পরিবারের পরমসুন্দরী পুত্রী পাইবারই প্রত্যাশা। পরেশের প্রত্যাশা পরিপূর্ণ। পাঁচটী পরমসুন্দরী পুত্রবধূ পাইলেন;—প্রতিভা, প্রতিমা, প্রমীলা, প্রণীতা, প্রণতা। পাঁচটী পুত্রবধূতে পরেশের প্রাসাদ পরিশোভিত। পদ্মাবতী পুত্রবধূ-পরিদর্শনে পরম পরিতুষ্টা। পুত্রবধূ পাঁচটী প্রতিক্ষণেই পদ্মার প্রশংসা পাইতেন। প্রতিভাময়ী পদ্মাবতী পরেশ, পরেশ-পুত্রগণ, পুত্রবধূগণ প্রাতঃকথাস্মরণ, পর প্রভাতে ও প্রদোষে পূজাহ্নিক, প্রণবজপ ও প্রণামের পর পুরাণ পড়িতেন। পরে পদ্মাবতী পারিবারিক পরিশ্রমে প্রশ্বাস পাইতেন। পরেশের পরিবারে

পুণ্যপ্রকৃতি ও পবিত্রভাব-প্রদর্শনে প্রত্যেক প্রতিবেশী পরিতৃপ্ত ও প্রসন্ন। পরমেশ্বর পুণ্যফলে পরেশ পদ্মাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন। পাপ পরেশের প্রাঙ্গণ স্পর্শিতে পারে না। পবিত্রতা প্রহৃষ্টচিত্তে পরেশের পুরীতে প্রবন্ধ। পরমেশ্বরের প্রসাদে পুত্রে পৌত্রে পরেশের পুরী পরিপূর্ণ।

প্রবন্ধ পরেশের প্রাসাদে পার্ব্বতী-পূজা। পানুর পিসীর পরমানন্দ; পাড়ায় প্রচার—পানুর পিসী পেটুক; পূজা-প্রাঙ্গণে পানুর পিসী পাতা পাতিয়াছেন; প্রবীণা পাচিকা প্যারী পরিবেশনে পটু। প্যারী-প্রদত্ত পানতুয়া পানুর পিসীর পাতে পড়িতেই, পানু পিসীর পাতের পানতুয়া প্লেটে পুরিয়া ফলাইল। পিসীমাকে পানুর পিণ্ড-প্রদত্তে প্রবৃত্তা-পরিদর্শনে, প্যারী পুনরায় পনরটী পানতুয়া-প্রদানে পরিত্রাণ পাইল।

পূজা-পুরীর প্রত্যেক প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে প্রতিহারী পরিদৃশ্যমান। পরিচারক, পরিচারিকা; পাচক, পাচিকা; প্রতিবাসী, পুরবাসী, পরিজন, পুরজন প্রভৃতিতে পূজা-পুরী পরিশোভিত। প্রত্যেকেই প্রফুল্ল, প্রতি প্রাণেই প্রীতি প্রকাশ পাইতেছে। পরমার্থপ্রদায়িনী পার্ব্বতীর পদার্পণে পরেশ-পুরী পবিত্র; পদ্মার প্রাণ প্রমোদ-প্রাচুর্য্যে পরিপ্লুত। পদ্মাবতী পুত্রপ্রতিম প্রজাপুঞ্জকে পরিধেয়-প্রদান-পুরঃসর পরমান্ন, পূজার প্রসাদ পাওয়াইলেন। পরাহ্নে পতি-পুত্র-পৌত্র-পরিজন প্রভৃতিতে পরিবৃতা পদ্মাবতী পূজা-প্রকোষ্ঠে পশিলেন; প্রাণ পুরিয়া প্রতিমা-প্রদর্শন, পাদোদকপানপূর্ব্বক প্রগাঢ় প্রেমভক্তিপূর্ণ প্রাণে পার্ব্বতীর পদপ্রান্তে পড়িলেন। পরেশনাথের, পদ্মাবতীর পূর্ব্ব পুণ্যে প্রনন্দ প্রসরা, পরলোকের পথও প্রশস্ত।

শ্রীমতী—

বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা। *

[যেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা ও দয়ালু আল্লাহ-তায়ালার নামে আরম্ভ করিতেছি।

[কোরাণ।]

আমরা তোমারই অর্চ্চনা করি, এবং তোমারই নিকট সাহায্য-ভিক্ষা করি; হে বিশ্বপতি প্রভো! আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন কর। আমিন। [কোরাণ,—সুরা, ফাতেহা।]

* বাঁকীপুরের প্রবাস বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনে পঠিত।

কলিকাতা সহর এখন বাঙ্গালা দেশের রাজধানী। সুতরাং বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, দেখিতে কলিকাতার মুসলমান সমাজ, এবং তাহাদের মাতৃভাষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক।

সাধারণতঃ কলিকাতা সহরে এখন পাঁচ শ্রেণীর মুসলমান দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

(১) যাঁহারা ভারতবর্ষের বাহিরের লোক, কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় বাস করিতেছেন, এবং কর্ম্ম শেষ হইলে আপনার মাতৃভূমির ক্রোড়ে ফিরিয়া যাইবেন। ইঁহারা নিজেকে কলিকাতার লোক বলিয়া জনসমাজে পরিচিত করিতে লজ্জা ও ঘৃণা বোধ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মাতৃভাষা আরবী ও পার্শী।

(২) যাঁহারা কলিকাতায়, এবং বাঙ্গালা দেশের অধিবাসী নহেন, কর্ম্মের জন্য ভারতের অপরাপর প্রদেশ হইতে এখানে আসিয়া অস্থায়িভাবে বাস করিতেছেন, এবং কর্ম্ম শেষ হইলে, স্ব স্ব প্রদেশে ফিরিয়া যাইবেন, অথবা কলিকাতাতেই আজীবন অবস্থান করিবেন। ইঁহারা নিজেকে বাঙ্গালী বলিয়া স্বীকার করেন না, এবং স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। ইঁহাদের মাতৃভাষা উর্দ্দু, হিন্দী, গুজরাথী, তেলেগু, তামীল, উড়িয়া প্রভৃতি। ইঁহাদের মধ্যে হিন্দী-ভাষীর সংখ্যাই অধিক।

(৩) যাঁহারা বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন স্থানের বাসিন্দা, কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেছেন, এবং কর্ম্মের শেষে স্ব স্ব জন্মস্থানে ফিরিয়া যাইবেন, এবং নিজেকে খাঁটী বাঙ্গালী বলিয়া জন-সমাজে পরিচিত করিতে সর্ব্বদাই ইচ্ছুক। এমন কি, নিজেকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচিত করিতে গৌরব বোধ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা।

(৪) কলিকাতা-সহর-পত্তনের পূর্ব্বে, সহর-পত্তনের সময়, এবং তাহার কিঞ্চিৎ পরেও যাঁহারা বর্ত্তমান কলিকাতা ও পঞ্চান্ন গ্রামের মধ্যস্থিত শিবাবাড়ী, শিবদহ, আঞ্জির বাগান, সুঁড়া, হাড়িবাগান, লিচুবাগান, কোরেদান বাগান, মেহেদিবাগ, ভালতলা, সুতানুটী, গোবিন্দপুর, ধাপধাড়া, মলঙ্গা, কার্সিডাঙ্গা, বালিগঞ্জ, কেসিয়াবাগান, গোববা, শরিকপুষ, খেয়ারাবাগান, পটলডাঙ্গা, চাঁপাতলা, শানকিডাঙ্গা, স্বর্ত্তিবাগান, হরিণবাড়ী প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেন, এবং বাঙ্গালা ভাষাকে স্বীয় মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, বরং শ্লাঘা বোধ করিতেন, এবং বর্ত্তমান সময় সেই সকল মুসলমানদিগের

বংশধরেরা কলিকাতায় বাস করিতেছেন, এবং বাঙ্গালা ভাষাকে প্রীতি মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন।

(৫) কলিকাতার আদিম বাঙ্গালী মুসলমান অধিবাসীদিগের যে সকল বংশধরেরা আজিও কলিকাতায় বাস করিতেছেন, এবং বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে যে সকল বাঙ্গালী মুসলমান কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, এবং আজীবন কলিকাতাতেই বাস করিয়াছিলেন, আর তাঁহাদের যে সকল বংশধর আজিও কলিকাতায় বাস করিতেছেন। বাঙ্গালা দেশ ব্যতীত ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে যে সকল মুসলমান কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, কলিকাতাতেই বাস করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের যে সকল বংশধরেরা কলিকাতাতেই বাস করিতেছেন। ভারতবর্ষের বাহিরের যে সকল মুসলমান কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া স্থায়িভাবে কলিকাতার অধিবাসী হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের যে সকল বংশধর আজিও কলিকাতায় বাস করিতেছেন।

বর্ত্তমান সময় কলিকাতার মোট অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় এগার লক্ষ, তন্মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা প্রায় চারি লক্ষ। এই চারি লক্ষ মুসলমানের মধ্যে উক্ত প্রথম শ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা প্রায় শতকরা এক জন। দ্বিতীয় শ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা প্রায় শতকরা দশ জন। তৃতীয় শ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা প্রায় শতকরা ২৫ জন। চতুর্থ শ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা প্রায় শতকরা ৫ জন; এবং শেষোক্ত পঞ্চম শ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা প্রায় শতকরা ৫৯ জন। এই শেষোক্ত পঞ্চম শ্রেণীর মুসলমানেরা আপনাদিগকে 'ক্যাল্‌কেশিয়ান' মুসলমান বলিয়া বাক্য ও ব্যবহারের দ্বারা পরিচিত করিয়া থাকেন।

কিন্তু শেষোক্ত পঞ্চম শ্রেণীর 'ক্যাল্‌কেশিয়ান' মুসলমানদিগের সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিতে হইলে, উহাদিগকে পুনরায় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। সুতরাং আলোচনার সুবিধার জন্য, আমি প্রথমে উহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া, আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

এই দুই শাখা-শ্রেণীর মধ্যে যাঁহারা প্রথম শাখা-শ্রেণীর অন্তর্গত, তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্ব মাতৃভাষা ভুলিয়া একপ্রকার ভাঙ্গা উর্দ্দুকে আপনাদের মাতৃভাষা-রূপে গড়িয়া লইয়াছেন। আর যাঁহারা দ্বিতীয় শাখা-শ্রেণীর অন্তর্গত, তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্ব মাতৃভাষাকে, সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া, অর্থহীন একপ্রকার নূতন ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং সেই ভাষাকে তাঁহারা তাঁহাদের মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

দিল্লী এবং লক্ষ্ণৌ এই উভয় স্থানের উর্দ্দু ভাষাই এখন উর্দ্দু-ভাষা-ভাষীদিগের আদর্শ। এক দল দিল্লীর উর্দ্দুকে বিশুদ্ধ উর্দ্দু বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন; আর এক দল তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া থাকেন যে, "দিল্লীর উর্দ্দু অতি জঘন্য—লক্ষ্ণৌএর উর্দ্দু খাঁটী ও বিশুদ্ধ।" কিন্তু এতদুভয় দলের কোনও দলই পূর্ব্বোক্ত পঞ্চম শ্রেণীর প্রথম শাখা-শ্রেণীস্থ 'ক্যাল্‌কেশিয়ান' মুসলমানদিগের ভাষা উর্দ্দুকে পছন্দ করেন না। পরন্তু ইঁহারাও এখন ইংরাজী ও স্বরচিত ভাঙ্গা উর্দ্দু ব্যতীত অপর কোনও ভাষা জানেন না।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, "প্রায় শতকরা ৫৯ জন 'ক্যাল্‌কেশিয়ান' মুসলমান পঞ্চম শ্রেণীর অন্তর্গত।" এই ৫৯ জনের মধ্যে, উল্লিখিত প্রথম শাখা শ্রেণীস্থ মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ১০ জন, এবং অবশিষ্ট ৪৯ জন মুসলমান, পঞ্চম শ্রেণীর দ্বিতীয় শাখা-শ্রেণীর অন্তর্গত। এই দ্বিতীয় শাখা-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ৪৯ জন মুসলমানই যে আপনাদের পূর্ব্ব মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া, এক অর্থহীন অভিনব ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এক্ষণে আপনাদের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে তাঁহাদের সেই অভিনব ভাষার দুই চারিটী শব্দ প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করিতেছি। যথা—"আইস্থা", "গেইস্থা", "খাইস্থা", "বোলেহে", "খেলেহে", "জাহে", "কা", "কাহে", "কা-বে", "হাঁয়", "হাঁজী", "হামার", "পিইস্-হ্যায়" "সুইস্-হ্যায়", "সেইস্-হ্যায়", "গ্যায়োতানি", "খায়ো-সনি", "বোলো-সনি", "তানিসা", "এনে-আও", "এনে-জী" প্রভৃতি।

দুঃখের বিষয়, এই শ্রেণীর মুসলমানদিগকে, উর্দ্দু অথবা বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিবার কোনও চেষ্টাই কেহ করেন না। বরং এই দুর্ব্বোধ্য ভাষাকেও এখন স্বার্থের খাতিরে উর্দ্দু ভাষা বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে। তবে সুখের বিষয় এই যে, ইঁহারা আপনাদের আনন্দে আপনারাই মগ্ন রহিয়াছেন। কাহারও কোনও আচার ব্যবহার ও কার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ করিবার কোনও চেষ্টাই ইঁহারা করেন না। কাহারও উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিবার আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা ইঁহাদের নাই। কিন্তু ইঁহাদের উপরের স্তরে যাঁহারা, সেই প্রথম শাখা-শ্রেণীর মুষ্টিমেয় মুসলমানগণ, আপনাদিগকে ত বাঙ্গালী বলিয়া স্বীকার করেনই না, অধিকন্তু বাঙ্গালী মুসলমানদিগকে দলে টানিয়া লইয়া, তাঁহাদের উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত।

উক্ত শতকরা ৪৯ জনকে বাদ দিলে, কলিকাতার মুসলমানদিগের মধ্যে খাঁটী উর্দ্দু-ভাষা-ভাষীর সংখ্যা শতকরা ২০ জনের অধিক নহে। এই ২০ জনের

মধ্যে দশ জনের ভাষা ভাঙ্গা-উর্দ্দু, এবং ১০ জনের ভাষা খাঁটী উর্দ্দু। পরন্তু কলিকাতায় খাঁটী বাঙ্গালা-ভাষা-ভাষীর সংখ্যা শতকরা প্রায় ২৫ জন। সুতরাং এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, বাঙ্গালী মুসলমানেরা বাঙ্গালার রাজধানী কলিকাতার উপর স্বীয় অধিকার হারান নাই।

কলিকাতার মুসলমানদিগের মধ্যে,আমি যে পরিমাণ বাঙ্গালী মুসলমানদিগের কথা উপরে উল্লেখ করিয়াছি, ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় খাঁটী বাঙ্গালী মুসলমানের সংখ্যা তাহা অপেক্ষা আরও অধিক ছিল। দুঃখের বিষয়, সে সময়ের কলিকাতার বাঙ্গালী মুসলমানদিগের অনেকের বংশ এখন লোপ পাইয়াছে, এবং অনেকের বংশধরেরা এখন মূর্খতা প্রযুক্ত আপনাদের বাঙ্গালীত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছেন।

অধিকদিনের কথা বলিব না। ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে, খাস কলিকাতার মুসলমানদিগের কি ভাষা ছিল, আমি নিম্নে তাহার দুই একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। তখন আমাদের বাসা শিয়ালদহ হাজীপাড়ার ছিল। আমার পূজনীয় পিতৃদেব ৩০।৩৫ বৎসর ঐ স্থানে বাস করিতেছেন। প্রত্যহ প্রাতে আমাদের বাসায় একটি ছোট রকমের মজলিস্ বসিত, এবং বেলা প্রায় ৯।১০ টার সময় মজলিস ভাঙ্গিত। পাড়ার যে সকল লোক সেই মজলিসে সমবেত হইতেন, তাঁহাদের কাহারও বয়স ৬০ বৎসরের কম ছিল না। সমবেত মহাত্মাদিগের মধ্যে মওলানা আব্দল খালেক মরহুম (১), হাজী আব্দল রাজ্জাক মরহুম (২), ৺বাবু গিরীশচন্দ্র কর, বাবু হরিদাস দত্ত, মুন্শী বেলায়েৎ হোসেন ওরফে

---

(১) মওলানা আব্দল খালেক, নদীয়া জেলার জুনিয়াদহ গ্রামের বিখ্যাত কাজী বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাল্যকালে ইনি গ্রাম্য-পাঠশালায় বাঙ্গালা শিক্ষা করেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া আরবী ও পার্শী ভাষা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েন। কিছুদিন কলিকাতায় বিদ্যাশিক্ষা করিয়া, পরে দিল্লী গমন করেন, এবং সেখানে মওলানা উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। অনেক দিন তিনি দিল্লীর 'কোতবখানা'র অধ্যক্ষ ছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের পর তিনি কলিকাতায় আইসেন, এবং কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হয়েন। কিছুদিন এই পদে কার্য্য করিয়া, চাকরীতে ইস্তফা দেন, এবং 'রাদ্' নামক একখানি পার্শী বাঙ্গালা মাসিকপত্র বাহির করেন। 'রাদ্' ৩ বৎসরের পর ১৮৮৪ সালে বন্ধ হয়। ১৮৮৫ সালে তিনি পুনরায় 'মোহাম্মদী' নামক বাঙ্গালা-উর্দ্দু ভাষায় এক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ১৮৯০ সালে মোহাম্মদী বন্ধ হয়। আমরা পৃথক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

(২) হাজী আব্দল রাজ্জাক, মওলানা আব্দল খালেক মরহুমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। ইনি মুসলমানী ধর্ম্মপুস্তক বিক্রয়ের ব্যবসায় করিতেন।

কালীদাস, মুনশী মতিয়ার রহমান মরহুম ওরফে ছাম বাবু (৩), মুনশী শরাফত হোসেন মরহুম ওরফে শরীফ বাবু (৪), মুনশী গোলাম রহমান মরহুম (৫), মুনশী মিনহাজদ্দিন মরহুম (৬), মুনশী ইমতিয়াজ আলী মরহুম (৭), শেখ

---

(৩) শিয়ালদহ ষ্টেশনের পূর্ব্ব দিকে খালের ধারে যে প্রকাণ্ড আমে মস্‌জিদ্ আজিও বর্ত্তমান আছে, উক্ত মস্‌জিদ্ ১১৭৩ বঙ্গাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে কলিকাতায় কোনও পাকা মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হয় নাই, এবং এরূপ প্রকাণ্ড মস্‌জিদ্ কলিকাতায় দ্বিতীয় ছিল না, এবং নাই। মুনশী কেতাবদ্দিন নামক এক ব্যক্তি এই মস্‌জিদ্ প্রতিষ্ঠিত করেন। মুনশী মতিয়ার রহমান উক্ত কেতাবদ্দিনের পৌত্র ছিলেন। শিয়ালদহ ষ্টেশন-গৃহ ও আফিস-গৃহ যে জমীর উপর স্থাপিত হইয়াছে, ঐ সমস্ত জমী উক্ত মসজিদের 'ওয়াকফ' সম্পত্তি ছিল। মতিয়ার রহমানের বাবুগিরির ফলে এই সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছিল। কলিকাতার মধ্যে ১৯ বিঘা জমী উক্ত মসজিদের নামে 'ওয়াকফ' করা ছিল।

(৪) কলিকাতার যে অংশে এখন 'গ্যাস-হাউস' বর্ত্তমান, ঠিক ঐ স্থানে শরিফবাবুদের ভিটা ছিল। তাঁহাদের বাহাদুরী কাঠের গোলা ও জমীদারী ছিল। পক্ষ মকদ্দমা সাধনায় শরীফবাবুর যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট হয়। শরীফবাবু বলিতেন, তাঁহার প্রপিতামহের সময় হইতে তাঁহারা কলিকাতার অধিবাসী। শরীফবাবুর পিতা মরহুমের সময় হইতে তাঁহাদের অবস্থার উন্নতি হইতে আরম্ভ হয়, এবং শরীফবাবু তাহার ধ্বংসসাধন করেন। গ্যাস-কোম্পানী প্রস্তুতের সময় তাঁহারা সে ভিটা বিক্রয় করেন, এবং পূর্ব্বোক্ত মসজিদের অনতিদূরে একখণ্ড জমীর উপর, বাড়ী প্রস্তুত করিয়া বাস করিতে থাকেন। আমি সে বাড়ী দেখিয়াছি। বেশ সুন্দর বাড়ী এখন আর বড় একটা দেখা যায় না। এখন সে বাড়ী নাই।

(৫) মুনশী গোলাম রহমান পূর্ব্বোক্ত কেতাবদ্দিনের পৌত্র ছিলেন। তিনি পুলিসের দারোগাগিরি করিয়া পেন্সিয়ান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি দারোগা বকাউল্লার সহকারী ছিলেন। কথিত আছে যে, তাঁহারই জন্য দারোগা বকাউল্লার এত নামডাক হইয়াছিল। কারণ, তিনি সর্ব্বদাই আত্মগোপন করিয়া চলিতেন, এবং দারোগা বকাউল্লা সেই সুযোগে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

(৬) মুনশী মিনহাজদ্দিন শিয়ালদহ ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে মোক্তারী করিতেন। তিনি এক জন প্রতিভাশালী মোক্তার ছিলেন। তিনিও কলিকাতায় অনেক ভূসম্পত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বংশধরেরা মোকদ্দমা-মামলায় সমস্ত উড়াইয়া দিয়া এখন পথের ভিখারী হইয়াছেন।

(৭) মুনশী ইমতিয়াজ আলী পূর্ব্বে কি করিতেন, জানি না। কিন্তু যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন তিনি পূর্ব্ব-বঙ্গ রেল-আফিসের কেরাণী ছিলেন।

আহমদ ওরফে আবু ওস্তাগার মরহুম (৮) ও মুনশী মণিরউদ্দিন আহমদ মরহুম (৯) প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মজলিসে গল্প-গুজব ও কথাবার্ত্তা বাঙ্গালা ভাষাতেই হইত। দেশের, রসের ও মহাজনের কথা হইত। সমাজ-শাসনের পরামর্শ চলিত। কলাচারী ও পাপ-পথগামী ভ্রষ্ট ব্যক্তিদিগকে (হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে) শাসন করিবার ব্যবস্থা হইত। পাড়া প্রতিবেশীদিগের অভাব অভিযোগ শ্রবণ করিয়া, তৎপ্রতীকারের জন্য সুপথ অবলম্বন করা হইত। পাড়ার মামলা-মোকদ্দমা বড় একটা আদালতে যাইতে পারিত না। ইহা ব্যতীত দুধ, ঘি, মাছ, মাংস, তরি-তরকারী, পোলাও-কোর্ম্মা প্রভৃতি খাদ্যাখাদ্যের কথাও হইত। এক রবিবারে বড় বড় রসের গল্প, পোলাও-কোর্ম্মার কথা হইতেছিল। হরিবাবু বলিয়াছিলেন, "আমাদের বাঙ্গালীরা আপনাদের ন্যায়, উত্তম খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতে জানেন না! সুস্বাদু ও মুখরোচক খাদ্য আপনাদের বাড়ীতেই প্রস্তুত হয়, এবং আপনাদের মোছলমানেরাই এ কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী।"

আমার বেশ মনে আছে, হরিবাবুর এই কথা শুনিয়া, মুনশী মণিরদ্দিন ও আবু ওস্তাগার বিশেষ অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "হরিবাবু! আপনার দেখিতেছি বুদ্ধিলোপ পাইয়াছে—মতিভ্রম হইয়াছে!"

হরিবাবু তাঁহাদের ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া ও তর্জ্জন-গর্জ্জন শুনিয়া অবাক্—হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, এবং কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া, মৃদুস্বরে বলিলেন, "মহাশয়! আমি কি অপরাধ করিলাম? আমি ত কোনও অন্যায় কথা আপনাদিগকে বলি নাই?"

তখন ওস্তাগার সাহেব বলিলেন, "ইহা অপেক্ষা যদি আরও কিছু অন্যায় বলিবার ইচ্ছা থাকে, বলুন। আপনি বাকীই বা রাখিয়াছেন কি? আপনি যদি আমার গণ্ডদেশে দুইটী চপেটাঘাত করিতেন, আমি বিনা বাক্যব্যয়ে তাহা সহ্য করিতাম; কিন্তু ইহা অসহ্য।"

তখন দত্তমহাশয় অতি সঙ্কুচিতভাবে বলিলেন, "যদি অপরাধ হইয়া থাকে,

---

(৮) শেখ আহমদ ওরফে আবু ওস্তাগার কলিকাতা কেমাল গার্ডেনারীর প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন।

(৯) মুনশী মণিরউদ্দিন আহমদ পুলিসের কমাণ্ডার ছিলেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন তিনি পেন্সিলিয়ান ভোগ করিতেন। কর্ম্মোপলক্ষ্যে তিনি বেশ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

তাহা আমার জানকৃত নহে। আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক বলিয়া দিন, আমার অপরাধ কি?"

ইহা শুনিয়া মওলানা আব্দল খালেক সাহেব বলিয়াছিলেন, "হরিবাবু আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না, হিন্দু ও মুসলমানকে যে আপনি পৃথক করিয়া ফেলিতেছেন। বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক অধিবাসী—সে হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, অথবা খৃষ্টান, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম হউক—সে বাঙ্গালী। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা দেশে পাঁচটী ধর্ম্মসম্প্রদায় বাস করিতেছেন,—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্ম। দেশের মঙ্গলামঙ্গল এই পাঁচটী ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মঙ্গলামঙ্গলের উপর নির্ভর করিতেছে। কিন্তু পাঁচটী ধর্ম্ম-সম্প্রদায় যতদিন কলহ বিরোধ ত্যাগ না করিবে, যতদিন পরস্পর একতাসূত্রে আবদ্ধ না হইবে, ততদিন কাহারও মঙ্গল হইবে না। কারণ, একের ধর্ম্মবিশ্বাস অপরের ধর্ম্মবিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত।

"তবে একতার এক উপায় আছে। সে উপায় এই যে, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্ম, এই পাঁচটী ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে বুঝাইয়া বিশ্বাস করাইয়া দিতে হইবে যে, তাহারা যে যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউক না কেন, তাহারা সকলেই বাঙ্গালী। ধর্ম্মের হিসাবে তাহারা হিন্দু, মুসলমান, কিংবা অপর কোনও ধর্ম্মাবলম্বী নামে অভিহিত হউক না কেন, কিন্তু দেশ হিসাবে তাহারা সকলেই বাঙ্গালী। এখন হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতির মধ্যে এই বিশ্বাস ক্রমশঃ দৃঢ়তর হইতেছে। ঠিক এই সময় যদি হিন্দুকে বাঙ্গালী বলিয়া মুসলমান হইতে পৃথক করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যৎফল বড়ই বিষময় হইবে।

"বাঙ্গালী বলিয়া কোনও ধর্ম্ম নাই। আমি ইসলামপন্থী, আমিও যেমন বাঙ্গালী, আপনি হিন্দুপন্থী, আপনিও সেই প্রকার বাঙ্গালী। বাঙ্গালা দেশে জন্মিয়াছি, বাঙ্গালা দেশে বাস করিতেছি, বাঙ্গালা ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকি, এবং বাঙ্গালার জল, বায়ু ও স্বভাব আমাদের জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন; সুতরাং আমরা বাঙ্গালী। আমাদের বাঙ্গালী নাম গৌরবের বিষয়।

"ওস্তাগর সাহেবের অসন্তোষের কারণ এই যে, অদ্য আপনি একাকী যে বাঙ্গালী নামটী কেবল হিন্দুর অধিকারে আনিতেছেন, কল্য আপনার অনুকরণে আর দশ জন ঐরূপ চেষ্টা করিবে। তাহা হইলে বিশ বৎসরের পর দেখিবেন, হিন্দু-মুসলমানের একতা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

"হিন্দু মুসলমানকে ছাড়িয়া, এবং মুসলমান হিন্দুকে ছাড়িয়া কি এক

এ দেশে বাস করিতে পারিবে? এ দেশের হিন্দুরাই যদি বাঙ্গালী হইবার চেষ্টা করে, এবং মুসলমানদিগকে উপেক্ষা করে, তাহা হইলে উপেক্ষিত মুসলমান হয় ত বাঙ্গালীত্ব অস্বীকার করিয়া বসিবে। বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য-বশতঃ যদি কখনও এরূপ দুঃসময় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে জানিবেন, বাঙ্গালা দেশ ছারেখারে যাইবে। গুপ্তাগর সাহেব বড়ই দূরদর্শী, তাই ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া, অঙ্কুরেই ইহার মূলোচ্ছেদে যত্নবান হইয়াছেন।"

মওলানা সাহেবের এই প্রকার উপদেশপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া দত্তমহাশয় নিজের ত্রুটী বুঝিতে পারিয়া, আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী।

স্থাপত্য-শিল্প।

২

আধুনিক স্থাপত্যের আলোচনা করিলে আমরা উপকরণের প্রত্যক্ষ সুন্দররূপে উপলব্ধি করিতে পারি। আমাদের বাসভবনগুলিকে ইষ্টকাবৃত লৌহের খাঁচাস্বরূপ বলা হইয়াছে; লৌহের চলন না থাকিলে এগুলির আকৃতি এ সংস্থান কখনই এরূপের হইত না। আমি লৌহের ব্যবহারের বিপক্ষে মত ব্যক্ত করিতেছি, এরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসকে যেন কেহ মনে স্থান না দেন; লৌহের অপব্যবহারের কথাই বলিতেছি। সম্প্রতি আবার Reinforced concrete বা লৌহ দ্বারা দৃঢ়ীকৃত concrete বা concrete blocksএর বহুল প্রচার হওয়াতে পূর্ব্বোক্ত অপব্যবহারের মাত্রা বাড়িয়াছে; ইহাতে নির্ম্মাণ-কৌশল ও উদ্ভাবনীশক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আমরা আমাদের স্থাপত্যের লক্ষ্য হইতে দূরে যাইয়া পড়িতেছি। শুদ্ধ প্রস্তরে গৃহভিত্তিনির্ম্মাণ ব্যয়সাধ্য বলিয়া কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ইষ্টক ও প্রস্তরের মিশ্রণে ভিত্তিনির্ম্মাণের চলন হইয়াছিল; ইহাতে স্থাপত্যের বিশুদ্ধি, সৌন্দর্য্য ও উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে রক্ষিত হইত; কিন্তু Reinforced concreteএর ব্যবহার ও ব্যয়সঙ্কোচের উপদেশে সে সামান্য আশা সুদূরপরাহত হইয়াছে। প্রস্তরের ব্যবহারে ও নির্ম্মাণে গৃহাধিষ্ঠান, গৃহভিত্তি, খিলান, দ্বারদেশ ও জানালা প্রভৃতি যেরূপ

মনোহর ভাবে বিন্যস্ত ও নির্ম্মিত হওয়া সম্ভব, শুদ্ধ ইষ্টক বা Reinforced concrete দ্বারা সেরূপ আশা করা সম্ভব নহে। আমরা সহজেই কল্পনাচক্ষে দেখিয়া বুঝিতে পারি যে, ভিত্তিপার্শ্বোদ্গত সমশীর্ষক প্রস্তরের সাহায্যে কিরূপ সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইতে পারে। এ যুগে ঐরূপ একটা ভিত্তিগাত্র হইতে বহিঃবর্দ্ধিত সমোচ্চ রেখার কল্পনা, ব্যয়বাহুল্য ও অপ্রয়োজনীয়তারূপ দুইটী রাক্ষসীর তীব্রকটাক্ষে আতঙ্কে কাঁপিতে থাকে, কিংবা হয় ত তাহাদের মূর্ত্ত ভৎর্সনায় লজ্জানতনয়নে ও করুণ-কোমল-মুখে স্থপতির কর্ম্মক্ষেত্র ক্ষুণ্ণ-রিক্ততায় আচ্ছন্ন করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হয়। এই কারণেই আধুনিক অনেক অভ্রস্পর্শী সৌধে বাহুল্য হিসাবে আমরা string course প্রভৃতি বহিঃ-বর্দ্ধিত অংশের ব্যবস্থা দেখি না।

এ স্থলে একটা কথা বলিয়া রাখা উচিত মনে করি। স্থাপত্যের ইতিহাস অনুশীলন করিলে দেখা যায় যে, পূর্ব্বযুগে প্রচলিত রীতি বা style'র প্রতি অনুরাগাতিশয্যবশতঃ পরবর্ত্তী যুগের স্থপতিরা উপকরণের অভাব খর্ব্ব করিবার জন্য নানা উপায়ের উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তিপ্রণালী অনুধাবন করিলে, ইহাতে বিশেষ সারবত্তা দেখি না। তাঁহাদের মতে যে রীতি এত কাল ধরিয়া লোকলোচনের তৃপ্তি ও মনে অনন্ত আনন্দের উত্তেজনা করিত, তাহার মধ্যে সৌন্দর্য্যের সনাতন ভাব বর্ত্তমান; ইহা কখনও উপকরণ বা উপাদানের প্রভাবে অন্বিত হইতে পারে না; এ সৌন্দর্য্যের শাশ্বতী ধারা দেশ, কাল, উপাদান প্রভৃতির দ্বারা কখনই অবরুদ্ধ বা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইটালী দেশে ও ষোড়শ শতাব্দীতে য়ুরোপে যে রেণাসাঁস রীতির (Renaissance) প্রবর্ত্তনা দেখি, তাহার আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, সৌন্দর্য্যের আধার হিসাবে প্রাচীন রীতির মধ্যে সনাতনত্বের বীজ যে নিহিত রহিয়াছে, তাহা স্বতঃসিদ্ধরূপে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল।

একই ভূমি হইতে একই রস গ্রহণ করিয়া যেমন নানাপ্রকার মহীরুহের উদ্ভব হয়, তেমনই একই রীতি বা পদ্ধতি বা একই রীতির মূল সত্যগুলি ভিন্ন ভিন্ন দেশে তাহাদের স্থানীয় রীতির বা আচার-ব্যবহার দ্বারা ভিন্ন প্রকারে অণুপ্রাণিত হইয়া এক জটিল ও যৌগিক পদার্থে পরিণত হয়। এই কারণেই এক ইটালীর মধ্যেই রোম্যাণেস্ক রীতির কত প্রভেদ। লম্বার্ডির রোম্যাণেস্ক (Romanesque) রীতির সহিত টাস্কেনির রোম্যাণেস্কের মিল নাই, এবং এই কারণেই ফ্রান্স, ইটালী ও জর্ম্মাণীর রোম্যাণেস্কের মধ্যে অন্ত প্রভেদ

হইয়া থাকে। এই স্থানে আর একটী কথা বলিয়া রাখি; একটী নূতন রীতি বা পদ্ধতির আবির্ভাবকাল হইতে গড়িয়া উঠিয়া পরিণত ও পরিপক্ক হইতে অনেক সময়ের প্রয়োজন; দুই এক বৎসরে ইহা অসম্ভব; সময় সময় অনেক শতাব্দী কাটিয়া যায়। এই রোম্যাণ্টিকের কথাই ধরা যাউক। ইহার অভ্যুদয়কাল আট শত বৎসর ব্যাপিয়া বর্ত্তমান; আট শত বৎসর অল্প সময় নহে; ইহাতে কত রাজ্যের আবির্ভাব ও তিরোধান হয়; কত রাষ্ট্রবিপ্লব, জাতিসমূহের কত নূতন ভাবের উন্মেষ ও তাহার সাধনায় কত শোণিতপাত, কত সংগ্রাম, কত জয়-পরাজয়ের পরিচয় পাই। সমাজ যে কতবার আলোড়িত ও বিক্ষুব্ধ হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। সমাজরূপী জগন্নাথ অনেকবার নবকলেবর গ্রহণ করেন; এই কলেবরের মধ্যে পুরাতনের প্রাণস্পন্দন থাকিলেও, দেহপঞ্জরের এত পরিবর্ত্তন হয় যে, অনেক সময় চিনিবার উপায় থাকে না। সুতরাং একই দেশে একই রীতিটী বিবর্ত্তিত হইয়া যে কত প্রকারের কলেবর ধারণ করে, তাহা কে বলিবে? এই জন্য অনেক সময় দৃষ্টিবিভ্রম উপস্থিত হয়, এবং রীতিটির শ্রেণীবিভাগ ও গোত্রনির্ণয় করিতে বিষম ভ্রমে পতিত হইতে হয়। পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যে আমাদেরই এই উদ্দেশ্যহীন সমাজে এত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে যে, আমাদের পিতামহেরা যদি পুনরায় আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের প্রিয় কর্ম্মক্ষেত্র দেখিতে আইসেন, ইহা নিশ্চিতভাবে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহাদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিবে; তাঁহারা আমাদিগকে ও আমাদের সমাজকে চিনিতে পারিবেন না; আমাদের বাসভূমিগুলিতে প্রবেশ করিলে তাঁহাদের শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইবে।

পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি হইতে বুঝা গেল যে, সময়ক্রমে মূল রীতিগুলি কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। সুতরাং রোম্যাণ্টিকের ন্যায় যে রীতির অভ্যুদয়কাল আট শত বৎসর, তাহার জীবনের সমস্ত স্তরের মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকিলেও, সে সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। যদি কোনও অশীতিবৎসরবয়স্ক বৃদ্ধের সম্মুখে তাঁহার মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত প্রতিবৎসরের এক একখানি প্রতিকৃতি তাঁহারই সম্মুখে স্থাপিত করা যায়, অন্যে পরে কা কথা, তাঁহারই বিস্ময় উদ্রিক্ত করিবে। কিন্তু এত জন প্রাণিভদ্রস্থ বোধ হয় চিত্রগুলির মধ্যে একটা সাধারণ লক্ষণ ধরিয়া তাহাদের মধ্যে গৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট রূপে অবধারণ করিতে সমর্থ হইবেন।

যেমন সঙ্গীতের এক একটী তালে বা মূর্চ্ছনায় শ্রোতার স্মৃতিশক্তী বাড়িয়া

তবে, কিংবা চিত্রের রেখানিপাত বা ছায়ালোকের বিচিত্র মিলনে দর্শকের মন আকৃষ্ট বা আন্দোলিত হয়, তেমনই স্থপতির সৃষ্ট বিষয়ের আকৃতিগত সৌন্দর্য্যে মানুষের অন্তরে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের তরঙ্গ বহিতে থাকে। আমার এখনও মনে পড়ে যে, যখন বহুদূর হইতে সূর্য্যকিরণমাত্র তাজ আমার নয়নগোচর হইল, তখন কোন কল্পনারাজ্যের স্বপ্নে আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম! সোণার্কের সূর্য্যমন্দিরের নিকটে যাইয়া ও মহীশূরস্থ হালেবিডের মন্দির দেখিয়াও এই প্রকার বিস্মিত ও পুলকিত হইয়াছিলাম; অবশ্য, সর্ব্বস্থানে মন একই প্রকার চিন্তায় পূর্ণ হয় নাই। যে সৌধের আকৃতিগত সম্পৎ যত অধিক, স্থাপত্যহিসাবে তাহার উৎকর্ষও তত অধিক; কিন্তু এই আকৃতিগত সৌন্দর্য্য-বিধানের একটা নিয়ম আছে; যে সৌধের যাহা উদ্দেশ্য, তাহার আকৃতি তদনুযায়ী করা উচিত। কোনও ব্যাঙ্ক বা বস্ত্রের দোকানকে আগরায় নিকটবর্ত্তী সিকন্দ্রাস্থিত আকবরের সমাধি-মন্দির বা অজন্তায় বৌদ্ধবিহারানুযায়ী নির্ম্মাণ করিলে সৌন্দর্য্যবিধানের আশা নিশ্চয়ই সুদূরপরাহত হইবে।

গ্রীকমন্দির পার্থিননের (Parthenon) সম্মুখ শীর্ষ পেডিমেণ্ট (pediment) দ্বারা শোভিত বলিয়া তোমার সোমেশ্বরের মন্দিরশীর্ষে, বা গাজিসাহেবের দরগায় পেডিমেণ্ট সন্নিবেশিত করিয়া দিলে, কিংবা হুমায়ুনের সমাধি-হর্ম্ম্যের গম্বুজ বা মিনারের সন্নিকটে পেডিমেণ্ট জাতীয় কোনও অলঙ্কারের সমাবেশ করিলে, সভ্যসমাজে তোমাকে বাতুলতার অভিযোগে নিন্দিত হইতে হইবে। বাস্তবিক যখন কলিকাতাস্থ কোনও অফিসের* সম্মুখে বহু উচ্চে স্থাপিত গ্রীক্ কারিয়াটাইডিস্ (Caryatides) মূর্ত্তিগুলি ও তাহার পার্শ্বে ইটালিয়ান্ ঢঙ্গের বারাণ্ডা নিরীক্ষণ করি, তখন আমার চক্ষে এমন যন্ত্রণা উপস্থিত হয় যে, মূর্ত্তিগুলিকে ভূমিসাৎ করিতে ইচ্ছা করে। পারসীকদিগের সাহায্যকারিণী কেরিয়াবাসিনীদিগের উচ্ছেদসাধন করিয়া যখন তাহাদিগকে যজ্ঞিনীস্বরূপে এথেন্স নগরে আনয়ন করা হয়, তাহার কিছু পরে পারসীকবিজয় চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এথেন্স নগরীস্থ এক্রোপলিসের (Acropolis) উপর ইরেক্থিয়ন্ (Erechtheion) নির্ম্মিত হইলে, তাহার তিনটী দ্বারদেশের অন্যতমের স্তম্ভের উপর কেরিয়াবাসিনী রমণীর মূর্ত্তি স্থাপিত করা হয়; এই স্থানে নিশ্চয়ই মূর্ত্তিগুলির সার্থকতা বিদ্যমান; কিন্তু কলিকাতাস্থ সঙ্কীর্ণ পথের উপর নির্ম্মিত ও বহু উচ্চে স্থাপিত, সুতরাং সাধারণ লোকচক্ষুর অগোচর কেরিয়া-রমণীর মূর্ত্তি-

* Oriental Life Insurance Company'র অফিস।

[illegible] ও অট্টালিকার যে কোনও প্রাচীর বা আবরণের আছে, তাহা মনে করা। যাহা, বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যা, বা বিদ্যালয়ের সেখানে সেখানে এ মূর্তিগুলি [illegible] হইবে, তাহাদিগের নিতান্তই সঙ্কোচ বোধ করিবেন।

এদেশের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, ইংলণ্ডের বিলাস [illegible] সম্ভবপর সহে [illegible] হওয়াতেই স্ত্রী জাতির এই দুর্দশা। এতৎসম্বন্ধে একবার মসজিদের [illegible] প্রণালীর আলোচনা করা যাউক, কেননা ধর্ম্মে "একেশ্বরাদি [illegible]" [illegible] উপাসনা সেখানে সেখানে অনুষ্ঠিত হইতে পারে; এই জন্য [illegible] উপযুক্ত স্থানাভাবে অন্যান্যের ন্যায়ও উপাসনা করিতে দেখিয়াছি [illegible] পথে, মাঠে, কাছারিতে, খেলো, পর্ব্বতশৃঙ্গে, বিংবা সমুদ্রের মধ্যে জলযানে [illegible] ইত্যাদিরূপ উপাসনা করিতে দেখা যায়। তাহাদের কোনও [illegible] এরূপ নিয়মের আবশ্যকতা নাই, কেন না, ইনি যে বিশ্বদেবতা, এবং [illegible] উপাসনার জন্য কোনও পুরোহিত বা মধ্যস্থ ব্যক্তিরও প্রয়োজন নাই [illegible] সম্বন্ধে ধর্ম্মযাজকের সাধারণ-তন্ত্র বিস্তার হইতে পারে; সুতরাং [illegible] উপযোগী স্থানের বা মসজিদের নির্ম্মাণকল্পনার কোনও [illegible] সম্ভবপর নহে। মসজিদটী এমন ভাবে নির্ম্মিত করিতে হইবে যে, উপাসনার [illegible] উপাসকদিগের দৃষ্টি পশ্চিম দিকে বা মক্কার দিকে নিবদ্ধ হয়; সম্মুখে একটী [illegible] প্রয়োজন, এবং তাহাতে একটী ফলাধার থাকা চাই; কেন না, [illegible] প্রক্ষালন করিয়া শুদ্ধদেহে, সমাহিতমনে উপাসনায় যোগদান করিতে [illegible] ধর্ম্মসম্প্রদায়ে জাতিবিচার নাই; যদিও কোনও কোনও উপাসককে [illegible] মসজিদের একান্তে উপাসনা করিতে দেখা যায়, তথাপি যাহার যেখানে ইচ্ছা [illegible] উপাসনা করিতে পারেন। এক সঙ্গে উপাসনা করিতে হইলেই সারিবদ্ধ [illegible] হয়। এ স্থান যেন বিশ্বদেবতার দরবার; এবং এই জন্যই বৃহদায়তন [illegible] মধ্যস্থলে বড় গম্বুজের ব্যবস্থা; পার্শ্বে গম্বুজগুলি সাধারণতঃ ক্ষুদ্রায়তন; [illegible] হেতু পার্শ্বে গম্বুজই দৃষ্ট হয় না। যথা—দিল্লীর "পুরাণা কিল্লা"স্থিত শেরশাহ [illegible] নির্ম্মিত মসজিদ, বিজাপুরস্থ গোল মসজিদ, বিংবা পারস্যের অন্তর্গত ইস্পাহানের [illegible] মেস্‌জিদ-ই-সাহ মসজিদ। প্রথমোক্ত শ্রেণীর মসজিদের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ [illegible] দৃষ্টগোচর হয়। কোনও কোনও মসজিদে মধ্যস্থ সর্ব্বোচ্চ গম্বুজের আশ্রয়ে পার্শ্বেও আর দুইটী মধ্যায়তন গম্বুজের ব্যবস্থা থাকে; যেমন মুলতানের [illegible] বাদুর জামে মসজিদ। বোধ হয়, বলিতে হইবে না যে, এই শ্রেণীর মসজিদগুলি পূর্ব্বোক্ত শ্রেণী হইতে নিকৃষ্ট।

হিন্দুর দেবতা। ভোগবাদ ধর্মাচরণের নিয়ম আছে; সুতরাং আমার জন্য ... প্রয়োজন। এই জন্যই ভোগমন্দির, নাটমন্দির প্রভৃতির ...।

আমার বক্তব্য এই যে, স্থূলদৃষ্টি-লিপ্ত বুদ্ধিতে হইলে, ইহার চরম লক্ষ্য বা ... প্রতি হৃদয়ঙ্গম হইলে চলিবে না। মানবজীবনে ও মানবরচিত শিল্পে ... নিয়ম প্রযোজ্য; অর্থাৎ, মানবজীবনে যে কারণে সংস্কার প্রভৃতির উদ্ভব, ... রচিত স্থাপত্য, সাহিত্য, কাব্য প্রভৃতি সর্ববিষয়েই, সংস্কার সেই কারণেই ... । যেখানেই সংস্কার, সেখানেই দেখিবে যে, মানব-মন চরম লক্ষ্যের ... প্রয়োজনীয়তা হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছে।

আধুনিক স্থাপত্যের আলোচনা করিলে সংস্কারের প্রভাব বেশ বুঝা যায়। এই ... কারণ অনেকগুলি; মানবের অনুকরণপ্রিয়তা তন্মধ্যে নগণ্য নহে। ... পত্রের অন্যতম অংশ ডোরিক গঠনপ্রণালীর এন্টাব্লেচার (entablature) ... (Triglyphs) প্রভৃতির যে ব্যবস্থা আছে, আমাদের বঙ্গদেশের কোনও "চোচাল" মন্দিরে তাহার পুনরাবৃত্তি দেখিলে বিকৃত অনুকরণপ্রিয়তার প্রকৃষ্ট ... পাওয়া যায়; দুঃখের বিষয়, আমাদের বঙ্গদেশে কত মন্দির যে এই ... রুচির পরিচয় দিতেছে, তাহা বলা অসাধ্য। মসজিদে এই বিকৃতরুচির ... অধিকতর প্রবল। প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের ... কর্ত্তৃক কোনও পুরাতন মসজিদ ভাঙ্গিয়া নূতন মসজিদ নির্ম্মাণ করিবার ... স্থানীয় মুসলমানদিগের সহিত এক বিরোধ উপস্থিত হইলে কোনও জেলা ... ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর কর্ত্তৃক আহূত হইয়া বিদেশীয় গঠনরীতি ও বিশিষ্টতা নিরীক্ষণ করিয়া সপ্রমাণ করিয়াছিলাম যে, পুরাতন মসজিদটি অতিশয় প্রাচীন নহে; ... মন্দির অপেক্ষা মসজিদে বিদেশীয় রীতির অনুকরণপ্রিয়তা অধিকতর ... হয়। দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণকালে চিদম্বরম্‌ মন্দিরের গোপুরম্‌ উপর "কেরেটেড্‌" লৌহের আবরণ দেখিয়া, ও গর্ভগৃহটি বিকৃতরুচিতে সংস্কৃত দেখিয়া ... ভীত হইয়াছিলাম। অনুকরণপ্রিয়তার আর এক কদর্য্য উদাহরণ ... মাদুরাই, মহীশূরস্থ হালেবিডের মন্দির-সংরক্ষণ ব্যাপারে। বাদশ শতাব্দীতে ... নৃপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত মন্দিরে ইংরাজী "প্যানেল" (panel) ... ... আমি এত দুঃখিত হইয়াছিলাম যে, বাঙ্গালোরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ... কর্ত্তৃপক্ষীয় কর্ত্তার নিকট এ সম্বন্ধে অভিযোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম; ... নিজের আমাদের ভারতবর্ষে কেন, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই যথেষ্ট উদাহরণ মিলিবে।

ষোড়শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া [illegible] ইউরোপের স্থাপত্য যে বিশেষ উন্নতি হইল না বলিয়া ইউরোপীয় [illegible] প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহার মূল কারণ অনুসন্ধান [illegible] যে, রোমক স্থাপত্যের অনুকরণস্পৃহা য়ুরোপের মনীষা [illegible] দেশ, কালের উপযোগিতা ও আদর্শ এবং স্থাপত্যে [illegible] করিয়া রোমক রীতির প্রচলন-মানসে তাঁহারা যে [illegible] তাহা বুঝাইতে হইবে না। ইহার পূর্ব্বেই দান্তে, [illegible] প্রাচীন গ্রীসীয় ও রোমক সাহিত্য হইতে উপকরণ সং[illegible] পণ্ডিতদিগের মনে মধ্যযুগের সাহিত্য ও শিল্প হইতে বিদ্রোহে[illegible] ছিলেন। এই সময়েই (১৫২১ অব্দে) পণ্ডিতেরা ভিট্রুভিয়াস্ (১[illegible] প্রণীত স্থাপত্যসম্বন্ধীয় গ্রন্থ ইতালীয় ভাষায় অনূদিত করিলেন; ইঁ[illegible] প্রভৃতি পণ্ডিতেরা দেশবাসীর সম্মুখে গ্রীক্ সাহিত্য ও সভ্যতার ভাণ্ডার উ[illegible] করিলেন; মধ্যযুগের রীতিনীতি, সাহিত্যদর্শনের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা হ্রাস হইল; মধ্যযুগের স্থাপত্যরীতি আর লোকের চিত্তাকর্ষক রহিল না। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে লুপ্তপ্রায় স্থাপত্য আবার নবজীবনে সঞ্জীবিত হইয়া নবকলেবর ধারণ করিল। ইহাতে মানব-মনের মৌলিকত্বের লোপ হইয়া, এক বৈচিত্র্যের পরিবর্ত্তে একত্বের প্রচলন হইল। আমি এই নব-রোম্যান্ বা নব-গ্রীসীয় পদ্ধতির একেবারে নিন্দা করিতেছি না; কেন না, এ সময় অনেক[illegible] সুন্দর সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে; কিন্তু স্থাপত্যের যাহা প্রাণ—মৌলিকত্ব, সার্থকতা, প্রয়োজনীয়তা ও বিন্যাসবৈচিত্র্য—তাহার তিরোধান দেখি। একটা সামান্য উদাহরণ দিয়া আমার মন্তব্যটিকে বিশদ করিবার চেষ্টা করিব।

মহাবলিপুরের রথসংজ্ঞক মন্দিরগুলির আদর্শ কখনও বিংশ শতাব্দীতে প্রযোজ্য হইতে পারে না; এবং এ চেষ্টা কখনও লোকের চিত্তাকর্ষক হইবে না। এগুলির আয়তন বাড়াইয়া কমাইয়া, বায়ু চলাচলের ও লোকসঙ্কুলানের ভিন্ন বন্দোবস্ত করিয়া বহির্দৃশ্যের পরিবর্ত্তন না করিলে, কখনও এ সময়ে চলিতে পারে না। পুরাপ্রিয়তাকে স্থাপত্যের নিয়ন্তা করিলে উহার মর্ম্মস্থলে আঘাত করা হয়; কিন্তু পুরাতত্ত্ব-জ্ঞানকে আমরা অনেক স্থলে ইহার নিয়ন্তা করিতে পারি। এই পুরাতত্ত্ব-জ্ঞানসহায়ে আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারি যে, কোন্ কারণে অন্য কোন্ বিশেষ স্থাপত্য অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই; এই জ্ঞানের সাহায্যে আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে, যে নির্ম্মাণ-রীতি বা

স্থাপনবিন্যাস প্রিয়দর্শী অশোকের সময় চলিত, তাহা বিংশ শতাব্দীয় কলিকাতার ষষ্টক, দশম শতাব্দীতে চলিতে পারে না; বা, যে এক্রোপলিসের নির্ম্মাণ পেরিক্লিসের সময় [illegible] তাহা এ যুগে নিতান্ত বিসদৃশ হইবে; কেন না, পেরিক্লিসের সময়ের [illegible] ও সমাজের মূলতত্ত্বগুলি বিংশ শতাব্দীতে প্রযোজ্য নহে।

[illegible] যোধাবাই-মহল বলিয়া কথিত, তাহা ষোড়শ [illegible] আকবরের মহিষী যোধাবাইএর তৃপ্তিসাধন করিত বটে, [illegible] আমাদের ন্যায় সামান্যাবস্থ পরিবারের মহিলারা তথায় [illegible] করিতে পারিবেন না, কেন না, তাঁহাদের বাসোপযোগী যথেষ্ট বায়ু ও [illegible] অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধানের বন্দোবস্ত নাই।

[illegible] স্থাপত্যবিষয়ে সংস্কারের প্রভাবের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা গিয়াছে। এই বিষয়ের চিন্তা করিতে গিয়া ইহার অংশীভূত আর একটী কথার উল্লেখ প্রয়োজনীয় মনে করি। ইহার প্রতি অনুরাগ অনেকের পক্ষে সংস্কারস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোনও অট্টালিকানির্ম্মাণে ইহার অংশ সকলের পরস্পর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া তাহাদের বিন্যাস-সাধন বা symmetry-রক্ষাকে লক্ষ্য করিয়াই আমি পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিলাম। এখনকার দিনে কিন্তু symmetryর, বা পরস্পরের মধ্যে বিন্যাস-সামঞ্জস্যের ছুচ্ছেদ্য বন্ধনে আর স্থাপত্যকে, বিশেষতঃ বাসগৃহসম্বন্ধীয় স্থাপত্যকে বাঁধা চলে না; এ কথায় হয় ত অনেকে বিস্মিত হইবেন; কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে নিশ্চিতই বুঝিবেন যে, [illegible] হি নো দিবসা গতাঃ"। ইহা সর্ব্বাংশে ভাল কি মন্দ, সে বিচারের স্থল ইহা নহে; কিন্তু কথাটা এই যে, যে সামাজিক বন্ধন একপরিবারস্থ সকলকে যে প্রীতি ও সখ্যের ভাবে বাঁধিত, এখন তাহার তিরোধান হইয়াছে। এখন [illegible] জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সামাজিক সম্পর্ক যদি জটিল হয়, তাহা হইলে যে স্থাপত্য তাহারই প্রতিবিম্বস্বরূপ, তাহা কখনই সরল সহজ হইতে পারে না। কথাটা আর একটু প্রণিধান করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বে আমরা সকলের সম্মুখেই আমাদের বেশভূষা পরিবর্ত্তন করিতে ত্রিধা বোধ করিতাম না; এখনও বনিয়াদী ঘরের ব্যবস্থা এই যে, ভৃত্যেরাই প্রভুর পরিধেয় বস্ত্রাদি পরাইয়া দেয়। পূর্ব্বে ভৃত্যের গতায়াত সর্ব্বত্র সম্ভবপর ছিল; সুতরাং Dressing room বলিলে যাহা বুঝায়, তাহার প্রয়োজনীয়তা ছিল না; কিন্তু বর্ত্তমান সমাজে আমরা ক্রমশঃ দেখিতেছি যে, বিশ্বাসী ভৃত্য দূরে

[illegible] ষ্টাইক, মানুষ পুরা পর্য্যন্ত ধিয়ার বেশভূষা-পরিবর্ত্তনের সময় মনুষ্যে [illegible] যাবে না; Dressing roomই বল, আর গাহাই বল, একটী ক্ষুদ্র কক্ষ [illegible] প্রয়োজনীয়তা বেশ পরিস্ফুট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৃহৎ প্রকোষ্ঠের নিকট একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের স্থাপনা করিতে হইলে গৃহনির্ম্মাণ ব্যাপারটা [illegible] ও জটিল হইয়া পড়ে। বৃহদায়তন প্রকোষ্ঠে বায়ু ও আলোক চলাচলে যে প্রকার ধার ও জানালার বন্দোবস্ত করা উচিত, ক্ষুদ্রায়তন Dressing [illegible] কিন্তু Bath roomএ সে প্রকার কখনই বন্দোবস্ত নহে; সুতরাং এই [illegible] আমলের বাটীতে symmetry বা অংশ সকলের সামঞ্জস্য যেরূপ অনায় [illegible] এখনকার সমাজে তাহা অসম্ভব।

লক্ষ্ণৌয়ের বাটীর প্রকোষ্ঠগুলি প্রায়ঃ একই আয়তনে নির্ম্মিত হইবার কারণ যে, সে সময়কার সামাজিক জীবনে জটিলতা ছিল না; তখনকার সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে একাত্মতা ছিল।

Symmetryর ছাঁচে ঢালা বাটীগুলি প্রাণহীনতার পরিচায়ক, ইহার কঠোর শাসনে জীবনীশক্তির হ্রাস হয়, এবং যে মৌলিকতা স্থাপত্যের উৎকর্ষ, তাহা সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে; কিন্তু এক এক জনের এমনই মোহ [illegible], symmetryর কথায় দেখিলে তাঁহারা বিশ্ব অন্ধকারময় দেখে, তাহাদের কৃতির লোপ হয়। ফরাসী সম্রাট চতুর্দ্দশ লুইএর মতে, কোনও অট্টালিকার সামঞ্জস্য রক্ষিত হইলেই তাহার সার্থকতা সিদ্ধ হইত। সম্ভবতঃ ভার্সাইতে এই কার্য্যপ্রণালী সাদরে গৃহীত হইয়াছিল, এবং স্থাপত্যের ধারা এই রূপ নিয়ম আশ্রয় করিয়া প্রবাহিত হইত। ইহার ফল বড় বিষময় হইয়াছিল। [illegible] মানসার্ড (Mansard) কর্ত্তৃক কল্পিত ও চতুর্দ্দশ লুই কর্ত্তৃক আদৃত Chateau de clagny নিরীক্ষণ করিলে বুঝা যায় যে, symmetry রক্ষা করিতে গিয়া অট্টালিকাটি কিরূপ অসঙ্গত হইয়া পড়িয়াছে। [illegible] দক্ষিণপার্শ্ব বামপার্শ্বের অনুরূপ; কিন্তু এই সাদৃশ্যবোধে যে কিরূপ অযথা ও অসঙ্গত, তাহা যাঁহারা প্রকোষ্ঠগুলির উদ্দেশ্য অবগত আছেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইবে না। বামপার্শ্বটি রাজকীয় আবাসমণ্ডল-রূপে কল্পিত, এবং দক্ষিণ পার্শ্বের অংশগুলি মন্ত্রণাগৃহ, দরবার প্রভৃতির জন্য নির্ম্মিত। শয়ন ও বেশ-পরিবর্ত্তনের ক্ষুদ্রায়তন প্রকোষ্ঠগুলির বহির্দ্দৃশ্য বৃহদায়তন মন্ত্রণাগৃহের অনুরূপ, এবং Bath room রাজকীয় উপবেশনাগারের সদৃশ। স্থাপত্যে এরূপ symmetryর পক্ষপাতী, অনুমোদন করেন, তাঁহারা যে নিতান্ত ভ্রান্ত, [illegible] তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার মাশুল প্রদান করে।

স্থাপত্যের প্রকৃত সৌন্দর্য্য অঙ্গসমূহের সামঞ্জস্যবিধানের মধ্যে নিহিত নহে ; কোনও সৌধের অঙ্গসংস্থানের সমতুল্যতা বা balancing রক্ষা করিলে স্থাপত্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এক পার্শ্বে এক প্রকারের বাইদ্ধের ব্যবস্থা আছে বলিয়াই তাহার বিপরীত দিকে যে ঠিক সেই প্রকারের বন্দোবস্ত করিতে হইবে, এমন কোনও নিয়ম নাই ; কিন্তু এমনটি করিতে হইবে যে, সমষ্টি-ভাবে দেখিলে যেন অঙ্গসংস্থানের মধ্যে একটা সমতুল্যতা রক্ষিত হয়। বিষয়টি আর একটু বুঝিবার চেষ্টা করিব।

গম্বুজ বা মেনারকে অঙ্গসংস্থানের ঠিক মধ্যস্থলে কল্পিত করিতে হইবে, এমন ব্যবস্থা কখনই সর্ব্বসময়ে ও সকল অবস্থায় বাঞ্ছনীয় নহে ; আর সকল সময় সম্ভবও নহে। গির্জ্জাগুলির উচ্চ ঘণ্টাঘর বা belfry এক পার্শ্বে নির্ম্মিত হইয়া থাকে, এবং তাহার পার্শ্বে ক্রমনিম্ন ছাদযুক্ত বহুকোষ্ঠের ব্যবস্থা ; এই প্রকোষ্ঠের পূর্ব্ব দিকের ভিত্তির দুই ধারে দুইটা সামান্য উচ্চ মেনারের ব্যবস্থা ; ইহার মধ্যে symmetry নাই ; কিন্তু অঙ্গসংস্থানের মধ্যে একটা মনোহর সাম্য বা শৃঙ্খলা লক্ষিত হয় ; তাহাতে বোধ হয়, যেন ওজন করিয়া অঙ্গগুলিকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। আর একটী উদাহরণ দেওয়া যাউক। অনেকেই পুরীধামে জগন্নাথের মন্দির দেখিয়াছেন ; বিমানের উপরিস্থ দেবের এক পার্শ্বে নির্ম্মিত না হইয়া যদি ঠিক মধ্যস্থলে, অর্থাৎ, জগমোহন ও নাটমন্দিরের শীর্ষে স্থাপিত হইত, তাহা হইলে symmetry-দর্শনেচ্ছা চরিতার্থ হইত বটে, কিন্তু চিত্রকরী চক্ষে ঘুরে যাইতেন।

স্থিতিবিজ্ঞানে (statics) আমরা যে সাম্যের কথা পাঠ করিয়াছি, তাহার তুলনা স্থাপত্য বিষয়ে প্রযোজ্য ; বলগুলি কোনও নির্দ্দিষ্ট আপেক্ষিক অবস্থায় থাকিয়া প্রযুক্ত হইলে যে সাম্য-ব্যাঘাত সংঘটিত হয়, ইহাদের মধ্যে একটী বলের অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটিলে যেমন সেই সাম্যের লোপ হয়, তেমনই কোনও সৌধ বা প্রাসাদের অঙ্গসংস্থানের বিপর্য্যয় ঘটিলে স্থাপত্যঘটিত সাম্যের তিরোধান হইবে ; এ কথার প্রমাণ দর্শকের চক্ষে।

Symmetryর কথা উঠিলে যাঁহারা ঠিক হাঁ-তে হাঁ মিলাইয়া তাহার কথা তুলিয়া আপনাদের মত পরিপুষ্ট করিবার চেষ্টা করেন, আমি তাঁহাদিগকে খ্রীঃ পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে নির্ম্মিত এথেন্সের অন্তর্গত "ইরেক্থিয়নে"র কল্পনা চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। উহার নির্ম্মাণে অঙ্গসমূহের সামঞ্জস্যবিধানকে স্থাপত্যবিশেষের অন্যতম বলিয়া গণ্য করা হয় নাই। এই মন্দির বাস্তবিক দুরূহতার বিন্যাস ও বিস্তারে

যেরূপ রীতির অনুসরণ করা হইয়াছে, তাহা দেখিলে বিস্মিত ও আনন্দিত হইতে হয়। বিস্ময়ের কারণ এই যে, অত প্রাচীন কালেও গ্রীক্ স্থপতিরা অঙ্গসমূহের সংস্থানে সমতুল্যতা ও সঙ্গতি দ্বারা যে শিল্পের চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহা এত সুন্দররূপে বুঝিতেন; আর আনন্দের কারণ এই যে, বহির্দৃষ্ট দর্শনেন্দ্রিয়ের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া চিত্তে অনন্ত চিন্তার দ্বার খুলিয়া দেয়।

যে ইরেক্থিয়নের কথা বলিলাম, তাহা গ্রীক্জাতির অতিশয় প্রিয়; ইহাতে তাহাদের ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র উভয়বিধ সাধনা চিরস্মরণীয় করিয়া রাখা হইয়াছে। শুদ্ধ পারসীক বিজয়ের স্মৃতি উদ্রিক্ত করিবার জন্য ইহার কল্পনা হয় নাই। ইহাতে মিনার্ভা (Minerva) এবং নেপচুন্ (Neptune) উভয় দেবতার পূজার জন্য মন্দির রহিয়াছে; সুতরাং গ্রীক্জাতির অতিশয় প্রিয় ইরেক্থিয়ন হইতে তাঁহাদের স্থাপত্যসম্বন্ধীয় মত সপ্রমাণ করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। এ স্থলে বলিয়া রাখি যে, রোম্যানেরা symmetryর বিশেষ আদর করিতেন; তাঁহাদের এই অনুরাগ স্তম্ভ ও ত্রিরেখ (Triglyphs) বিন্যাসের মধ্যে বিশেষ অভিব্যক্ত। যাঁহারা রোম্যান্দিগের প্রাচীন ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে না যে, ব্যবস্থাপক বা বিধিনিষেধের প্রবর্ত্তক বলিয়া রোম্যান্দের বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। যে জাতি বিধিনিষেধের বিধানে বা ব্যবস্থাপ্রণয়নে শক্তি ব্যয়িত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা যে স্থাপত্যেও বিধি-নিষেধের প্রবর্ত্তক হিসাবে symmetryর প্রচলন করিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই।

শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

আলোচনা।

মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত।

গত মাসের সাহিত্যে শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয়ের "মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত" শীর্ষক যে সন্দর্ভটী একাশিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। গুপ্তমহাশয় স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার প্রবন্ধের শেষাংশটী "ইতিহাসসম্মত প্রামাণিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত" নহে। সুতরাং উক্ত "ভ্রমপ্রমাদমূলক" অংশের সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করা অসঙ্গত; কিন্তু শেষাংশে ঐতিহাসিক প্রামাণ্য গ্রন্থের যথেষ্ট ব্যবহার দৃষ্ট হয়: যথা, ভিন্সেন্টের Historic

Philippus XV. 4 ; প্লুটার্কের Vita Alexandri, ch. 62 ; বিষ্ণুপুরাণ ; তদ্ভ টীকা।—"চন্দ্রগুপ্ত" বিরচিত ; বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস নামক নাটক।

রমেশবাবু লিখিয়াছেন, "আমরা প্লুটার্কের গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি যে, আলেকজাণ্ডার—হেফেস্তীয়ের প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্কল্প করিলে নবীন যুবক চন্দ্রগুপ্ত (Sandrachotus) তাঁহার সহিত উপনীত হইয়া বলেন, অগ্রবর্ত্তী দেশে অতি সহজেই আপনার বিজয়পতাকা উড্ডীন করিতে পারিবেন।"

কিন্তু প্লুটার্ক লিখিয়াছেন,—"He [Alexander] also erected altars for the gods which the kings of the Prasii even to the present day hold in veneration, crossing the river to offer sacrifices upon them in the Hellenic fashion. Androkottos himself, who was then but a youth, saw Alexander himself, and afterwards used to declare that Alexander could easily have taken possession of the whole country * * * *"

—*McCrindle's translation.*

আধুনিক ঐতিহাসিকেরা অনুমান করিয়া থাকেন যে, শতদ্রু নদীর সন্নিকটেই দ্বিতীয় দেব-প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। Androkottos যৌবনারম্ভে আলেকজাণ্ডারের সাক্ষাৎ করিয়া থাকিবেন, কিন্তু সে ঘটনাটী যে ঐ স্থলে এবং ঐ সময়ে, অর্থাৎ শতদ্রুতীরে আলেকজাণ্ডারের প্রত্যাবর্ত্তন-সঙ্কল্পের পরে ঘটিয়াছিল, তাহার কোনও নির্দ্দেশ নাই। প্লুটার্ক জানাইতে চাহেন যে, তাঁহাদের বীররাজা আলেকজাণ্ডারের প্রতি আমাদের প্রভুত্ব-প্রতাপশালী রাজা Androkottosএর যথেষ্ট ভীতি ও ভক্তি ছিল। অথবা, এরূপ অর্থও অসঙ্গত নহে যে, আলেকজাণ্ডারের নির্ম্মিত দেবতারাই প্রাচ্য নৃপতিদিগের পূজ্য ছিলেন ; এবং স্বয়ং Androkottos (যিনি গ্রীকদিগের নিকট সর্ব্বপ্রধান ভারতীয় রাজা বলিয়া পরিগণিত) যবনরাজ আলেকজাণ্ডারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন,—কোথায়, কি সূত্রে এবং কোন সময়, তাহা জানা নাই ; তবে তখন Androkottos পূর্ণযৌবন প্রাপ্ত হন নাই ; উপরন্তু, পরে (অর্থাৎ এই সাক্ষাতের পরে) Androkottos বলিতেন যে, আলেকজাণ্ডার ইচ্ছা করিলেই সমগ্র দেশ জয় করিতে পারিতেন।

শুভ মহাশয় লিখিয়াছেন, "মহারাজ নন্দের দ্বিতীয়া রাণী মুরা শূদ্র অপেক্ষাও অধম কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" ইহার অর্থ বোধগম্য হইল না ; শূদ্র অপেক্ষা অধম কুল যে কি, তাহা আমার অবিদিত। তবে জনশ্রুতি এই যে, মুরা জাতিতে ক্ষৌরকারিণী ছিলেন। ক্ষৌরকারিণী কি অন্যরূপ শূদ্রাণী অপেক্ষা অধমা ? তা ছাড়া, এ জনশ্রুতি কত দিনের প্রাচীন ? মুদ্রারাক্ষসে মুরার নামগন্ধও নাই ; থাকিলেও বিশেষ আসিয়া যাইত না ; কারণ ওটা একটী নাটকমাত্র। যদি নাটক পুরাতন হইলেই বিশ্বাসযোগ্য হয়, তাহা হইলে দেখিতেছি, কিছু দিন পরে স্বর্গীয় ডি, এল, রায় মহাশয়ের "চন্দ্রগুপ্ত" নামক নাটকটীও ইতিহাস-লেখকের কাজে আসিবে !

রমেশবাবু বলিতেছেন, "বিষ্ণুপুরাণে চন্দ্রগুপ্তকে মৌর্য্যবংশের শেষ-পুরুষরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।" ইহা আমাদের পক্ষে নূতন সংবাদ। বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে—

"নবনন্দান্ দ্বিজঃ কশ্চিৎ প্রপন্নান্ উদ্ধরিষ্যতি
তেষামভাবে জগতীম্ মৌর্য্যা ভোক্ষ্যন্তি বৈ কলৌ।"

ভাগবতেও ঐরূপ।

মৎস্য, বায়ু এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

"উদ্ধরিষ্যতি তান্ সর্ব্বান্ কৌটিল্যো বৈ দ্বিজর্ষভঃ
ভুক্ত্বা মহীম্ বর্ষশতম্ ততো মৌর্য্যান্ গমিষ্যতি।"

পুনরপি গুপ্ত মহাশয়ের মতে, "এই অংশের [অর্থাৎ বিষ্ণুপুরাণের এই অংশের] নিম্নোক্ত প্রকার লিখিত হইয়াছে যে, চন্দ্রগুপ্তের মাতার নাম হইতে তাঁহার বংশের মৌর্য্য নামকরণ হইয়াছিল; তাঁহার মাতার নাম 'মুরা', তিনি মহারাজ নন্দের অন্যতম মহিষী ছিলেন।" শ্রীধরস্বামীর টীকা এইরূপ :—"নন্দস্যৈব মুরানাম্নাং পত্ন্যাস্তস্যাং পুত্রঃ চন্দ্রগুপ্তো মৌর্য্যাদি-প্রথমঃ।" অর্থাৎ, "বিষ্ণুপুরাণোল্লিখিত মৌর্য্যগণের আদিম-পুরুষ চন্দ্রগুপ্তের মাতার নাম মুরা; ইনি নন্দরাজারই অন্যতমা মহিষী।" ইহাতে "মুরা" হইতে "মৌর্য্য" শব্দের নিষ্পত্তি স্পষ্ট নির্দ্দেশ নাই; সম্ভবতঃ গুপ্ত মহাশয় বলিতেছেন,—"চন্দ্রগুপ্ত মাতার অভিধান হইয়া মৌর্য্য উপাধি গ্রহণ করেন। বিষ্ণুপুরাণের টীকাকারের মতে, চন্দ্রগুপ্তের মাতা মুরা হইতে মৌর্য্য উপাধি নিষ্পন্ন হইয়াছে।" এ সকল নূতন তথ্য কোথা হইতে আবিষ্কৃত হইল? অথচ, শ্রীধরস্বামী যে ক্ষেত্রে এবং যেরূপ ভাবে টীকাটি লিখিয়াছেন, তাহা হইতে অনুমিত হইতে পারে যে, "মৌর্য্য" নামটীর উদ্ভব নির্দ্দেশ করাই তাঁহার গৌণ উদ্দেশ্য; এবং সেই উদ্দেশ্যেই চন্দ্রগুপ্তের মাতার নাম "মুরা", এ কথাটী, দৃষ্টান্তঃ সামান্য হইলেও, সম্ভবতঃ প্রসঙ্গতঃ বলিয়া—লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এ অনুমান সত্য কি না, কে স্থির করিবে?"

শেষ কথা, সংস্কৃত-ব্যাকরণানুসারে "মুরা" হইতে "মৌর্য্য" পদ নিষ্পন্ন করা যায় কি? ঐরূপ, "স্ত্রীভ্যো ঢক্", অর্থাৎ, স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর ঢক্ হয়। যথা, মুরার অপত্য মৌরেয়। মৌর্য্য নহে। যদি চন্দ্রগুপ্তের মাতা সত্যই নন্দরাজার মুরা (অথবা তদপেক্ষা অন্য কিছু) স্ত্রী হইতেন, তাহা হইলে চন্দ্রগুপ্ত কি মাতার নাম হইতে পিতৃ বংশের নামকরণ করিতেন? মুরাপ্রসূ মৌর্য্যেরা নন্দবংশ হইতে পৃথক্ ভাবেই বর্ণিত। এই দুই বংশের সম্বন্ধ কিরূপ নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহা ইতিহাসবেত্তার অনুসন্ধানের বিষয়। মুদ্রারাক্ষসেই এই কলঙ্কের কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

শ্রীঅজীতকুমার মৈত্র।

মধু-গয়া।

[স্থানবৃত্তান্তের কথা।]

গয়াধামে যে ব্রহ্মযোনিপর্ব্বতে একটী প্রকাণ্ড স্থান, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। অনেকে এই মহাপুণ্যক্ষেত্রে প্রাদ্ধ করিয়া কীর্ত্তিরক্ষা করিতেছেন, ইহা

স্মরণ করিয়া আমরা সেই মাননে একটা দল বাঁধিলাম। তারিখ ২৫এ ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ।

দলের মধ্যে অনেকেরই শ্রাদ্ধ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সকলের সে রকম অর্থ-সম্বল নাই। অতএব আমরা চাঁদা করিয়া একটা 'কোপারেটিভ ফণ্ড' তুলিলাম। চাঁদা করিয়া এবং দল বাঁধিয়া কোনও বৃহৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিশেষ সুবিধা আছে। হয় ত কার্য্যসিদ্ধি নিশ্চয়, নচেৎ সকলে মিলিয়া রসাতলে যায়। এরূপ কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে স্বার্থপরতার লেশমাত্র নাই।

এ দলের বিশেষত্ব ছিল। স্ত্রী ও পুরুষ একত্র দল বাঁধিয়াছিল। কাহারও কাহারও মতে স্ত্রীলোক শ্রাদ্ধ কিংবা গীতা-পাঠ প্রভৃতি শুভকর্ম্মের অধিকারিণী নহেন। কিন্তু অনেকে বলিলেন যে, শ্রাদ্ধ না করিলেও, শ্রাদ্ধস্থলে বসিয়া যজ্ঞ দেখিবার, কিংবা যজ্ঞের সরঞ্জাম যোগাইয়া দিবার কোনও বাধা নাই। অতএব তাঁহাদের অনুরোধে আমরা স্ত্রীলোকদিগকে সঙ্গে লইলাম। যখন প্রথমে তাহাদিগকে বাটীতে বর্জ্জন করিয়া আসিবার কথা হইয়াছিল, তখন তাহাদিগের মুখ ম্লান হইয়াছিল, চক্ষু ছল-ছল করিয়াছিল, এবং তদ্দৃষ্টে অনেক সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয়ে করুণ রসের সঞ্চার হইয়াছিল। একেই আমরা দীনহীন জাতি, কখন্ রাজায়টে কোন্ 'চিলে ছোঁ মারিয়া' লইয়া যায়, তাহা কেহ বলিতে পারে না; এমতাবস্থায় স্ত্রীলোকদিগকে ছাড়িয়া কোথাও যাওয়া যেমন অর্ব্বাচীনের কাজ, স্ত্রীলোকদেরও আমাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া তথৈব চ। 'শ্রাদ্ধ-সমিতি'র সন্তুষ্টি-সাধনের জন্য কতকগুলি লোক—কেহ বা গীতবাদ্য, কেহ বা চিত্রকলা ও কাব্য প্রভৃতির শ্রাদ্ধসঙ্কল্পে প্রণোদিত হইয়া ছুটিয়া গিয়াছিলেন।

সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, আমাদিগের মধ্যে নানাপ্রকারের লোক ছিল। কাহারও নেক্‌টাই ও হ্যাট্-কোট্, কাহারও গেরুয়া রঙ্গের বস্ত্র ও পিরিহান্, কাহারও গর্ণেটের কোট্ এবং সোনার চেন, কাহারও এণ্ডির কোট্ ও পেটেলুন, কাহারও মস্তক অনাবৃত, কিন্তু মোজা ও বুটজুতা দ্বারা চরণযুগল সুরক্ষিত, কাহারও মুক্ত পদযুগল, কিন্তু কম্ফর্টারের দ্বারা মস্তক এবং গলদেশ সম্পূর্ণ আবৃত, এবং কাহারও কেবলমাত্র করাসডাঙ্গার ধুতি এবং 'পঞ্জাবী-আস্তীন'। কেশের পারিপাট্য সম্বন্ধে বক্তব্য যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও শশুরের চুল লম্বা ও পশ্চাতের ছোট, এবং কাহারও পশ্চাতে বিলম্বিত গুচ্ছ, সম্মুখে সমতলক্ষেত্র। কাহারও শ্মশ্রু সুরক্ষিত, এবং কাহারও শ্মশ্রু একেবারে লুপ্তিত।

[illegible] মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, ইংরেজের বিরুদ্ধে [illegible] তুলে দেওয়াই ভাল; কারণ, এই প্রবন্ধটা উপন্যাস নয়। ও যেন [illegible] হলেঃ একরূপ হইয়া পড়িত। একটা প্রবন্ধ লিখিয়া জনসাধারণকে [illegible] বলা যায়ত। বিশেষতঃ যাহারা কলেজে পড়ে, তাহাদের চরিত্রের [illegible] এইরূপ চরিত্রকে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া মনের মত করিয়া লওয়া অসম্ভব; কারণ, [illegible] চরিত্র বিষয়ে পাকা বাঁশ বিশেষ শক্ত এবং পুরাতন খাপরা ভঙ্গুর। [illegible] সমিতির মধ্যে কোনও ঐক্যগঠি ছিল না। ওভয়ের কোনও [illegible] ইতিহাস-বিরুদ্ধ; বরং অন্যান্য দেশে, যেমন ফ্রান্স, আয়ার্লণ্ড, রাশিয়ায় এই [illegible] দেখা যায়। তবে নিম্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে :—

১। রাধাধন গাঙ্গুলী—ইনি খুব হিন্দু, এবং গীতা প্রভৃতি পাঠ করেন। [illegible] সন্ধ্যা-আহ্নিক প্রভৃতিতে খুব মনোযোগী। একটা রেলওয়ে পার্সিলের বড় বাবু। ইনি ওকালতী পাশ করিয়াছেন, তাহা ব্যবহার করেন নাই। বয়স কম, এবং [illegible] বলে, সকলে মনে করিয়াছিল যে, পরলোকগতা স্ত্রীর শ্রাদ্ধ করিতেই [illegible] আসিয়াছেন। ইহার সঙ্গে এক 'স্যুট' শার্ট, কোট, এবং নেক্‌টাই ছিল, [illegible] মধ্যে মধ্যে পরিধান করিতেন। 'কাড়ি, গোঁফ, সব সমান'।—

২। হাকাদ বসু ভঙ্গীল। ইনি 'পজিটিভিস্ট'-বিশ্বাসী। ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম, ন্যায় এবং অন্যায়, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের মধ্যে কোনও পার্থক্য আছে, তাহা স্বীকার করেন না। 'অমনিবাস'-(ইভল্যুশন)-বাদী। ইহার তিনটি [illegible] বিবাহ করায়ও এখনও বিবাহ হয় নাই। কারণ, তিনি পণের বিরোধী, এবং সমাজের শ্রাদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প। [illegible] আছে।

৩। ধনুর্বেদ হারাধন ঘোষ। বিখ্যাত 'ঘোষ কোম্পানী' (ন্যাশনাল এবং ফেনসিবল অর্ডার সপ্লাইয়ার্স) ইহারই নামা [illegible] দোকানদারী সম্বন্ধে ইহার মত বিলাত খুব সম্ভ্রান্ত লোকের ছিল। 'পজিটিভ ইকনমীতে এক জন ওস্তাদ। ভলিবলের পিণ্ড দিতে আসিয়াছিলেন। খুব [illegible] লোক, এবং হবিষ্যভুক্ত। বয়স আর পঞ্চাশ, [illegible] ছেলেপুলে নাই।

৪। বরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য। ইনি সম্প্রতি মেডিকেল কলেজ হইতে বাহির হইয়াছেন। পসার হয় নাই। খাটী সাহেব, এবং ডাক্তারীতে [illegible] বুৎপত্তি, [illegible] দেখিলেই। ইনি রোগী [illegible] আসেন।

৫। নিবারণ বাড়ুয্যে। নিষ্কর্ম্মার ঢিপি ও পরীক্ষা লোক। [illegible] নাই। [illegible] ইহাদের প্রবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছিলেন।

৩। সাতকড়ি মিত্র, বি, এ। হারাধন বাবুর ভাগিনেয়। নবা ছোকরা, সৌখীন আষ্টীন্। কাব্যশীল। সকলেরই প্রিয়, এবং ঘরের ছেলের মত।

৪। গদাধর ভট্ট, এবং তদীয় শ্যালক। ইহারা গান গাহে ও তবলা বাজায়। ব্রাহ্মসেল প্রভৃতির শ্রাদ্ধের জন্য ব্যস্ত। ইহারা বিষ্ণুপুরের লোক। বৈষ্ণব।

২

আমরা পুরুষবর্গের মধ্যে কেবল সপ্তরথীর নাম করিলাম মাত্র। ইহা ছাড়াও যাহারা জুটিয়াছিল, তাহাদের যথাসময়ে ও যথাস্থানে উল্লেখ করিলেই চলিবে। অতঃপর যে সকল স্ত্রীলোক শ্রাদ্ধসমিতিতে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও উল্লেখ করা উচিত।

১। দুর্গা ঠাকুরাণী। ইনি হারাধন গাঙ্গুলীর মাতা। ধর্ম্মে নিষ্ঠাবতী, সেকালের লোক। বিধবা।

২। মিস্ নিস্তারিণী বসু। শ্যামচাঁদ উকীলের কন্যা। ইহার অনেক স্থান হইতে বিবাহের প্রস্তাব আসিতেছিল। লিখিতে পড়িতে খুব হুঁসিয়ার, এবং ছবি টানিতে ও গান গায়িতে জানেন। বিনম্রা, লজ্জাশীলা, সুশ্রী, এবং কোমলচরিত্রা। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা।

৩। হারাধন ঘোষের স্ত্রী গরবিনী ঘোষ। খুব গর্ব্বিতা, এবং প্রশস্তদেহা। মনে অনেক টাকা, এবং একরাশি গহনা। শ্রাদ্ধসমিতির সেক্রেটরী।

৪। খগেন্দ্র ডাক্তারের স্ত্রী, বিমলা। অল্প দিন বিবাহিতা। ঠাকুর দেবতার উপর, এবং পতির উপর স্ত্রীলোকের কি করিয়া ভক্তি হইতে পারে, এই সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন।

৫। গদাধর ভট্টের শ্যালকের স্ত্রী মালতী। একটা বেয়াকুফ্ স্ত্রীলোক।

৬। ঝি।

এতগুলি পুরুষের ও স্ত্রীলোকের পরিচয় দিবার বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য নাই। কেবল ইহাই বক্তব্য যে, নানা রকমের লোক হইয়াও ইহাদের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব একতা সঞ্চারিত হইয়াছিল। পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট সহানুভূতি। সকলেই পরস্পরের সুখসাধনের জন্য ব্যগ্র। সকলেই একটা দল। সকলেরই পাঁচ রকম কথাবার্ত্তা, গলার সাতটা সুর, মুখের সাতটা ভাব, অঙ্গের সাতটা ভাবভঙ্গী লইয়া যেন একটা বৃহৎ গান, কিংবা একটা বৃহৎ কাব্য, কিংবা একটা সুদৃশ্য চিত্র দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। একটা গূঢ় কল্পনায় যেন সকলে বিভোর, একটা সুরে যেন সকলেই অনুপ্রাণিত।

সেই ভাবটুকু, গানটুকু, কিংবা কান্নাটুকু একটা বিরাট আঘাতে উধাও হয়ে গেছে। বুকের ব্যথা, দুঃখের কথা ও দুরাশা প্রভৃতি অন্তরে সেদিন কাঁদিয়া আজ সকলেই মধু-গয়ার যাত্রী।

পাছে হাবড়া ষ্টেশনে রেলে চড়িতে গোলমাল হয়, সেই জন্য বড় বাবু হারাধন গাঙ্গুলী তাঁহার সুপরিচিত বালি ষ্টেশনে সকলকে পূর্ব্বেই নৌকারোহণ করাইয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকালে শিবাকুলের তীব্র ও উদাস ধ্বনিকে অতিক্রম করিয়া তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে রেলগাড়ীতে আরোহণ করিলেন।

স্ত্রীলোকেরা স্ত্রীলোকের গাড়ীতে গেল, এবং পুরুষগণ তাহারই পার্শ্বের গাড়ীতে (ইণ্টারমিডিয়েট কম্পার্টমেণ্টে) বসিয়া পড়িল।

সকলেই 'গয়া-অওাল' প্যাসেঞ্জার ধরিয়া প্রথমতঃ লুপলাইন এবং তাহার পর 'দক্ষিণ বিহার' রেলপথ বাহিয়া যাইতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

প্রাতঃকালে আমরা একটা ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, সেটার নাম পাকুড়। হারাধন গাঙ্গুলী বুঝাইয়া দিলেন যে, আমরা বিহারাঞ্চলের সাঁওতাল পরগণার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন বাঙ্গালা দেশ দূরে পড়িয়াছে। ইহাতে আমাদের মনে কেমন একটা মায়ার সঞ্চার হইল। এমন সময় এক ব্যক্তি একটা ব্যাগ হাতে করিয়া আমাদের পার্শ্বের কামরায় উঠিয়া পড়িল। সাতকড়ি জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাশয়ের নিবাস ?'

আগন্তুক। মহেশপুর। আপনারা কোথায় যাচ্ছেন ?

সাতকড়ি। গয়াতে শ্রাদ্ধ কর্ত্তে। এদেশের বাসিন্দা ও সমাজ কি প্রকার ? ভাষা কি ?

আগন্তুক। এ দেশে দু রকম জাতি বাস করে। বাঙ্গালী ও সাঁওতাল। সাঁওতাল জাতি পূর্ব্বে নিজের ভাষা নিয়ে থাকৃত, ক্রমে বাঙ্গালীর সঙ্গে মিশে তাদের ভাষা একটু বদলে আস্‌ছিল। এখন এ দেশ বিহারের অন্তর্গত হওয়াতে সেটার সঙ্গে আমরা হিন্দুস্থানী ভাষা মিশিয়ে ফেল্‌ছি। তিনটে ভাষা মিশে এখন একটা সুন্দর ভাষার উৎপত্তি হচ্ছে। এই ভাষাটা পূর্ব্বদিকে বীরভূমের হেতমপুর হ'তে আরম্ভ ক'রে উত্তরে মালদহের প্রান্ত, দক্ষিণে হাজারিবাগ, পশ্চিমে মুঙ্গের জেলার চকাই পরগণা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। এই সাঁওতাল পরগণার সীমার মধ্যে। আমার পূর্ব্বপুরুষেরা সাঁওতাল ছিল। আমার পিতার নাম বোঙ্গা মাঝি, আমার নাম 'হরকালী'। কর্ত্তারা রেখে ছিলেন। আমি পাকুড়ের জমীদার পাঁড়েদের এক জন লাঠিয়াল সর্দ্দার। এরা

আমার যে ছেলে হবে, তার নাম গনোরি মারি থাকবে। এ নামটা পুরা হিন্দুস্থানী। সে আমাকে 'বাবুজী' বলে ডাকবে, ও আর মাতাকে ডাকবে 'হো মাতারি', ও ভ্রাতাকে ডাকিবে 'ভইয়া হো!'

সাতকড়ি। কি সুন্দর পরিণাম! এতে একটা মস্ত সুবিধা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় কাব্যের ছন্দ মেলাবার জন্য কথা ভাবতে হয়, এদের কাছে নূতন কথা শিখলে সেটার অভাব দূর হবে।

খগেন্দ্র ডাক্তার কথাটা টুকিয়া লইলেন। 'আচ্ছা, তোমাদের আচার ব্যবহারের কোনও দুর্দ্দমনীয় ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হইয়াছে?'

আগন্তুক (হাসিয়া) 'হয়েছে বৈ কি। আমরা ছাতুর সঙ্গে মাগুর মাছের ঝোল খাই। আমাদের স্ত্রীলোকেরা মাথায় ঘোমটা দেয় না, হোলীর সময় হাতে বীণা নিয়ে নাচে, তখন আমরা মাদল বাজাই। তারা যখন গান করে, তখন কখনও বাঙ্গালা ভাষায়, কখনও হিন্দীতে, কখনও তার সঙ্গে সাঁওতালী মিশিয়ে গেয়ে।

সাতকড়ি। কি সুন্দর! কি বিশ্বজনীন! কি বিরাট!

শ্যামচাঁদ বাবু বলিলেন, 'ইহার মধ্যে কিছুই আশ্চর্য্য নাই। হার্বার্ট স্পেন্সর বলছেন যে, 'হেটেরোজেনেটি' অর্থাৎ, রকমারির বিকাশই ক্রমোন্নতির চিহ্ন। মানবের সৃষ্টির অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই, ইহারা সকল রকম সৃষ্টি মিশাইয়া নানা রকম 'টাইপ্' বের করবে, এবং তাই নিয়ে দ্বন্দ্ব সংগ্রাম, আনন্দ আহ্লাদ করে' শিঙ্গে ফুঁকে দেবে।'

৩

আগন্তুক শ্যামচাঁদ বাবুর কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় কুতূহলী হইয়া পড়িল। 'মহাশয়ের কথাগুলো যদিও আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না, তবুও শুনতে ভাল লাগছে'।

শ্যামচাঁদ। এতেই বুঝতে পারা যায় যে, আপনি ক্রমোন্নতির পথে যাচ্ছেন। সাহিত্যিক লোকে বলবে যে, 'আমরা ও সব বুঝি', তৎক্ষণাৎ বুঝতে হবে যে, তারা গোলদীঘি গিয়েছে। আপনি যে বুঝতে চাচ্ছেন, এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ দি! এই যে 'ইভল্যুশন' অর্থাৎ 'ক্রমবিকাশ' ও 'ক্রমোন্নতি', এটা ঠিক বুঝিয়ে ওঠা কঠিন। মনে করুন, এটা একটা গোলার মত জিনিস, অনাদিকাল কেবল রূপ বদলাচ্ছে। বড় বড় লোকে বলে যে, এটা একটা আদর্শের দিকে যাচ্ছে। কিন্তু যে আদর্শ কি, তা কেউ ঠিক বলতে পারে না। কেউ জ্ঞানের আদর্শ দিকে

দেখায় যে, এর ভেতর হ'তে এমন জীব বেরুবে যে, তাহারা মহাজ্ঞানী হয়ে সকলকে জ্ঞানে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলবে। কেউ ভক্তির আদর্শ দিয়ে দেখাবে যে, সকলে খুব ঈশ্বরভক্ত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে সখ্যতায় আবদ্ধ হয়ে যাবে—এক হয়ে পড়বে—পরস্পরের দুঃখ সমান ভাবে বেঁটে নিয়ে সকলেই সুখী হবে। কেউ কর্ম্মের আদর্শ দিয়ে দেখায় যে, সকলে বেশ বুঝে', জেনে শুনে, কর্ত্তব্যজ্ঞানে পরস্পরের হিতের জন্য কর্ম্ম করবে। সকলেই কর্ম্মযোগী, ভক্তিযোগী, জ্ঞানযোগী প্রভৃতি যোগী ঋষির মত এই সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করবে। জীব দুঃখ পাবে না, সংসারে পাপের লেশমাত্র থাকবে না। সংসার নন্দনকাননের মত হয়ে যাবে। কেউ কারু নয়, অথচ সকলেই সকলের জন্য। ভেদাভেদ থাকবে না। যাহার যা খুসী তা করতে পারবে, কিন্তু তাতে কেউ মনে কষ্ট পাবে না। আরও ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলি। কোনও বর্ণাশ্রম কিংবা জাতিবিচার থাকবে না। সকলে সকলের সঙ্গে, এমন কি, পশুপক্ষীদের নিয়ে, একই রকম খাবার খাবে, যখন যা জুটে উঠে। এতে যদি ব্যারাম হয়ে পড়ে, সকলে অষুধ দিয়ে সারিয়ে দেবে। ডাক্তারের পয়সা লাগবে না। সমস্ত জগৎ নিয়ে মানুষের মধ্যে একই সমাজ হবে, তার নাম 'কমিউন্'। কারও নিজের নিজস্ব অর্থ সম্পত্তি থাকবে না। যখন যার দরকার হবে, সমাজ তাকে যোগাবে। এমন কাজ কেউ করবে না, যাতে অর্থের অসদ্ব্যবহার হয়। এটা প্রথমে আশ্চর্য্য ব'লে বোধ হ'তে পারে, কিন্তু ভেবে দেখলে তা নয়। আপনার ছেলেও যা, আমারও ছেলে তাই। সকলেরই সমান দাবী। কিন্তু সকলেই নিজের শক্তি অনুসারে খাটবে, কেউ বসে থাকবে না। এতে বুঝতে পাচ্ছেন যে, তমোগুণটা উড়ে যাবে ও রাজসিক গুণের সমন্বয় হয়ে সাত্ত্বিকে দাঁড়াবে।

"পছন্দ সম্বন্ধে কেউ কাকে বাধা দেবে না। যার যাকে মনে ধরে, সেই রকম স্ত্রী বেছে নেবে। তার গহনা সম্বন্ধে (স্ত্রীগণ) আপনার সন্দেহ হতে পারে, যে 'সেটা কার হবে?' কিন্তু আগেই বলেছি যে, সম্পত্তির উপর সমাজের সকলেরই সমান দাবী, সুতরাং গহনার জন্য কেউ লালায়িত হবে না। রাস্তায় ফেলে দিলেও চোরে চুরী করবে না, সাধারণের খাজনায় গিয়ে পৌঁছবে। দুষ্ট বিগংবাদ থাকবে না।

"এখন আপনার আপত্তি হ'তে পারে, সকলে যদি সুন্দরী নিয়ে টানাটানি করে, তবে কালোগুলো যাবে কোথায়? ঐটে মস্ত ভুল। যে রকম সমাজের কথা বলছি, সে রকম অবস্থায় উপস্থিত হ'লে চেহারা সকলেরই এক রকম হয়ে

দাঁড়াবে। দেখুন, বানরগুলোর দিকে তাকিয়ে। সব চেহারাই এক রকম। সেই রকম বাঘ, ভালুক ও হরিণ। এদের মধ্যে সৌন্দর্য্যের বিশেষ কোনও তারতম্য নাই, কাজেই প্রাণের জ্বালাও নাই, পণের ডাকহাঁকও নাই, আর প্রেম-কলা'র কন্যারও দর বেশী নাই। মানুষ এমন স্তরে পৌছবে যে, যতদূর সম্ভব, সকলে পরস্পরের সঙ্গে মিলে একই আদর্শের সৌন্দর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হবে। পাছে কোনও দর কসিতে গোলমাল হয়, এজন্য গোঁফ দাড়ী সকলে কামিয়ে ফেলবে। এক রকম ভাষায় কথা কবে, এক রকম সুরে গান করবে, এক রকম ভাবে নাক ডেকে ঘুমুবে, এক রকম ক'রে সকলের উপর হেসে চুলে পড়বে, একই রকম কবিতা লিখবে, কোনটায় মধ্যেই তফাৎ থাকবে না। তখন একদিন ভগবান্ নিজের সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি ধ'রে করযোড়ে প্রকাশ হয়ে বলবেন 'বস্, তোমরা ক্রমবিকাশের চরমে উপস্থিত হয়েছ, এখন আমার সঙ্গে মিশে যাও।' তার পরেই একটা প্রলয়। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি হার মেনে অন্ধকারে লীন হবেন। আমি খুব সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলেম।"

বিরিঞ্চি বাঁড়ুয্যে। সাংখ্য বলেন, পুরুষ প্রকৃতি উভয়েই অনাদি, ও আত্মা নহে। জীব কখনও ভগবানের সঙ্গে একেবারে মিশ্‌তে পারে না, তা হলে সৃষ্টি থাকে না।

খগেন্দ্র ডাক্তার। 'ফিভার মিক্‌শ্চরের' মত থাকে। আমরা স্পিরিট্ ক্লোরোফর্ম্মের সঙ্গে নানা রকম অষুধ মিশিয়ে দিই, যেমন সিরাপ টলু, ক্যাসক্যারা প্রভৃতি। তাতে ইাপানীও সারে, দেহও বেশ লঘু হয়।

হারাধন ঘোষ। দেখ শ্যামচাঁদ! তুমি 'কমিউনিষ্টিক আইডিয়াল্' এখানে ছড়িও না। আমার দোকানে কোন্ দিন ডাকাতী হয়ে যাবে। (আগন্তুকের দিকে সন্দিগ্ধভাবে দৃষ্টিপাত।)

আগন্তুক। আমাকে সন্দেহ করবেন্ না। আমি যদিও সাঁওতাল, কিন্তু সভ্য কি, তা জানি। এই যে কমিউনিজম্ ও ক্রমবিকাশের কথা বলছেন, তা আমার মনে লাগছে। এক সময় আমাদের সমাজও ঐ রকম ছিল। কিন্তু এখন বিগড়ে যাচ্ছে। তবে জগতের উন্নতি হচ্ছে কেমন ক'রে?

শ্যামচাঁদ।—একটা সমাজ ধ'রে উন্নতি হবে না। সকলকে মিশে কর্ম্মী ও ভাবী সাঁওতাল হতে হবে।

৫

এমন সময় ট্রেণ আমাদের ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে অতিশয়

জনতা। অনেক লোক ব্যগ্রভাবে গাড়ীতে আরোহণ করিতে উদ্যত হইল। তাহাদের মধ্যে একটি বৃদ্ধ লোক দুইটি স্ত্রীলোক লইয়া কাতরভাবে স্ত্রীলোকদের কামরায় প্রবেশ করিলেন। সেক্রেটরী গরবিনী ঘোষ চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'এটা মেয়েদের গাড়ী। পুরুষ কেউ এ'স না।'

বৃদ্ধ। আমি বুড়ো মানুষ, বসে পড়েছি মা, এখন যাই কোথায়! আমার নাম শ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য, প্লেগের ভয়ে গয়াতে পলাচ্ছি। সেখানে আমার ছোট ভাই খুব বড় এক জন উকীল। এটি আমার শালী। বিধবা! আর ঐটি বিধবার মেয়ে, এখনও বিয়ে হয় নাই।

গোলমাল শুনিয়া সাতকড়ি সেই কামরায় প্রবেশ করিয়া গরবিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মামী! ব্যাপারখানা কি?' কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করিতে করিতে 'ট্রেণ' গন্তব্যপথে ধাবিত হইল।

শ্যামচাঁদ বাবু পার্শ্বের গাড়ী হইতে গলদেশ বাড়াইয়া বলিলেন, 'ছাতু! গোলমাল ক'রো না, বুড়ো মানুষকে বস্‌তে দাও। যে ভিড়, এতে 'ফিমেল কম্পার্টমেণ্ট' বজায় রাখা শক্ত হবে। বরং অমন ধারা লোক দিয়ে গাড়ী ভর্ত্তি করা ভাল।'

বিমলা! ছাতুবাবু! তুমি দোরের পাশে বসে থাক। যেন অন্য ষ্টেশনে লোক ঢোকে না।

গরবিনী। (ভাগিনের সাতকড়ির প্রতি) বিপদে পড়া গেল। আমাদের গাড়ী 'রিজার্ভ' করা উচিত ছিল।

সাতকড়ি মাতুলানীর কথার কোনও উত্তর দিল না।

বিমলা। আহা! এরা দয়ার পাত্র! যার স্বামী নেই, সে ত দয়ার পাত্রী, আর যার স্ত্রী নেই, সে আরও দয়ার পাত্র। (বৃদ্ধের বিধবা শ্যালীর নিকট ডাকাইয়া) আপনি এই দিকে আসুন, পতির উপর স্ত্রীলোকের কি ক'রে ভক্তি হতে পারে, সেই সম্বন্ধে আমি একটা প্রবন্ধ লিখেছি। আপনার নাম?

বিধবা। আমার নাম মল্লিকা।

মল্লিকা প্রীতিপূর্ব্বক বিমলার নিকট উঠিয়া গেল। মল্লিকার বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর। খুব সুন্দরী। মল্লিকার কন্যা গোলাপ (যাহার বিবাহ হয় নাই) তাহার প্রায় তের, কিংবা তাহা হইতেও বেশী বয়স। সে যথার্থই একটি অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী গোলাপ!

সাতকড়ি চিন্তাপন্ন হইয়া তাহার রূপ দেখিতেছিল। সে মনে করিল,

ক্রমবিকাশ হ'লে বোধ হয় সকলেরই এমনি রূপ হবে, তখন আর রূপের লালসা থাকবে না।'

এই রকম ভাবিয়া এবং নানাপ্রকার সরল কাব্য মনে গড়িয়া সে ক্রমাগত চক্ষু বুজিয়া দুলিতে লাগিল।

গরবিনী ঘোষের পূর্ব্ব হইতেই প্লেগের কথা শুনিয়া একটা আতঙ্ক হইয়াছিল। তিনি তাঁহার বিরাট স্থূল দেহ কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করিয়া গোলাপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমাদের বাড়ীতে ইঁদুর মরেনি ত?'

গোলাপ। না। কিন্তু আমাদের বাড়ীর পাশে মরেছিল।

গরবিনী ক্রমেই ভীতা হইয়া পড়িতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসিলেন, 'প্লেগ হ'লে কি রকম হয়?'

গোলাপ। নেশার মত হয়। জ্বর হয়। গিল্‌টি বেরোয়। বিকার হয়। এই ত শুনেছি।

গরবিনীর বোধ হইল যে, হয় ত গোলাপের সম্মুখে বসিয়া থাকাতে সাতকড়ির নেশার মত হইয়াছে। আবার ভাবিলেন, 'এক জনের কাছে আর এক জন জন্মলেই কি প্লেগ হয়?'

সাতকড়ি তখন সম্পূর্ণভাবে কাব্য-জগতে গিয়াছিল, এবং মধ্যে মধ্যে গোলাপের রূপ মানসে ছন্দোবদ্ধ করিতেছিল; পুনরপি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বিভোর হইয়া পড়িতেছিল, এবং মধ্যে মধ্যে পাঞ্জাবী আস্তীন গুটাইয়া তাহার সবল, সুন্দর, দৃঢ়, মাংসপেশীসম্পন্ন বাহুদ্বয় উপরিস্থ 'বংকে' প্রসারিত করিয়া নিরাবয় সংসারের 'বাস্তব' ভাবটুকু গ্রহণ করিতেছিল।

গরবিনী। আচ্ছা, তোমরা এতদিন প্লেগের মধ্যে ছিলে, ভয় হয় নাই?

গোলাপ। আমরা 'টীকে' নিয়েছিলুম।

সর্ব্বনাশ! তবে ত সদ্য প্লেগের বিষ শরীরে? এবং সাতকড়ির শরীরে সেটা নিশ্চয় সংক্রামিত হইতেছে মনে করিয়া গরবিনী ঘোষ ডাকিলেন, 'ছাতু!'

সাতকড়ি। অ্যাঁ?

গরবিনী। এ দিকে স'রে আয়। দেখছিস্‌নে,—ওরা টীকে নিয়েছে?

সাতকড়ি। (আশ্চর্য্য হইয়া) বল্‌ছ কি মামী! একদিন হয় ত আমাদের লড়াইয়ে যেতে হবে, হয় তুর্কীস্থান কিংবা পারস্যদেশ পার হ'তে হবে। হয় ত কত রকম টীকে আছে, প্লেগের, বসন্তের, ওলাউঠার, শেয়াল-কুকুরে কামড়ানোর, সব রকম নিয়ে যেতে হবে। আমি কি ও সব গ্রাহ্য করি?

গরবিনী ঘোষ সত্রাসে মুখব্যাদান করিলেন।

মিস্ নিস্তারিণী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'ঠিক ত! পুরুষ মানুষের ভয় করিলে চলিবে কেন?'

ইহাতে গরবিনী ঘোষ একটু চটিয়া গেলেন। তাঁহার মনে মনে কল্পনা ছিল যে, নিস্তারিণীর সহিত সাতকড়ির বিবাহ দিয়া সার্থক হইবেন। নিস্তারিণীর বীরত্বের উচ্ছ্বাসে তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'তোমার বিয়ে হলে স্বামীকে যেতে দেও কি না দেখা যাবে।'

ইহাতে নিস্তারিণী ও সাতকড়ি উভয়েই লজ্জিত হইল। গোলাপ-উটনী তাহার মাতার নিকট গিয়া বসিল।

বৃদ্ধ শ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য একমনে হরিনাম করিতেছিলেন।

৫

গয়াধামে উপস্থিত হইয়া সকলেরই হারাধন ঘোষের 'ফ্যামিলী-পাণ্ডা'র বাটীতে উঠিবার কথা ছিল। শ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার শ্যালী মল্লিকা ঠাকুরাণী বলিলেন যে, তাহা কখনই হইতে পারে না। শ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্যের অগ্রজ নীলকণ্ঠ-বাবু উকীলের খুব বড় তেতালা বাটী খালি ছিল, সেখানে যাইতে তাঁহারা সকলকে অনুরোধ করিলেন। গয়ালী ঠাকুরও আপত্তি করিলেন না। বিদেশে এক জন সহায় থাকা ও পরামর্শ দিবার লোক থাকা নিতান্ত দরকার; বিশেষতঃ, নীলকণ্ঠ বাবুর মত লোকের নিতান্ত দরকার। সকলে শ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্যকে শ্রাদ্ধের পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন।

তাই সকলে গাড়ী করিয়া বড় বাটীতে উঠিলেন, এবং নীলকণ্ঠ বাবু তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। ক্রমে প্রকাশ পাইল যে, নীলকণ্ঠ বাবু শ্যামচাঁদ উকীলের সঙ্গে 'রিপন কলেজে'র আইনের ('ল') ক্লাসে একত্র পাঠ করিতেন, এবং শ্যামচাঁদের অনুপস্থিতিকালে নীলকণ্ঠ; এবং নীলকণ্ঠের অনুপস্থিতিকালে শ্যামচাঁদ 'রোল কল্' হইলে 'উপস্থিত' লিখাইয়া দিতেন। তাহা মনে পড়িয়া উভয়ের পুরাতন স্মৃতি জাগরূক হইল, এবং পরস্পরের গলদেশে বাহুবেষ্টন করিয়া উভয়ে অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিলেন। আহা! বাল্যকালের প্রণয় কি মধুর!

কাজেই, নীলকণ্ঠ বাবুর স্ত্রী শ্যামচাঁদের কন্যা নিস্তারিণীকে ধরিয়া লইয়া গেলেন, এবং মল্লিকা ঠাকুরাণী খগেন্দ্র-ডাক্তারের স্ত্রী বিমলাকে লইয়া গেলেন।

সুতরাং শ্যামচাঁদ বাবু ও খগেন ডাক্তার নীলকণ্ঠ বাবুর বাটীতেই নিমন্ত্রণ

করিতে গেলেন। হারাধন বাবু সস্ত্রীক ভাগিনেয় সাতকড়ির সহিত বড় বাটীর দ্বিতল অধিকার করিলেন। ঝি তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল।

হারাধন গাঙ্গুলী তাঁহার মাতা দুর্গাঠাকুরাণীর সহিত দ্বিতলে গিয়া উঠিলেন। গায়ক গদাধর ভট্ট, এবং বাদক তদীয় শ্যালক, এবং সেই শ্যালকের স্ত্রী মালতী বৈষ্ণবী নিম্নতলে গীতবাদ্যের আয়োজন করিতে লাগিল।

সন্ধ্যার পরেই গদাধর ভট্ট কীর্ত্তন আরম্ভ করিল, এবং তদীয় শ্যালক খোল প্রস্তুত করিয়া চাঁটী দিতে লাগিল, এবং মালতী চক্ষু মুদিয়া করতাল লইয়া বসিল গেল। নিম্নতলস্থ গৃহ একটা 'ট্রেঞ্চের' মত, এবং বিকট মশার উপদ্রব। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মধুর শ্যামনাম পাড়া মাতাইয়া তুলিল। এক জন হিন্দুস্থানী চৌবে (কালাইলাল ঢেঁড়ীর শিষ্য) ইস্রার হস্তে সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁরি লেগে যেতে পারি কি?'

মালতী খুব খুসী হইয়া বলিল, 'লাগ!' গদাধর মাথা দোলাইয়া অনুমোদন করিল।

চৌবেজী লাগিয়া গেলেন। সুরও লাগিয়া গেল। কীর্ত্তন বড় মধুর, এবং ইস্রার-সহযোগে তাহা মধুরতর হইয়া সকলকে বিভোর করিয়া তুলিল। চৌবেজীর পরিবার ও বন্ধুবান্ধব আসিয়া আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া পড়িল। এক জন বলিল, 'বাঙ্গালীরা প্রেমের সর্দার, 'গজব্' করিয়া দেয়।'

চৌবেজী অশ্রুপূর্ণনয়নে বলিতে লাগিলেন, 'আহা! ইহাদের নিতাই আমাদের বৃন্দাবন দ্বিতীয় বার বসাইয়াছিলেন। প্রেমের প্রচার বাঙ্গালীই আবার করিবে।'

গান শেষ হইলে চৌবেজীর পরিবার প্রকাণ্ড থালা পরিপূর্ণ করিয়া লুচী এবং মিষ্টান্ন লইয়া আসিল। বিরিঞ্চি বাঁড়ুয্যে বাহিরে বসিয়া ক্ষুধা সম্বন্ধে নীরবে আলোচনা করিতেছিল। সে গাত্রোত্থান করিয়া বলিল, 'গরীবের মা বাপ ভগবান্, গোলোকের হরি।' ইহা বলিয়া সে লুচী ও মিষ্টান্নের শ্রাদ্ধে মনোযোগী হইল।

আর মালতী? সেও বড় কম নয়। সে খইচুর তৈয়ারী করিয়াছিল, সেগুলি লইয়া চৌবেজীর দলের সম্মান রক্ষা করিল। মালতী পরিবেশন করিল, চৌবেজীর দল খাইল, চৌবেজীর স্ত্রী ও কন্যা পরিবেশন করিয়া গদাধর ভট্টের দলকে খাওয়াইল। বিরিঞ্চি বাঁড়ুয্যে বলিলেন যে, 'যদিও আত্মা বহু, কিন্তু যখিকালে পরস্পরের সহিত মিশিয়া থাকে।'

চৌধুরী। এই নৈষ্ঠীপ্রকৃতির ভাবই বাংলার নিজস্ব। ইহাকেই সমগ্রভাবে বুঝিয়া লইতে হইবে। আমরা সকলে বৃন্দাবনে গিয়া [illegible] বাস করিব।

ইহা বলিয়া চৌধুরী বায়বখানা ঘুড়ী গলাধঃকরণ করিলেন।

অতিশয় বৈষ্ণবী-ভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়িল, এবং অনেকে বৈষ্ণবদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে বসিয়া গেলেন।

এমন সময় সাতকড়ি ভিতর হইতে নিম্নে আসিয়া চৌধুরীকে [illegible] করিল, এবং তাঁহার 'পাইলওয়ানি' দেখিয়া একটি 'কুস্তি' লড়িতে [illegible] করিল; তাহাতে উভয়ের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার হইয়া পড়িল। চৌধুরী বলিলেন, 'আপনারা কিছুদিন এখানে থাকুন। এখানে আপনাদের মত ওস্তাদ [illegible] নাই।'

সাতকড়ি। কথাটা ঠিক। ওস্তাদী দেখাইবার স্থান সবই বাঙ্গালা করিবে। প্রেমের ওস্তাদ যাঁরা, তাঁহারা জগন্নাথধাম কিংবা বৃন্দাবনে যান. খাঁরের ওস্তাদ গাহকে আসেন; গানের ওস্তাদ পশ্চিমে চলিয়া যান। কেবল [illegible] কাযো ওস্তাদ, কিংবা দোকানদারীতে, তাঁহারাই কলিকাতায় থাকেন. আমার একটি বন্ধু চাকুরীর চেষ্টায় বিলাতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি [illegible] যে, এখানে এখন চাকুরী করা চলিবে না, তবে ভাঙ্গ প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্মে বাধা নাই। তিনি সেই জন্য যজমানী কার্য্যে ব্রত হইয়া গিয়াছেন।

চৌধুরী বলিলেন, 'নিশ্চয়! যাহারা শিক্ষা দিতে আসে, তাহাদের সকলেই ভালবাসে, কিন্তু ঠকাইয়া পয়সা কামাইতে গেলে চক্ষুঃশূল হইয়া পড়িবে নিশ্চয়। আসুন, আমরা পরস্পরকে শিক্ষা দিই।'

৬

কলিকাতায় মদ্যপের অতিশয় দৌরাত্ম্য, তবুও আমার অভিজ্ঞতায় হওয়াতে, এবং নূতন বন্ধুকলিকার উৎপত্তি হওয়াতে, কেহই সে সম্বন্ধে আপত্তি করে নাই। বিশেষতঃ গদাধরের গান, এবং তদীয় তালজ্ঞের বাদন, এ [illegible] বৈষ্ণবীর প্রভাব বর্ণে লাগিয়া থাকাতে নিন্দা সহজেই [illegible] কলিকা প্রভৃতি সুরম্য স্থান সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিয়াছিল। তাহাতে [illegible] ছড়াটী পুণ্যসংস্পর্শ হইয়া থাকে। কেহই কখন দেখে নাই, [illegible] প্রাতে কাণে শুনিতে পাওয়া গেল যে, সাতকড়ি একবার [illegible] [illegible] পড়িয়াছিল, কিন্তু সে কথা কাহাকেও প্রকাশ করিয়া বিরক্ত করে নাই।

পরদিন প্রাতঃকালের উল্লেখযোগ্য বিষয়।—

১। সাতকড়ির সহিত চৌবেজীর মল্লযুদ্ধ। এবং সাতকড়ির জয়, তজ্জনিত মাতুলীর গৌরববর্দ্ধন।

২। ধনকুবের হারাধন ঘোষের পিতৃপিণ্ডদান ও কাঙ্গালী ভোজনের ঘোঁপাড়।

৩। সাতকড়ির সহিত মিস্ নিস্তারিণীর বিবাহের আয়োজন।

৪। হারাধন গাঙ্গুলীর সহিত গোলাপবালার বিবাহের ঘটকালী।

উপরি-উক্ত কয়েকটি ঘটনা একদিনে কি প্রকারে উপস্থিত হইল, তৎসম্বন্ধে পাঠকবর্গের কৌতূহলনিবৃত্তি করা উচিত।

হারাধন গাঙ্গুলী গোলাপবালাকে দেখিবামাত্র যে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিবার অভিলাষী হইয়াছিলেন, এ কথা শ্রাদ্ধসমিতির মধ্যে প্রথমে প্রকাশ পায় নাই। বেলা নয়টার সময় হারাধনের মুখমণ্ডল ম্লান দেখিয়া তদীয় মাতৃদেবী দুর্গাঠাকুরাণী কোনও প্রকারে সন্তানের মনের কথা বাহির করিয়া শ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্যের নিকট বিনিমিত্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠাইয়াছিলেন। ঘটক শুভোদ্বাহের প্রস্তাব শুনিয়া শ্রীকণ্ঠ তদীয় শ্যালিকা মল্লিকার (গোলাপের মাতা) সহিত অনেকক্ষণ কথোপকথন করিয়া, এবং ভ্রাতা নীলকণ্ঠ উকীলের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া, অবশেষে ব্যক্ত করিলেন যে, 'দোজ বরে' বিবাহ দিবার যদিও তাঁহাদের ইচ্ছা নহে, তথাপি কন্যার 'অলঙ্কার বাবত' পাঁচ হাজার টাকা নগদ গণিয়া দিলে কাহারও আপত্তি থাকিবে না।

বলা বাহুল্য যে, এ কথা শুনিয়া দুর্গাঠাকুরাণীর চক্ষুঃস্থির হইয়া পড়িল। তিনি চীৎকার করিয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িলেন, এবং তারস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন।

সাতকড়ি চৌবেজীর মল্লযুদ্ধে জয়ী হইয়া সগৌরবে দ্বিতলে মাতুলের নিকট যাইতেছিল। দ্বিতলে ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া সে বীরসুলভচিত্তে হারাধন গাঙ্গুলীর গৃহে প্রবেশ করিল। হারাধন তখন হতাশ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

সাতকড়ি ধূলিলুণ্ঠিতা এবং শোকাভিভূতা দুর্গাঠাকুরাণীর হাত ধরিয়া উঠাইল। দুর্গাঠাকুরাণী বাধা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'কেও?'

সাতকড়ি। আমি ছাতু।

দুর্গা। বাবা ছাতু! তুই ত আমার ছেলের মত। তোরা থাকতে আমার হারাধনের বিয়ে হবে না, প্রাণে কি তা সয়?

সাতকড়ির বীরহৃদয় করুণায় ভরিয়া গেল।

'তোমার কোনও ভাবনা নাই। হারুদাদার বিয়ে আমি দিব। যত টাকা লাগে।'

দুর্গা। দেখ বাবা, তীর্থস্থানে কোনও কথা দিও না। যদি না পার?

তাহার পর দুর্গাঠাকুরাণী গোলাপের কথা ও তাহার মাতা মল্লিকার দাবীর কথা প্রকাশ করিলেন।

সাতকড়ি হাসিয়া বলিল, 'তার জন্য ভাবনা কি? এখনি তার কিনারা কচ্চি।'

ইহা বলিয়াই সাতকড়ি এক লম্ফে দ্বিতলে গিয়া উপস্থিত। গৃহে প্রবেশ করিয়া সাতকড়ি ডাকিল, 'মা!' [সাতকড়ি তাহার মাতুলানী গরবিনী ঘোষকে আদর করিয়া 'মা' বলিয়া ডাকিত।]

সেক্রেটরী গরবিনী ঘোষের আজি কত আনন্দ! তিনি সাতকড়ির মস্তকের আঘ্রাণ লইয়া বলিলেন, 'বাবা, তুই আজ বাঙ্গালীর নাম রেখেছিস্। এখন আমার কথাটা রেখে নিস্তারিণীকে বিবাহ ক'রে ফেল্।'

সাতকড়ি মাতুলানীর হাত ধরিয়া বলিল, 'মা, আমি তোমার কথা রাখ্‌ব, যদি তুমি আমার কথা রাখ। সে কথাটা খুব ছোট। হারুদাদা গোলাপকে বিয়ে কর্ত্তে চায়, কিন্তু দশ হাজার টাকা চাই। সে টাকা তুমি দাও। এক জন মলিন মুখ ক'রে ব'সে থাকবে, আর আমি বর সেজে যাব, এ কখনও হতে পারে না। আমার এ কথাটা যদি না রাখ, তবে আমি আজই মেসোপোটেমিয়ায় চলে' যাব।'

দশ হাজার টাকা ধনকুবের হারাধন ঘোষের সহধর্ম্মিণী গরবিনী ঘোষের নিকট তুচ্ছ সামগ্রী। তাঁর ভয় ছিল যে, ছাতু পাঁছে 'প্রেগ রোগী' গোলাপের জন্য একটা গোলমাল উপস্থিত করে, এবং চটিয়া যুদ্ধে চলিয়া যায়। সুতরাং তিনি সহাস্যমুখে, অম্লানবদনে, পাঁচ হাজার টাকার নোট তৎক্ষণাৎ গণিয়া দিলেন।

সাতকড়ি মাতুলানীর চরণধূলি লইয়া দ্বিতলে ফিরিয়া আসিল, এবং হারাধন পাঙ্গুলীর হাত ধরিয়া বলিল, 'হারু দাদা, আজ তোমার সুখেই আমার আনন্দ।'

দুর্গাঠাকুরাণী এখন সত্য সত্যই কাঁদিয়া বলিলেন, 'বাবা, মানুষের মধ্যে দেবতা থাকে ত তুমি। আমরা ব্রাহ্মণ হয়েও ছার!'

দ্বিতলে হারাধন ঘোষ পিতৃপিণ্ডদান করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীমুখ প্রফুল্ল। গরবিনী তাঁহাকে সব কথা বলিল।

সমাগত লোক বলিলেন। 'এ পাঁচ হাজার টাকা ব্রাহ্মণকে দান করিয়া ধন্য হইতে পারেন। আরও পাঁচ হাজার টাকার ওজনি আমি নিয়ে এসেছি। কন্যাটীর কল্য সন্ধ্যাকালে দান করিব।— তুমি বিয়ের আয়োজন কর।'

১

সাতকড়ির অসাধারণ শিরোচিত বদান্যতা রাষ্ট্র হইয়া পড়াতে গন্ধবাসীর আনন্দধ্বনির মুখে 'সাধু! সাধু!' বাক্য উচ্চারিত হইতেছিল। চৌধুরী কহিতে লাগিলেন, 'এই সকল বীরপুরুষের নিকট কুস্তিতে পরাজিত হওয়া গৌরবের ও স্পর্দ্ধার বিষয়।'

আজ ত্রিবিধ মহা সমারোহ। ছাতুর বিবাহ, ছাবাধন গাঙ্গুলীর বিবাহ, এবং ছাবাধন মোহেন্দ্র পিতৃপিতামহসম্পর্কীয় কায়স্থী ভোজন। অনেকের ইচ্ছা ছিল যে, এত বড় তিনটি ব্যাপার তিন দিন ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইলে ভাল হয়। কিন্তু পঞ্জিকায় অধ্যাত্ম মাসের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শুভদিন। সুতরাং অন্য কোনও উপায় নাই।

এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মসমিতির সেক্রেটরি উকীল বাবুর বাটীতে একত্র হইলেন। পাড়ার অনেক ভদ্রলোকও আসিয়া সম্মিলিত হইয়া। প্রথম প্রস্তাব 'উভয় বিবাহ এক সময়ে কি করিয়া সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে?'

অনেকে বলিলেন যে, এক বাটীতে দুইটী বিবাহ একত্র দেওয়া এক রকম অসম্ভব। কারণ, প্রথমতঃ স্থানাভাব। যদি দুই বাটীতে, অর্থাৎ নীলকণ্ঠ বাবুর 'বেলতবাটী' ও 'ভাড়াটীয়া' বাটীতে, কার্য্য সম্পন্ন করা হয়, তবে এক স্থানে বিবাহক্রিয়া ঘটিতে পারে না; কারণ, উভয় পক্ষই ব্রাহ্মসমিতিভুক্ত। কোন পক্ষে উপাচার্য্য হওয়া কাহারও অভিপ্রেত নহে।

আর উকীল উচিয়া বলিলেন, 'এ সম্বন্ধে আমার দুই বক্তব্য আছে, তাহা স্বপক্ষে নহে। ঠিক হিন্দুমতে আমার বিবাহ দেওয়ার ইচ্ছা নাই। ওঁহারা মন্ত্র উচ্চারণ করেন, তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু স্ত্রীআচার প্রভৃতির জন্য আমি অনুরোধ করি না।'

এক জন আগন্তুক ভদ্রলোক উঠিয়া বলিলেন, 'ইহাতে যৌতুক আপনাকে দিতে হইবে, নচেৎ এ বাটীতে কেহ কন্যাগ্রহণ করিবে না।'

এতগুলি লোক উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া নীলকণ্ঠ বাবু বলিলেন, 'তোমরা মহাশয়দের মত কি?'

হারাধন ঘোষ। আমি বৈষ্ণব-প্রকৃতির লোক, আপনারা যাহা মীমাংসা করিবেন, তাহাতেই আমি রাজি।

যগেন ডাক্তার উঠিয়া বলিলেন, 'চটাচটির কোনও দরকার নাই। আধুনিক প্যাথলজির মতে একটা নূতন ব্যাধির আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার নাম 'ফাইলেরিয়া'। এই ব্যায়রাম্‌টার 'জার্মস্' ম্যালেরিয়ার মত মশকদংশন দ্বারা আমাদের শরীরে সঞ্চারিত হয়। তাহার ফলে 'মৃত্যুবৎ' অর্থাৎ, পা ফুলিয়া অবস্থা পূর্ণিমায় অর হয়। আজ পূর্ণিমা, সুতরাং অধিক রাত্রি জাগরণ করিলে গয়াধামের মশক নিশ্চয় স্বধর্ম্মবশবর্ত্তী হইয়া সকলকে, বিশেষতঃ উভয় পক্ষের আত্মীয় কুটুম্বকে আক্রমণ করিবে। অতএব সকলকে পূর্ব্বেই সাবধান করিয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য।'

বিরিঞ্চি বাঁড়ুয্যে বলিলেন, 'সাংখ্যমতে আত্মা বহু, কিন্তু বেদান্তমতে পরমাত্মা একই, সুতরাং বহু আত্মার দুঃখ পরমাত্মাতেই বর্ত্তে। যদি বিবাহপ্রথার পরিবর্ত্তনে আপনারা এ বাটীতে জলগ্রহণ না করেন, তবে তাহারও সুন্দর উপায় আছে। পাতঞ্জলের মতে, আপনারা গাঙ্গুলী মহাশয়ের বিবাহে লুচী কালিয়া প্রভৃতি ভাড়াটিয়া বাটীতে বসিয়া আহার করুন, এবং তথায় জলগ্রহণ এবং আচমনাদি শেষ করিয়া এ বাটীতে আসিবেন, এবং জৈমিনিদর্শন অনুসারে এখানে সন্দেশ ও রসগোল্লা প্রভৃতির সহযোগে উদরের অবশিষ্ট ভাগ পূরণ করিয়া রাত্রি বারটায় সময় বাড়ী ফিরিয়া যাইবেন। ন্যায়দর্শন মতে ইহাতে কোনও আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না, এবং ধর্ম্মও নির্ভীকভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে পারে।'

অনেক তর্কবিতর্কের পর স্থির হইয়া গেল :—

১। হারাধন গাঙ্গুলীর সহিত গোলাপবালার বিবাহ গোধূলিলগ্নে ভাড়াটিয়া বাটীতেই হইবে। সেখানে হিন্দুমতে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া বর কন্যা রাত্রি নয়টার সময় বাসরঘরে চলিয়া গেলে, গোঁড়া হিন্দুবর্গ লুচী তরকারী প্রভৃতি আহার করিবেন, এবং সেই সময়টুকু বর ও কন্যা স্ত্রীলোকবেষ্টিত হইয়া বাসরঘরে বিশ্রাম করিবে। বাহিরে পিণ্ডদানের কাঙ্গালীভোজন হইবে।

২। রাত্রি দশটার সময় পূর্ণিমার চন্দ্রালোকে সমগ্র শ্রাদ্ধসমিতি ও নূতন বর কন্যা, বরযাত্রী সমভিব্যাহারে বাজনা বাজাইয়া এবং কাঙ্গালীগণকে সঙ্গে করিয়া পুনরায় নীলকণ্ঠ বাবুর বাটীতে আসিবেন।

৩। সেখানে হিন্দু, ব্রাহ্ম ও বৈষ্ণব মতের সামঞ্জস্য করিয়া একটা সংক্ষিপ্ত

পাতকুড়ি বাবুর সহিত মিস্ নিস্তারিণী বসুর বিবাহ হইয়া গেলে, গৌড়া হিন্দুবর্গ কেবল সন্দেশ আহার করিয়া বাটী চলিয়া যাইবেন, এবং সেখানে গিয়া জলপান করিবেন। নব্যদল (অর্থাৎ 'রিফর্মড্' ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব প্রভৃতি) যাহার যেমন ইচ্ছা, 'কারি', 'কট্‌লেট্', 'চপ্' প্রভৃতি আহার করিয়া, সোডা, লেমোনেড্ ইত্যাদি ইত্যাদি পান করিবেন, এবং দম্পতীযুগল[বর]-কে আশীর্ব্বাদ করিয়া বাটী ফিরিবেন।

৫। তাহার পর নীলকণ্ঠ বাবুর বাটীতে একটা 'কোপারেটিভ্ বাসরঘর' হইবে, অর্থাৎ একই বাসরে উভয় বর, এবং উভয় কন্যা বিরাজ করিবেন, এবং উভয় পক্ষের স্ত্রীলোক সকলে মিলিয়া গান এবং বাক্যালাপ, হাস্য এবং পরিহাস করিয়া, এবং সুখ দুঃখের কথা কহিয়া, রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত কাটাইবেন।

৬। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর মশার দৌরাত্ম্য হইলে সকলে চলিয়া যাইবে, এবং বাটী নিস্তব্ধ হইয়া পড়িবে। কেবল মধ্যে মধ্যে নৈশবায়ু বহিবে, এবং ভদ্রলোক বাতায়ন দিয়া প্রবেশ করিবে, এবং নিদ্রাদেবী নবদম্পতীর সম্ভাষণের অপেক্ষা করিবে।

৮

উল্লিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্ববাদিসম্মত হইলে সভা ভঙ্গ হইল, এবং বিবাহের আয়োজন আরম্ভ হইল।

৯

গদাধর এবং তদীয় শ্যালক, এবং সেই শ্যালকের স্ত্রী খোল খরতাল প্রভৃতি লইয়া কাঙ্গালী বিদায়ের অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। দানাপুর, পাটনা এবং নানা স্থান হইতে ব্যাণ্ড ও রসনচৌকি আসিয়া নীলকণ্ঠ বাবুর বহির্বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। শ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বেই নানা স্থান হইতে গাড়ী ও এক্কার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাহার ফলে এক শত ঘোড়ার গাড়ী ও দেড় শত এক্কা আসিয়া জুটিল। ধনকুবের হারাধন ঘোষের ইচ্ছামতে গয়ার কাঙ্গালীগণ এক্কা করিয়া আনীত হইলে, সকলে সারি সারি রাস্তার দুই পার্শ্বে এক মাইল ধরিয়া বসিয়া গেল। পুলিসের দারোগা বলদেব বাবুর সুবন্দোবস্তে কোলাহলের লেশমাত্র ছিল না, কেবল প্রতীক্ষা ও আনন্দ। আনন্দ ও প্রতীক্ষা!

গদাধর ভট্টাচার্য্য ও তদীয় শ্যালক ও শ্যালকের স্ত্রী কাঙ্গালীগণের অভ্যর্থনার ভার লইলেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ভাড়াটিয়া বাটীতে বিবাহের আয়োজন হইয়া গিয়াছিল।

গোধূলি-লগ্নে সুচারুভাবে বিবাহ-সম্পন্ন হইয়া গেল, এবং হারাধন পাঙ্গুনী-সহ রাজবরে বিশ্রাম লাভ করিলেন। গোড়া হিন্দুবর্গ লুচী প্রভৃতি লইয়া যথাস্থানে অবস্থিত হইলে, বাহিরে কাঙ্গালীভোজন আরম্ভ হইল।

এমন সময় একটা মহা কোলাহল উত্থিত হইল। প্রায় পঞ্চ শত সাঁওতাল, পুরুষ এবং স্ত্রী, কেহ ধনুর্ব্বাণ এবং কেহ মাদল হস্তে ষ্টেশন হইতে আসিয়া উপস্থিত। তাহাদের দলপতি চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এখানে সাতু বাবু আছেন?'

লম্ফ দিয়া সাতু বাহিরে আসিয়া বলিল, 'হাঁ।'

দলপতি আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত হরকালী মাঝি। পাঠকবর্গের মনে থাকিতে পারে যে, ইহারই নিকট শ্যামচাঁদ বাবু রেলের গাড়ীর উপর 'ক্রম-বিকাশ' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। হরকালী সাতুর বিবাহের সংবাদ পাইয়া রাতারাতি দলবল সমেত গয়াতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

তুমুল কাণ্ড! সাঁওতালগণ মাদল বাজাইয়া নৃত্যগীতে রত হইল। সেই তালে কাঙ্গালীগণ ভোজন আরম্ভ করিল। সাড়া পাইয়া ব্যাণ্ড ও রসুনচৌকির দল উন্মত্ত হইয়া তাহাদের সহিত মিশিয়া গেল, এবং গদাধর ভট্টাচার্য্য সেই সুযোগে গয়ালীদিগকে লইয়া হরিসঙ্কীর্ত্তন জুড়িয়া দিলেন। ঘোর কোলাহলে সান্ধ্য-গগন সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ ধনকুবের হারাধন ঘোষ মহাশয় প্রচার করিলেন, 'আলো জেলে দে', 'দুআনি আন্'।

অমনই সহস্র আলোক জ্বলিয়া উঠিল। হারাধন ঘোষ বলিলেন, 'এবার দুআনি ছড়াইয়া দে।'

সরদার হরকালী মাঝি মালসাট্ মারিয়া সম্মুখে উপস্থিত। 'হুজুর! এ স্থলে দুআনি ছড়াইয়া দিলে একতান বাদ্যের বাধা পড়িবে।'

হারাধন। হরকালী! এটা শ্রাদ্ধের দান। সুতরাং সকলে মিলে লেগে যাও।

হরকালী 'তথাস্তু' বলিয়া সেই পাঁচ সহস্র টাকার দুআনি গণে ওজনে ভাবে বিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল।

এই সংবাদ সহরে রাষ্ট্র হওয়াতে প্রায় দুই সহস্র লোক একত্র হইয়া সেই দুআনি কুড়াইতে লাগিল। কেহ কাহারও স্কন্ধে, কেহ পৃষ্ঠে, কেহ লম্ফ দিয়া, কেহ স্থিরভাবে বসিয়া, কেহ চিৎপাৎ হইয়া, সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রজতখণ্ড-গ্রহণার্থ নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিল।

যেন গণ্ডগোল ইতিহাসে বিরল। গ্রীকসম্রাট আলেকজন্দর পুরু রাজাকে পরাস্ত করিবার কালে অনেকটা এই রকম ঘটনা ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাহা পরস্পরের দালহুলে নহে।

ইতাবসরে সুযোগ পাইয়া বালকের দল সেই বিরাট শ্রাদ্ধ ও শুভবিবাহের ঘটনা ছন্দোবদ্ধ করিয়া কবিতার কাগজ 'প্রেস' হইতে ছাপাইয়া আনিয়াছিল। তাহা বিলাইতে লাগিল।

কবিতাগুলির বিশেষত্ব এই যে, তাহা বাঙ্গালা, হিন্দী ও সাঁওতালী ভাষা মিশ্রিত। সকলে উৎফুল্ল হইয়া বলিল, 'অতি সুন্দর কবিতা! অতি সুন্দর প্রাদেশিক একতা! অতি সুন্দর ভবিষ্যৎ-সমাজ-বোধ!' বাস্তবিক যে উভয় প্রদেশ এক কালে মিশিয়া একই আচার ব্যবহার এবং একই ভাষা অবলম্বন করিবে, সে-সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ রহিল না।

তখন শ্রাদ্ধসমিতির সেক্রেটরী গরবিনী ঘোষ সদলে দ্বিতলের বারান্দার উপর দাঁড়াইলেন। তৎক্ষণাৎ সমাজ নিস্তব্ধ।

'আপনাদিগের অনুমতি হইলে এখন শুভ বিবাহটি আরম্ভ হইতে পারে।'

মহা নির্ঘোষের সহিত সকলে বলিল, 'নিশ্চয়।'

তৎক্ষণে শ্রাদ্ধসমিতির স্ত্রী ও পুরুষ দলবল সহিত ধীরে ধীরে নীলকণ্ঠ বাবুর বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে পূর্ণিমার আলোকোদ্ভাসিত ও বহু পুষ্প এবং পত্রে শোভিত বিস্তীর্ণ বারান্দায় কন্যাপক্ষের সকলে প্রফুল্লমুখে বরপক্ষীয় লোকের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

৯

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে, এবারকার বিবাহটা ঠিক হিন্দুমতে নহে। সুতরাং সকলেরই পরিচ্ছদ কিঞ্চিৎ নব্য ধরণের। এমন কি, হারাধন গাঙ্গুলী বিবাহের পরেই পট্টবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, স্বীয় স্যুট, কোট এবং 'টাই' প্রভৃতি সুন্দর ভাবে পরিধান করিয়াছিলেন। কন্যাপক্ষীয় নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকের মধ্যে যাহারা 'ডোমিসাইল্‌ড্' বাঙ্গালী, তাঁহারা একপ্রকার টুপী মস্তকে পরিধান করিয়া আসিয়াছিলেন, সেগুলি 'ডোমিসাইল ক্যাপ্' বলিয়া আখ্যাত। বিশেষত্ব ইহাই যে, সেগুলি ঝাড়িলে সূক্ষ্ম শক্ত চূর্ণ বাহির হয়।

শ্যামচাঁদ বাবু সকলকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, 'আমি এ পক্ষের কন্যাকর্ত্তা, অথচ সৌভাগ্যের বিষয় এই, আমার বাল্যবন্ধু নীলকণ্ঠ বাবুর স্ত্রী আমার পরিবর্ত্তে কন্যাপক্ষের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। (সকলে—'সাধু')।

'সুতরাং কন্যাদানের পূর্ব্বে আমি গোটাকতক কথা বলিতে ইচ্ছা করি। এই গয়াধামে আমরা শ্রাদ্ধ উপলক্ষে আসিয়াছিলাম, কিন্তু সকলের প্রীতি অতিশয় বর্দ্ধিত হওয়াতে শেষে তীর্থফল বিবাহে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। সকলে (সখেদ বিষয়)।

'আধুনিক সমাজে আমরা যাহারই অনুষ্ঠান করি না কেন, তাহা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের পিণ্ডদান ছাড়া আর কিছুই নহে। পূর্ব্বে বিবাহের পূর্ব্বে 'নান্দীমুখ' নামক একটা সুন্দর প্রথা ছিল; এখন তাহার বিশেষ দরকার হয় না; কারণ, বিবাহের পূর্ব্বে দান, পণ ইত্যাদি যত রকম শুভকর্ম্ম, সকলই নান্দীমুখের ছাঁচে ঢালা; এটা বোধ হয় বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। (সকলে—'মোটেই না।')

'কিন্তু অদ্যকার বিবাহে আমরা সকলেই গৌরবান্বিত। কারণ, আমাদিগের শ্রাদ্ধসমিতির মাননীয়া সেক্রেটরী সর্ব্বলোকপ্রশংসিতা শ্রীমতী গরবিনী ঘোষ এ বিবাহে পণ প্রভৃতি দেওয়া দূরে থাকুক, কন্যাকে নিজেই বহুমূল্য অলঙ্কারে বিভূষিতা করিয়াছেন, এবং গয়াধামে একটা চিরস্থায়ী শ্রাদ্ধসমিতির প্রতিষ্ঠার্থ বিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। (সকলে সহর্ষে 'বিরাট দান, সাধু সাধু!')

'ইহা ছাড়া, যাহারা ভবিষ্যতে এখানে শ্রাদ্ধ করিতে আসিয়া বিবাহ করিয়া যাইবেন, কিংবা বিবাহ করিতে আসিয়া শ্রাদ্ধ সারিয়া যাইবেন, তাঁহাদের জন্য সেক্রেটরী মহোদয়া একটা বিশ্রামাগার নির্ম্মাণ করিয়া দিতে প্রস্তুত। এটা বুদ্ধগয়াতে শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হইবে।' (সকলে উচ্চৈঃস্বরে—'ধন্যবাদ!')

সেক্রেটরী গরবিনী ঘোষ স্বীয় প্রশংসাবাদে লজ্জিতা হইয়া বলিলেন, 'এখন কন্যাকে সভাস্থ করিতে চাহি।'

সকলে বলিলেন, 'নিশ্চয়।'

বর এবং কন্যা সভাস্থ হইলে খগেন্দ্র ডাক্তারের স্ত্রী বিমলা তাঁহার পতিভক্তি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ সুমিষ্টস্বরে পাঠ করিলেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, পতির প্রতি স্ত্রীলোকের ভক্তিসঞ্চার করিতে হইলে, প্রথমতঃ পতিকে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, এবং মাৎসর্য্য প্রভৃতি ষড়রিপু একেবারে গর্জ্জনপূর্ব্বক বর্জ্জন করিতে হইবে, এবং যতদিন তাহা না হয়, পত্নী সজলনয়নে পতির ব্যভিচার সমালোচনা করিবেন। তাহাতেও যদি ফল না দর্শে, তবে পত্রিকা প্রকাশ করিয়া আন্দোলন করিবেন।

বৃটীশভূমে, যে সকল সভ্যজাতি এখন জগতের শীর্ষস্থলে দণ্ডায়মান, তাঁহারা

যে স্ত্রীলোকের তাড়নাতেই উচ্চসোপানে আরূঢ় হইয়াছেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ ইতিহাস দিতেছে। অধিক, কোনও জাতি যদি বীরাগ্রগণ্য হইবার আকাঙ্ক্ষা করেন, তবে প্রথমে তাহাদের স্ত্রীবর্গকে যথাযোগ্য শিক্ষা প্রদান করিয়া পুরুষের আক্রমণ হইতে রক্ষাই কর্ত্তব্য। কারণ, জীবতত্ত্ববিশারদ মনীষিগণ বলিয়াছেন যে, যতদিন দুর্ব্বল স্ত্রীলোকের উপর আক্রমণ ও তাহাদিগের সহিত লড়াই ঝগড়া করিবার প্রবৃত্তি পুরুষের থাকে, ততদিন সমাজে পুরুষদিগের বীরত্ব বহির্মুখ না হইয়া অন্তর্মুখ থাকিয়া যায়।

ধনকুবের হারাধন ঘোষ এবং অনেক নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক সেই বক্তৃতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া গলদ্ঘর্ম হইয়া পড়িলেন। ঘোষ মহাশয়ের মধ্যে চক্ষু উলটাইয়া যাইতেছিল। তাহা দেখিয়া খগেন্দ্র ডাক্তার কানে কানে বলিলেন, 'যদি বলেন ত এক ডোস্ শেরী এনে দি।'

হারাধন ঘোষ। 'বোধ হয় সোডা খেলেই সেরে যাবে।'

তাহার কিয়ৎক্ষণ পরেই পুরোহিতবর্গের মন্ত্রোচ্চারণ ও স্ত্রীলোকদিগের ধান্যোদ্গারণ এক সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইয়া বিবাহক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

যাঁহারা হিন্দুমতে ও বাটীতে লুচী তরকারীর শ্রাদ্ধ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এ বাটীতে জাতিরক্ষার্থ কেবল 'কেক্' ভক্ষণ ও কিঞ্চিৎ 'শেরী' পান করিলেন। যাঁহারা খুব 'গোঁড়া', তাঁহারা 'কেক্'-স্পর্শ করেন নাই। যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা 'গোঁড়া', তাঁহারা মৃণ্ময়ীস্থিত বারি পান করিতেছিলেন।

তাঁহাদিগকে বিরিঞ্চি খাড়ুয্যে আসিয়া বলিলেন, 'আপনারাই যথার্থ হিন্দু, এবং এই যজ্ঞের দেবতাবৃন্দ। শ্রীযুক্ত হারাধন ঘোষের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া আমি আপনাদিগের শ্রীচরণে পঞ্চাশটি করিয়া টাকা সম্মানার্থ সমর্পণ করিতেছি।'

সকলে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'সাধু!' তাহার পর যাহার যাহা প্রাপ্য, তাহার তালিকা হইয়া গেল, এবং পুলিস্ হইতে আরম্ভ করিয়া টাউন-চৌকিদার পর্য্যন্ত পূর্ণহস্তে এবং সহাস্যমুখে বাড়ী ফিরিয়া গেল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। যাঁহারা এ পর্য্যন্ত আহারের চেষ্টায় অপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারা আহারে বসিয়া গেলেন। কেহ টেবিলে, কেহ কার্পেটের উপর, কেহ বাহিরে দাঁড়াইয়া, যাঁহার যাহা খুসী, আহার করিতে লাগিলেন।

কেবল দুইটী লোক অপর্য্যাপ্ত রকম আহার করিয়া চিৎপাৎ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা 'বিরিঞ্চি বন্দ্যোপাধ্যায়' ও 'চৌবেজী'। যখন সকলে

ক্রমে চলিয়া গেল, দীপ ক্রমে নিভিতে লাগিল, এবং গৃহপ্রাঙ্গণ ক্রমে নিস্তব্ধ হইল, তখনও তাঁহারা উত্থানশক্তিরহিত। চৌবেজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন, 'এখন উপায় কি?'

বিরিঞ্চি। কলিতে হরিনাম ছাড়া কোনও উপায় নাই। বিপদে, আপদে, সম্পদে, পদে পদে, সেই নাম।

চৌবেজী ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, তাঁহার অবস্থা এত শোচনীয় যে, সহস্র হরিনামটা তাঁহার সাধ্যাতীত।

বিরিঞ্চি। তবে তুমি বল 'হ', এবং আমি বলি, 'রি।'

এই প্রস্তাবটি খানিকটা সম্ভব বোধ হওয়াতে চৌবেজী ডাকিলেন, 'হ—' এবং বিরিঞ্চি ক্ষীণস্বরে বলিলেন, 'রি—'।

হরিনাম শুনিয়া গদাধর ও তদীয় শ্যালক এবং শ্যালকের স্ত্রী মালতী খোল ও মঞ্জনী লইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে বসিয়া গেল। কিন্তু অপরিমিত আহারের ফলে কেহ তাহাতে যোগ দিতে না পারায়, সকলের চক্ষে বারিধারা বহিল।

বিরিঞ্চি বলিলেন, 'তবুও তোরা থামিস্ নে। এক বৃক্ষে জীব ও পরমাত্মা বাস করে। জীব গেলেই পরমাত্মারও চিহ্ন থাকবে না'—

তাই চৌবেজী বলিলেন,—'হ', এবং বিরিঞ্চি পুনর্ব্বার বলিল, 'রি'। ইহাতে সকলের ভাব লাগিয়া গেল, এবং ভাব লাগিয়া যাওয়াতে একটা ক্রন্দন-ধ্বনি উত্থিত হইল। সেই ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া অনেকের পিতৃপুরুষদিগের কথা মনে পড়িল, এবং তাহারাও কাঁদিতে আরম্ভ করিল। অন্দরমহলে স্ত্রীলোকেরা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারাও স্ত্রীস্বভাবসুলভ আকস্মিক দুঃখের বশবর্ত্তী হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সেই ক্রন্দনে যোগ দিয়া গৃহ মাতাইয়া তুলিল।

সেক্রেটরী গরবিনী ঘোষ ভয়ানক চটিয়া বাহিরে আসিলেন। 'তোদের ব্যাপারখানা কি বল্ ত?'

গদাধর। বর কন্যা কোথায়?

সেক্রেটরী। ঘুমিয়ে পড়েছে।

গদাধরের শ্যালক বলিল, 'তবে খোল বাজাও। আমাদের ঘুমাইবার পালা নাই।'

সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'হরিবোল!' পূর্ণিমার শেষযামের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সেই অপূর্ব্ব ধ্বনি পাড়া প্রতিধ্বনিত করিল। কেহ কেহ মনে করিল যে, ইহসংসার হইতে কেহ সরিয়া পড়িয়াছে।

নিশিরাম।

হেড্ মাষ্টার।

১

রামবাবু প্রামাণিকের সাংসারিক অবস্থা কোনও দিনই স্বচ্ছল ছিল না। সে ট্যাংরামারীর 'হালি' বড়লোক; 'পেটো' মহাজন হলধর হালদারের আড়তে গুদাম-সরকারী করিয়া অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত; কিন্তু সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার সময় আড়তের টিনমণ্ডিত দোকানঘরে 'পেঁড়' কাঠের পায়াভাঙ্গা জলচৌকীখানির উপর বসিয়া অন্য পাঁচ জন দোকানদারকে সে যে সকল গল্প শুনাইত, তাহা কর্ণগোচর হইলে কেহ বিশ্বাস করিতে পারিত না যে, সে সেই আড়তের আট টাকা বেতনের গুদাম-সরকার। তাহার গল্পে প্রত্যহ যে কত 'রাজা উজীর' মারা পড়িত, তাহার সংখ্যা হয় না। তাহার গল্পগুলি হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইত যে, সে জমীদারের ম্যানেজারী হইতে লোক্যাল বোর্ডের 'পাউণ্ড-কিপারী' পর্য্যন্ত সকল চাকরীর রসাস্বাদন করিয়া, এবং কোনও চাকরীতেই স্বাধীনতা নাই দেখিয়া, অবশেষে এই গুদাম-সরকারী কার্য্য গ্রহণ করিয়াছে। তাহার উপযুক্ত পুত্র নদেরচাঁদ কলিকাতায় শ্রীমানীদের গদীতে চাকরী করিয়া 'শালিয়ানা' হাজার বার শ' টাকা উপার্জ্জন করে, কিন্তু যত দিন পরীরে সামর্থ্য আছে, তত দিন সে কি জন্য পুত্রের মুখাপেক্ষী হইবে? কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, নদেরচাঁদের পিতৃভক্তি তেমন প্রশংসনীয় ছিল না। শ্রীমানীদের গদীতে সামান্য একটী চাকরী পাইয়াই সে পিতার সহিত বিবাদ করিয়া পল্লীগ্রামের পৈত্রিক গৃহ ত্যাগ করে, এবং হাটখোলা অঞ্চলে একখানি খোলার ঘর ভাড়া করিয়া সপরিবারে সেখানে বাস করিতে থাকে। রামবাবু একবার শ্রীক্ষেত্রে যাইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া নদেরচাঁদের নিকট কিঞ্চিৎ পাথেয় চাহিয়াছিল; কিন্তু নদেরচাঁদ টাকা কড়ি না পাঠাইয়া বৃদ্ধ পিতাকে ডাকযোগে যে উপদেশ পাঠাইয়াছিল, তাহার ভাবার্থ এই যে, কুব্জ ব্যক্তির 'চিৎ' হইয়া শুইবার সখ কোনরূপেই সমর্থনযোগ্য নহে। বৃদ্ধ বয়সে মানুষের অনেক ব্যয়সাধ্য সখ হয় বটে, কিন্তু হাতে পয়সা না থাকিলে, তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। এ সকল ঘরের কথা আড়তের মজলিসে প্রকাশ করা সঙ্গত নহে বুঝিয়া, রামবাবু তাহার বন্ধুগণকে উল্টা বুঝিতে দিত। এবং সম্বলে তাহার কথাগুলি বিনা প্রতিবাদে শুনিয়া যাইত দেখিয়া সে সোৎসাহে ঘন ঘন তামাক খাইত।

রামযাদুর ছোট ছেলে গোবর্দ্ধনকে সকলে বলিত, গোবরে পদ্মফুল। রামযাদুর ইচ্ছা ছিল, গোবরা পাঠশালে লিখিয়া হাতটা একটু পাকাইতে পারিলেই তাহাকে হলধর হালদারের ভূষিমালের কারবারে একটা মুহুরীগিরিতে ভর্ত্তি করিয়া দিবে। গোবরা যেরূপ বুদ্ধিমান ও হিসাবী, তাহাতে সে কিছু দিনেই গোমস্তাগিরির 'লায়েক' হইবে। কিন্তু তাহার এ আশাও পূর্ণ হইল না। গোবর্দ্ধন পাঠশালায় পড়িতে পড়িতে এবং তাহার হাতের লেখা না পাকিতেই তাহার দাদার এক বন্ধুর সহিত কলিকাতায় পলায়ন করিল। নদেরচাঁদের মনিব ছেলেটি বুদ্ধিমান দেখিয়া নদেরচাঁদকে বলিলেন, "ওকে ইংরিজী ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দাও, কেতাবের দাম আর ইস্কুলের 'ব্যাতোন' না হয় আমিই দেব।" নদেরচাঁদ প্রভুবাক্য লঙ্ঘন করিতে পারিল না। গোবর্দ্ধন দাদার বাসায় থাকিয়া ক্রমে এণ্ট্রেন্স ও এল, এ পাশ করিল; তাহার পরই ছেলে 'লায়েক' হইয়াছে দেখিয়া রামযাদু তাহার বিবাহ দিয়া ফেলিল।

কিন্তু বিস্তর আশা করিয়া এ বিবাহেও রামযাদুকে ঠকিতে হইল। ব্যাপার-খানা করুণরসাত্মক, এবং উপভোগ্য।

২

তখন পল্লীঅঞ্চলেও পাশ-করা ছেলেদের নীলাম আরম্ভ হইয়াছে। রামযাদু যে সমাজের লোক, সে সমাজেও মেয়ের বাপেরা পাশ-করা 'হাভাতে'দের হাতে কন্যা সম্প্রদান করিয়া কৃতার্থ হওয়া সৌভাগ্যের বিষয় মনে করিত। সুতরাং অনেকগুলি কন্যাদায়-গ্রস্ত উমেদার রামযাদুর গৃহে ঘটক পাঠাইতে আরম্ভ করিল। রামযাদু যখন বুঝিল, চারে মাছ আসিয়াছে, তখন সে গম্ভীর হইয়া বসিল; এবং ঘন ঘন তামাক টানিতে লাগিল। কিন্তু রামযাদুর হাঁক শুনিয়া ট্যাংরা পুঁটির দল টোপে দুই একটা 'ঠোকর' মারিয়াই পলাইতে লাগিল। কেহই সাহস করিয়া বঁড়শী গিলিল না। শেষে চারে একটি প্রকাণ্ড কাতলার আবির্ভাব হইল। তিনি ভূষিমালের কারবার করিয়া হঠাৎ ফাঁপিয়া উঠিয়াছেন; তাঁহার নাম জগমোহন দে। ট্যাংরামারীর পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী দেবনারায়ণপুরে সে মহাশয়ের নিবাস। কাতলামারী, রুইতনপুর, চিংড়ীখালী, হেঁড়েদহ প্রভৃতি নানা স্থানে তাঁহার গোলাবাড়ী; তেজারতী, লগ্নীকারবারেও তাঁহার বিস্তর টাকা খাটে। ট্যাংরামারীর বিশ্বাসদের বাড়ীতে তাঁহার এক ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল; ভাগিনেয়ের চূড়াকরণ উপলক্ষে তিনি ট্যাংরামারীতে আসিয়া একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে রামযাদু প্রামাণিকের গৃহে উপস্থিত হইলেন।

রামযাদু পরমসমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া তাহার চালাঘরের বারান্দার একখানি কম্বলের উপর বসিতে দিল। সে মহাশয়ের ভগিনীপতি জনার্দন বিশ্বাস উকীল হইয়া তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। রামযাদু হুঁকায় জল পুরিয়া এক কল্‌কে তামাক দিয়া কুটুম্বদ্বয়ের অভ্যর্থনা করিল। অন্যান্য কথার পর জনার্দন কাজের কথা পাড়িলেন, হুঁকায় 'সুখটান' দিয়া বলিলেন, "রামদা, তুমি নাকি গোবর্দ্ধনের জন্য মেয়ে খুঁজ্‌চো?"

রামযাদু মাথা চুল্‌কাইয়া বলিল, "ইয়ে—কি বলে—তা একটি ভাল মতন পাত্রী ত খুঁজ্‌তেই হয়! আর আমার 'গোবদ্ধন' ত শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে একুশ বছরে পড়েছে; পাশও দু'টো করেছে। আমাদের নদেরচাঁদের মনিব—ঐ যে কি বলে—নামটা তাঁর আবার মনে থাকে না—অরাতিবিমর্দ্দন বাবু বলেছেন, আমার 'গোবর্দ্ধন' নেকাপড়ায় যে রকম দিগ্‌গজ হয়ে উঠছে, তাতে 'সল্‌পূর্ণ' বৃত্তি না হয় বি, এ পাশ করলেই নাটসাহেব তাকে হাকিমী চাকরী না দিয়ে ছাড়বে না। ছোঁড়া বি, এটা পাশ কল্লে রাজা নিধিরাম পালের নাত্‌নীর সঙ্গেই বিয়ে—সম্বন্ধটা করে ফেল্‌তে পারতাম, কিন্তু ততদিন আর সবুর কর্‌তে পারচি নে; বুড়ো হয়েছি, কবে মরে টরে যাব, ছোঁড়ার বিয়েটা দিয়ে 'সাট্‌-আপ্পান্‌'টা মিটিয়ে নিই।"

জনার্দ্দন হুঁকাটি রামযাদুর হাতে দিয়া বলিলেন, "এ ত বেশ ভাল কথা, তাহাদের সে মহাশয়ের একটি মেয়ে আছে; দেখ্‌তে শুন্‌তে বেশ, আর দেবেন থোবেনও ভাল; এ 'প্রেস্তাবে' তোমার মত কি? সে মশায় এ 'গের্দো'র ভেতর কত বড় গোক, তা কারও ত 'অছাপি' নেই।"

রামযাদু এই প্রস্তাব শুনিয়া মানসিক উৎসাহ চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া হুঁকায় এমন একটি উৎকট দম দিল যে, কলিকার আগুন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ইহাতে সে কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া হাঁকিল, "ওরে! ও বদ্দিনাথ, ভাল করে এক কল্‌কে তামাক সেজে আন্‌তো। ব্যাটা এখন পর্য্যন্ত তামাক সাজ্‌তে শিখ্‌লি নে। না পারিস্ গরু চরাতে, না পারিস্ তামাক সাজ্‌তে!"

গালি খাইয়া পাকাটীর ন্যায় হাত পা বিশিষ্ট একটি ঢক্কাকার বিশাল উদর রঙ্গভূমিতে আবির্ভূত হইল। ক্রমাগত ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া তাহার দেহটি এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই বালকটির নামই বদ্দিনাথ; সে বাগ্দীর ছেলে, বাপ নাই, মা রামযাদুর 'গোয়ালকাড়ুনী', আর বদ্দিনাথ তাহার রাখাল। সে রামযাদুর বাড়ী তিন বেলা খাইয়া তাহার গাই দুটিকে মাঠে চরাইয়া আনিত;

বদ্দিনাথের বয়স দশ এগার, কিন্তু বেলে-জমীর নাবলা গাছের মত তাহার বয়স অনুমান করিবার উপায় ছিল না। একখানি প্রকাণ্ড পিষ্টকাকার প্লীহায় তাহার উদরটি-পূর্ণ; উদরে চক্রাকার কয়েকটি শুষ্ক ক্ষতচিহ্ন, প্লীহা-দমনের জন্য দেশী 'বেলেতারা' দেওয়া হইয়াছিল, তাহারই চিহ্ন। বেচারা যতদিন বাঁচিবে, এ চিহ্ন মিলাইবার নহে। এতদ্ভিন্ন তাহার বুকের নীচে দেশী চিতার আঁচার একটি লম্বা দাগ; বুকের 'কড়া' নামিয়া ছেলেকে কাহিল করিতেছে শুনিয়া তাহার মা গ্রাম্য কবিরাজের নিকট গিয়া 'বদ্দিনাথ'কে এই ভাবে 'দাগিয়া' আনিয়াছে। এই সকল গ্রাম্য 'গোবৈদ্যে'র চিকিৎসাই এইরূপ; তাহারা কেবল গরু দাগে না, রোগ তাড়াইবার জন্য গোরুর রাখালকেও দাগিয়া চিকিৎসা-নৈপুণ্য প্রদর্শন করে! বদ্দিনাথের দু'হাতে দু গাছি রূপার বালা, এবং গলায় রূপার হাঁসুলি। ক্রমাগত জ্বরে ভুগিয়া তাহার মাথার চুল বার আনা রকম উঠিয়া গিয়াছে; যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা কদম্বকেশরের ন্যায় কণ্টকিত। কটিদেশে ধড়া, তাহার সহিত কোনও কালে 'ক্ষারে'র সাক্ষাৎ হয় নাই।

এবংবিধ বদ্দিনাথ রামযাদুর সম্মুখে আসিয়া কলিকাটি গ্রহণপূর্ব্বক তাহাতে ফুৎকার দান করিয়া বলিল, "ইস্, টানের 'চোটে' যে গুলে আগুন ধরে গিয়েচে, আজাই! তামুক কুতায়? আমাদের দা-কাটা তামুক সাজ্‌লে ইনারা সাম্‌লাতে পারবে? সে যে বড্ডা তলব!"

বদ্দিনাথের মা রামযাদুকে 'খুড়োমশাই' বলিয়া ডাকিত, সেই সুবাদে বদ্দিনাথ তাহাকে 'আজাই' (মাতামহ) বলিত। ভদ্রলোকের সম্মুখে বাগ্দীর ছেলের এতখানি ঘনিষ্ঠতা-প্রকাশে আজাই ভয়ঙ্কর চটিয়া গেল; মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "বেটার বাবাকেলে আজাই! যা, কুটুম্বিতে করতে হবে না, কলুঙ্কার মধ্যে ভাঁড়ে অম্বুরী তামাক আছে, সেজে আন্। নীমে বেণের দোকানের ভাল জর্দ্দা, তোদের দৌরাত্ম্যিতে ভাল তামাক লুকিয়ে না রাখ্‌লে ত থাক্‌বে না।"

বদ্দিনাথ এই প্রকার অপবাদে ক্ষুব্ধ হইয়া আজামশায়ের উক্তির প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, কিন্তু রামযাদুর রক্ত-চক্ষুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার মুখে কথা ফুটিল না, সে তাড়াতাড়ি কলিকা লইয়া গৃহান্তরে প্রবেশ করিল, এবং নীমে বেণের দোকানের আতর দেওয়া 'অম্বুরী' তামাক সাজিয়া আনিয়া কলিকাটি রামযাদুর হস্তে প্রদান করিল। জনার্দ্দন গম্ভীরভাবে ধূমপান করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামযাদু পুত্রের বিবাহ-সম্বন্ধে কোনও রায় প্রকাশ না করায় সে মহাশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন; রামযাদুকে বলিলেন, "আপনার কাছে একটু আশ্বাস পেলে—"

রামবাবু মাথা চুলকাইয়া বলিল, "তা বেয়াই একবার বেঁকে বসলে তা হলে সম্বন্ধ হলেই ভাল হয় না কি?"

জনার্দন বিস্ময় তৎক্ষণাৎ হুঁকা ছাড়িয়া হাঁই তুলিলেন, এবং উহা হস্ত দ্বারা তুলিয়া তুড়ি দিয়া বলিলেন, "সে মেয়ে কি আমার দেখতে হয়? চেলা বামুনকে পৈতে দেখিয়ে ফলারে বসতে হবে? সে মশায়ের মেয়ে সাক্ষাৎ পরী, ও রকম ব্যাটার বৌ, এ রকম বেয়াই পাওয়া—বিস্তর তপিস্তের ফল।"

রামবাবু সে ভাষাক ছিলিমটা দগ্ধ করিয়াও কি জবাব দিবে—তাহা স্থির করিতে পারিল না, কিন্তু জবাব একটা না দিলেও ত নয়! শেষে সে বলিল, "একবার গোবর্দ্ধনের 'গন্ধধারিণী'র মতটা জেনে আসি।"

রামবাবু উঠিয়া মিনিট পাঁচেক পরে বাড়ীর ভিতর হইতে ঘুরিয়া আসিল, তাহার পর মুখে গাম্ভীর্য্যের বোঝা নামাইয়া বলিল, গিন্নী বলছিলেন, বৌমাকে বাউড়িমুট গহনা, আর গোবর্দ্ধনকে নগদ হাজার টাকা যৌতুক দিতে রাজী হলে তিনি বিবেচনা করে উত্তর দেবেন। ছেলের 'গন্ধধারিণী' যা বলছেন—তার উপর আমার কথা কি? আমি ত বলে—এক পা জলে, এক পা ডাঙ্গায়। যা দেবেন, আপনার মেয়ে জামাইয়েরই থাকবে। চক্ষু বুঁজলে সবই অন্ধকার। হরি হে, তুমিই সত্য।"

রামবাবুর দাবীর পরিমাণ শুনিয়া সে মহাপ্রভু হঠাৎ গরম হইয়া উঠিলেন, তিনি বড় ধনী লোক, আর একটা সামান্য আড়তের গুজন-সরকার তাঁহার সম্মুখে এতদূর গোস্তাকী করিতে সাহস করিল? তিনি চোখ মুখ লাল করিয়া ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "এত যে টাকা কড়ি গহনা চাচ্ছো, এ সকল রাখবে কোথায়? সম্বলের মধ্যে ঐ ত দুখান কুঁড়ে ঘর! এত টাকা খরচ করে' আমাদের সমাজে কে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, বলতে পার?"

রামবাবু অত্যন্ত কোপন প্রকৃতির লোক, সে দরিদ্র বটে, কিন্তু ধনাঢ্য বেয়াইয়ের নিকট সে ত ভিক্ষা চাহিতে যায় নাই, তবে তাহার বাড়ীতে আসিয়া এ ভাবে তাহাকে অপমান করিবার কারণ কি? রামবাবু রাগ করিয়া বলিল, "কিনবেন মিছরী, দাম দেবেন মুড়ীর? আমার ছেলে অবিক্রি পড়ে নেই, টাকা দিয়ে কাজ সারতে চান ত একটা গরু ধরে সাতপাক ঘুরিয়ে নেব বিয়ে। আমার দু'পাশ করা ছেলের সঙ্গে হবে টবে না।"

বেয়াই মহাশয় সবেগে উঠিয়া তাঁহার কুটুম্বকে বলিলেন, "ওঠ হে বিশেষ! এ দেশে আর কথাই, এ স্থানে মেয়ের বিয়ে দিয়ে সুখ হবে না।—ওঠ হে

হাজার টাকা খরচ করতে হয় ত বার ঘরে ভাত আছে, তার ঘরেই মেয়েব বিয়ে দেব। দেখা যাবে, কে কত টাকা ঘুঁস দিয়ে এ রকম কশাইয়ের ঘরে মেয়ে দেয়!"

সে মহাশয় জনার্দ্দন বিশ্বাসের সঙ্গে প্রস্থান করিলেন। রামযাদু প্রামানিক হুঁকাটি হাতে লইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "এক ছিলিম অম্বুরী তামাকই মাটী। টাকার গরমে মাটীতে যেন পা পড়ে না! উঃ! ড্যামাক্ দেখ! বড় লোক আছেন, উনিই আছেন। বড় লোক বলে যেচে ওঁর মেয়ে আন্‌তে হবে! কত বেটা নগদ দু'হাজার টাকা গণে দিয়ে, গোবর্দ্ধনের হাঁটু ধরে মেয়ে গতাতে পথ পাবে না।"

৩

বিবাহ-সম্বন্ধে বাঙ্গলাদেশ অত্যন্ত উদার। এ দেশে কাণা, খোঁড়া, বুড়া, কাহারও বিবাহ হইতে বাকী থাকে না; গোবর্দ্ধন ত সোনারচাঁদ, দুই পাখি করা ছেলে! প্রাণকৃষ্ণপুরের নকুড় বিশ্বাসের কন্যা সৌদামিনীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু রামযাদুর আশা পূর্ণ হইল না; নকুড় বিশ্বাস চতুর, রামযাদুকে নগদ দুই হাজার টাকা দিবে লোভ দেখাইয়া গোবর্দ্ধনের সহিত কন্যার বিবাহ দিল, কিন্তু একটি পয়সা দিল না। বিবাহের মজলিসে রামযাদুকে নগদ দুই হাজার টাকা দেওয়ার কথা ছিল; কিন্তু সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ও আগন্তুক লোকজনের সহিত বকাবকি করিয়া বিবাহের লগ্নের দশ মিনিট পূর্ব্বে নকুড়ের হঠাৎ মূর্চ্ছা হইল। বাড়ীতে গণ্ডগোল, কাঁদাকাটি পড়িয়া গেল। অনেকে নকুড়ের মাথায় জল ঢালিয়া তাহার চেতনা-সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিল। রামযাদু টাকাগুলি বুঝিয়া না পাইলে ছাঁদলাতলায় বর লইয়া যাইতে দিবে না বলিয়া বাঁকিয়া বসিল; কিন্তু গ্রামের পাঁচ জন মাতব্বর লোক তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না, জোর করিয়া সাত পাক ঘুরাইয়া দিল। মুক্তকচ্ছ রামযাদু অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া 'আমার টাকা! টাকা কোথায়!' বলিয়া চারি দিকে দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। নকুড় একখানি ঘরে মাদুরের উপর চক্ষু বুজিয়া পড়িয়াছিল, হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি শুনিয়া সে বুঝিল, তাহার শ্যালক ক্যালারাম নির্ব্বিঘ্নে কন্যা সম্প্রদান শেষ করিয়াছে। নকুড় তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিল, এবং তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া ঢুলীদের ধমক দিয়া বলিল, "খুব জোরে জোরে বাজা!" তাহার গলার আওয়াজ শুনিয়া রামযাদু দ্রুতপদে তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "বেয়াই, আমার

টাকা?" নকুড় হাসিয়া বলিল, "ব্যস্ত কেন? টাকা সিন্দুকে আছে। কাল সন্ধ্যালেই পাবে। এত রাত্রে টাকা নিয়ে রাখবে কোথায়?"

কিন্তু পরদিন সকালে নকুড়কে আর কেহ বাড়ীতে দেখিতে পাইল না। 'পলায়তি সঃ জীবতি' এই নীতিবাক্যের অনুসরণ করিয়া সে পলাইয়াছিল। রামযাদু টাকার অভাবে ম্রিয়মাণ হইয়া বৈবাহিককে গালি দিতে দিতে পুত্র, পুত্রবধূ সহ বাড়ী ফিরিল। তাহার পর এক বৎসর সে সৌদামিনীকে তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইল না। ইহাতে নকুড়ের স্ত্রী কন্যাবিরহে আকুল হইয়া কখন কখন অশ্রুবর্ষণ করিত, কখনও বা বৈবাহিককে অভিসম্পাত দিয়া কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিত; কিন্তু তাহাতে নকুড়ের আহার নিদ্রা প্রভৃতি দৈনন্দিন কার্য্যের ব্যাঘাত হইত না। ফাঁকি দিয়া মেয়ের বিবাহ দিয়া সে বেশ নিশ্চিন্ত হইয়াছিল।

কেবল কন্যার বিবাহ নহে, ফাঁকি দিয়া সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহেও নকুড় বিশ্বাসের অসামান্য দক্ষতা ছিল। কলিকাতার দরমাহাটার পেটো মহাজন 'শ্রীরবাসী লোকনাথ সা' নামক ফারমের কর্ত্তা বিশ্বনাথ সার দালাল-রূপে বাংবলে পাট কিনিতে কিনিতে একবার কয়েক হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়া সে দেশ গুছাইয়া লইয়াছিল। তাহার পূর্ব্বেও সে দুই তিন বার ছোলা, গম, ভুসিমাল প্রভৃতি ক্রয়ের ভার লইয়া কলিকাতার কোনও কোনও মহাজনকে প্রতারিত করিয়াছিল। শেষবার মহাজনেরা টাকা আদায়ের জন্য অত্যন্ত টানাটানি আরম্ভ করিলে, নকুড় বিশ্বাস হঠাৎ একদিন গেরুয়া পরিয়া ঝুলি ও চিমটা লইয়া তীর্থযাত্রা করে। স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি অল্প কিছু ছিল, কিন্তু সমস্তই তাহার স্ত্রীর সহোদরের নামে বেনামীতে ছিল। অগত্যা মহাজনের টাকাগুলি তাহার কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারিল না; নানা তীর্থ-দর্শনে পরস্বাপহরণ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, নকুড় কন্যাদায় হইতে উদ্ধার-লাভের জন্য রামযাদুর শরণাপন্ন হইল। তাহার হরিনামের ঝোলা, গলায় তিন ছড়া তুলসী কাঠের মালা, কোঁটা তিলকের ছটা, এবং মস্তকে জাজ্বল্যমান টীকি ও স্কন্ধে 'রাধাকৃষ্ণ চরণ ভরসা'-ঙ্কিত নামাবলীর ঘটা দেখিয়া রামযাদু তাহার অন্তরে বিশ্বাস করিল; এবং নগদ দুই হাজার টাকা যাত্র লইয়া গোবর্দ্ধনের সহিত সৌদামিনীর বিবাহের সম্বন্ধ পাকা করিয়া ফেলিল। রামযাদুর বিশ্বাস ছিল, নকুড় বিশ্বাস অনেক টাকার মানুষ; পুত্রের বিবাহ দিয়া বৈবাহিকের নিকট এক কপর্দ্দকও পাইবে না, ইহা সে কল্পনাও করে নাই। কিন্তু তাহাকেও সে ফাঁকি দিয়া কন্যাদায় হইতে উদ্ধার লাভ করিল।

৪

বৎসরের পর বৎসর জলের মত কাটিতে লাগিল, কিন্তু বৈবাহিকদ্বয়ের মনান্তর ঘুচিল না। কেহ কাহারও তত্ত্বতল্লাস লইত না। বিবাহের পর হইতে সৌদামিনী শ্বশুরবাড়ীতেই রহিয়া গেল। শ্রীমান্ গোবর্দ্ধন দুই বারের চেষ্টায় বি, এ পাশ করিয়া, গবর্মেণ্টের আফিসে চাকরী লইবার আশায়, কিছু দিন মুরুব্বীদের বাড়ী ঘুরাঘুরি করিয়া, দুই জোড়া জুতা ছিঁড়িয়া ফেলিল। কিন্তু লাটসাহেব তাহাকে হাকিমী কার্য্যে নিযুক্ত করা দূরের কথা, সে কোনও সরকারী আফিসে ত্রিশ টাকা বেতনের কেরাণীগিরিও জুটাইতে পারিল না। তখন সে হতাশ হইয়া বাড়ী আসিয়া বসিল, এবং গৃহধর্ম্মে মনোনিবেশ করিল। ইতিমধ্যে ট্যাংরামারীর অদূরবর্ত্তী নিত্যানন্দপুরের এণ্ট্রেন্স স্কুলের হেড মাষ্টারের পদ খালি হইলে, রামষাদুর মনিব হলধর হালদারের সুপারিশে স্কুলের সেক্রেটারী পরেশনাথ বাবু গোবর্দ্ধনকে সেই পদে নিযুক্ত করিলেন। পরেশ বাবু মহকুমার উকীল, হলধর তাঁহার একজন প্রধান মক্কেল। তিনি ধনাঢ্য মক্কেলের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া, অনেক যোগ্যতর প্রার্থীর দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিলেন। গোবর্দ্ধন হেড মাষ্টার হইয়া নিত্যানন্দপুরে বাসা ভাড়া করিল, এবং শিশুপুত্র সহ সৌদামিনীকে বাসায় আনিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

ওদান-সরকারের পুত্র হঠাৎ এণ্ট্রেন্স স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া পৃথিবীটাকে 'মধুপর্কের বাটী'র মত অত্যন্ত ক্ষুদ্র দেখিতে লাগিল। বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক তাহার প্রভুত্বে জ্বালাতন হইয়া উঠিল। সামান্য কারণে বা অকারণে সে তাহার পিতার সমবয়স্ক বৃদ্ধ শিক্ষকগণকেও অবমানিত করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিত। গ্রাম্য ভদ্রলোকদের সহিতও তাহার সদ্ভাব ছিল না; কিন্তু যাহারা চেষ্টা করিলে তাহার অপকার করিতে পারে, সে তাহাদের সহিত হামেসা দেখা সাক্ষাৎ করিত, তাহাদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিত। স্থানীয় সবডিবিজনাল অফিসার মহেন্দ্রবাবু স্কুল-কমিটীর প্রেসিডেণ্ট। গোবর্দ্ধন মধ্যে মধ্যে চোগা চাপকান আঁটিয়া তাঁহার বাঙ্গলায় হাজিরা দিত; এবং হাকিম সাহেবের ছেলেদের পড়াশুনায় উৎসাহবর্দ্ধন করিত। স্কুলের সম্পাদকের ছোট ছেলেটি প্রথম শ্রেণীর গর্দ্দভ, কিন্তু সে হেড মাষ্টারের কৃপায় প্রতি বৎসর বার্ষিক পরীক্ষায় অধিকাংশ বিষয়ে 'রসগোল্লা' লাভ করিয়াও উচ্চতর শ্রেণীতে 'প্রমোশন' পাইতে লাগিল। বৎসরান্তে স্কুলের ছাত্রগণকে পুরস্কার বিতরণ

করা হইত। গোবর্দ্ধন কোন-না-কোনও উপলক্ষে স্কুলের সম্পাদক ও স্কুল-কমিটীর প্রেসিডেন্টের পুত্রকে পুরস্কার দেওয়াইতে লাগিল। একবার সে দেখিল, প্রেসিডেন্টের পুত্রটিকে কোনও উপায়েই 'প্রাইজ' দেওয়ান যায় না, তখন সে পুরস্কার-বিতরণ-সভায় "আলেকজান্দার ও দস্যু"র অভিনয় জুড়িয়া দিল এবং প্রেসিডেন্টের পুত্রকে দিয়া আলেকজান্দারের ভূমিকা অভিনয় করাইয়া তাহাকে একটি পুরস্কার দিল।

ইতিমধ্যে বঙ্গদেশীয় বিদ্যালয়সমূহে 'ইণ্ডীয়িয়াল গ্রাণ্ট' মঞ্জুর হইলে নিত্যানন্দপুর স্কুলের হেড্‌মাষ্টারের বেতন এক শত টাকা হইল। পঁচাত্তর টাকা বেতনে এক জন সহকারী হেড্‌মাষ্টার নিযুক্ত করাও স্থির হইল। এডুকেশনের সাহায্যের পরিমাণও অনেক বাড়িয়া গেল। গ্রামের লোক বলিতে লাগিল, "এক শত টাকা বেতনে ভাল এম, এ, পাওয়া যাইবে। এক জন বুদ্ধদর্শী এম একে হেড্‌মাষ্টারী দিয়া, গোবর্দ্ধনকে সহকারী হেড্‌মাষ্টারের পদে দেওয়া হউক।" গোবর্দ্ধন তখন পঞ্চান্ন টাকা বেতন পাইত, তাহার ন্যায় এক জন বাদে ও অল্পদিন পূর্ব্বে পাশকরা বি,এ,র পক্ষে পঁচাত্তর টাকা মাসিক বেতন নিতান্ত অল্প নহে। কিন্তু স্কুল-কমিটীর মিটিংএ প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল না। হাকিম-প্রেসিডেন্ট মত প্রকাশ করিলেন, গোবর্দ্ধন বাবু অতি উপযুক্ত হেড্‌ মাষ্টার, তাহাকেই এক শত টাকা বেতন দেওয়া হউক, এক জন ভাল গ্রাজুয়েটকে সহকারী হেড্‌মাষ্টার নিযুক্ত করা হউক। হাকিমের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতে কমিটীর অধিকাংশ মেম্বরেরই সাহস হইল না; তাঁহার প্রস্তাব মঞ্জুর হইল; পঞ্চান্ন টাকা মূল্যের গোবর্দ্ধন মাসিক এক শত টাকা বেতনের পদটি দখল করিয়া আঙ্গুল ফুলিয়া তালগাছ হইল; এবং পূর্ব্বে সে যাহাদিগকে দেখিলা নমস্কার করিত, তাহাদিগকে কীট পতঙ্গের মত দেখিতে লাগিল! তাহাদের মুখে তামাক খাইয়া নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতেও কুণ্ঠিত হইল না।

যামিনীভূষণ বাবু গোবর্দ্ধনের বি, এ পাশ করিবার পূর্ব্ব বৎসর ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম বিভাগে বি, এ পাশ করিয়াছিলেন; দৈনিক "বেঙ্গলী"তে চাকরী খালির বিজ্ঞাপন দেখিয়া তিনি নিত্যানন্দপুর স্কুলের সহকারী হেড্‌মাষ্টারের পদের জন্য আবেদন করিলে, ৩২৬ খানি দরখাস্তের মধ্যে তাঁহারই দরখাস্ত মঞ্জুর হইল। যামিনীভূষণ সহকারী হেড্‌মাষ্টার নিযুক্ত হইবার পর তিন মাস না যাইতেই গোবর্দ্ধন নানাভাবে তাঁহাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাঁহার প্রধান অপরাধ, তিনি ইংরাজী সাহিত্যে গোবর্দ্ধন অপেক্ষা সুপণ্ডিত.

বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ তাঁহার অধ্যাপনায় পক্ষপাতী, এবং ছাত্রবিশেষের প্রতি গোবর্দ্ধনের ন্যায় তাঁহার অন্যায় পক্ষপাত ছিল না।—ইংরাজী ভাষায় তেমন অধিকার না থাকায় হেডমাষ্টার গোবর্দ্ধন প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের অনেক ভুল শিখাইয়া দিতেন, যামিনীভূষণ কৌশলে সেই ভ্রম সংশোধন করিয়া দিতেন, ছেলেদের নিকট হেডমাষ্টারকে অপদস্থ হইতে না হয়, সে বিষয়ে তাঁহার লক্ষ্য ছিল। কিন্তু গোবর্দ্ধন মনে করিত, যামিনী ক্রমাগত তাহাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

৫

যোগ্যতর কর্ম্মচারী নিম্নতর পদে থাকিলে উচ্চতর কর্ম্মচারীর মনে শান্তি থাকে না, সর্ব্বদা আশঙ্কা হয়, যোগ্যতর তাঁবেদারটি হয়ত তাহার চাকরীটি আত্মসাৎ করিবে। গোবর্দ্ধনেরও সেই আশঙ্কা প্রবল হইল। বিশেষতঃ তাহার মুরুব্বী—স্কুলকমিটীর প্রেসিডেণ্ট ডেপুটী বাবু অন্য মহকুমায় বদলী হওয়ায় অবলম্বনশূন্য 'ন্যাড়া'র ন্যায় সে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িল। বিপদের উপর বিপদ! সেই বৎসর যে-কয়েকটি ছাত্র প্রবেশিকায় 'ফেল' হইয়া, 'ক্লোনিষ্ট' জানাইয়া দেখা গেল,—তাহারা সকলেই ইংরাজীতে ফেল! গ্রামের লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল, "নাঃ, এ হেডমাষ্টার দিয়া আর কাজ চলিবে না, লোকটা ইংরাজী ভাষায় একেবারে 'ঘা', নূতন হেডমাষ্টার না আসিলে স্কুলটি মাটী হইবে।" স্কুলের সম্পাদক বলিলেন, "ভদ্রলোক এতদিন আছে, কি ক'রে তাড়াই?" স্কুলের নূতন প্রেসিডেণ্ট বলিলেন, "এক শ' টাকায় অনেক ভাল লোক মিলিবে, হেডমাষ্টার ইংরাজীতে কাঁচা হইলে তাহাকে রাখায় ফলে ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই।"

গোবর্দ্ধনের মুখ শুকাইল। সে ভদ্রসমাজে অপদস্থ হইয়া ঘরে আসিয়া স্ত্রীকে ঠেঙ্গাইতে আরম্ভ করিল। তাহার মেজাজ যেদিন বেশী গরম থাকিত, সেদিন পত্নী-নির্য্যাতন কার্য্য অধিক উৎসাহে চলিত। ইতিমধ্যে একদিন সৌদামিনীর পিতা নকুড় বিশ্বাস কন্যার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া তাহার নেকলেসের জন্য সোনা কিনিবার অজুহাতে দুই শত টাকা কাঁকি দিয়া লইয়া গেল। গোবর্দ্ধন সে কথা জানিতে পারিয়া সৌদামিনীকে এমন পর্য্যন্ত শাসন করিল যে, তিন দিন সে শয্যাত্যাগ করিতে পারিল না। গ্রামের ভদ্রলোকেরা তাহার এই বীরত্বকাহিনী শুনিয়া কানে আঙ্গুল দিলেন।

গোবর্দ্ধন যখন দেখিল, এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় অবতীর্ণ ছেলেদের ইংরাজী

সাহিত্যের 'রেজাল্টের' জন্য তাহাকেই দায়ী করা হইতেছে, তখন সে অপরাধের সুকৌশলী হেড্‌মাষ্টার যামিনীভূষণের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা করিল। সে বলিল, দ্বিতীয় শ্রেণীতেই ছেলেরা ইংরাজী শেখে, এণ্ট্রেন্স-ক্লাসে উঠিয়া তাহারা নূতন কিছু শিখিবার বিশেষ সময় পায় না। সুতরাং দ্বিতীয় শ্রেণীতে যদি তাহারা ইংরাজী না শিখিয়া থাকে, তবে সে জন্য তাহাকে দায়ী করা অন্যায়।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছেলেরা আদৌ ইংরাজী শেখে না, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য বুদ্ধিমান গোবর্দ্ধন এক কৌশল অবলম্বন করিল। যামিনীভূষণ দ্বিতীয় শ্রেণীতে ও চতুর্থ শ্রেণীতে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন। বার্ষিক পরীক্ষায় সময় উক্ত দুই শ্রেণীর ইংরাজী সাহিত্যের পরীক্ষা-ভার গোবর্দ্ধন নিজের হাতে রাখিল। পরীক্ষার পর দেখা গেল, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছত্রিশ জনের মধ্যে ছয় জন ও চতুর্থ শ্রেণীতে চুয়াল্লিশ জনের মধ্যে সাত জন মাত্র ইংরাজী সাহিত্যে পাশ করিয়াছে, আর সব ফেল! সুতরাং প্রতিপন্ন হইল, যামিনীভূষণ ইংরাজীতে অত্যন্ত অ-লায়েক। তিনি স্কুলে থাকিতে স্কুলের মঙ্গল নাই। কেবল তাহাই নহে, গোবর্দ্ধন সার্কুলার জারি করিল, যে সকল ছাত্র বার্ষিক পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যে পাশ করিতে পারে নাই, তাহারা 'প্রমোশন' পাইবে না।

এবার ছেলেদের বাপদাদারা ক্ষেপিয়া উঠিল। তাহারা ছেলেদের একটি বৎসর এ ভাবে নষ্ট করিতে দিতে রাজী হইল না। কিন্তু হেড্‌মাষ্টারেরও অসম্ভব পণ! অনেক ছেলে বলিল, তাহারা খুব ভাল শিখিয়াছে, তবু হেড্‌মাষ্টার অন্যায় করিয়া ফেল করিয়াছে। তাহাদের কাগজ পুনর্ব্বার পরীক্ষা করা হউক।

ছেলেদের এই প্রার্থনা গোবর্দ্ধন হেড্‌মাষ্টার তৎক্ষণাৎ না-মঞ্জুর করিল। কিন্তু এই দলে স্কুলের সম্পাদকের ছোট ছেলেটিও ছিল। সেক্রেটারী হেড্‌মাষ্টারের নিকট তাহার উত্তরের কাগজ চাহিয়া লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, হেড্‌মাষ্টার তাহাতে পূর্ণসংখ্যা এক শতের মধ্যে ২৩ নম্বর দিয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে ৬০ নম্বর পাইতে পারে। সম্পাদক মহাশয় এই কথা বলিতেই গোবর্দ্ধন তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। সম্পাদক কাগজগুলি পুনঃপরীক্ষায় প্রস্তাব করিলে সে তাহাতে সম্মত হইল না। অবশেষে অনেকের নিকট ভাড়া খাইয়া সে কাগজগুলি ছাড়িয়া দিলে পুনঃপরীক্ষায় দেখা গেল, বিস্তর ছেলে অন্যায়রূপে ফেল হইয়াছে।

এই সকল গুপ্তকথা ব্যক্ত হওয়ায় নিত্যানন্দপুরের জনসাধারণ গোবর্দ্ধনকে

স্কুল হইতে তাড়াইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। কেহ কেহ সম্পাদকের সহিত দেখা করিল। সম্পাদক মহাশয় গোবর্দ্ধনের ব্যবহারে অবমানিত হইয়াছিলেন, তিনি ভদ্রলোকদের যথাবিহিত উপদেশ দানে আপ্যায়িত করিলেন। তৎপর স্কুলকমিটীর নিকট জনসাধারণের এক প্রকাণ্ড দরখাস্ত পেশ হইল। তাহার অভিযোগ করিল, বর্ত্তমান হেড্‌মাষ্টার গোবর্দ্ধন প্রামাণিক ইংরাজীতে অভ্যন্ত কাঁচা, কয়েকটি গুরুতর কারণে সে হেড্‌মাষ্টারের পদে নিযুক্ত থাকিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য; এক শত টাকা বেতনে ভাল এম, এ পাওয়া যায়, অতএব গোবর্দ্ধনকে পদচ্যুত করিয়া উপযুক্ত হেড্‌মাষ্টার নিযুক্ত করা হউক। কমিটী যদি এ আবেদন গ্রাহ্য না করে,—তাহা হইলে কমিটীকে সাধারণের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং সাধারণের প্রতিনিধি হইতে পারেন—এরূপ লোক নির্ব্বাচিত করিয়া নূতন কমিটী গঠন করা আবশ্যক হইবে।

কিন্তু তাহা আর আবশ্যক হইল না, স্কুলকমিটীর অধিকাংশ সভ্য গোবর্দ্ধনের প্রভুত্বে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন; কমিটীর মিটিংএ স্থির হইল, হেড্‌মাষ্টার গোবর্দ্ধন পরামাণিককে পদত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক, সে পদত্যাগে সম্মত না হইলে তাহাকে 'সদ্‌গেও' করিয়া অভিযোগগুলি সত্য কি না, তাহার অনুসন্ধান হউক।

গোবর্দ্ধন দেখিল, আর চাকরী থাকে না। সে কমিটীকে জানাইল, সে পদত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছে, কিন্তু তাহাকে এক মাস সময় দেওয়া হউক।

কমিটীর কোনও কোনও সভ্য বলিলেন, "বেচারা ত বাইবেই, সরকারের মোটা টুকা পান করিতে চাহিলে তাহা দেওয়াই কর্ত্তব্য। উহাকে এক মাস সময় দেওয়া হউক।" কিন্তু সম্পাদক মহাশয় ও তাঁহার দলস্থ কয়েক জন সভ্য ইহাতে আপত্তি করিলেন। সম্পাদক মহাশয়ের আশঙ্কা হইল,—গোবর্দ্ধন সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার পুত্রেরই 'প্রমোশন' বন্ধ করিবে। এতদ্ভিন্ন নানারূপে স্কুলের অনিষ্ট চেষ্টা করিবে। অতএব তাহাকে সময় না দেওয়াই উচিত।

গোবর্দ্ধনের ইস্তফানামা মঞ্জুর হইল, কিন্তু সে আর একদিনও চাকরীতে থাকিতে পাইল না। সে দিন গোবর্দ্ধন সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়া, "আজ আমি স্কুলে হাজিরা দিয়াছি, আমিকার মাহিনাটা পাইব নাকি?"

সম্পাদক মহাশয় দয়া করিয়া সে দিনেরও বেতন মঞ্জুর করিয়া গোবর্দ্ধনকে বিদায় করিলেন। গোবর্দ্ধন কাহারও সহিত দেখা সাক্ষাৎ না করিয়া রাত্রিযোগে নবদ্বীপের নৌকায় উঠিয়া নিতানন্দপুর ত্যাগ করিল। সে স্ত্রীকে বাড়ী রাখিয়া

আলিপুরদুয়ার গিয়া নূতন চাকরীর চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বিধাতার ছাপ্পো আর শিকা ছিঁড়িল না; এক শত টাকা বেতনের হেড মাষ্টারী কোথাও মিলিল না। বহুবধানেক পরে আলিপুর দুয়ার অঞ্চলে বহু কষ্টে ৬০ টাকা বেতনের একটি মাষ্টারী জুটিলে সে পত্রযোগে নিত্যানন্দপুরে প্রচার করিল—ব্রাঞ্চিলিংএ দেড় শত টাকা বেতনের চাকরী পাইয়াছে। গুণের আদর সর্ব্বত্র, কেবল ভেড়ার সিংএ পড়িয়া হীরার ধার ভাঙ্গিয়াছে। নিত্যানন্দপুরের সব লোক মূর্খ ও অভদ্র, তাহারা গোবর্দ্ধন পরামাণিকের কদর বুঝিতে পারিল না।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। জ্যৈষ্ঠ।—শ্রীহরিনাথ চক্রবর্ত্তী কাব্যরত্ন শাস্ত্রীর উপাধিতে যে কবিত্ব আছে, তাহার 'ব্যাকরণতা'র সে কবিত্ব নাই। যাহা মনে জাগে, তাহাই কবিত্ব; কাব্যরত্ন শাস্ত্রীমাও যদি তাহা না বুঝেন, তাহা হইলে আমরা নাচার। 'উদ্বোধন', এই শ্রেণীর মামুলী রচনা যেমন হইয়া থাকে, তেমনই। উদ্বুদ্ধ করিতে পারে না, পড়িলে ঘুম ভাঙ্গে, অথচ ঘুম হয় না; বিরক্তি ভিন্ন ইহাতে অন্য কোনও ভাবের উদ্রেক হয় না। 'ভাগবতী বিদ্যের অভিব্যক্তি' প্রবন্ধে লেখকের নাম নাই। সাম্প্রদায়িক প্রবন্ধ। শ্রীশচন্দ্রনাথ পণ্ডিতের পুঁটি পাঁড়িয়া সুবোধ ছেলেদের essay লেখা মনে পড়ে। দুই পৃষ্ঠায় 'ধর্ম্মের স্বরূপনির্ণয় সহজসাধ্য, সুতরাং নয়। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ডাকী' একটি 'কবিতা'। কবিতা, বা কবিতা রচনার চেষ্টা কিরূপ সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে, ইহা হইতে তাহা বুঝা যায়। ক্ষিতীন্দ্রনাথ নিজে ও বিজ্ঞানের আলোচনায় চিরজীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, কিন্তু তিনিও এ 'হাওয়া' অতিক্রম করিতে পারিলেন না। কবির বংশের সকলেই কবি নয়, এবং 'ডাকা' বুঝে যার তার কাছে ডাকাইকি করিলেও সকলের রচনায় মানসী লেখা দেন না, ইহাতে এই সত্যটি প্রতিপন্ন হইতেছে। শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যাবিনোদ 'নিয়ন্ত্রিত সম্প্রদায়' উল্লেখযোগ্য। শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঋণাণ্ডের স্মৃতিকথা' ও 'গীতারহস্য' চলিতেছে। প্রথমটি উপভোগ্য; কিন্তু দ্বিতীয়টির ভাষা এত জটিল হইতেছে, যে আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

নারায়ণ। জ্যৈষ্ঠ।—শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরীর 'পর-আহারী বাঘ' একটি বাঘা—সাময়িকের প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। আখ্যানটি চিত্তাকর্ষক, কিন্তু ইহার দোষে সাধারণ আকৃষ্ট হইয়াছে। তাহার পর সম্পাদকের 'বাঙ্গলার কথা'। প্রাদেশিক সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির অধিনায়কে চিত্তরঞ্জন যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাই 'বাঙ্গলার কথা'। এই কথা লইয়া নানা কথার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে অনেক কাজের কথা এ অপেক্ষা অনেক বেশী বাজে কথা আছে। দুই শ্রেণীর কথার কোনও কথাই যৌক্তিক চিন্তার ফল নহে।—এ সকল কথার অনেক কথার—অধিকাংশ কথার বীজ 'সভ্যতা' ও 'বস্তুতান্ত্রিকতা' নামক

[illegible] ছুটি [illegible] [illegible] [illegible]

নব আকারের শক্তি ও সৃষ্টির সৃষ্টি হইবে, তাহা পূর্ব্ব হইতে বলা সাধারণ ক্ষমতাতীত। বেলুড় মঠে স্বামীজীর এই উক্তি সপ্রমাণ হইতেছে। অন্যত্র—'ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় মাসিকপত্রগুলি অনেক সময় একাধারে এক প্রকার অক্ষম স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজেই চলে। তাহাদের প্রভাব অদ্ভুত। উহারা এক দিকে যেমন ভাব ছড়াইয়া দেয়, অপর দিকে তেমনি লোকের মনোভাব ব্যক্ত করিবার যন্ত্রস্বরূপ হয়। স্বামীজী উহাদের এই শিক্ষাসংক্রান্ত উপকারিতা যেন সহজসংস্কার-প্রভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি তাঁহার গুরুভ্রাতা ও শিষ্যগণপরিচালিত মাসিকপত্রগুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এত আগ্রহান্বিত হইলেন।' কোন সাময়িক পত্রের একই সংখ্যায় হয় ত এক পৃষ্ঠায় উচ্চতম অতীন্দ্রিয় তত্ত্বসমূহ আলোচিত হইয়াছে, আবার অপর এক পৃষ্ঠায় অপেক্ষাকৃত কাঁচা হাতের লেখা নানা ঐহিক বিষয়ের কল্পনা জল্পনা স্থান পাইয়াছে। ইহা হইতে ভারতীয় যুগসন্ধিকালের (Transition) সাধারণ লোকের মনের গতি কোন্ দিকে, তাহারও একটী প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।' মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণের 'বেদান্ত দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শন' অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, কিন্তু উপাদেয় ; উচ্চ চিন্তায় পূর্ণ। শ্রীরমণীকান্ত বসুর 'শঙ্করদেব' উল্লেখযোগ্য। 'প্রাদেশিক সম্মিলনে সাধারণ কথা' নামক প্রবন্ধে 'ভারতের সাধনা'র লেখক যে বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আমাদের পরাধীন দেশে সে বিষয়ের স্বাধীন ও স্বাধীন আলোচনার যখন অবকাশ নাই, তখন এ বিড়ম্বনা কেন ? যথা ;—'১ম, দেশের কাজ দেশের লোকই করিবে ; রাজাকে দিয়া উহা করাইবার জন্য আর্জ্জি পেশ করা দেশের কাজ নহে।' কেন ? রাজা ত প্রজার সমবায়-শক্তি। ব্যষ্টিতে যে কাজ সাধ্য নয়, তাহা ত সমষ্টিতেই করিতে হয়। রাজা ত সেই সমষ্টি-শক্তির কেন্দ্র ও আধার। বিশ্বামিত্র নিজে যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসদিগের সংহার করিয়া 'আত্মশক্তি' সার্থক না করিয়া রাজা দশরথের শরণাপন্ন হইলেন কেন ? দেশের লোক প্রত্যেকে দেশের কাজ করিবে, না সমবেতভাবে করিবে ? প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে দেশের সকল কাজ করিতে পারে না ; অতএব, সমবেত ভাবেই করিতে হয়। সমবেত হইলেই একটা কেন্দ্র চাই ? প্রজাশক্তির সেই কেন্দ্রই রাজা। এই বুদ্ধিতেই ভারতবর্ষে রাজাকে কেন্দ্র করিয়া প্রজাশক্তির বিকাশ হইয়াছিল ; এ দেশে রাজা বিদেশী। পদে পদে প্রজার আর্জ্জি বিফল হয়। তাই অভিমানে এই স্বাবলম্বনের উৎপত্তি হইয়াছে। চিত্তরঞ্জনের অভিভাষণ রাজনীতিক চালাকী ; তাহাতে ভাষার চাতুরী শোভা পায়। 'ভারতের সাধনা'র সাধকে ইহা অপেক্ষা স্পষ্টোক্তি বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাহা যখন সম্ভব নয়, তখন 'মৌনং হি শোভনম্'। তাহার পর, '২য়, আমাদের একটা বিশিষ্ট জাতিত্ব আছে ; সেই জাতিত্ব বজায় রাখিয়া ইংরাজের সহিত মিলিত হইতে হইবে।' ইহার অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা'। আমাদের 'একটা বিশিষ্ট জাতিত্ব' যদি থাকে, তাহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। সেই 'বিশিষ্ট জাতিত্ব' অক্ষুণ্ণ রাখা জাতীয় প্রচেষ্টার কর্ত্তব্য হইতে পারে ; 'তাহা বজায় রাখিয়া বিশে আমরা কি করিব, ইহাই জাতির চিন্তার বিষয়ীভূত হইতে পারে, কোন জাতিবিশেষের সহিত মিলিব, তাহা জাতির চিন্তার বস্তু নহে। আর্থের বিচারেই তাহা নির্ণীত হইতে পারে। আমাদের জাতিগত কর্ত্তব্যের আলোচনায় কিন্তু প্রতিপদেই ইহা বলিয়া দিতে হয়, 'বুড়ী ছুঁইয়া' রাখিতে হয়।

বিক্রমপুরী। [illegible]—শিবচন্দ্রের দাদা [illegible] [illegible] [illegible]

ভালবাসা নাই। বৈষ্ণবকবিতার কবিরা নিজে এই দুই বিষয়ে কি অভিজ্ঞতা করেছেন, জানা যায়। এখনও এখনও শেষ হয় নাই। শ্রীযতীন্দ্রসেনচন্দ্র মিত্র 'সনেটের কথা' খুব টানিয়া বুনিয়াছেন। সনেট 'ছোট খাটোর মেলে রূপে গুণে অপূর্ব্ব সুন্দরী'; কেন না, ছোট ছোট সনেট সম্পূর্ণ হয়। তার পর 'মোহিত-মাইকেল হেরি, হাতে তার মশিয়া সনেট একদিন ছড়াছড়ি যাইয়া আসিলেন: 'কেহ দিল, টিটকারী, কেহ কেহ বাহবা হাসারী।' [তার পর হেমচন্দ্র বাঁড়ুয্যে আসিলেন। সনেট লিখা হইল:] 'অমর অক্ষয় করে' বিদ্যার উপর কবিতাটি রচনা করিলেন। তার পর কবীন্দ্র রবীন্দ্র চৌধুরীর গান শুনাইলেন, তার পর 'প্রিয়-কুঞ্জ মেরেছে' 'অজকে অনোমগুহ্য মেঘেতরে কবির প্রমান।' অবশেষে সনেট সুন্দরী সনেট-পাগলিনের কবি প্রমথ চৌধুরীর ঘাড়ে পড়িল। যথা,—

'পাকাধৎ ভক্তের নানাবিধ করি কারিগরী
অভোগায় পড়িল মুটে তার প্রমথ চৌধুরী।'

বোধার দুর্ভাগ্যের পরম ইহার কাছে কোথায় লাগে?—বাঙ্গালা কবিতা বহুদিন পূর্ব্বে পাগলের খেয়া তরিয়াছে; এবার বোধ হয় ঘটির নেড়ী তরিল।—এখন সনেটের পরম ভক্ত; সনেট-পাগলিনের কবির কি দুর্ভোগ। শ্রীযুক্ত জাহাও 'স্মৃতির চর্চ্চা করিতেছেন।

'হয় ত তোমায় আমি ভালবাসিতাম—
আগে ভালবাসি।'

সেদিনের অনুভবনাথের 'আগে ভালবাসি' বোধ হয় মনে পড়ে। অতীতে সন্দেহ ছিল, এখন কবি নিঃসন্দেহ। তাই 'আগে ভালবাসি' কবিতাও বটে, pathetic ও বটে। কবি শেষটির শেষে একটি নূতন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—'প্রাণের সকলে তোলা নাহি যায়।' সকলে পারে কি পারে নাই; এখন বাঙ্গালা কবিরা গদ্যগদ্য পদ্য লিখিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের ভাবনের মাঝখানে বসিয়া বলিয়াছিলেন, 'সব ভাল হো ভাল।' বাঙ্গালার সাহিত্য সেবিগণ প্রকাশকে তাহিবাবাদ করা যায়,—'সব পদ্য হো ভাল।' সাধে পদ্যে কি কথা, ছন্দমেরও এই দুর্দ্দশা। শ্রীযুক্ত দীনেশ 'শ্রীমাতন গোবাধীর মহিষ' শুনাইছে। শ্রীযুক্ত যোগেশ 'হরিষ কাতর' ও শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার 'পুরাকথা' লিখিতেছেন। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় 'মনের প্রতিমা' গড়িয়াছেন, তাহার পর আধ্যাত্মিকতার মানবের বাঁচিয়াছিলেন। প্রথমে 'যে জনে নয়নে দেখিয়াছেন', তাহাকেই 'তারি কুঞ্জ কুঞ্জ' ভালবাসিয়াছেন। অবশেষে দেখিলেন, 'তবু যেন তারে প্রাণ খুঁজিবারে চায়।' শেষে বুঝিলেন, 'সে যে মোর জীবনের বিধাতা মোহন।' তার পর তাঁহাকেই হারিয়া তাকিয়া বাহিরাও করিয়াছেন। 'সুবর্ণবণিক সমাচার' অনেক কবির সমাচার দিলেন। 'সুবর্ণবণিক সমাচারে' আমাদের কবিতার উপর একটা রোষ ফলাইলে, গ্রাহকগণ তি, পি, ফেরত দিলেও আসে, ফরিয়াদ কোনও ফল পাইবে না। 'সুবর্ণবণিক সমাচার' পুরোহিতের ভর্ৎসনায় অনেকের রোষ পড়িয়াছে দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি। শ্রীবিনয়ভূষণ দত্ত 'ভারতবর্ষের 'সজনী কাব্যের' মন, এক্সরে—!

'আপন' ও 'পর'।

১

দীতের মধ্যাহ্নে দেবীবর তাঁহার শয়নকক্ষে শুইয়া একখানা সংবাদপত্র পড়িতেছিলেন, বা পড়িবার চেষ্টা করিতেছিলেন। পত্নী হৈমবতী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ বাইরে যা'বে না?"

দেবীবর উত্তর দিলেন, "না।"

"কেন?" এই প্রশ্ন হৈমবতীর মুখ দিয়া বাহির হইবার জন্য যেন বিশেষ চেষ্টা করিতেছিল। কেন না, কয় দিন—কয় সপ্তাহ হইতে তিনি স্বামীর যে ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মনে এইরূপ আশঙ্কা জন্মিয়াছে যে, তিনি অদূরে একটা বিষম দুর্ঘটনার সূচনা লক্ষ্য করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না—ঘর হইতে চলিয়া গেলেন।

হৈমবতী চলিয়া যাইবার পর দেবীবর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া অস্থিরভাবে সংবাদপত্রখানা ফেলিয়া দিয়া ভাবিলেন—যদি সব কথা বলিতে পারিতাম! কিন্তু তাঁহার মনে হইল, তিনি আজ যে পথে যাইতে চাহেন, গত পঁচিশ বৎসরের ব্যবহারের প্রস্তর-প্রাচীরে সে পথ স্বহস্তে এমন করিয়া বন্ধ করিয়াছেন যে, আজ তিনিও আর সে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারেন না; একটা অতর্কিত ঘটনার প্রলয়প্লাবন ব্যতীত সে প্রাচীর টলিবে না। কিন্তু—কিন্তু তিনি কি প্রলয়-প্লাবনেরই গর্জ্জন শুনিতে পাইতেছেন না?—সে গর্জ্জন ত আর দূরাগতও নহে; সে যে একেবারে কাছে শুনা যাইতেছে! আর একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া—যেন আপনাকে ভুলাইবার জন্য তিনি আবার সংবাদপত্রখানি তুলিয়া লইলেন—প্রবন্ধ, প্যারা, সংবাদ, শেষে বিজ্ঞাপন পড়িতে চেষ্টা করিলেন; কিছুই ভাল লাগিল না।

এই সময়—একটা কি জিনিস লইবার ছুতা করিয়া—প্রকৃতপক্ষে স্বামীকে লক্ষ্য করিবার জন্য—হৈমবতী আবার সেই ঘরে আসিলেন। দেবীবর বলিলেন, "দেখ, গুরুপ্রসাদকে তোমার মনে পড়ে?"

হৈমবতী বলিলেন, "পড়ে না? অনেক দিন তাঁ'কে এ দিকে দেখিনি।"

হৈমবতী ভাবিলেন, এইবার বোধ হয়, তাঁহার সন্দেহ ঘুচাইবার উপায় হইবে—

স্বামীর কথায় তাঁহার ভাবান্তরের কারণ বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু দেবীবর আর কোনও কথা বলিলেন না—অন্যমনস্কভাবে কি ভাবিতে লাগিলেন। তখন হৈমবতীই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

দেবীবর কেবল বলিলেন, "নাঃ!" তাহার পর তিনি হৈমবতীর নিকট হইতে নাতিনীকে (বড় মেয়ের মেয়ে) লইয়া একটু আদর করিলেন। শিশু ঘুমাইয়া পড়িবার উপক্রম করিল। তখন হৈমবতী তাহাকে লইয়া চলিয়া গেলেন—যাইবার সময় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া গেলেন।

হৈমবতীর মুখের কাতরভাব দেবীবর লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি পত্নীকে ডাকিলেন। হৈমবতী আসিলে বলিলেন, "দেখ, আমার ছেলেরা যেন কখনও কারও কোনও উপকার না করে; কখনও কা'রও কাছে কোনও উপকারের আশা না করে।" কূলের কাছে যে হ্রদ সমুদ্রের জল অগভীর—সেই জায়গাটাতেই তাহার চাঞ্চল্য অধিক—যেখানে জল গভীর, সেখানে সে চাঞ্চল্য থাকে না; তেমনই একটু ক্ষুদ্র ব্যাপারের বেদনাই যেন দেবীবরকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছিল—আর যে বেদনা—অসীম, অপার, অপরিমেয়—তাহার কথা তিনি যেন ভাবিতেও পারিতেছিলেন না।

স্বামীর এই কথায় হৈমবতীর আশঙ্কা আরও বাড়িল। তবুও তিনি জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না—কি হইয়াছে?

এই স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধে একটু বৈশিষ্ট্য ছিল—কাহারও প্রেমের অভাব ছিল না; কিন্তু যে সরল ব্যবহারে—স্ত্রীকে সব কথা জানাইবার যে অভ্যাসে পতিপত্নীর সম্বন্ধে নিবিড় মধুরতার সঞ্চার হয়—তাহা দেবীবরের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। সবলের যে ভালবাসা দুর্ব্বলকে সর্ব্ববিধ কষ্ট হইতে রক্ষা করিয়া—সব কষ্ট আপনি সহ্য করিয়াই আপনাকে সার্থক মনে করে—সেই ভালবাসায় দেবীবর মনে করিতেন, পত্নীকে সুখভাগ দিবেন—দুঃখ-দুশ্চিন্তার ভাগ দিবেন না। সংসার-সংগ্রামের সব ভার তিনি যেন "ফুরাইয়া" লইয়াছিলেন—প্রেমের গৌরবানন্দে হৈমবতীকে মণ্ডিত করিয়া সুখী করিবেন, আপনি সুখী হইবেন। ইহাতে যে পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান রচিত হয়, এবং সেই ব্যবধানে প্রেমের প্রবাহই শেষে প্রতিহত হইতে পারে, দেবীবর তাহা বুঝিতে পারেন নাই। বিবাহিত জীবনের এই পঁচিশ বৎসর তিনি এই ভুল করিয়া আসিয়াছেন—পঁচিশ বৎসরের ভুল এক দিনে সংশোধন করা যায় না। আর এই পঁচিশ বৎসর হৈমবতী এই ব্যবহারেই অভ্যস্তা। স্বামীর সব কথা স্বামী তাঁহাকে

[illegible] তাঁর জন্মের [illegible] তাঁহার [illegible] হইত ; [illegible] তাঁর জন্মের [illegible] হইয়াছে। বিশেষ আতঙ্কের [illegible] ও [illegible] [illegible] বিশেষে যেমন—এই দুইটি ঘটনায় সংসারের সব ভার তাঁহার উপর [illegible] তিনি ক্রমে ক্রমে সংসার ও সন্তান লইয়াই মাতিয়া [illegible] [illegible] দিয়াছেন। অভ্যাসের কাছে সকল পরাজয় মানিতে বাধ্য হয়। [illegible] [illegible] স্বামীর দুর্বল পত্নী তিনি—তিনি ইহাই স্বাভাবিক মনে করিতে [illegible] [illegible] তাহার পর—এখন দুইটি মেয়েরই বিবাহ হইয়াছে, তাহারা [illegible] [illegible] হইয়াছে—ছেলে দুইটিও বড় হইয়াছে—এখন কি আর তাঁহার [illegible] [illegible] আছে? তিনি আপনার দুর্বলতার ভালবাসায় আকাশটুকুকে যেন একেবারে [illegible] করিতে চেষ্টা করিতেন। দিন কাটিয়া যাইত।

দেবীবরের সমস্ত ব্যাপারই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ—সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত। [illegible] তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, তখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, ক্লাসে পাঠ করিতেছিলেন। তাঁহার পিতা বিষ্ণুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। তিনি সেকালের [illegible]—উপরওয়ালা য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীদিগকে দেখিয়া [illegible] করিতেন; এমন দুষ্ট লোক বলে, একবার তিনি এক জন সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করিতে [illegible] সেক্রেটারীর হুকুম তাঁহাকে ভাড়া করে;—তিনি কুদুরতে বলিয়াছিলেন, "ও ভাই, কেও চিল্লাতা হায়? হুম ভি বিস্কো কুত্তা হায়, হাম ভি উসিকা [illegible] হ্যায়" এবং তাহাতেই তাঁহার পদোন্নতি হয়। সে কথা সত্য হউক আর না হউক সাহেবরা তাঁহাকে ভালবাসিতেন; আমাদের কালাবদনে তাঁহার মৃত্যুর [illegible] জন্যই দেবীবরকে একটা সবরেজেষ্টারী চাকরী দিতেও চাহিয়াছিলেন। অনেকে বলিয়াছিল, "দেবীবর, এ সুযোগ ছাড়িও না—'সাহেব' সুপারিশ করিলে, সব করিতে পারে; বি, এ, পাশ এখন বাজারে গড়াগড়ি যায়, চাকরী লও।" দেবীবর যখন সেই সব উপদেশ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন তখন কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, "তা' ভাল; ছেলেটার ধার আছে; [illegible] পাশ করিলে ডেপুটী হইবে—বোধ হয়, সেই চেষ্টায় আছে।" বি, এ, [illegible] পরীক্ষাও সে চাকরী না লইয়া দেবীবর যখন আইন পড়িতে লাগিলেন, [illegible] তাঁহার বন্ধুরা বলিল, "উহার বাপ আছে—হাইকোর্টের জজ হইবে।" এ কথা—দেবীবরের কোনও বাপই ছিল না, এবং সে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে [illegible]—উত্তীর্ণ হইয়া তাহার কিছু অধিক দিন ব্যারিষ্টারি

আরও। তিনি লাভা পীতাম্বর ভ্রাতাদিগকে একরূপ উপেক্ষা করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। তখন লোকে বলিত, "পীতাম্বরের কেহ নাই—কিন্তু ভাই ছিল; দেবীদাসের অতিরিক্ত দয়াই তাহার কাল হইল।"

পিতার মৃত্যু হইতেই সংসারের সব ভার দেবীদাসের ঘাড়ে আসিয়াছিল—কিন্তু কোনও দিন তাহাকে সে সম্বন্ধে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করে নাই; পীতাম্বরের চাকরী-প্রাপ্তির তিন বৎসর পরে সে স্ত্রীপুত্রকন্যা লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিল। চাকরীর অবস্থা বুঝিয়াই সে পরিবার লইয়া যাইবার প্রস্তাব করে নাই; কেন না, তিন চারি বৎসরে একবার যাতায়াত সময়সাপেক্ষ। তখন পড়া আসা সম্ভব হইবে না। কিন্তু তাহার মাতার স্বাস্থ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া সে বিরত ছিল। প্রায় দুই বৎসর রোগভোগ করিয়া তিনি যে পরপারে যাত্রা করিলেন, তখন কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধ সারিয়া স্থায়ীভাবে বসিবার সময় সে পরিবার সঙ্গে লইয়া যায়। তাহার পর সে বরাবরই কলিকাতায়, যেন নিজের বাড়ী অতিথি হইয়া আসিয়াছে—ভাতাদিগের ভোগ না করিয়া আপনি ভোগ করিয়াছে! বাস্তবিকই দেবীদাস ভ্রাতাকে নিজের দেহ করিতেন। বিশেষ, এক সঙ্গে থাকিলে যে সব ছোট ছোট ব্যাপার পুঞ্জীভূত হইয়া স্নেহের পথ কণ্টকাকীর্ণ করে, দূরে থাকিলে সে সব ব্যাপার উঠিতেই পারে না। হৈমবতীও দেবরকে ও দেবরপত্নীকে বিশেষ যত্ন করিতেন—ননিতেন, খাওয়া, চিকিৎসা বিষয়ে থাকে। এখন পীতাম্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র কলিকাতায় ডাক্তারের কাছে থাকিয়া কলেজে পড়িতেছে। পীতাম্বরের এক কন্যার বিবাহ হইয়াছে—সেও মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় বাড়ীতে আসিয়া থাকে। সে কের বিশ্বাস, পীতাম্বর অনেক টাকা উপার্জ্জন করে; জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে, "ভালই ত, ধনাগমের ত অদৃষ্টের কথা। তবে কি জান—যত গর্জ্জে, তত বর্ষে না, পরের টাকা আর পরের মেয়ে দুই-ই লোক বেশী দেখে।" দেবীদাস কোনও দিন সে সন্ধান লয়েন নাই; বরং ভ্রাতাকে বলিয়াই দিয়াছিলেন, "আমার কিছু দরকার হইলে তোর টাকা পাঠাইতে হইবে না; কেমন ভাল বুঝিস, খাটাইবার ব্যবস্থা করিস—দরকার হয়, আমাকে জিজ্ঞাসা করিস।" পীতাম্বরের জিজ্ঞাসা করিবার দরকার হয় নাই; কারণ, সে কর্ম্মস্থানেই চড়া সুদে টাকা খাটাইবার অনেক সুবিধা পাইয়াছিল, এবং সে সব সুবিধার সদ্ব্যবহার করিতে তিলে করে নাই।

যদি দেবীদাস ও দেবীদাসের প্রতিভা ছিল, বুদ্ধিহীনতা ছিল না; তিনি বড়

বড় ব্যাপারের স্বপ্ন দেখিতেন—কিছুতেই সাফল্যলাভ করিতে পারিতেন না; বিশেষ, তাঁহার স্বাভাবিক চাঞ্চল্য তাঁহাকে কিছুতেই অপেক্ষা করিতে দিত না—সাফল্যের বিলম্বে তিনি বিরক্ত হইতেন, আরব্ধ কার্য্য ছাড়িয়া আবার একটায় হাত দিতেন—কোনটারই শেষ পর্য্যন্ত দেখিতে পারিতেন না। অথচ তিনি কোনও কালে কাহারও সাহায্য লইতেন না; এমন কি, পত্নী হৈমবতীকেও কিছু জানাইতেন না। জানাইলে হয় ত অনেক স্থলে তাঁহার উপকার হইত; কারণ, কুটিল ও জটিল ব্যাপারেই বুদ্ধিনিয়োগ করিয়া আমরা অনেক সময় সরল পথটাই দেখিতে পাই না; আমরা কৃত্রিম আলোকে অজস্র চেষ্টাতেও যাহা দেখিতে পাই না, মহিলাদিগের স্বাভাবিক সরল বুদ্ধির আলোকে তাহা সপ্রকাশ হয়। কিন্তু কাহারও বুদ্ধি লওয়া দেবীবরের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল।

তিনি আপনার বুদ্ধিতে অস্থির ভাবে এই এতদিন—বিংশ বর্ষেরও অধিক কাল কাজ করিয়াছেন—একটার পর একটা কাজে হাত দিয়াছেন—কোনটাতেই লাগিয়া থাকেন নাই। অসাফল্যের পর অসাফল্য—লোকসানের পর লোকসান পুঞ্জীভূত হইয়াছে—তাঁহার মৎলবের বোঝার ভার তাঁহাকে পীড়িত করিয়াছে—চিন্তার চাঞ্চল্য তাঁহাকে দুর্ব্বল করিয়াছে; কারণ, যে অগ্নি বর্ত্তিকাকে প্রদীপ্ত করে, সেই অগ্নিই তাহাকে দগ্ধ করে। এই ভাবে দীর্ঘ বিশ বৎসরে তাঁহার সকল আশার দীপ হতাশার ফুৎকারে নিভিয়া গিয়াছে। তিনি আজ অন্ধকারে—পথহারা—সঙ্গীহীন—অর্থহীন; আর কোন দিকে কোনও উপায় দেখিতে পাইতেছেন না। এ কালরাত্রি যে আর কখন পোহাইবে, তাঁহারও আর সে আশা নাই। তিনি কি করিবেন, ভাবিয়া পাইতেছেন না—আপনার আর্থিক অবস্থার কথা ভাবিলেও তিনি শিহরিয়া উঠিতেছেন; স্ত্রীপুত্রকে যে অবস্থায় উপনীত করিয়াছেন, তাহা মনে করিয়া তিনি আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইতেছেন। তাই আজ—এই বেদনা ব্যক্ত করিবার ব্যাকুলতায় তিনি মনে করিতেছেন, যে পত্নী তাঁহার গৃহের গৃহিণী—সংসারে সঙ্গিনী—পুত্রকন্যার জননী; যিনি বিবাহিত জীবনের এই পঁচিশ বৎসর তাঁহার সব বৈশিষ্ট্য বিনা প্রতিবাদে সহ্য করিয়া আসিয়াছেন—তাঁহাকে সুখী করিবার জন্যই প্রাণপণ করিয়া আসিয়াছেন—আজ যদি তাঁহাকেও সব কথা—সব অবস্থা বুঝাইয়া বলিতে পারিতেন! কিন্তু তাহাও তিনি পারিলেন না।

২

গুরুপ্রসাদ হাইকোর্ট হইতে ফিরিয়া কাপড় ছাড়িতেছেন, এমন সময় সরকার

কয়খানা পত্র লইয়া আসিল। কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে তিনি কয়খানা পত্র পড়িয়া সরকারকে দিয়া বলিলেন, "রামকে দিও।" রাম গুরুপ্রসাদের মুহুরী। গুরুপ্রসাদ বড় উকীল—জমীদারীর বন্দবস্ত তাঁহার যত্নের তরণী প্রঁছছিতে আর বিলম্ব নাই। শেষ পত্রখানা—একখানা চেক। সেখানা লইয়া গুরুপ্রসাদ কি ভাবিলেন—তাঁহার মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। তিনি ভৃত্যকে বলিলেন, "দেখ্ দেখি, সাদা জুড়ীটা আজ কেউ নিয়ে গেছে কি না।" তিনি বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বড় দাদা বাবু কোথায় যাবেন, বলেছেন?"

গুরুপ্রসাদ বলিলেন, "বলে আয়, আমি এখনই বেরোব; গাড়ী আনতে বল।"

তিনি একটু ব্যস্ত হইয়াই হাত মুখ ধৌত করিয়া আসিলেন; মুখটা চিন্তায় অন্ধকার। তিনি ফিরিয়া আসিলেই, ভৃত্য চা লইয়া আসিল। তিনি ভৃত্যকে বলিলেন, "তোর মা'কে একবার ডাক।"

চা পান হইয়া গেল। তখনও গৃহিণী আসিতেছেন না, দেখিয়া গুরুপ্রসাদ যেন একটু অধীর হইলেন। এমন চাঞ্চল্য তাঁহার মত বিষয়ী লোকের পক্ষে একটু নূতন। কিন্তু আজ তিনি কিছুতেই অধীরতা দমন করিতে পারিতেছিলেন না।

গৃহিণী আসিয়া কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই গুরুপ্রসাদ বলিলেন, "তোমার বাড়ী কোনও খবর আছে?"

গৃহিণী বলিলেন, "কেন?"

"আমি যাচ্ছি।"

গৃহিণী চক্ষু ডাগর করিয়া বলিলেন, "কেন?"

"সে পাড়ার কাজ আছে।"

গৃহিণীর বিশ্বাস হইল না। তিনি ভাবিলেন, কোনও একটা দুঃসংবাদ না পাইলে আদালত হইতে ফিরিয়াই স্বামী কখনও ভবানীপুর হইতে পটলডাঙ্গায় যাইতেছেন না। তিনি বলিলেন, "আমার গায়ে হাত দিয়ে বল—কোনও ভয় নেই?"

"না—গো—না"—অধীর ভাবে এই কথা বলিয়াই গুরুপ্রসাদ উঠিবার উদ্যোগ করিলেন।

গৃহিণী বলিলেন, "সত্যি—বল।"

"আমি দেবীবরকে দেখতে যা'ব; অমনই হেদোর বাড়ী হয়ে আসব।"

"তা—ই বল; নইলে মেয়ের কি এত ভাগ্যি হ'বে যে, আমি না বল্‌তে তুমি তা'কে দেখ্‌তে যা'বে! বলে, কখনও যা' হয় নি, আজ তাই হ'বে!"

গুরুপ্রসাদ জুতা পায়ে দিলেন।

গৃহিণী বলিলেন, "তা' এই ত আদালত থেকে ফিরলে—আবার এখুনি যাওয়া কেন?"

গুরুপ্রসাদ বসিয়া বলিলেন, "মনটা বড় খারাপ হয়েছে। অনেক দিন পরে সে দিন দেবীবর এসেছিল; আমার কাছে হাজার টাকা ধার চাইতে—"

"তা'র পর?"

"তখন টাকাটা দিলাম না।"

"তা' দিলেই পারতে।"

"দিলাম না এই জন্যে যে, সে যে কাজের জন্যে চেয়েছিল, তা'তে লোকসান হ'বেই হ'বে।"

"তা' ভালই করেছ।"

"কিন্তু সে টাকাটা না পেয়ে সেভাবে ফিরে গেল, তা'তে মনে হ'ল—দূর হ'কগে ছাই; আমি টাকা দেব। তাই হাজার টাকার চেক পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সেখানা ফিরিয়ে দিয়েছে। তাই একবার তা'র কাছে যা'ব।"

গৃহিণী ঘৃণায় অধর কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "আর যেতে হ'বে না। তুমি টাকা দিলে, তা' আবার ফিরিয়ে দিলেন! তোমার পক্ষে যা'ই হোক, অপরের পক্ষে বড় কম নয়—হাজার টাকা।"

গুরুপ্রসাদ হাসিলেন। গৃহিণীর নাংসল প্রকোষ্ঠের জন্য পূর্ব্বদিনই স্বর্ণকার বাইশ ভরীর চুড়ী গড়াইয়া দিয়া গিয়াছিল। তাহা দেখাইয়া তিনি বলিলেন, "তা' বটে; কিন্তু আমার দুঃসময়ে ঐ দেবীবরের সাহায্য না পেলে আজ বোধ হয়, ও চুড়ী তোমার গায়ে উঠত না—আমাকে মাষ্টারী বা কেরাণীগিরি করে' মাসে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা আনতে হত। সেটা কি ভুলে গেলে?"

গৃহিণী সেটা ভুলেন নাই; কিন্তু ভুলিতে পারেন না বলিয়াই তাঁহার রাগ। দুঃসময়ের—দারিদ্র্যের উপর তিনি বিস্মৃতির যবনিকা ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাহেন; কারণ, সেটা অন্ধকার। তিনি কেবল বর্ত্তমানকে—সম্মানসম্ভ্রমসম্পদ-সমুজ্জ্বল এই বর্ত্তমানটাকেই সর্ব্বস্ব করিয়া অতীতকে লোকচক্ষুর—এমন কি, আপনার স্মৃতিরও অগোচর করিতে চাহেন। দেবীবর সেই অতীতের যবনিকা তুলিতে পারেন; তাই দেবীবরকে তাঁহার ভাল লাগে না।

কিন্তু এই বিষয়ে রামিণীতে বিশেষ প্রভেদ। গুরুপ্রসাদ এখন যত বড় হইয়াছেন, তাহাতে তিনি অতীতটাকে মুছিতেও পারেন; কিন্তু মুছিতে তিনি অনিচ্ছুক। বরং তিনি ছেলেদের সর্ব্বদাই আপনার দুঃসময়ের গল্প করেন। তাঁহার পিতা ষ্টেশনমাষ্টারী করিয়া মাসে কুড়ি টাকা উপার্জ্জন করিতেন—মাতৃহীন পুত্রকে শিক্ষা দিবার জন্য সব কষ্ট সহ্য করিতেন—বুঝি পেট ভরিয়া খাইতেও চাহিতেন না। বড় কষ্টে তিনি গুরুপ্রসাদকে 'মানুষ' করিয়াছিলেন। পুত্র এণ্ট্রেন্স, এ, পাশ করিলে প্রধানতঃ তাহার পাঠের ব্যয়নির্ব্বাহে সুবিধা হইবে বলিয়া তিনি তাহার বিবাহ দেন; বৈবাহিকও দরিদ্র; দুই জনে যেনওরূপে তাহার পাঠের ব্যয় চালাইবেন। এই অবস্থায় পুত্র বি, এ, পরীক্ষা দিবার ছয় মাস পূর্ব্বে, এক দিন ষ্টেশনে লাইন পার হইবার সময় তিনি গাড়ীতে কাটা পড়েন। গুরুপ্রসাদের পক্ষে জগৎ অন্ধকার হয়। তাঁহার শ্বশুরও এত তাঁহার ভার লইতে অক্ষম। কাজেই গুরুপ্রসাদকে পাঠের আশা ত্যাগ করিয়া চাকরীর চেষ্টা করিতে হয়। সেই সময় দেবীবর তাঁহার কথা জানিতে পারেন। দেবীবর তাঁহার সহপাঠী—কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহারও পিতৃবিয়োগ হইয়াছে। দেবীবর তাঁহাকে আপনার বাড়ীতে রাখিয়া তাঁহার পাঠের সব ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার প্রস্তাব করেন। গুরুপ্রসাদ সে দয়া গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। শেষে দেবীবরের মাতা তাঁহাকে ডাকিয়া বলেন, "বাবা, তুমিও দেবুর মত, পিতুর মত আমার ছেলে—আমাকে তোমার মা বলে জেনো।" গুরুপ্রসাদ দেবীবরের মাতার কাছে মাতৃস্নেহ লাভ করিয়া তাঁহারই কাছে তিন মাস থাকিয়া বি, এ, পাশ করেন। ছেলেদের কাছে সে সব কথা বলিবার কালে গুরুপ্রসাদের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিত। আপনার পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া তিনি আপনার বাড়ীতে দশটি ছাত্রকে রাখিয়া তাহাদিগকে পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার গৃহিণীর তাহা ভাল লাগে না। আজ তাঁহার কথায় তাই গৃহিণী বিরক্তই হইলেন। কিন্তু গুরুপ্রসাদ বিচলিত হইলেন না।

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল—গাড়ী প্রস্তুত। গুরুপ্রসাদ প্রস্থানোদ্যত হইলে গৃহিণী বলিলেন, "বেশ লোক! তোমার বাড়ী কোনও খবর আছে কি না, জিজ্ঞাসা করে' সে কথার উত্তর পর্য্যন্ত আর দেরী সইল না!"

গুরুপ্রসাদ বলিলেন, "তুমি যে সেই কথাটাই কিছুতে বললে না!"

"তা'কে বলো, রবিবারে যেন একবার আসে; বেয়াইকে বলে এস, নেমাইকেও পাঠান।"

"হুঁ" বলিয়া গুরুপ্রসাদ যাইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। দেবীবর যে দিন তাঁহার কাছে টাকা না পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন, সেই দিনই গুরুপ্রসাদের মন অনুশোচনায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। সত্য বটে, তিনি গুরুপ্রসাদের ভালর জন্যই তাঁহাকে টাকা দেন নাই; কিন্তু তিনি যে বিচার না করিলেই পারিতেন। দেবীবর যখন তাঁহাকে আশ্রয় ও সাহায্য দিয়া জীবন-সংগ্রামে সাফল্য-লাভের সুবিধা দিয়াছিলেন, তখন তিনি ত এত বিচার করেন নাই—কেবল দয়াই করিয়াছিলেন। আজ তিনি কেন তেমনই করিতে পারিলেন না? আর কে বলিতে পারে, দেবীবর যে কাজের জন্য টাকা চাহিয়াছিলেন, সে কাজে তাঁহার লোকসানই হইবে? গুরুপ্রসাদের মনে হইল, তিনি বন্ধুত্ব—কৃতজ্ঞতা এ সকলের অপেক্ষা টাকা অধিক ভালবাসিয়াছেন; তাই অনুশোচনায় তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল। তিনি দেবীবরকে পত্র লিখিয়া ত্রুটী স্বীকার করিয়া হাজার টাকার চেক পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। দেবীবর সে পত্রের উত্তর দেন নাই—কেবল চেকখানি ফেরৎ পাঠাইয়াছেন। তাঁহার এই কাজে গুরুপ্রসাদ যেন লজ্জায় মরিয়া গিয়াছেন। তাই তিনি ক্ষমাপ্রার্থনা করিবার জন্য বন্ধুর গৃহে চলিয়াছেন।

সন্ধ্যা হয়, এমন সময় তিনি দেবীবরের গৃহে উপনীত হইলেন—জানিলেন, দেবীবর বাড়ীতে আছেন।

ভৃত্য যাইয়া দেবীবরকে সংবাদ দিল, গুরুপ্রসাদ বাবু আসিয়াছেন, দেবীবর বলিলেন, "বল, আমি বড় ব্যস্ত; দেখা হ'বে না।"

গুরুপ্রসাদ পরিচিত গৃহে—পরিচিত পথে দেবীবরের বসিবার ঘরে যাইতেছিলেন; পথে ভৃত্য আসিয়া দেবীবরের উত্তর তাঁহার গোচর করিল। সে উত্তর গুরুপ্রসাদের পক্ষে অতর্কিত—অপ্রত্যাশিত আঘাতের মত বাজিল। তিনি মুহূর্ত্তের জন্য নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইলেন—যেন তাঁহার মাথা ঘুরিয়া আসিতেছিল; তাহার পর তিনি ফিরিয়া গাড়ীতে আসিয়া গাড়ী বাড়ী লইয়া যাইতে বলিলেন—কন্যার বাড়ী যাইবার কথাও ভুলিয়া গেলেন।

গাড়ীতে বসিয়া গুরুপ্রসাদ দেবীবরের ব্যবহারের কথা মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই রাগ করিতে পারিলেন না। তাঁহার দুঃসময়ের কথা—দেবীবরের দয়ার কথা—দেবীবরের মাতার কাছে মাতৃহীন তাঁহার মাতৃস্নেহলাভের কথা—যতই তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল, ততই তিনি আপনাকে অপরাধী মনে করিতে লাগিলেন; আর তাঁহার হৃদয়ের বেদনার

উৎস হইতে করুণার বারি উৎসারিত হইয়া দেবীবরের সকল ত্রুটীর কালিমা ধৌত করিয়া দিতে লাগিল।

গৃহে ফিরিয়া তিনি স্থির হইতে পারিলেন না। মুহুরী আজ পরদিনের মোকর্দ্দমার কাগজপত্র আনিয়া দিল—তিনি সে সব খুলিয়া পড়িতে পারিলেন না। শেষে তিনি দেবীবরকে একখানি পত্র লিখিলেন, সে পত্রে তিনি সকল স্বীকার করিলেন, ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন; লিখিলেন—"তুমি আমাকে ছোট ভাইয়ের মত দেখিয়া আসিয়াছ—তোমার ঋণ আমি কখনও শোধ করিতে পারিব না। মা আমাকেও তাঁহার স্নেহ হইতে বঞ্চিত করেন নাই। নাথ পুরা স্মরণ করিয়া সেকালের কথা মনে করিয়া ছোট ভাইটির অপরাধ ক্ষমা করিও। আমার এ অপরাধ তুমি ক্ষমা না করিলে আমি শান্তি পাইব না। তোমার কত টাকা দরকার, আমাকে লিখিও; আমার যাহা কিছু, তোমার জন্য করিও। হয় তুমি একবার আইস; নহে ত আমাকে তোমার কাছে যাইবার অনুমতি দিও।"

পত্রখানা লিখিয়া—ডাকে পাঠাইয়া তবে গুরুপ্রসাদ একটু স্থির হইলেন—মোকর্দ্দমার কাগজপত্র দেখিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি আহার স্বপ্নের স্বাভাবিক ধৈর্য্য ফিরিয়া পাইতেছিলেন না।

রাত্রিতে আহারের সময় গৃহিণী যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "যেহাই কি উত্তর দিলেন? মেয়ে জামাই রবিবারে আসবে ত?" তখন গুরুপ্রসাদের মনে পড়িল, তিনি জামাতার গৃহে যাইতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি যে যাই নি।"

গৃহিণী বলিলেন, "পোড়াকপাল আমার, তাই তোমাকে আবার কাজের কথা বলি। কি মানুষ—মেয়ের বাড়ী যা'বে বলে' বাহির হ'লে, আর গেলে না!"

গুরুপ্রসাদের হৃদয়ের বেদনায়—চাঞ্চল্যের স্বরূপ বুঝিবার সামর্থ্য যদি তাঁহার গৃহিণীর থাকিত, তবে তিনি এ কথা বলিতে পারিতেন না।

গৃহিণী এমনই ভাবে বকিয়া চলিলেন; গুরুপ্রসাদ বিরক্ত হইয়া সামান্য ভোজন করিয়াই উঠিলেন। গৃহিণী বলিলেন, "ও মা, কিছুই যে খেলে না! বন্ধুর বাড়ী খেয়ে এসেছ বুঝি?"

৩

পীতাম্বরের বড় মেয়ে রেণু কলিকাতায় বাপের বাড়ী আসিয়াছে; এবার

দুই তিন মাস থাকিয়া প্রসবের পর ফিরিয়া যাইবে। সে তাহার মাকে লিখিয়াছে, "তুমি আসিলে, বাবার ও আর সকলের কষ্ট হইবে; তোমার আসিয়া কাজ নাই। জ্যেঠাইমার যত্নেই আমি অস্থির—আর যত্নের দরকার নাই। জ্যেঠাইমা আমাকে লইয়াই ব্যস্ত; যেন তাঁহার আর কোনও কাজই নাই।" হৈমবতী জাকে লিখিয়াছেন, "আমার যতটুকু সাধ্য আমি যে করিব, তাহা তোমাকে বলাই বাহুল্য। তবুও তোমার মার প্রাণ; হয়ত তুমি স্থির থাকিতে পারিবে না। যদি আস, তবে কেন ঠাকুরপোকে ছুটী লইয়া আসিতে বল না? অনেক দিন তোমাদের দেখিতে পাই নাই; দেখিতে বড় ইচ্ছা করে—খোকাখুকী ত আমাদের চিনিতেই শিখিল না!"

রেণু বাপের বাড়ী আসা অবধি তাহার স্বামী অমরনাথ সপ্তাহে দুই একবার করিয়া শ্বশুরবাড়ী আসিয়া থাকে—এক সপ্তাহ না আসিলে হৈমবতী নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। অমরনাথ এটর্ণী হইবে বলিয়া কাজ শিখিতেছে—ছয় বৎসরের এখনও তিন অবশিষ্ট। ছেলেটি বেশ চালাক—বিশেষ শ্বশুর ধনবান বলিয়া শ্বশুরবাড়ীর একটু 'নেওটো'—এটাও তাহার বিষয়-বুদ্ধির পরিচায়ক, সন্দেহ নাই; কারণ, তাহার আশা আছে—সে পাশ করিয়া আফিস খুলিয়া বসিলেই শ্বশুরের সঞ্চিত অর্থ রাজপুতানার মরু হইতে কলিকাতায় আনিয়া খাটাইবার ব্যবস্থা করিবে। নহিলে তাহার পিতার যেরূপ আর্থিক অবস্থা তাহাতে তাহার পক্ষে সহসা স্বতন্ত্র আফিস খুলিলে তাহার খরচ যোগান অসম্ভবই হইবে। ভবিষ্যতে সাফল্যের চেষ্টায় সে এখন হইতেই ধনী দেখিয়া বন্ধুত্ব করে—সভা-সমিতিতে যায়, ইত্যাদি।

শনিবারে সে শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে। বাড়ীর মধ্যে যে ঘরটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সেইটিই হৈমবতী রেণুর জন্য রাখিয়াছিলেন। সেই ঘরে শুইয়া অমরনাথ পত্নীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। রেণু আসিয়া শ্বশুরবাড়ীর সব সংবাদ সংগ্রহ করিল। তাহার পর অমরনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "মার খবর কি?" সে শাশুড়ীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। রেণু হাসিয়া বলিল, "আমি লিখেছি, মার এসে কাজ নেই; জ্যেঠাইমার যত্নেই আমি অস্থির হয়ে উঠেছি। আমি নেকচিখুকী—তিনি রাত দিন আমাকে নিয়ে এখন ব্যস্ত!"

স্ত্রীর মুখচুম্বন করিয়া অমরনাথ বলিল, "তুমি বুঝি এর মধ্যেই খুব বড়—পাকা গিন্নী হয়েছ? আগে তোমার খুকু হ'ক!"

স্বামীর কথায় রেণুর পাণ্ডু গণ্ডে লজ্জার রক্তাভা সঞ্চার হইল—সে

পরিবর্ত্তনে তাহাকে বড় সুন্দর দেখাইল। অমরনাথ আবার তাহাকে চুম্বন করিল।

তাহার পর অমরনাথ বলিল, "কিন্তু তাঁরা এলে ভাল হ'ত।"

রেণু বলিল, "কিছু না।"

"সে জন্যে নয়।"

"তবে ?"

অমরনাথ গম্ভীর ভাবে বলিল, "অন্য কাজ আছে।"

স্বামীর ভাবান্তর দেখিয়া রেণু চিন্তিত হইল; জিজ্ঞাসা করিল, "কি ?"

অমরনাথ যে এটর্ণীর আফিসে কাজ করিত, গুরুপ্রসাদের সব কাজ সেই আফিসে হইত। গুরুপ্রসাদ দেবীবরকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, এক সপ্তাহ তাহার উত্তরের আশা করিয়া হতাশ হইয়া তিনি বন্ধুর আর্থিক অবস্থার সন্ধান লইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার এটর্ণীকে সন্ধানের ভার দিয়াছিলেন। সন্ধানে জানা গিয়াছে, লোকসানের পর লোকসানে তাঁহার আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আফিসে অমরনাথ সে সব জানিতে পারিয়াছে, এবং শ্বশুরকে সে সব কথা জানান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছে। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহার এই সতর্কতায় তাহার বুদ্ধিতে শ্বশুরের শ্রদ্ধা জন্মিবে, এবং তিনি বুঝিতে পারিবেন, উপযুক্ত জামাতা এখন হইতেই তাঁহার স্বার্থের প্রতি বিশেষ মনোযোগী।

অমরনাথ যখন রেণুকে সে সব কথা বলিতে লাগিল, তখন প্রথমে রেণু একটু শঙ্কিতা হইল; কিন্তু সব কথা সে ভাল বুঝিতে পারিল না। বিশেষ, অমরনাথ তখনও আইন পরিপাক করিতে না পারায়, তাহার কথায় আইনের তর্ক ও আইনের ভাষা এত অধিকপরিমাণে ব্যবহৃত হইতে লাগিল যে, শেষে রেণু তাহার কথা বুঝিবার আশা ত্যাগ করিল। তাহার দুর্ব্বল দেহে নিদ্রার শিথিল ভাব আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল—সে হাই তুলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু অমরনাথ তাহা লক্ষ্য না করিয়া কেবলই বলিয়া যাইতে লাগিল। শেষে অমরনাথের কথা শেষ হইলে রেণু বলিল, "তাই ত!" অমরনাথ আর কিছু বলিল না দেখিয়া রেণু বলিল, "তা' এ'র জন্যে বাবার আসার দরকার কি ?"

অমরনাথ বলিল, "তোমার যদি একটু বুদ্ধি আছে! এ কি একটা কম ব্যাপার ?"

রেণু ভাবিল, স্বামী যাহা বলিলেন, তাহাই সত্য হইবে—সে কিছু বুঝে না।

যৌবনারম্ভকালে বাঙ্গালীর মেয়ে স্বামীর প্রতি যে ভালবাসা অনুভব করে, তাহা ভক্তিরই নামান্তর; নবযৌবনপুলকিত হৃদয়ে বিকশিত প্রেমপদ্ম তখন পতিকে নিবেদন করিতে পারিলেই সে কৃতার্থ—ধন্য বোধ করে, সেই জন্যই সে ব্যাকুল হয়। সে প্রেম পবিত্র ও সুন্দর; তাহাতে স্বার্থের আবিলতা বা বিচারবিবেচনার ত্রুটী নাই। রেণু বলিল, "তবে কি করবে?"

অমরনাথ বলিল, "সেই কথাই ত বলছি; তা' তুমি সেদিকে কাণই দিচ্ছ না।"

স্বামী তাহার নিদ্রালস ভাব লক্ষ্য করিয়াছেন বুঝিয়া রেণু লজ্জিতা হইল। একটু ভাবিয়া অমরনাথ বলিল, "তুমি এ সব কথা লিখে দাও।"

কি সর্ব্বনাশ! সে কি লিখিবে? একে ত সে স্বামীর সব কথা বুঝিতেই পারে নাই; তাহার পর সে এ সব কথা লিখিবে কেমন করিয়া? সে জ্যেঠামহাশয়কে ও জ্যেঠাইমাকে কখনও পর ভাবিতে পারে নাই—তাহাদের অবারিত স্নেহই ত তাহাকে তাহা ভাবিতে দেয় নাই! সুতরাং এখন সে কেমন করিয়া তাঁহাদের এ সব কথা বাবাকে বা মাকে লিখিবে? তাঁহারা জানিতে পারিলে কি মনে করিবেন? বাবা কি মনে করিবেন? তাঁহার সর্ব্বোপরি তাহার মন কি বলিবে? সে তাহা পারিবে না। কিন্তু—স্বামী তাহাকে লিখিতে বলিতেছেন; তিনি বলিতেছেন, এ কথা বাবাকে জানান আবশ্যক। রেণু ভাবিতে লাগিল; কিন্তু সে কিছুতেই পিতাকে এ সব কথা লিখিতে পারিবে না। সে স্বামীকে বলিল, "এ সব বড় কথা—আমি বরং তুমি লিখ।"

অমরনাথ বলিল, "তা' তুমি না লিখলে আমাকেই লিখ্‌তে হ'বে।"

রেণু আবার ভাবিল; জিজ্ঞাসা করিল, "লেখাটা দরকার—এখনই কি?"

"যত দেরী হ'বে, তত বেশী ক্ষতি হ'বার সম্ভাবনা। আর যখন জানাতেই হ'বে, তখন যত শীঘ্র জানান যায়, ততই ভাল।"

রেণুর মনে হইতে লাগিল, যেন তাহাদের সংসারের আনন্দালোকে উজ্জ্বল আকাশে দূরে সহসা দুর্ঘটনার মেঘ দেখা দিতেছে; এখনও তাহা ক্ষুদ্র—এখনও তাহাতে আলোক নির্ব্বাপিত হয় নাই; কিন্তু তাহার বক্ষে প্রলয়-ঝঞ্ঝা নিহিত আছে, সেই ঝঞ্ঝায় সে সংসার ছিন্নবিচ্ছিন্ন—চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে। সে কল্পনায় দুশ্চিন্তায় যেন তাহার শ্বাসরোধ হইয়া আসিতে লাগিল! সে ভাবিল, সে না হয় কিছু বুঝে না; কিন্তু তাহার দাদা? সকলেই ত তাহাকে

বিশেষ বুদ্ধিমান বলে। সে স্বামীকে বলিল, "আচ্ছা; না হয় তুমি দাদাকে চিঠিটা দিতে বলো।"

অমরনাথ স্বীকৃত হইল।

তখন রাত্রি প্রায় বারটা—কর্ম্মকেন্দ্র কলিকাতার রাজপথেও কোলাহল থেমিয়া গিয়াছে;—ধূমাচ্ছন্ন গগনে তারকার দীপ্তি, আর রাজপথে আলোকের দীপ্তি—উভয়ই ম্লান ও মলিন। কেবল যে সব শব্দ দিবাভাগে শ্রুত হয় না—সেই সব শব্দে বুঝা যাইতেছে, মানুষ যখন ঘুমাইতে যায়, তখনও জীবজগৎ সুপ্ত হয় না। কোথাও তলে ভদ্রজীবীদিগের জন্য আহ্বান ধ্বনিত হইতেছে—কোথাও ঠিনাবের বাঁশী বাজিতেছে—দূরে ট্রেণের এঞ্জিনের গর্জ্জন; আর গৃহে—পথে সর্ব্বত্র কত জীবের জীবনকোলাহল! কত কীট, কত পতঙ্গ—যখন আহার-সন্ধানে বাহির হইয়াছে—তাহারাও জীবন-সংগ্রাম হইতে অব্যাহতি পায় না—তাহাদের মধ্যেও কত কলহ—কত কাড়াকাড়ি—জীবনধারণের জন্য কি জীবনান্ত চেষ্টা!

অমরনাথ ঘুমাইয়া পড়িল; বেণু যে ঘুমাইয়াছে, সে বিষয়ে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বেণু ঘুমায় নাই—সে ভাবিতেছিল। অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাহার হৃদয় চঞ্চল হইয়াছিল—নিদ্রায় তাহার নয়ন মুদিয়া আসিতেছিল, তবুও সে ঘুমাইতে পারিতেছিল না। এ সময় স্বভাবতঃই মহিলাদিগের সুনিদ্রা হয় না—তাহার উপর দুশ্চিন্তায় সে যখনই ঘুমাইতেছিল, তখনই দুশ্চিন্তানুগত বিকৃত স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিতেছিল—আর যেন শান্তির আশায় চিরাভ্যস্ত স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইতেছিল।

ঘরের ঘড়ীতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজিতেছিল—একটা, দুইটা, তিনটা। তাহার পর বেণু কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—ক্লান্ত প্রকৃতি তাহাকে নিদ্রার শান্তি দিতেছিল।

যখন মুদিত-নয়নপল্লবে স্বামীর অধরস্পর্শে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন সকাল হইয়াছে; অমরনাথ একটা জানালা খুলিয়া শার্সি বন্ধ করিয়া দিয়াছে—কাচের মধ্য দিয়া দিবালোক কক্ষ প্লাবিত করিতেছে; তাহার ঘর ধূনদানীতে সঞ্চিত গোলাপের সৌরভে পূর্ণ; বাহিরে রাজপথে কর্ম্মকোলাহল শ্রুত হইতেছে।

অমরনাথ আবার পত্নীকে চুম্বন করিয়া বিদায় লইল; বলিয়া গেল—যাইবার সময় তাহার দাদাকে সে কথা বলিয়া যাইবে। বেণু বসিয়া ভাবিতে

লাগিল—তবে স্বামীর গত রাত্রির কথা দুঃস্বপ্নমাত্র নহে? যদি তাহা কেবল একটা দুঃস্বপ্ন হইত! সে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিল।

অমরনাথ বৈঠকখানায় আসিয়া দেখিল, রেণুর দাদা বেণুকর হাই তুলিতে তুলিতে সেই ঘরে প্রবেশ করিতেছে। বেণুকর গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিত—তাহার উঠিতে একটু বিলম্ব হইত। ঘরে আসিয়াই সে দেবীবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র নটবরকে বলিল, "দাও, বড়দা,—এক কাপ চা দাও।"

অমরনাথ বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "বেশ ব্যবস্থা—সব শেষে এসে সকলের আগে চা!—Last come first served!"

বেণুকর বলিল, "কলির উল্টা ব্যবস্থা।"

"এখনই এই—গিন্নী হ'লে না জানি কি করবে!"

"তখন গিন্নী সকালে তুলে দেবেন; তাঁ'কে ত আর রাত জেগে নোট মুখস্থ করতে হ'বে না।"

চা পান করিয়া অমরনাথ দেবীবরের কাছে বিদায় লইয়া হৈমবতীকে প্রণাম করিয়া যাইবার সময় বেণুকরকে বলিল, "চল না—একটু বেড়িয়ে আসবে।"

বেণুকর বলিল, "কত দূর?"

"এই ট্রাম পর্য্যন্ত।"

হতাশভাবে "চল" বলিয়া বেণুকর উঠিল—আপনার চটী জুতা নটবরকে দিয়া তাহার অ্যালবার্ট জুতা পায়ে দিয়া, শিথিল কাপড় কষিয়া পরিয়া, গায়ের কাপড়খানা গাত্রে জড়াইয়া সে ভগিনীপতির সহগামী হইল।

পথে অমরনাথ তাহাকে দেবীবরের আর্থিক অবস্থার কথা জানাইল। কথাগুলা বেণুকরের ভাল লাগিল না—যদি এ সব কথা সত্যই হয়, তবুও সে তাহাদের কথা; অমরনাথের সে জন্য এত মাথাব্যথা কেন?

শেষে অমরনাথ যখন তাহাকে সে সব কথা পীতাম্বরকে জানাইতে বলিল, তখন বেণুকর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল; বলিল—"না। আমি তা পারব না। যদি জানানই দরকার হয়—জ্যেঠামশায় জানা'বেন।"

অমরনাথ বলিল, "তিনি জানা'বেন?"

"নিশ্চয়। কেন না—তিনিই বাবার ভাই।"

"তবে তুমি জানা'তে পারবে না?"

"না।"

"তা' হ'লে আমাকেই জানাতে হ'বে ?"

— "তোমার খুসী।"

ট্রামে উঠিয়া অমরনাথ ভাবিল, ভাই বোন দুইটিনই বুঝি সমান।

বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে বেণুকর ভাবিতে লাগিল, আইনের মানে কি মানুষের বুঝি এমনই হয়! মানুষ আর কাহাকেও বিশ্বাস করে না? বোধ হয়, কেবলই মামলার মিথ্যায় অভ্যস্ত হইলে মানুষ এমনই হয়।

সে বাড়ী ফিরিয়া দেবীবরের কনিষ্ঠ পুত্র নীলাম্বরকে জিজ্ঞাসা করিল—নীনু, চা কি ফুরিয়ে গেছে ?"

নীলাম্বর বলিল, "হাঁ, মেজদী।"

পাশের ঘর হইতে দেবীবর বলিলেন, "বেণু, আয়—আমার কাছে এক কাপ আছে—রেণু খা'বে না।"

বেণুকর জ্যেঠা মহাশয়ের কাছে যাইয়া এক কাপ চা শেষ করিল; তাহার পর আপনার ঘরে যাইয়া একখানা পুস্তক লইয়া শুইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে হৈমবতী সেই ঘরে আসিয়া বলিলেন, "কি, বেণু, এখনও বিছানায় ?"

বেণুকর বলিল, "কি করি, বল—জ্যেঠাইমা ? বারোটার আগে কুলোয় নেই। আবার এই শীতে সকাল বেলা অমর ট্রাম পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে গেল!"

হৈমবতী হাসিয়া বলিলেন, "সেই পরিশ্রমে বুঝি আবার ক্লান্তি ?" তাহার পর তিনি বলিলেন, "আজ ত তোর কলেজ বেলায় ? সেদিন ফুলুরী খেতে চাইছিলি—আজ ভেজে দেব। দেখি, বেণু যদি দু'খানা খেতে পারে; কিন্তু খায় না।"

"সে না খায়, আমি সব খা'ব। তাই ত ভাবি, জ্যেঠাইমা, তুমি মরে' গেলে, এমন করে' আমাকে কে খাওয়াবে ?"

"আমি মরবার আগে সে ব্যবস্থা করে যা'ব; বৌমাকে সব শিখিয়ে দিয়ে যা'ব। এবার আসুক ছোটবৌ, তোদের দু' ভাইয়ের বিয়ে আমি বৈশাখ মাসেই দেব।"

"কি সর্ব্বনাশ! কিন্তু জ্যেঠাইমা ও কিছু না। তোমার মত যত্ন কেউ করতে পারবে না।"

"পাগল ছেলে!" বলিয়া হৈমবতী বেণুকরের কপালের উপর হইতে তাহার চুলগুলা সরাইয়া দিলেন।

৪

মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গিয়াছে। পীতাম্বরের গৃহের প্রাঙ্গণে একটি বালিকা একটি হরিণ-শাবককে খাবার দিতেছে; ঘাঘরাপরা দাই (ঝি) একটি শিশুকে ঘুম পাড়াইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে এবং সে না ঘুমাইলে যে মন্দিরের কাছে বড় গাছের বাসিন্দা অবদেবতাটি তাহাকে লেজে বাঁধিয়া লইয়া যাইবেন, সে কথা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। শিশু সোৎসাহে বলিতেছে, সে তাহার পিতার ডাক্তারী ছুরী দিয়া তাহার লেজ কাটিয়া দিবে। এক পার্শ্বে প্রাচীরের উপর বসিয়া দুইটি ময়ূর ঝিমাইতেছে। এমন সময় দ্বারে গাড়ী থামিল—পীতাম্বর আসিয়া ভৃত্যকে গাড়ী হইতে ব্যাগ প্রভৃতি নামাইয়া লইতে বলিয়া প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন, যাইবার সময় কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কণা, হরিণ খাচ্ছে ত?"

আজ পীতাম্বরকে বড় শ্রান্ত দেখাইতেছিল—হাঁসপাতালের কাজ শেষ করিয়া তাঁহাকে মন্ত্রীর বাড়ী যাইতে হইয়াছিল; মন্ত্রীর পৃষ্ঠে পৃষ্ঠব্রণের চিকিৎসা চলিতেছে—রাজ্যের সব ডাক্তারকেই হাজিরা দিতে হয়। ক্ষতের অবস্থা বড় ভাল নহে—মন্ত্রীরও বয়স অনেক, শরীর দুর্ব্বল; কাজেই দুশ্চিন্তার কারণ হইয়াছে। এ সব রাজ্যে রাজার বা মন্ত্রীর মৃত্যু বড় বিষম ব্যাপার—সকলেরই এক একটা দল আছে—দলের কর্ত্তার মৃত্যু হইলেই খেলার ছকে বলের স্থান পরিবর্ত্তন হয়; সকলেরই চাকরী লইয়া—কখনও বা প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়ে।

কাপড় ছাড়িয়া পীতাম্বর স্নান করিয়া আসিলেন। পাচক খাবার দিলে ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল। পীতাম্বর তখন একখানা পত্র পড়িতেছিলেন। তাঁহার আগমন-বিলম্বে পত্নী কল্লোলিনী ভৃত্যকে খাবারের পাহারায় রাখিয়া স্বয়ং তাঁহাকে ডাকিতে আসিয়া দেখিলেন, তিনি নিবিষ্টচিত্তে পত্র পড়িতেছেন—ভ্রূ কুঞ্চিত। কল্লোলিনী বলিলেন, "খাবার দিয়েছে।"

"হুঁ" বলিয়া পীতাম্বর আবার পত্রখানা পড়িতে লাগিলেন।

কল্লোলিনী একটু ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কা'র চিঠি?"

পীতাম্বর মুখ না তুলিয়াই বলিলেন, "অমরের।"

কল্লোলিনী আরও ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সব ভাল ত?"

"হাঁ।"

"রেণু ভাল আছে?"

"ভালই আছে।"

তখন কল্লোলিনী বলিলেন, "চল। ভাত যে জুড়িয়ে গেল; শীতকাল—জুড়ান ভাত কি আর খেতে পারবে?"

পীতাম্বর পত্র ফেলিয়া আহার করিতে গেলেন।

আহারের সময় পীতাম্বরের অন্যমনস্কভাব দেখিয়া কল্লোলিনীর বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, কোনও কারণে তিনি চঞ্চল হইয়াছেন। বাস্তবিক, পীতাম্বর জামাতার পত্র পাইয়া যে চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করিতেছিলেন, তাহা জয় করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার জীবনে চাঞ্চল্যের কারণ বড় ঘটে নাই—ঘটনার স্রোত একটানা বহিয়া গিয়াছে। পঠদ্দশায় তিনি যখন পিতৃহীন হয়েন, তখন সংসারের সব ভার দেবীবর লইয়াছিলেন। যদি প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইয়া থাকে, সে সংগ্রাম দেবীবর করিয়াছেন; যদি ঝড় বহিয়া থাকে, দেবীবর তাহা সহ্য করিয়া ভ্রাতাকে নিরাপদ করিয়াছেন। তাহার পর বিদ্যাশিক্ষা শেষ করিয়া এই চাকরী—সংসার, সন্তান, সম্পদ—সব বিষয়েই তিনি সৌভাগ্য সম্ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। কাজেই সামান্য কারণে তিনি চঞ্চল হইয়া উঠেন; সে চাঞ্চল্য গোপন করিতে পারেন না।

স্বামীর চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া কল্লোলিনী তাহার কারণ বিচার করিতে লাগিলেন—মন্ত্রীর পীড়া? সে ত আজ পক্ষকালের কথা; পক্ষকালই ত মানুষে মরণে যুদ্ধ চলিতেছে; কিন্তু কই কোনও দিন ত তিনি স্বামীকে এত চিন্তিত দেখেন নাই? তবে?—তবে ঐ যে পত্র, উহাতেই কিছু আছে। নহিলে পীতাম্বর বার বার পত্র পড়িবেন কেন? তবে পীতাম্বর তাঁহার কাছে কোনও কথা গোপন করিয়াছেন। কৌতূহলে কল্লোলিনী আর স্থির থাকিতে পারিতেছিলেন না—সঙ্গে সঙ্গে একটু অভিমানও হইতেছিল। কেন না, তিনি সত্য সত্যই স্বামীর গৃহিণী ও সচিব—স্বামী চন্দ্রগুপ্ত হইলে তিনি চাণক্য—স্বামী প্রথম উইলিয়ম হইলে তিনি বিসমার্ক। পীতাম্বর টাকা রোজগার করিয়া খালাস, সংসারের সব বন্দোবস্ত কল্লোলিনীর; সে দিকে দৃষ্টি দিবার সময় বা ইচ্ছা পীতাম্বরের নাই। এমন কি, টাকা খাটান প্রভৃতি কাজেও পীতাম্বর পত্নীর পরামর্শ লইয়া থাকেন—কি জানি বিদেশে যদি সহসা কোনও দুর্ঘটনা ঘটে, স্ত্রীর সব জানা থাকা ভাল। এমন কি, হিসাবের খাতাও কল্লোলিনীর কাছে। এ অবস্থায় স্বামী তাঁহার নিকট হইতে কিছু গোপন করিতেছেন মনে করিয়া কল্লোলিনী কিছু কুপিতাও হইলেন। একটু ব্যস্তভাবে আহার শেষ করিয়া তিনি স্বামীর কাছে উপস্থিত হইলেন।

পীতাম্বর আজ অন্য দিনের মত বিশ্রাম করিতেছিলেন না—কতকগুলি ডাক্তারী মাসিকপত্র লইয়া পৃষ্ঠাঙ্কণে রোগরস-চিকিৎসার ফলাফলের হিসাব দেখিতেছিলেন। একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া কল্লোলিনী বলিলেন, "অমর কি লিখেছে?"

পীতাম্বর বলিলেন, "ও সব অন্য কথা।"

"কি অন্য কথা?"

"পরে শুনো।"

পীতাম্বর পড়িতে লাগিলেন; কল্লোলিনী বসিয়া রহিলেন—তিনি কাজ লইতে জানিতেন।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে পীতাম্বর পাঠ শেষ করিয়া মুখ তুলিয়া দেখিলেন, কল্লোলিনী বসিয়া আছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ যে গড়াইলে না?"

কল্লোলিনী বলিলেন, "না। তোমার পড়া শেষ হ'ল?"

"হাঁ।"

"এখন অমরের পত্রখানা আমাকে পড়ে শুনাও!"

পীতাম্বর পত্রের কথা পত্নীকে বলিলেন।

শুনিয়া কল্লোলিনী বলিলেন, "দেখ্‌লে—মন নারায়ণ! রেণু লিখেছে, আমার যাবার দরকার নেই; তুমিও বল্‌ছ, তাই; কিন্তু আমার কেমন মন টান্‌ছে।"

পীতাম্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, তুমি গিয়ে কি করবে?"

"তুমি যা'বে না?"

"না।"

"ও মা, আমার কি হ'বে! এত বড় একটা ব্যাপার শুনেও তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাক্‌বে?"

"দাদা ত আমাকে কিছু লেখেন নি।"

"শোন কথা। তিনি কি আর লিখবেন? তোমার যেমন ভাই-অন্ত প্রাণ! কই, এই যে এতখানি হয়েছে, তিনি কি এক দিন একবার তোমাকে কিছু জানিয়েছেন?"

"কোনও কালেও ত আমি জান্‌তে চাইনি।"

"তুমি যে চাওনি—সেই জন্যেই ত তাঁ'র আরও জানান উচিত ছিল।"

পীতাম্বর পত্নীর কথার কোনও উত্তর দিলেন না। কিন্তু আবাল্য তাঁহাদের

দুই ভ্রাতার সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া তিনি ভ্রাতার ব্যবহারে কোনও ত্রুটী লক্ষ্য করিতেও পারিলেন না।

কল্লোলিনী বলিলেন, "ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি না হ'লে কি আর অবর লিখেছে।"

"সে লেখাতেই কি এত ভাবনার কারণ হ'ল?"

"হ'ল না? তা'রা আইনের সব জানে—বুঝে।"

পীতাম্বর হাসিয়া বলিলেন, "আইন কিছু অসাধারণ কাণ্ড নয়।" জিনিস-টাকে লঘু করিবার চেষ্টায় তিনি বলিলেন, "যদি আইনের কথাই বল, তবে ত ভাববার কোনও কারণই নেই। থাকবার মধ্যে বাড়ী, তা' দাদা নষ্ট করলেও তাঁ'র অর্দ্ধেক ছাড়া নষ্ট করতে—দান বিক্রয় বন্ধক—কিছু করতে পারেন না।"

কল্লোলিনী বলিলেন, "শুধু কি বাড়ী? ঠাকুর কি তোমাদের কেবল ঐ বাড়ীই দিয়ে গিয়েছিলেন; আর কিছু দেন নি? আমি কি জানি নে?"

"ওগো—শোন—ছিল আর বার হাজার টাকা; তা'ও ত তোমার আইনের হিসাবে ছ' হাজার দাদার। যদি হিসেবই ধর—তবে মনে আছে ত, বেণুর বিয়েতে যে গয়না আমি আগে করিয়েছিলাম, তা' ছাড়া আর সবই ত দাদা দিয়েছেন। তা'র পর এই বার মাসে তের তত্ত্ব—ইস্তক জামাইষষ্ঠী লাগায়েত—ইলিশমাছ—এ সবেও সব ধরলে কোন্ চার হাজার না গেছে। তবে ত রইল, কেবল দু' হাজার।"

তর্কে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া কল্লোলিনী ভাবের দিকে গেল—"ও সব তর্ক রাখ। দেনাকে আমার বড় ভয় গো—বড় ভয়। তুমি জান না, কত লোক দেনার জ্বালায় আত্মহত্যা করেছে।" দেনাকে যে কল্লোলিনীর বড় ভয়, সে কথা সত্য; সেই জন্যই, পাছে কোনও সুদূর ভবিষ্যতে তাঁহার ভ্রাতা দেনা করে, এবং শেষে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়, সেই ভয়ে তিনি যখনই কলিকাতায় যান, তখনই স্বামীর বাড়তি টাকা হইতে কিছু ভাইকে দিয়া আসেন।

স্ত্রীর কথা শুনিয়া পীতাম্বর হাসিয়া বলিলেন, "তা' তুমি যাই কেন বল না—এখন আমার পক্ষে যাওয়া মানেই আত্মহত্যা করা—চাকরীটি আর সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি টাকা এই রাজপুতানার মরুভূমিতে ছড়িয়ে দিয়ে তোমার ভয় ভাঙ্গাতে বাঙ্গালায় যাওয়া।"

বুদ্ধিমতী কল্লোলিনী বুঝিলেন, এ সময়—মন্ত্রীর এই পীড়ার সময় ছুটী চাহিলে ছুটী ত মিলিবেই না, অধিকন্তু চাকরী যাইবে। তিনি নরম হইয়া বলিলেন, "আমি কি বলছি, আজই—এখনই চল?"

"তবে?"

"এর পর মন্ত্রী মশায় সারলে।—ও দিকে রেণুও ভরা পোয়াতী।"

"আচ্ছা, তখনকার কথা তখন হ'বে। আমাকে এখন আবার মন্ত্রী মশায়ের বাড়ী যেতে হ'বে।"

কল্লোলিনী উঠিলেন; বলিলেন, "যাবার আগে, অম্বরের চিঠির জবাবটা দেবে না?"

"কাল দেব" বলিয়া পীতাম্বর ধড়াচূড়া আঁটিতে উঠিলেন।

পীতাম্বর চলিয়া গেলে কল্লোলিনী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে বাসনাতৃপ্তির সম্ভাবনার আনন্দ আর আশঙ্কা আলোক ও অন্ধকারের মত খেলা করিতে লাগিল। যে বাসনা তিনি কত দিন হইতে মনে পোষণ করিয়াছেন—পুষ্ট করিয়াছেন, অথচ কোনওরূপে প্রকাশ করিতে সাহস করেন নাই—আজ কি অপ্রত্যাশিত ঘটনার অতর্কিত আবির্ভাবে তাহা পূর্ণ হইবে? যে আশা তিনি দেবমন্দিরে দেবতার পূজার সময় মনে মনে দেবতাকে নিবেদন করিয়াছেন, দেবতা কি সেই আশা পূর্ণ করিবেন? হৈমবতীর ব্যবহারে তিনি কখন কোনও দোষ দিতে পারেন নাই। কিন্তু ঐ যে হৈমবতীর স্নেহ ও যত্ন—ঐ যে দেবীবরের আওতায় পীতাম্বর, আর হৈমবতীর আওতায় কল্লোলিনী—ঐ যে তাঁহার স্বাতন্ত্র্যের ও প্রাধান্যের পথে স্নেহের ও লোকাচারের প্রাচীর—আর ঐ যে বেণুর ও রেণুর মুখে কেবলই জ্যেঠামহাশয়ের ও জ্যেঠাইমার প্রশংসা—ঐ সবই তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি চাহেন স্বাতন্ত্র্য—তিনি চাহেন প্রাধান্য। হৈমবতী কোনও দিন তাঁহার পথে দাঁড়ান নাই, কিন্তু তাঁহার স্নেহ তাঁহাকে তাঁহার ঈপ্সিত অধিকার লইতে কুণ্ঠা অনুভব করায়। যে আশা জীবনে পূর্ণ হইবে না মনে করিয়া তিনি ব্যথিত হইতেন, আজ যেন সেই আশাই পূর্ণ হইবার সব আয়োজন তাঁহার সম্মুখে। এই তাঁহার সুযোগ—এ সুযোগ অবহেলা করিলে—এ জোয়ার বহিয়া যাইলে সারা জীবন কাঁদিতে হইবে। তিনি দাসীকে দিয়া মন্দিরে পূজা পাঠাইয়া দিলেন।

সেই দিন হইতে তিনি প্রতিদিন কথায় কথায় স্বামীর মনে শঙ্কাসঞ্চার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

পীতাম্বর কিন্তু কিছুতেই দাদাকে দোষী করিতে পারিলেন না। তিনি যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মনে হইতে লাগিল, দেবীবর হয় ত যথেষ্ট কষ্টই সহ্য করিয়াছেন—তবুও তাঁহাকে কষ্ট জানিতে দেন নাই।

এমনই ভাবে তিন সপ্তাহ অতীত হইল। তিন সপ্তাহে প্রবল পত্নীর পরামর্শে ও অনুরোধে, তর্কে ও শঙ্কাপ্রকাশে পীতাম্বরও বিচলিত হইলেন। তিন সপ্তাহ পরে যখন মন্ত্রী মহাশয় আরোগ্য লাভ করিলেন, পীতাম্বর ছুটী চাহিলেন, তখন তাঁহার ছুটী ও ইনাম উভয়ই মিলিল।

কলিকাতা-যাত্রার আয়োজনকালে পীতাম্বর এক দিন অমরনাথের পত্রখানা খুঁজিতেছেন, এমন সময় কমলোমিনী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সব উল্টা-পাল্টা করে কি খুঁজছ?"

পীতাম্বর বলিলেন, "অমরের সেই পত্রখানা।"

"কেন?"

"তা'তে কি দাদার দেনার পরিমাণ কিছু আছে?"

কমলোমিনী বলিলেন, "কেন, তুমি দিবে না কি?"

"দেখি—কত টাকা।"

কমলোমিনী গর্জ্জিয়া বলিলেন, "বটে! মাথার ঘাম পায় ফেলে—মড়া নেড়ে, খুঁজরক্ত খেটে—ক'টা টাকাই বা করেছ যে, ছড়িয়ে দেবে? সংসারের কোনও খোঁজই ত রাখ না। এ দিকে যে আর এক মেয়ে বিয়ের যুগ্যি!"

পীতাম্বর ভাবিলেন, কলিকাতায় যাইবার আয়োজন না করিলেই ভাল করিতেন। কিন্তু তখন আর বন্দোবস্ত বাতিল করিবার উপায় নাই। কমলোমিনী কি বলিলেন?

৫

পীতাম্বর যে দিন সপরিবারে কলিকাতায় পঁহুছিলেন, অমরনাথ সেই দিনই আসিয়া কমলোমিনীর পায়ে দেবীবরের আর্থিক দুরবস্থার বিবরণ বিবৃত করিয়া গেল। তাহার পর এক দিন এক দিন করিয়া সপ্তাহ কাটিয়া গেল। কমলোমিনী প্রত্যহই স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "ওগো, জিজ্ঞাসা করেছিলে?" কিন্তু দেবীবর কিছুতেই দাদাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছিলেন না। শেষে স্ত্রীর উত্তেজনায় ও উৎসাহে তিনি এক দিন নিভৃতে দেবীবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। নিতান্ত বিব্রতভাবে তিনি বলিলেন, "দাদা, তোমার কি দেনা হয়েছে?"

দেবীবর উত্তর দিলেন, "হাঁ পিতু।" যে কথাটা তিনিও বলিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না, সে কথাটা যে বলা হইয়া গেল, ইহাতে দেবীবর কতকটা চাঞ্চল্যমুক্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার মনের অস্বস্তি কাটিল না—পীতাম্বর কি বলেন, জানিবার জন্য তিনি উৎসুক রহিলেন। তিন দিনেও যখন পীতাম্বর সে কথার উত্থাপন করিলেন না, তখন দেবীবরের মন হইতে সে ভাবটা দূর হইয়া গেল; কিন্তু পীতাম্বরের কথাটা তখন সময় সময় কাঁটার মত খচ্ খচ্ করিয়া লাগিতে লাগিল—"তোমায় কি দেনা হয়েছে?"—ঐ 'তোমার' কথাটাতেই ত সে সব ভাব প্রকাশ করিয়াছে—ঐ একটা কথায় সে দুই জনের মধ্যে অপরিসীম প্রভেদ বিস্তৃত করিয়া দিয়াছে। তাই বটে।

এ দিকে কল্লোলিনী প্রত্যহ স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ আঁটিতে লাগিল—এখন কি করা কর্ত্তব্য; কেমন করিয়া পীতাম্বর তাঁহার সব দায়িত্ব এড়াইয়া সরিয়া দাঁড়াইতে পারেন। শেষে পীতাম্বর এক দিন দাদাকে বলিলেন, "বাড়ীতে বলে, নটুর আর বেনুর বিয়ে এইবার দিতে হয়। তাই ভাবছি, তেতলার দু'টা ঘর করলে হয়।"

বাড়ীতে ঘরের অভাব ছিল না। সুতরাং ভ্রাতার কথার গূঢ় অর্থ দেবীবরের কাছে প্রতিভাত হইল। তিনি ইচ্ছা করিয়াই ভ্রাতার ঈপ্সিত ব্যাপারের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, "আমার ব্যাপার যেমন অসাব্যস্ত, তা'তে এখন দু' ভাগ ঠিক না করে' তেতলায় ঘর করা কি ভাল হ'বে?"

পীতাম্বর দাদার কথায় ঠিক পথ পাইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি রকম করা যায়?"

"আমি বলি, এক জন এঞ্জিনীয়ার ডেকে বাড়ীর প্ল্যান দেখে ভাগ ঠিক করা ভাল।"

"কিন্তু আমার ত কাউকে জানা নেই।"

"আমি এঞ্জিনীয়ার চন্দ্র পালকে খবর দেব।"

ভ্রাতার সকল সঙ্কোচের অবসান করিতে পারিলেন জানিয়া দেবীবর আনন্দ অনুভব করিলেন। পীতাম্বর যে আনন্দানুভব করিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। তিনি যাইয়া কল্লোলিনীকে এ সংবাদ দিলেন। কল্লোলিনীর মুখে চক্ষুতে আনন্দের আলোক যেন ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি এক গাল হাসি হাসিয়া বলিলেন, "যাই বল, আমি জানি বড়ঠাকুর দোষেগুণে মানুষ। হাজার হ'ক

পুরুষ মানুষ—বুদ্ধিমান—বুঝছেন, কিসে জড়িয়ে পড়েছেন—তাইতে ঘাবড়াচ্ছেন কেন? তা', হাঁগা—এঞ্জিনীয়ার ক'বে আসবে?"

এই অতিব্যস্তভাবে পীতাম্বর একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন; বলিলেন, "দাদা বলেছেন, তিনিই খবর দেবেন।"

"হুঁ' বেশ, তা' বেশ।"

পর দিনই এঞ্জিনীয়ার আসিলেন, এবং ফিতা টানিয়া, নক্সা আঁকিয়া, মাপ করিয়া সপ্তাহকালমধ্যেই গোটা বাড়ীটাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিবার ব্যবস্থায় নক্সার উপর লাল রেখা টানিয়া দিলেন।

বাঁধ বাঁধিয়া গেলে স্রোত বহিতে আর বিলম্ব হয় না—সে বাঁধ মাটীরই হউক, আর লজ্জারই হউক। তখন স্রোতের বেগেই বাঁধের ভাঙ্গন বাড়িয়া যায়—অনেক সময় বাঁধ ভাসিয়া যায়। পীতাম্বরেরও তাহাই হইল। এঞ্জিনীয়ার সে যান আপনার কাজ করিয়া গেলেন। এ দিকে কল্লোলিনী সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া জামাতার সহযোগে কেবলই স্বামীকে বুঝাইতে লাগিলেন—যাবতীয় কার্য্য অবশ্য যাঁরা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে—তাকে কি করে ভাল বলা যায় না; সুতরাং—বিশেষ—দেবীবর যখন অবস্থা বুঝিয়াই বিভাগের কথা বলিয়াছেন তখন—ও কাজটা একেবারে শেষ করা ভাল। দেবীবরকে ত আবার কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া যাইতে হইবে—এ ত আর বাড়ীর পাশে নহে যে, আবার শীঘ্র আসিবেন; হয় ত আসিতে আবার তিন চারি বৎসর। তবে ইহার মধ্যে বেণুকণার বিবাহ আছে—সে-ই কেবল আবার আসিবার কারণ হইবে; বেণুকণার শেষ পরীক্ষার আর ত ছয় মাসও নাই। কল্লোলিনী স্বামীর মতেই মত দিলেন।

বিভাগে ঘর-রচনা একটা ছলমাত্র। যেখুব সাংসারিক অবস্থার অভিলাষে সে কাজ বন্ধ করা চলিল; কিন্তু বিভাগের চিহ্ন পাকা করিবার জন্য মির্জা আসিল—দুই ভাগের মধ্যে দ্বারওলা বন্ধ না করিয়া একেবারে প্রাচীর গাঁথিয়া দেওয়া হইবে।

এইবার দেবীবর বুঝিলেন, তাঁহার হিসাবে ভুল হইয়াছে। তাঁহার স্নেহই তাঁহাকে ভুল বুঝাইয়াছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, নক্সায় রেখা কাটিলেই—আত্মীয়ের মর্য্যাদা বাঁচাইলেই পীতাম্বর সন্তুষ্ট হইবে; কারণ, তাহা হইলেই গণ্ডগোল কারণ দূর হইবে। কিন্তু তিনি যখন দেখিলেন—স্রোত বহিয়াছে, আর সে স্রোতে সব ভাসিয়া চলিল, তখন তিনি ক্ষুণ্ণ হইলেন। তাঁহার

মনে হইতে লাগিল, সে প্রাচীর যেন তাঁহার বেদনাকাতর—দুশ্চিন্তাভারপীড়িত বক্ষের উপর উঠিতেছে; তাঁহার শ্বাসরোধ হইয়া আসিতেছে। সে দিন তিনি যেন আর আপনাকে সামলাইতে পারিলেন না—শরীর অসুস্থ বলিয়া শয্যা লইলেন।

হৈমবতী স্বামীর অবস্থা বুঝিলেন—অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন। আর এক জন তাহা বুঝিল—বুঝিয়া কাঁদিল। সে—বেণুকর। বেণুকর পিতামাতার ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছে—বেদনা অনুভব করিয়াছে; কিছুতেই তাঁহাদের ব্যবহারের কারণ বুঝিতে পারে নাই—তাহার সমর্থন করিতে পারে নাই। বাল্যকালাবধি যত দিনের কথা সে মনে করিতে পারিয়াছে, মনে করিয়া সে দেবীবরের ও হৈমবতীর ব্যবহারে প্রশংসা ব্যতীত নিন্দার কিছুই পায় নাই। শৈশবে কোনও কারণে সে কাঁদিলে দেবীবর সর্ব্বকার্য্য ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে কোলে লইতেন—ভুলাইয়া শান্ত করিতেন; তাহার সব অত্যাচার তাঁহার কাছে মিষ্ট বোধ হইত। সে যখন কলিকাতার কলেজে পড়িতে আইসে, তখন অনেক বিবেচনার পর কল্লোলিনী তাহাকে "হাতখরচে"র জন্য যে টাকা দিয়াছিলেন, এই পাঁচ বৎসরে সে তাহা খরচ করিবার অবসর পায় নাই—এমনই ভাবে দেবীবর তাহার সব প্রয়োজন পূর্ব্বেই পূর্ণ করিয়া দেন। সে কেবল স্নেহের জন্য। এখনও তাহার সামান্য অসুখে হৈমবতী সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাহার শুশ্রূষা করেন। দেবীবরের ব্যবসায়ব্যাপারে অসাফল্য—প্রতিকূল অবস্থার সহিত দারুণ সংগ্রাম—বিপদে ধীরতা, এ সবই তাহার কাছে তাঁহার প্রতি প্রশংসার মনে হইতে লাগিল। আর তাঁহার স্নেহশীল হৃদয়ে ভ্রাতার এই ব্যবহারের বেদনা—কতই বাজিয়াছে! তিনি কেমন করিয়া মানুষে বিশ্বাস হারাইতেছেন! সে কথা সে যতই মনে করিতে লাগিল, ততই তাহার কাছে দেবীবর প্রতিকূল অবস্থার ঝঞ্ঝাহত—দুর্ব্বব্যবহারের বজ্রাঘাতছিন্ন গিরিশৃঙ্গের মত প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। তাঁহার কথা মনে করিয়া বেণুকর অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না।

তাহার পর বেণুকর আপনার দৌর্ব্বল্যের জন্য আপনাকে তিরস্কার করিল—তাহাকে দৃঢ় হইতে হইবে—সে পিতামাতার ব্যবহারের প্রায়শ্চিত্ত করিবে। সেই সঙ্কল্পে সে আপনাকে বলী করিল।

বেণুকর যে ঘরে থাকিত, সেটা দেবীবরের অংশে পড়িয়াছিল। সে সে ঘর ত্যাগ করে নাই। বাড়ীর পর যখন হাঁড়ি আলাহিদা হইয়াছিল, তখনও সে

জ্যেঠাইমার ভাগেই রহিয়া গিয়াছিল। পীতাম্বর ও কমলিনী মনে করিতেন, সে সজ্জায় আসিতে পারিতেছে না। তাই দুই বার পরে—পীতাম্বর যখন আবার কর্ম্মস্থানে যাইবার আয়োজন করিতেছিলেন, তখন এক দিন কমলিনী বলিলেন, "বেণু, তোর ঘর সাজিয়ে নে; ভজহরি পুরান চাকর, ও তোর কাছে থাকুক।"

বেণুকর বলিল, "আমি যেমন আছি, তেমনই থাকি, আর ছ' মাস ত নয়।"

স্ত্রীর কাছে সব কথা শুনিয়া পীতাম্বর পুত্রকে বলিলেন, "তুই এ বাড়ী ভাড়া দিবি নে?"

বেণুকর বলিল, "না।" মনে মনে বলিল, "কখনই না।"

"তা' হ'লে আমি বাড়ী ভাড়া দিয়ে যাই?"

বেণুকর কোনও উত্তর দিল না।

পীতাম্বর পুনরায় বলিলেন, "কিন্তু দাদার যে অবস্থা, তা'তে তাকে বিব্রত করা ত ভাল হ'বে না।"

বেণুকর বলিল, "আর ক' মাসই বা?"

বাড়ী ভাড়া দিবার পূর্ব্বে কমলিনী আর একবার পুত্রকে গৃহে আসিতে বলিলেন। বেণুকর সেই একই উত্তর দিল—না। তখন তিনি এক দিন হৈমবতীকে বলিলেন, "দিদি, উনি বলেন, বেণু যদি এসে না থাকে, তবে বাড়ী ভাড়া দিয়ে যাবেন। তা' হ'লে বাড়ীটাই নষ্ট হ'বে। জান ত তুমি—উনি কেমন একরোখা মানুষ। তুমি একবার বেণুকে বুঝিয়ে বল।"

হৈমবতী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। বলিলেন, "আমি আজই বলব।"

সেই দিনই হৈমবতী বেণুকরকে বলিলেন, "বাবা, ছোট বৌ আজ এসেছিল; বলে, তুই বাড়ী না গেলে, ঠাকুরপো রাগ করে বাড়ী ভাড়া দিয়ে যা'বেন; তাই আমাকে বল্লে, তোকে বুঝিয়ে বল্‌তে।"

বেণুকর কাতর ভাবে জ্যেঠাইমার দিকে চাহিয়া বলিল, "জ্যেঠাইমা, আমি যেতে পারব না—আমি যা'ব না।"

তাহার দৃষ্টিতে হৈমবতী তাহার হৃদয়ের বেদনা দেখিলেন; তবু—উদ্ভূত ভাবাবেগ—প্রশমিত করিয়া তিনি বলিলেন, "কিন্তু বাবা, বাপমার মনে কষ্ট দিবি?"

বেণুকর ম্লান হাসি হাসিল—"জ্যেঠাইমা, বাপমার মনে কষ্ট দিতে নেই—জ্যেঠাজ্যেঠাইয়ের মনে কষ্ট দিতে আছে?"

হৈমবতীর নয়নে অশ্রু উথলিয়া উঠিতেছিল। তিনি অনুযোগের স্বরে কহিলেন, "বেণু, বাপমায়ের সমান কি আর কেউ আছে?"

বেণুর মনে মনে বলিল, সেই বিশ্বাস যদি অবিচলিত রাখিতে পারিতাম! প্রকাশ্যে সে বলিল, "জেঠাইমা, আমি ত বাবার আর কোনও অসুবিধা করছি না, অসুবিধা যা' করছি, সে তোমার।"

হৈমবতী "অসুবিধা কি, বাবা?"—বলিতে না বলিতে সে বলিল, "সে অসুবিধা নয়, জেঠাইমা। আমি জানি, তোমার আর দুই ছেলে যে ব্যবস্থা [illegible] খুসী হ'য়ে খেতে পা'রে—সে ব্যবস্থা আমিও পা'ব। তুমি অমনোযোগ কর—দু' মাস পরে আমি সে ভাবনা আর ভাবব না। অসুবিধা এই যে, বাবা কল্পেন—তুমি তাঁর ছেলেকে পর করে' নিলে—তিনি যে পর করে' দিয়েছেন সেটা বুঝবেন না। তা' তুমি এত দিন আমার এত অত্যাচার সহ্য করেছ বৌ, আজ আমার এ আব্দারটুকুও সহ্য করবে। তা আমি জানি—আর কালই এ আব্দার করছি।"

হৈমবতী আর কথা কহিতে পারিলেন না। বেণুরবের মস্তকে [illegible] সংস্থাপিত করিয়া মনে মনে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—তাঁহার নয়নের দুই বিন্দু অশ্রু বেণুরবের কপালে পড়িল। তিনি চলিয়া গেলে বেণুরব সেই অশ্রু কপাল হইতে লইয়া ভক্তিভরে মস্তকে দিল।

৬

এত দিন যাইতেছিল, মানুষের উপর দেবীবরের ভক্তিই বিশ্বাস হারাইতে [illegible] দিয়া তিনি কিছুতেই মনে করিতে চাহিতেন না যে, সংসারে [illegible] পরমার্থ মনে করে—স্বার্থ ছাড়া মানুষের কাছে আর কোনও কাজ নাই। তিনি প্রাণপণ বলে মানুষের উদারতা, মহত্ত্ব, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা এ সকলে বিশ্বাস আঁকড়িয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। যখন তিনি কোথাও ব্যবহারে সঙ্কীর্ণতা ভিন্নমাত্র দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি আর বিশ্বাস করিতে পারিলেন না—আর সে বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজে [illegible] হারাইলেন। তাঁহার পক্ষে সংসার করিবার উদ্যমের ও উৎসাহের উৎস শুকাইয়া গেল—সংসার মরুভূমি হইয়া পড়িল। এখন তাঁর কেবল [illegible]—সকল কেবল দুর্ভাবনা।

এত দিন গাঙ্গুলীদের ভাগাভাগি করিতেছিল—ওজনে করিয়া, হাতে [illegible] মিলাইয়া বাটিয়া কুটিয়া চুলিয়া ভাগিতেছিল—দেবীবর তাহা [illegible]

শীঘ্রই সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। পীতাম্বর যখন বাড়ী ভাগ করিয়া লইলেন, তখন তাগাদা প্রবল হইল। যেখানে ভাই অপেক্ষা করিতে পারে না, সেখানে পাওনাদার অপেক্ষা করিবে কেন?

এ দিকে দেবীবরের বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল—হৃদয় ভাঙ্গিলে সঙ্গে সঙ্গে শরীর ভাঙ্গিয়া যায়। তিনি শয্যা লইলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র নটবর চাকরীর চেষ্টা করিতেছিল। বেণুকর সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন সন্ধান করিয়া, দরখাস্ত লিখিয়া, তাহার একটা চাকরী জুটাইল। সে চাকরীর আয়ে উদরান্নের সংস্থান হয়; কিন্তু দেনা শোধ হয় না। দেবীবর ভাবিতেন। তিনি দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছিলেন। হৈমবতী ডাক্তার ডাকিবার জন্য জিদ করিলে তিনি বলিতেন, আর অপব্যয়ের সময় নাই। এক দিন হৈমবতী বলিলেন, "আমি ডাক্তার ডাকাই।" দেবীবর বলিলেন, "না। ডাক্তার আমার কি করিতে পারে? পয়সা নষ্ট করো না—আরও অভাব হ'বে।" হৈমবতী বলিলেন, "আমি যা' করে পারি, খরচ চালা'ব, তুমি আপত্তি করো না।" হৈমবতী জানিতেন না যে, তিনি যে ইহার মধ্যেই কয়জন খুঁজরা তাগাদাদারকে পাওনা দিবার জন্য তাঁহার প্রায় সব অলঙ্কার বিক্রয় করিয়াছেন, তাহা দেবীবরের কাছে গোপন থাকে নাই। দেবীবর বলিলেন, "যদি তা'ও জানতাম যে, তোমার এক গা গয়না আছে—তা' হলেও কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারতাম—খেতে পা'বে। তাও ত নেই। তুমি ত কোনও দিন সাধ করে' কিছু চেয়ে নাও নি। যখন এক এক দিন হাজার হাজার টাকা এনে সিন্দুকে রাখতে দিয়েছি, তখন যদি চেয়ে নিয়েও নিজে কিছু রাখতে! তা' কখনও কর নি; কেবল আমার সুখের জন্যেই প্রাণপণ করেছ! তা'র শোধ আমি ভাল করেই দিয়ে গেলাম!" দেবীবর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। হৈমবতী বলিলেন, "তুমি কেন ও সব কথা ভাবছ?—তুমি সেরে উঠ—আমার কিসের দুঃখ। পুরুষের টাকা জোয়ারে আসে—ভাঁটায় যায়; অনেক ত এনেছ, আবার আনতে কতক্ষণ?" দেবীবর কেবল বলিলেন, "আর—কতক্ষণ?"

আজ স্বামীর এই কথায় বড় দুঃখের মধ্যেও হৈমবতী হৃদয়ে যেন স্নিগ্ধ শান্তি অনুভব করিলেন। যে স্বামী এতদিন তাঁহার ব্যবহারে এমনই ভাব প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন, যেন তিনি স্ত্রীর ভালবাসা ও ভক্তি, সেবা ও শুশ্রূষা—নিতান্ত প্রাপ্য হিসাবেই পাইয়াছেন ও লইবার বলিয়া লইয়াছেন, সে স্বামী যে তাঁহার ব্যবহারের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছেন, সেই অনুভূতি আজ তিনি লাভ করিলেন।

এই অনুভূতির শান্তি লইয়া তিনি সুখে মরিতে পারিবেন। আর তাঁহার কোনও দুঃখ নাই। স্বামীর ব্যবহারের কঠোরতার মধ্যে তিনি তাঁহার হৃদয়ের প্রেমামৃতের সন্ধান পাইয়াছেন। সত্য বটে, তিনি হারাইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে পাইলেন; কিন্তু তাহাতে কি আইসে যায়। যে অনুভূতির এক মুহূর্ত্ত শত বৎসরের আশার ও আশঙ্কার অপেক্ষা মধুর, সে অনুভূতি তিনি লাভ করিয়াছেন। আজ তিনি সুখী। কেবল তিনি যদি স্বামীকে রাখিয়া যাইতে পারিতেন! কিন্তু এই রোগকাতর—বেদনাবিক্ষত স্বামীর শুশ্রূষা করিবার সৌভাগ্য অধিক বাঞ্ছনীয়, না স্বার্থপরের মত তাঁহাকে ফেলিয়া আপনি পলাইবার সৌভাগ্য অধিক বাঞ্ছনীয়? হৈমবতী তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

যত দিন যাইতে লাগিল, দেবীবর ততই মৃত্যুর—মুক্তির সন্নিহিত হইতে লাগিলেন। ঝড়ের ঝাপটা যেমন কাণ্ডারীহারা তরণীকে আবর্ত্তের দিকে লইয়া যায়—এক একটা পাওনার চরম পরিণতি তাঁহাকে তেমনই মৃত্যুর নিকট লইতে লাগিল।

দেবীবর যতই মৃত্যুর সন্নিহিত হইতে লাগিলেন, ততই মৃত্যুর জন্য অধীর হইতে লাগিল; তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধৈর্য্যও সময় সময় সে অধীরতা গোপন করিতে পারিত না। তাহাতে তাঁহার ব্যবহারের মাধুর্য্যও যেন সময় সময় ক্ষুণ্ণ হইত। তিনি আপনাকে সংসারের অনাবশ্যক ভার বলিয়া মনে করিতেন, এবং যত শীঘ্র তাঁহার স্বজনদিগকে সে ভার হইতে মুক্তি দিতে পারেন, ততই ভাল ভাবিতেন।

তাঁহার এই অধীরতার স্বরূপ হৈমবতীও বুঝিতে পারিতেন না; তিনি মনে করিতেন, হতাশায় তাঁহার হৃদয় তিক্ত হইয়াছে—দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী থাকিয়া তিনি অধীর হইয়াছেন। কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি বেণুকর তাহা বুঝিত; সে যেন তাহার হৃদয়ে দেবীবরের বেদনা অনুভব করিত। সে অনুভূতি যে বেদনার! সে দেবীবরের ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে তাহার শ্রদ্ধার স্নিগ্ধ ভেষজ দিতে চেষ্টা করিত; কিন্তু বুঝিত, তাহার পিতামাতার ব্যবহারে যে অনিষ্ট হইয়াছে, সে জীবন দিলেও তাহার প্রতীকার হইবে না। তবুও সে তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। এক দিকে জ্যেষ্ঠতাতের শুশ্রূষা, আর এক দিকে দুশ্চিন্তা—আবার পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার পরিশ্রম—হৃদয়ে দৃঢ় সঙ্কল্পের প্রবল বল ব্যতীত বেণুকর কখনই এত সহ্য করিতে পারিত না। যদি যত্নে—শুশ্রূষায় সে আর কয় মাস জ্যেষ্ঠতাতের নির্ব্বাণোন্মুখ জীবনদীপ প্রজ্বলিত রাখিতে

যাবে ;—তবে সে পরীক্ষার-সাজসজ্জা ত্যাগ করিয়া আপনার চেষ্টায়—আপনার কর্ত্তব্যে কি সে দীপের ভস্ম হতে সংগ্রহ করিতে পারিবে না ? সে দীপ যে তাহার কাছে দেবমন্দিরে রত্নবেদীর দীপ—তাহা নিভিলে মন্দির অন্ধকার হইবে—দেবতার মুখ আর দেখিতে পাওয়া যাইবে না ! সে সৌভাগ্য কি সে লাভ করিতে পারিবে ?

বেণুকরের প্রতি ভাগ্য নির্দ্দয়। তাহার পরীক্ষা শেষ হইল—সাফল্যে তাহার সন্দেহ রহিল না। সেই সময়—পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পূর্ব্বে—সে যখন বন্ধিবের মত সোপান অতিক্রম করিয়া ডেউলের দ্বারে পঁহুছিয়াছে, তখন দেবীবর সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইলেন। যে দিন তাঁহার বাড়ীখানি নিলামে বিকাইয়া গেল, সেই দিন—কে তাহা কিনিল, তাহা জানিতে পারিবার পূর্ব্বেই তাঁহার অবাধস্থ প্রাণ শীতল হইল—তিনি দীর্ঘকাল যে মুক্তির সন্ধান করিয়াছিলেন, মৃত্যু যেন রূপান্তরিত হইয়া তাঁহাকে সেই মুক্তির নিষ্কৃতি প্রদান করিল। সব চুকাইল। তিনি জানিতে পারিলেন না,—তাঁহার বাড়ীর ক্রেতা —গুরুপ্রসাদ।

৭

নিলামের পরদিনই গুরুপ্রসাদ যখন দেবীবরের মৃত্যু-সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না ; বলিলেন, "তুমি আমাকে একবার খবর দিলে না—প্রায়শ্চিত্তের অবকাশ কিছুতেই দিলে না ?"

গুরুপ্রসাদ অত্যন্ত চড়া দরে দেবীবরের বাড়ী কিনিয়াছিলেন। অমরনাথের স্ত্রী পীতাম্বরও অত নামে নিলাম ডাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ; কিন্তু গুরুপ্রসাদের পক্ষ হইতে একেবারেই যে দর দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে পীতাম্বরের লোক আর ডাকিতে সাহসই করেন নাই। গুরুপ্রসাদ বাস্তবিকই তাহা মূল্য অপেক্ষা অধিক দামে বাড়ী কিনিয়াছিলেন। তাহার সে কারণ অনেকে বুঝিতে পারেন নাই—তাঁহার এটর্ণীও নহে। কিন্তু সেই টাকায় দেবীবরের বিরুদ্ধে সব ডিক্রী শোধ হইয়া গিয়াছিল। দেবীবরের পুত্রদ্বয় সর্ব্ব বান্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের আর পিতৃধনের ভাবনা ছিল না।

নিলামের পর দুই মাস কাটিয়া গেল। গুরুপ্রসাদের এটর্ণী কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলে গুরুপ্রসাদ বলিলেন, "আইনতঃ অধিকার নউন।" তাহার পর এটর্ণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "অধিকারীদিগকে গৃহত্যাগের জন্য নোটিশ দিতে হইবে ত ?" গুরুপ্রসাদ বলিলেন, "না।" ছয় মাস কাটিয়া গেল। এটর্ণী আবার জিজ্ঞাসা

করিলেন, "এখন কি করিবেন?" গুরুপ্রসাদ বলিলেন, "এখন থাকুক।" ইহার মধ্যে পীতাম্বরের পক্ষ হইতে অমরের প্রস্তাবে এটর্ণী গুরুপ্রসাদকে জানাইলেন, বাড়ীর ক্রেতা আছে, তিনি ইচ্ছা করিলে বিক্রয় করিতে পারেন। গুরুপ্রসাদ উত্তর দিলেন, তিনি এখন বাড়ী বেচিবেন না।

আরও তিন মাস গেল। তখন পীতাম্বর একেবারে কলিকাতায় আসিলেন—জামাতার গৃহে উঠিয়া গুরুপ্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অন্যান্য কথার পর তিনি বলিলেন, "দাদা ত বাড়ী রাখতে পারলেন না; তা' আপনি নিয়ে রেখে ভালই করেছেন। আপনার ত ওটাতে আর বিশেষ কাজ হ'বে না; ভাবছি বড় ছেলের বিয়ে দেব—ঘর কম; ওটুকু পেলে আমার ভাল হয়—আর পৈত্রিক ভিটা—।" গুরুপ্রসাদ বলিলেন, "এখন ত বেচবার কথা ভাবিনি; যদি বেচি, তোমাকে ছাড়া আর কা'কে দেব? কিন্তু পাশের জমী আর বাড়ীটাও কিনব মনে করছি—দেখি কি হয়।" পীতাম্বর প্রস্থান করিলেন।

সেই দিন গুরুপ্রসাদ আহারে বসিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "পীতাম্বর এসেছিল; এখন হচ্ছে—দাদার বাড়ীর অংশটুকু কিনবে।"

গৃহিণী বলিলেন, "কথায় বলে—'ভাইয়ের বাড়া শত্রু নেই।' তা তুমি কিনেছ কি বেচবার জন্যে! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা।"

গুরুপ্রসাদ হাসিলেন।

বেণুকর পাশ করিয়া চাকরী লইয়া বিদেশে গিয়াছিল—মাসে মাসে মাহিয়ানা পাইলেই আপনার নিতান্ত প্রয়োজনের মত টাকা রাখিয়া আর সব নটবরকে পাঠাইয়া দিত। সে নটবরকে বলিয়াছিল—"বড়দা, বাড়ী এখন পরের—যে কোনও দিন ভাড়ার দাবী করতে পারে—বাড়ীর দামের শতকরা বছরে ৫৲ টাকা সুদ ক'ষে—মাসে মাসে সেই টাকা ভাড়ার বাবদে জমিয়ে রেখো।"

নটবর তাহাই করিত। কিন্তু কেহ কখনও ভাড়া চাহিতে আসিত না।

গুরুপ্রসাদ পার্শ্বের জমী ও বাড়ী কিনিয়াছেন, অমরের কাছে সংবাদ পাইয়া পীতাম্বর তাঁহাকে একখানা পত্র লিখিলেন, এইবার যদি তিনি বাড়ী বিক্রয় করেন। গুরুপ্রসাদের পুত্র সে পত্রের উত্তরে জানাইল, তাহার পিতা পীড়িত; এখন ও সব কথার আলোচনা করা অসম্ভব।

বাস্তবিকই গুরুপ্রসাদ পীড়িত হইয়াছিলেন। এক দিন একটা বড় মোকর্দ্দমা চালাইয়া বাড়ী আসিবার সময় পথে তাঁহার শ্বাসরোধানুভূতি হয়। বাড়ী ফিরিয়া তিনি ডাক্তার ডাকাইলে ডাক্তার দেখেন, হৃদয়ের অতিবিস্তৃতি হইয়াছে।

মূত্রপরীক্ষায় প্রকাশ পায়, তিনি অ্যালবুমেনোরিয়ায় ভুগিতেছেন; রোগ সারিবার নহে। চিকিৎসা চলিতে লাগিল। গুরুপ্রসাদ বুঝিলেন, চিকিৎসকগণ তাঁহার ভগ্নস্বাস্থ্য অবস্থায় জীবনের মেয়াদ দিন কতক বাড়াইতে পারিলেও পারিতে পারেন; কিন্তু স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দিতে পারেন না। তিনি এক বিষয়ে বড় সাবধান ছিলেন—কোনও কাজ ফেলিয়া রাখিতেন না। তাহাও তাঁহার সাফল্যের অন্যতম কারণ। তাই তিনি সম্পত্তির ব্যবস্থাদি সব করিয়াই রাখিয়াছিলেন; যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও শেষ করিয়া অবশ্যম্ভাবীর সম্ভাবনজন্য প্রস্তুত হইলেন।

ক্রমে যন্ত্রণা বাড়িতে লাগিল—মধ্যে মধ্যে শ্বাসরোধের উপক্রম হয়। মৃত্যুর ছায়া নিবিড় হইয়া আসিল। তখন এক দিন তিনি সকলকে ডাকিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলিলেন, "তোমাদের জন্য যে ব্যবস্থা করবার, করে' গেলাম; আর কিছু বলবার নেই। বলবার কেবল আছে একটা কথা। তোমাদের অনেক দিন বলেছি, আমার যা' কিছু দেবীবর দা' হ'তে। আমি এক দিন তা'র সঙ্গে দুর্ব্ব্যবহার করেছিলাম। সেই অভিমান মনে নিয়ে সে চলে গেছে—আমাকে ক্ষমা করে নি—আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করবার অবকাশ দেয় নি—সে দুঃখ আমার গেল না। আমি তা'র ছেলেদের জন্যে একটা ব্যবস্থা করেছি—সে সব কাগজ বাক্সে আছে। আমি মরলে—কাচাগলায়—তা'র বাড়ী তা'র স্ত্রীর কাছে—তোমার জ্যেঠাইমার কাছে গিয়ে তাঁ'কে যেমন করে পার, আমি যা' দিলাম, দেওয়াবে। আমার শ্রাদ্ধের আগেই তা' করবে; নইলে শ্রাদ্ধে আমার তৃপ্তি হ'বে না।" বলিতে বলিতে দেবীবর হাঁপাইতে লাগিলেন। গৃহিণী কাঁদিয়া বলিলেন, "ওগো, তুমি ও সব কথা বল্‌ছ কেন?" গুরুপ্রসাদ তাঁহাকে স্থির হইতে ইঙ্গিত করিয়া পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বুঝেছ?"

গুরুপ্রসাদের মৃত্যুর দুই দিন পরে তাঁহার পুত্ররা তাঁহার উইল প্রভৃতি দেখিয়া জানিল, তিনি দেবীবরের বাড়ী এবং পার্শ্বস্থ জমী ও বাড়ী দেবীবরের পুত্রদ্বয়কে দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বতন্ত্র দানপত্র রেজেষ্টারী করিয়াছেন, এবং উইলে লিখিয়াছেন, পুত্ররা সেই দানপত্রানুসারে কাজ না করিলে তাঁহার উইলের ব্যবস্থা অসিদ্ধ হইবে, এবং সমস্ত সম্পত্তি একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠায় ব্যয়িত হইবে—ইত্যাদি।

পর দিন প্রভাতেই মুহুরী রামকে ও এটর্ণীর পক্ষে অমরনাথকে সঙ্গে লইয়া গুরুপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবীবরের বাড়ী উপস্থিত হইল। রাম যাইয়া নটবরকে

বলিল, তাহারা গুরুপ্রসাদ বাবুর বাড়ী হইতে আসিয়াছে। নটবর ভাবিল, এইবার বাড়ী ছাড়িবার নোটিশ বাহির করিবে। কিন্তু রাম বলিল, "বড়বাবু গাড়ীতে আছেন—ডেকে আনি।"

কাচাগলায় গুরুপ্রসাদের পুত্র আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "জ্যেঠাইমা কোথায়?"

নটবর বুঝিতে পারিল না।

অমরনাথ বলিল, "জ্যেঠাইমার সঙ্গে দেখা করবেন।"

হৈমবতী আসিলে গুরুপ্রসাদের পুত্র দানপত্র তাঁহার পদপ্রান্তে রাখিয়া বলিল, "জ্যেঠাইমা, এ আপনাকে নিতেই হ'বে—এই বাবার অন্তিম প্রার্থনা। তিনি বলে গেছেন, যদি আপনাকে এ না লওয়াতে পারি, তবে আমার শ্রাদ্ধেও তাঁর তৃপ্তি হ'বে না।"

তখন রাম সব কথা বুঝাইয়া দিল।

সে দিন, অনেক দিন পরে, হৈমবতী স্বামীর সে দিনের কথার অর্থ বুঝিলেন —'কেহ যেন কাহারও উপকার না করে—কাহারও কাছে উপকারের আশা না করে।' স্বামীর কথা স্মরণ করিয়া তিনি বড় বেদনায় কাঁদিলেন।

৮

সুসংবাদ দুঃসংবাদের মত শীঘ্র প্রচারিত হয় না। কিন্তু নটবরের ও নীলাম্বরের এই সুসংবাদ জানিতে কল্লোলিনীর বিলম্ব হইল না। অমরনাথ তাহাদিগকে সে সংবাদ দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে—সেই পত্রে তিনি জানিলেন, বেণুকরও ছুটী লইয়া আসিতেছে। এই সংবাদে কল্লোলিনী সুখী হইলেন কি না, জানি না; কিন্তু ইহাতে তাঁহার মনে একটা মৃতকল্প আশা আবার উজ্জীবিত হইল—এইবার যদি বেণুকর বিবাহ করে—সংসারী হয়। পীতাম্বরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তিনি কলিকাতায় যাত্রা করিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া কল্লোলিনী হৈমবতীর বাড়ীতেই উঠিলেন; তাঁহাকে বলিলেন, "দিদি, তুমি বেণুর মত করাও; আমি নটুর আর বেণুর বিয়ে দেব।" তিনি তাঁহার ছেলেকে পর করিয়া লইয়াছেন—সে জন্য কল্লোলিনী হৈমবতীকে ক্ষমা করিয়াছিলেন কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু হৈমবতীর সর্ব্বদাই মনে হইত—তাঁহারই জন্য বেণুকর সন্ন্যাসী হইয়া রহিল। তিনি বলিলেন, "আমি ত কতবারই বলি। তুমিও বল।"

সেই দিন কল্লোলিনী পুত্রকে জিদ করিয়া ধরিলেন, "দেখ, বাবা, যা হ'বার হয়ে গেছে; এখন ত ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন—এবার তুমি সংসারী হও।"

বেণুকর বলিল, "মা, গুরুপ্রসাদ বাবুর ব্যবহারে মানুষের সম্বন্ধে মত বদলাতে ইচ্ছে হয় বটে; কিন্তু তবুও যে সংসারে মানুষের চেয়ে টাকা বড়, সে সংসারের ভার আর বাড়া'ব না; যে সংসারে মানুষ প্রাচীর তুলে' স্নেহের পথ বন্ধ করে, সে সংসার আমার সহিবে না।"

কল্লোলিনী দেখিলেন, দ্বার গাঁথিয়া তিনি যে প্রাচীর তুলিয়াছিলেন, পুত্র সেই দিকে চাহিয়া আছে। তিনি বলিলেন, "তুই সংসারী হ'—আমি ও প্রাচীর ভেঙ্গে দেব।"

বেণুকর একটু বিচলিতভাবে বলিল, "প্রাচীর ভেঙ্গে দেবে। কিন্তু যে ভাঙ্গা বুক নিয়ে জ্যেঠামশায় শ্মশানে শুয়েছিলেন, সে ভাঙ্গা বুক কি আর জুড়বে?" সে যেন দেবীবরের হৃদয়ের সেই বেদনা আপনার হৃদয়ে অনুভব করিতেছিল। উচ্ছ্বসিত অশ্রুবেগ রুদ্ধ করিতে সে উঠিয়া বাহিরে গেল।

হৈমবতী বিধবার শুভ্র বসনের অঞ্চলে অশ্রু মুছিলেন।

কল্লোলিনী স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। তিনি বুঝিলেন, স্নেহ পরকে আপন করে, আর স্বার্থ আপনকে পর করে।

পারস্য-উপসাগর।
১৩ই চৈত্র, ১৩২৩।

—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

প্রাচীন শিল্প-পরিচয়।

চতুর্দোল।

যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে 'চতুর্দোল' যানের বিশেষ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। উহা রাজভোগ্য নিরভিলম্ব মূল্যবান্ যান বলিয়া কথিত হইয়াছে। (১)

বর্ত্তমান সময়ে জাঁকজমকের বিবাহে 'চতুর্দোল' যানের ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু শাস্ত্রবর্ণিত প্রাচীন যানের সহিত অধুনা দৃশ্যমান যানের সামঞ্জস্য প্রতীয়মান হয় না। শাস্ত্রে সাধারণতঃ চারি জন বাহকের দ্বারা বহনীয় যান "চতুর্দোল" নামে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু ভোজদেব বলেন যে, যে যান চারি জন বাহকের দ্বারা বহনীয়, অথচ যাহার দণ্ড অর্থাৎ ডাঁট চারিটি, যাহার থাম আটটি, যাহাতে ছয়টি স্তম্ভ সুন্দররূপে সংস্থাপিত হইয়া থাকে, তাহা অত্যুৎকৃষ্ট চতুর্দোল বলিয়া কথিত হয়।

(১) রাজ্ঞো যদ্বিপদং যানং বিশেষাখ্যমিতং [মিদং] বিদুঃ।
চতুর্ভিরুহ্যতে যত্তু চতুর্দোলং তদুচ্যতে॥

উক্ত চতুর্দোল আবার যথাক্রমে জয়, কল্যাণ, বীর ও সিংহ, এই চারি নামে পরিভাষিত, এবং যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চতুর্বিধ—নৃপতিদিগের ভোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

যে চতুর্দোলের দৈর্ঘ্য তিন হস্ত, পরিণাহ অর্থাৎ ওস্নার দুই হস্ত, এবং যাহা দুই হস্ত উন্নত, তাহা 'জয়' নামে অভিহিত হইয়াছে। যাহার দৈর্ঘ্য চারি হস্ত, পরিণাহ আড়াই হস্ত, এবং উন্নতি (খাড়াই) আড়াই হস্ত, তাহা 'কল্যাণ' নামে অভিহিত হইয়াছে। যাহার দৈর্ঘ্য পঞ্চ হস্ত, পরিণাহ তিন হস্ত, এবং উন্নতি তিন হস্ত, তাহা 'বীর' নামে অভিহিত হইয়াছে। যাহার দৈর্ঘ্য এবং পরিণাহ চারি হস্ত ও উন্নতি দুই হস্ত, তাহা 'সিংহ' নামে অভিহিত হইয়াছে।

সর্ব্বপ্রকার চতুর্দোলই আবার সচ্ছদি (ছাদযুক্ত) ও নিশ্ছদি (ছাদরহিত), এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে এবং বর্ষাকালে যে যান ব্যবহার্য্য, তাহা 'সচ্ছদি', এবং ক্রীড়ার্থ ব্যবহার্য্য যান ও বর্ষাভিন্ন ঋতুতে ব্যবহার্য্য যান 'নিশ্ছদি' বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। বজ্রবারণ কাষ্ঠের দ্বারা চতুর্দোলের দণ্ড নির্ম্মিত হইত, এবং অন্যান্য অংশগুলি চন্দনের দ্বারা ঘটিত হইত। ইহাতে লোমজ বস্ত্র ব্যবহৃত হইত, এবং ধাতুর মধ্যে স্বর্ণ ব্যবহৃত হইত। অর্থাৎ, পতাকা, আস্তরণ প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থে বস্ত্রের ব্যবহার আবশ্যক, সেইগুলি লোমজ বস্ত্র দ্বারাই রচনা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কুম্ভ প্রভৃতি শোভা-সম্পাদক অবয়বগুলি স্বর্ণের দ্বারাই নির্ম্মিত হইবার নিয়ম লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

অনূপাদি দেশভেদে (২) ত্রিবিধ রাজার চতুর্দোলে কুম্ভ, পদ্মকোষ, এবং পর্ব্বত, এই ত্রিবিধ চিহ্ন ব্যবহৃত হইত।

সূর্য্যাদি অষ্টগ্রহের দশাতে জাত নৃপতিদিগের চতুর্দোল যানের অগ্রদেশে যথাক্রমে দর্পণ, অর্দ্ধচন্দ্র, হংস, ময়ূর, শুক, গজ, অশ্ব ও সিংহ, ইহাদের প্রতিকৃতি চিহ্নস্বরূপ নিহিত হইত। ইহাতে নানা প্রকার মণিও খচিত হইত।

মণি-নিধানের ব্যবস্থা দণ্ডের রীতি অনুসারে কথিত হইয়াছে। (মণি-নিয়মস্ত দণ্ডবৎ।) এই স্থলে দণ্ড শব্দে কি অভিহিত হইয়াছে, তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না। তবে আচ্ছাদনের অবলম্বন-দণ্ড বলিয়াই যেন মনে হয়। উক্ত চতুর্দোলে রক্ত, শুক্ল, পীত, কৃষ্ণ, চিত্র (নানা-বর্ণ) অরুণ, নীল ও কপিল, এই অষ্টবর্ণ পতাকা ব্যবহৃত হইত। পতাকান্বিত চতুর্দোল 'শুভ্রবান' নামে অভিহিত হইয়াছে। রাজকেশ্বরদিগের অর্থাৎ সম্রাটদিগের চতুর্দোল যান দ্বিপটি

(২) অনূপ, জাঙ্গল ও ধন্বন্, এই তিন প্রকার দেশ।

মুক্তা-স্তবকের দ্বারা যুক্ত হইত। দিগ্‌বিজয়ার্থ প্রস্থিত নৃপতিদিগের চতুর্দোলে চামরান্বিত দশটি দণ্ড থাকিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। (৩) নৃপতিদিগের 'যাত্রা-সিদ্ধি' নামক চতুর্দোল যানে সর্ব্বোপরি চাসপক্ষীর পুচ্ছ নিহিত হইত। (৪)

এ পর্য্যন্ত চতুর্দোলের যে সমস্ত লক্ষণ কথিত হইল, তাহা কেবল 'সচ্ছদি' চতুর্দোলের পক্ষেই বুঝিতে হইবে।

'নিশ্ছদি' চতুর্দোলে স্তম্ভ থাকিবার ব্যবস্থা নাই। উহা আবার 'সধ্বজ' ও 'নির্ধ্বজ', এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে; তন্মধ্যে 'সধ্বজ' যানে চারিটি ধ্বজ স্থানীর হস্তমানানুসারে এক হস্ত পরিমিত হইত। এই চারিটি ধ্বজ চারি কোণে নিহিত করিতে হয়, এবং হস্তদ্বয় পরিমিত দুইটি ধ্বজ অগ্রে ও পশ্চাদ্‌ভাগে স্থাপিত করিবার উপদেশ দেখা যায়।

নৃপতিদিগের চতুর্দোল যানের ধ্বজে মণি, চামর, কুম্ভ ও খড়্গ চিহ্ন নিধানের ব্যবস্থা নবদণ্ড ছত্রের রীত্যনুসারে বুঝিতে হইবে। (৫) নির্ধ্বজ চতুর্দোলের অন্য প্রকার-পরিমাণ কথিত হইয়াছে। যে চতুর্দোলের দৈর্ঘ্য ও পরিণাহ চারি হস্ত, সেই যান 'বিজয়' নামে অভিহিত হইয়াছে। উক্ত 'বিজয়' যান এক-বিতস্তি-পরিমিত বর্দ্ধিত হইলে, 'মঙ্গল' নামে, এবং দুই বিতস্তি বর্দ্ধিত হইলে, 'ভব্য' নামে অভিহিত হয়। (৬) জাঙ্গলাদি ত্রিবিধ দেশবাসী ত্রিবিধ রাজার জন্য এই তিন প্রকার যান ব্যবহারের বিধান পাওয়া যায়।

অষ্টদোল।

যে যান-আট জন বাহকের দ্বারা বহনীয়, সেই যানকে পণ্ডিতগণ 'অষ্টদোল' নামে নির্দ্দেশ করেন। এই শ্রেণীর যানে দুইটি সোপান-নির্ম্মাণের ব্যবস্থা দেখা যায়। ভোজরাজের মতে, অষ্টদোল যানের বাহক অষ্টসংখ্যক, ইহার দণ্ড ছয়টি,

---

(৩) মুক্তাস্তবকৈর্দশভির্যুক্তঃ স্যাদ্রাজকেশানাম্।
চামরদণ্ডৈর্দশভি র্দিগ্‌জয়িনাং চতুর্দোলঃ॥

(৪) চাসপক্ষস্য পুচ্ছঞ্চেৎ সর্ব্বোপরি পরিন্যসেৎ।
যাত্রাসিদ্ধিরয়ং নাম্না চতুর্দোলো মহীভুজাম্॥

(৫) নবদণ্ড-ছত্রের বিবরণ ছত্র-প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

(৬) আয়ামপরিণাহাভ্যাং চতুর্হস্তমিতো হি যঃ।
বিজয়ো নাম বিজ্ঞাত শ্চতুর্দোলো মহীভুজাম্॥
বিজয়ো মঙ্গলো ভব্যো বিতস্ত্যৈকৈকবৃদ্ধিতঃ।
ত্রিবিধানাং মহীন্দ্রাণাং যানত্রয়মুদাহৃতম্॥

কুম্ভ দশটি, এবং স্তম্ভও দশটি বিহিত হইয়াছে। চতুর্দোল যানের মত ইহাদের জয়, কল্যাণ, বীর ও সিংহ, এই চারি প্রকার শ্রেণীবিভাগ ও যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বিধ রাজার উপভোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'জয়' নামক অষ্টদোল-যানের দৈর্ঘ্য ছয় হাত, পরিণাহ চারি হাত ও উন্নতি চারি হাত নির্দিষ্ট হইয়াছে। 'কল্যাণ' নামক যানের দৈর্ঘ্য ও পরিণাহ পাঁচ হাত, এবং চারি হাত উন্নতি বিহিত হইয়াছে। 'বীর' নামক 'অষ্টদোলে'র দৈর্ঘ্য প্রভৃতি যথাক্রমে সাত হাত ও পাঁচ হাত বিবেচিত হইয়াছে। 'সিংহ' নামক 'অষ্টদোলে'র দৈর্ঘ্য ও পরিণাহ আট হাত পরিমিত, এবং উন্নতি ছয় হাত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই যানও 'সচ্ছদি' ও 'নিশ্ছদি', এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত দেখা যায়। ইহার অন্যান্য অনেক নিয়মই চতুর্দোলের মত বুঝিতে হইবে। ইহাতে মণি, চামর ও পক্ষ, অর্থাৎ পাখীর পালক, ইহাদের বিন্যাস-নিয়ম 'নিষ্পতাক' চতুর্দোলের মত; ছদিরহিত যে অষ্টদোল যানে ধ্বজ নিহিত হয় না, তাহা 'শিবিকা' নামে অভিহিত হইয়াছে।

অমরকোষে 'শিবিকা' ও 'যাপ্যযান', এই দুইটি শব্দের তুল্যার্থতা বিবেচিত হইয়াছে। টীকাকার ভানুজীদীক্ষিত বলেন যে, শিবিকা শব্দের অর্থ—পাল্কী। রঘুনাথ চক্রবর্ত্তীর মতে, 'শিবিকা' ও 'যাপ্যযান' শব্দ চতুর্দোলের বাচক। কিন্তু ভোজরাজ উহাকে 'অষ্টদোল' বিশেষরূপ অর্থে প্রযুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং ভোজসম্মত শিবিকা এবং অমরোক্ত শিবিকা এক পদার্থ কি না, তাহা ঠিক বলা যায় না। রামায়ণে মৃত বালীর দেহবহনোপযোগী 'শিবিকা'র যে বর্ণনা দেখা যায়, তাহাও যেন ভোজবর্ণিত শিবিকা বলিয়াই মনে হয়। যথা :—

"দিব্যাং ভদ্রাসনযুতাং শিবিকাং স্যন্দনোপমাম্।
পাক্ষকর্ম্মভিরাচিত্রাং দ্রুমকর্ম্মবিভূষিতাম্॥"

ভদ্রাসন-যুক্ত, মনোরম রথের তুল্য শিবিকা আনীত হইয়াছিল। উহা পক্ষীর চিত্রের দ্বারা চিত্রিত, এবং বৃক্ষ-প্রতিকৃতি দ্বারা শোভিত ছিল। অধুনা দৃশ্যমান পাল্কীতেও বৃক্ষ প্রভৃতির চিত্র দেখা যায়। কিন্তু রথের সহিত উহার কোনরূপ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না। সুতরাং রামায়ণের সময়সাময়িক শিবিকা অধুনাতন পাল্কী হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়াই মনে হয়। কারণ, ইহাতে ভদ্রাসন-সংস্থাপন সম্ভবপর হয় না।

ভোজবর্ণিত শিবিকাতে নবদণ্ড-ছত্রের রীত্যনুসারে মণি, কুম্ভ, মুখ প্রভৃতি নিধানের ব্যবস্থা দেখা যায়। (৭) দ্বাদশদোল, ষোড়শদোল, বিংশতিদোল

(৭) মণিকুম্ভমুখাদীনাং নিয়মো নবদণ্ডবৎ।

প্রভৃতি যানও নির্ম্মিত হইতে পারে। ভোজের মতে, বিংশতিদোলের পরেও, অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতিদোল প্রভৃতি যানও হইতে পারে। ব্যাস বলেন যে, বহু-বাহ্বাদিসমন্বিত যান বহুগুণযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। (৮)

প্রদর্শিত চতুর্দ্দোলাদি-নির্ম্মাণ-পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয়, অতি-পূর্ব্বকালে যান প্রভৃতি প্রত্যেক ব্যবহার্য্য বস্তুতেই জাতিভেদের এবং দেশভেদের চিহ্ন-ব্যবহারের আবশ্যকতা বিবেচিত হইয়াছিল। সুতরাং যানাসন দেখিয়াই কোন্ জাতীয় রাজা, এবং কোন্ প্রদেশে তাঁহার বাস, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইত। হিন্দুর যাবতীয় বিষয়েই অদৃষ্টবাদ সম্বন্ধ। সুতরাং গ্রহবিশেষের দশাবিশেষে জাত নৃপতিদিগের ভেদসূচক যে চিহ্ন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের যানা কেবল শুভাদৃষ্ট দুরদৃষ্টেরই সম্ভাবনা বুঝা যায়। অর্থাৎ, নিয়ম প্রতিপালন করিলে শুভাদৃষ্ট, পক্ষান্তরে দুরদৃষ্ট অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

বঙ্গ-সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি।

২

আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যের একটা দিক ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভবের সঙ্গে উদ্ভূত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে। রামমোহন, দ্বিজেন্দ্রনাথ, কবীন্দ্র রবীন্দ্র, চিরঞ্জীব শর্ম্মা, বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় ও পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির ব্রহ্মসঙ্গীত, কাঙ্গাল হরিনাথের বাউলসঙ্গীত, মনে হয়, যেন এ বঙ্গ-ভারতীর কণ্ঠে অক্ষয় হীরক-কণ্ঠীর মত দীপ্যমান! কোনও দেশের কোনও সাহিত্যে এমন অসাম্প্রদায়িক ঈশ্বরানুভূতি বা ভগবদ্ধ্যান এমন শোভন কলানৈপুণ্যে জীবন্তরূপে স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে কি না সন্দেহ।

ব্রাহ্মসমাজের সংঘাতে নব্য হিন্দুয়ানীর উদ্ভব হইয়াছে। জার্ম্মাণ 'ফিল-অফী'র বা দর্শনের মাল-মশলা দিয়া বেদান্তের সিদ্ধান্তসমূহ বিলাতী ধরণে বুঝিবার প্রয়াসে বাঙ্গলা সাহিত্যের আর একটি অঙ্গ অলঙ্কৃত হইয়াছে। নবীনচন্দ্রের শেষ তিনখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য, বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ তিনখানি অপূর্ব্ব

(৮) এবং দ্বাদশ-ষোড়শ-বিংশতি-দোলাদিকাঃ কার্য্যাঃ।
বিংশতিদোলাৎ পরতো ভোজমতে সম্ভবেদ্ যানম্।
যানং বহ্বঙ্গযোজ্যং বহুগুণমেতদ্ভণাদ বৈ ব্যাসঃ।

উপন্যাস, এই নব্য আভরণের দুই দিক্‌কার দুইটি প্রধান উপাদান। এই হিঁদুয়ানী যদি স্থায়ী হয়, এ সকল সিদ্ধান্ত যদি কোনও দিন বাঙ্গালার জন-সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইবার সুযোগ ঘটে, তবে অবশ্যই এ-সাহিত্য টিকিয়া যাইবে। তদ্ভিন্ন, পুরাতন ভাবের পুরাতন সিদ্ধান্তের দূরাগত বংশী-ধ্বনির মত যে ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাঝে মাঝে আধুনিক সাহিত্যেও শ্রুত হইতেছে, তাহারি ফলে আধুনিক সাহিত্য যে একটা বৈচিত্র্য বা বিশেষত্ব পাইয়াছে, সে ভাব-সম্পৎও কতকাংশে স্থায়ী হইবে। কারণ, বাঙ্গালী যতই কেন ইংরেজী শিখুক না, বা তদ্ভাবে ভাবিত হউক না, তাহার স্বধর্ম্মসিদ্ধ বা মজ্জাগত বাঙ্গালীয়ানা—অকৃত্রিম স্বাদেশিকতা সে কখনও—কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। সে স্বাদেশিকতা যখনই যে ভাবে ফুটিয়া উঠিবে, তখনই সেই ভাবটি—প্রকাশ্য ভাবেই হউক আর অস্ফুটরূপেই হউক—কথঞ্চিৎ স্থায়িত্ব লাভ করিবেই।

আধুনিক সাহিত্যের বিশেষ লক্ষণই হইল—Patriotism বা দেশাত্মবোধ। (ইহার সহিত জাতি-বৈরের ভাবও কতকটা বিজড়িত আছে।) রঙ্গলালের "পদ্মিনী" কাব্য দেশাত্মবোধের সর্ব্বপ্রথম শঙ্খনাদ। হেমচন্দ্রের "কবিতাবলী" তাহার উদাত্ত দুন্দুভিধ্বনি। হেমচন্দ্র এই স্বাদেশিকতা, স্বদেশ-ভক্তি, বা দেশাত্মবোধের সঞ্জীবন সুরে এক অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব, অপূর্ব্ব সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া গেলেন। আমার যাহা, তাহা আমারই উপযোগী, আমিত্বের প্রভাবেই আমার কাছে 'আমার' বলিতে যাহা কিছু, তাহাই সুন্দরশোভন,—এই ভাব লইয়াই হেমচন্দ্রের কবিতার উদ্ভব ও তাহাই উহার বিশেষত্ব। তার পর, বঙ্কিম-চন্দ্রের "কমলাকান্তে"ও এই ভাবটিই সূত্রাকারে হতাশার আক্ষেপে ও উত্তেজনায় গ্রথিত হইয়াছে। সেই সুর একটু প্রণিধানপূর্ব্বক শুনিলে "ধর্ম্মতত্ত্ব" ও "কৃষ্ণ-চরিত্রে"ও সুস্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। বঙ্কিমের শেষ তিনখানি উপন্যাসও এই-ভাবেরই বিচিত্র ও অপরূপ অভিব্যঞ্জনামাত্র। এই ফোটা ফুলটি কালক্রমে ক্ষীণজন্মা কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালের "রাণা প্রতাপ", "দুর্গাদাস", "মেবারপতন" প্রভৃতি নাটকাবলীতে স্বাদু ও পুষ্টিকর সুফলে পরিণত হইয়াছে। অক্ষয়চন্দ্রের "বাঙ্গালীর বৈষ্ণবধর্ম্ম", ইন্দ্রনাথের ব্রাহ্মণ্য-প্রতিষ্ঠার প্রয়াসমূলক বিবিধ প্রবন্ধাদি, চন্দ্রনাথের "ত্রিধারা" ও "হিন্দুত্ব", পণ্ডিতবর শশধরের "ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা", এমন কি, রবীন্দ্রনাথের "ব্রাহ্মণ", "গোরা" প্রভৃতি সকল পুস্তক, সকল নিবন্ধ, প্রবন্ধ, সন্দর্ভই—এই Patriotism, স্বাদেশিকতা, বা দেশাত্মবোধের ভিত্তির

উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাবটা সমাজে যত ছড়াইয়া পড়িবে, ইহার তীব্র ও অভ্রান্ত উন্মাদনার আস্বাদ বাঙ্গলার জনসাধারণ গ্রহণ করিতে যতই উৎসুক ও আগ্রহান্বিত হইবে, ততই এবংবিধ সাহিত্যের পুষ্টি, প্রভাব ও প্রসার ঘটিবে। কিন্তু ইহা শিক্ষা ও প্রচার-সাপেক্ষ। আমাদের দেশের জনসমূহ প্রেম-ভক্তি বোধে, সন্ন্যাস-সংযমের শ্রেষ্ঠতা নতশিরে স্বীকার করে; (কেন না, সে সকল কথা গত সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া বাঙ্গালায় সিদ্ধ মহাত্মগণ ও পণ্ডিতপরম্পরা বাঙ্গালীকে নানা ভাবেই শিখাইয়া আসিতেছেন।) কিন্তু দেশাত্মবোধ বা এই জাতিবৈরের ভাব বাঙ্গালীর পক্ষে বিশেষভাবেই অভিনব। এই দুইটি ভাবে বাঙ্গালীকে দীক্ষিত করিবার জন্য পদ্ধতিক্রমে তেমন কোনও প্রয়াসও হয় নাই, সুবিধাও ঘটে নাই। যত দিন তাহা না হইতেছে, বা হইতে পারিতেছে, যত দিন আধুনিক বাঙ্গলার এ সব ভাব ও রস বাঙ্গালী-সমাজের সকল স্তর ভেদ করিয়া সমগ্র বাঙ্গালী জাতিটাকে মজাইয়া মাতাইয়া না তুলিতেছে, তত দিন এ সাহিত্যকে এ দেশের জন-সাধারণ নিজস্ব বলিয়া সহজে বিশ্বাস বা গ্রহণ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

এইখানে আর একটা বিষয়ের প্রসঙ্গ তুলিব। মোগল-পাঠানের যুগে পূর্ব্বে এ দেশের কবিগণ সাহিত্যের পোষণকল্পে অসংখ্য কাব্য ও পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। তবে, চণ্ডীদাস হইতে ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার অধিকাংশ সুপরিচিত কবিগণ রাঢ় দেশের লোক হওয়াতে, বাঙ্গলার উপরে রাঢ়ের প্রাধান্যই একটু অধিকপরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তার পর, "ফোর্ট-হবলিয়াম্" কলেজের পণ্ডিতগণ সকলে রাঢ়ীয় ছিলেন। বিদ্যাসাগর হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার পনের আনা সুসম্পন্ন, সুখ্যাত, সুপ্রতিষ্ঠ লেখক রাঢ়ের বা কলিকাতার লোক। বিদ্যাসাগর মহাশয় পাঠ্য-পুস্তক-প্রণয়নে—ভ্রাতসারেই হউক, আর অজ্ঞাতসারেই হউক—রাঢ়ের প্রাদেশিক শব্দই সমধিক ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাহার ফলে, আজ রাঢ়ের বাঙ্গালা সমগ্র বাঙ্গালা দেশের ভাষা হইয়াছে। উহা এখন সকলের পক্ষে সুখবোধ্য,—সকলের পক্ষেই অল্পায়াস-সাধ্য হইয়াছে। জাতির সংহতি-শক্তি বাড়াইতে হইলে, জাতিকে একভাষী করিতেই হইবে। ভাষার বন্ধনেই জাতির পুষ্টি ও সংহতি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ইংরেজের শিক্ষা-বিভাগের কল্যাণে, মাইকেল, বঙ্কিম, হেম, নবীন ও রবি প্রভৃতি মনস্বী ও প্রতিভাশালী কবিকুলের প্রভাবে, এবং কলিকাতা হইতে প্রচারিত সংবাদপত্রসমূহের জাতি-প্রসারে যখন আমরা

এখন একটা নির্দ্দিষ্ট ভাষা পাইয়াছি, তখন সে ভাষাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণ প্রভাবে বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া এখন আমাদের পক্ষে কোনক্রমেই কর্ত্তব্য হইবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লোক-শিক্ষার উদ্দেশ্যে, দেশের আপামর সাধারণে ধর্ম্মমত-প্রচারের জন্যই বাঙ্গলা ভাষার প্রথম উৎপত্তি। এই জন্ম-বৃত্তান্তের কারণ উপেক্ষা করিলে চলিবে না। বাঙ্গালীকে নূতন কথা শুনাইতে, বাঙ্গালীকে নিখিল বিশ্বের বিচিত্র ও অগণ্য ভাব ও চিন্তার সহিত পরিচিত করাইবার জন্য, ভাইকে ভাইয়ের মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলিবার উদ্দেশ্যেই আমাদের এ বাঙ্গলা লেখা। যে ভাষায় রামপ্রসাদ বাঙ্গালীকে মাতাইয়া তুলিয়াছেন, দাশুরায় বাঙ্গালীকে হাসাইতেন ও কাঁদাইতেন, ভারতচন্দ্র তাঁহার ভাষার অনায়াস স্বচ্ছন্দ গতি ও অপূর্ব্ব ধুধুরীচ্ছটায় বঙ্গবাসীকে বিমুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেই ভাষাই বস্তুতঃ বাঙ্গালীর যথার্থ ব্যবহার্য্য ভাষা। সুতরাং, আজ আমাদের লিখিত কোনও বিষয় খেয়ালের বশে বা ভেদের জোরে দুর্ব্বোধ বা একদেশদর্শী করিয়া তুলিলে চলিবে না। বাঙ্গালা যদি রাজার ভাষা বা রাজ-দরবারের ভাষা হইত, তবু না হয় উহাকে নানা অলঙ্কার-আভরণে জটিল, ভারাক্রান্ত, দুর্বোধ, বা দুর্লভ্য করিয়া তুলিলে তত ক্ষতি ছিল না। কিন্তু আমাদের বাঙ্গলা ত আর তাহা নহে!—এ যে একেবারেই প্রজার ভাষা; অন্তর্নিহিত গুপ্ত বেদনার অভিব্যঞ্জনার ভাষা, এ যে ব্যথিতের—আর্ত্তের—আকুল সহমর্ম্মিতার করুণ আকাঙ্ক্ষার ভাষা! এই Democratic ভাষাকে আজ যদি কেহ দুর্বোধ প্রাদেশিকতায় দুষ্ট করিয়া তোলেন, তবে তিনি স্বদেশেরই প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিবেন।

"মনে পড়িল রে আমার সেই ব্রজভূমি!" স্মৃতির অদম্য আলোড়নে ও অসহ্য বৃশ্চিকদংশনে অধীর হইয়া, যখন এই ভাবে ও এই ভাষায় আকুল কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিব, তখন বাঙ্গালায়—বাঙ্গালী সমাজে নিম্নতম স্তর হইতে উচ্চতম স্তর পর্য্যন্ত সকল স্তরের-সমুদায় লোক যদি হাহাকারে কাঁদিয়া না উঠে, তবে আমার এ রোদনের ফল কি? এই কারণেই ত বাঙ্গালা-সাহিত্য করুণরস-প্রধান। এই জন্যই, আবার বলি—এই খোসমেজাজের, খোসখেয়ালের আমাদের এই খাঁটী ও অকৃত্রিম বাঙ্গালা সাহিত্যকে কেহ সহজে পরিবর্ত্তিত বা আকারান্তরিত করিতে কিছুতেই পারিবে না। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের শ্রীপাদপদ্মসমুদ্ভূত হইয়া যে প্রীতি-পীযূষ-নিষ্যন্দিনী ত্রিদিব-মন্দাকিনী আজি এই পুণ্য বঙ্গভূমি প্লাবিত করিয়া বহিয়া চলিয়াছে, আজ বঙ্গসাহিত্যের সেই করুণ প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি না

বাধিয়া, যিনি ইহার এই সার্ব্বজনীন প্রভাবের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, উদ্ভট, অসঙ্গত ও অশোভন সৃষ্টি করিতে, এবং সেই সঙ্গে শুধু স্বীয় বাহাদুরী ফলাইয়া তুলিতে উদ্যত হইবেন, তাঁহাকে পরিণামে এক দিন ঠকিতে হইবেই হইবে। মাইকেল মধুসূদন ইংরেজী ঢঙ্গে "মেঘনাদবধ" রচনা করিলেও, সে রচনার কালে তিনি বঙ্গীয় প্রকৃত প্রকৃতিটিকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই; কিছুতেই কারুণ্যপ্রধান বাঙ্গালী-প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিতে সাহসী হন নাই। "মেঘনাদবধ" কাব্য তাই করুণার উৎস।

বাঙ্গালা-সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতির কথা একটা তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বোল আনা বলা হয় না,—বলা যায়ও না। তবে আমি যে ভাবে উহাকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি, সেই ভাবটা আমার সামান্য সামর্থ্য অনুসারে আজ আপনাদের গোচর করিলাম। আপনারা সকলেই বিবেচক, বিদ্বান্ ও ভাবুক। আমার কথিত এই কয়েকটি কথায় আপনাদের চিন্তা-স্রোত যদি কোনও কিছু নূতন বা নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলেই আমার এ লেখনী-শ্রম সার্থক হইল, মনে করিব। আমরা,—অর্থাৎ এই ইংরেজী শিক্ষিত সাহিত্য-সেবিসম্প্রদায় এতকাল বাঙ্গালার জনসাধারণকে অনেকটা উপেক্ষা করিয়াই এ যাবৎ সাহিত্য-চর্চ্চা করিয়াছি। আমরা যেন মনে মনে ইহা ধরিয়া লই যে, আমরা যা লিখিব, সেই সবই বাঙ্গলার জনসাধারণ বা পাঠকবর্গ পড়িতে ও বুঝিয়া লইতে বাধ্য। বাঙ্গলা ভাষা যদি বঙ্গদেশের রাজভাষা হইত, আমরা যদি সকলেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক হইতাম, তাহা হইলেও হয় ত বা আমাদের এ স্পর্দ্ধা কতকটা সাজিত। বিলাতে 'Literature'এর পঠন-পাঠন যে হিসাবে হয়, আমাদের দেশে এখনও সংস্কৃতের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা যে রীতিতে হয়, বাঙ্গালার সেই ভাবের চর্চ্চা থাকিলে আমাদের এ 'আব্দার' কতকটা বজায় রাখিতেও পারিত। কিন্তু, বাঙ্গালা যে চিরকালই আমাদের স্বাভাবিক ব্যবহার ভাষা, বাঙ্গালা যে চিরদিনই দর্শন-শাস্ত্রের কঠিন ও জটিল তত্ত্বগুলিকে সরল করিয়া, এ সংসারের অনিত্যতা ও অবিনশ্বরতা জন-সমাজের হৃদয়ঙ্গম-যোগ্যভাবে সর্ব্বসাধারণেরই শ্রুতিগোচর করিয়া আসিতেছে। বাঙ্গালার বাঙ্গালী মনে করে—এ ভাষায় যাহাই লিখিত বা উক্ত হইবে, তাহা অনায়াসে আমরা সকলেই বুঝিতে পারিব। অতএব, বাঙ্গালায় আমাদের কিছু লিখিতে হইলে, ইংরেজী হিসাবে বাঙ্গালায় একটা Literature-এর সৃষ্টি করিতে হইলে, উহাকে সর্ব্বতোভাবে Democratic (লোকমতানুগামী) করিতে হইবে; উহাকে

সকলেরই বোধশক্তির বিষয়ীভূত করিতে হইবে। যেটুকু বাঙ্গালার জনসাধারণ মাথায় করিয়া লইয়াছে, বাঙ্গালা সাহিত্যে আজ সেইটুকুই স্থায়িভাবে বিরাজ করিতেছে।

কেহ কেহ বলেন যে, ভাবের বৈচিত্র্য, গভীরতা ও মৌলিকতার প্রভাবেই আধুনিক সাহিত্য সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সুবোধ্য হইতেছে না। এ কথাটা যদিও সর্ব্বথা অযৌক্তিক নহে, তবু একটু চিন্তা করিলে এটুকুও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইব যে, পূর্ব্বের ন্যায় এখনকার লেখকগণ রচনার কালে জনসাধারণের কথা একেবারেই চিন্তা করেন না,—তাঁহাদের এখন লক্ষ্যই থাকে—ঐ বিলাতী শিক্ষিত সম্প্রদায়। কাজেই, এ অবস্থায় সাধারণ লোকে কিছুতেই এ সব লেখার মর্ম্ম-গ্রহণ বা রসাস্বাদ করিতে সমর্থ হয় না। বৈষ্ণব সাহিত্যে ভাবের বৈচিত্র্য, মৌলিকতা, বা গভীরতা যে নিতান্তই অল্প ছিল, এ কথা কোনও মতেই মানিয়া লওয়া চলে না। তথাপি সে সকল সাহিত্যের আসল ভাব বা মর্ম্মটা যে অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ-শিক্ষিত লোকেরাও বেশ বুঝিতে পারিত, বস্তুতঃ ইহার কারণ সন্ধান করিতে গেলেও আমরা দেখিতে পাইব যে, সে সব লেখা সাধারণের জন্য রচিত ও উদ্দিষ্ট হওয়ায়, প্রকাশের স্বাভাবিকত্বে বা কৌশলে (সে ভাবরাশি শত জটিল ও গভীর হইলেও) তাহাদের পক্ষে অধ্যয্য হয় নাই। কাজেই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য হইলেই যে তাহা জন-সাধারণের অবোধ্য বা অগম্য হইবেই, এ কথাটার যাথার্থ্য সর্ব্বতোভাবে মানিয়া লওয়া কোনও মতেই চলিতে পারে না। আর এই কারণেই অপ্রিয় হইলেও আমি এ কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, মাইকেল হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার আধুনিক সাহিত্যরথিগণ যে অভিনব ও অপূর্ব্ব সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছেন, তাহা সর্ব্বসাধারণের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া। সে সকল শুধু এই শিক্ষিতগণেরই রুচি-অনুযায়ী করিয়া রচিত হওয়ায়, এখনও সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মর্ম্মস্পর্শ করে নাই; এবং তাই তাহা আজিও বাঙ্গালী জনসাধারণ মাথায় করিয়া লয় নাই। যত দিন এ দেশে ইংরেজী-শিক্ষার প্রসার ততদূর সার্ব্বজনীন না হইবে, তত দিন এ সাহিত্যের সার্থকতাও সম্পূর্ণ হইবে কি না, তাহা বলা যায় না। কিন্তু সে পরিণতিটিকে কল্যাণপ্রসূ ও প্রাণময়ী করিতে হইলে, এ সাহিত্যের প্রচারে আমাদিগকে বদ্ধ-পরিকর হইতেই হইবে।

মুখ্যতঃ আমরা এই হেতু এই সাহিত্য-পরিষদের সেবায় আত্মসমর্পণ

হইয়াছে বলিয়া উক্ত হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার তিব্বতীয় শিষ্য ও উত্তরাধিকারী ব্রোম্‌তান রচিত অতীশের জীবনচরিতও রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস পড়িয়া দেখিয়াছিলেন। এই ব্রোম্‌তানই তিব্বতের প্রথম বিরাট আচার্য্যক্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অতীশ কবে বিক্রমশিলার মহাস্থবির-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা লিখিত হয় নাই; কিন্তু পূর্ব্বাংশের সহিত অন্বিত করিয়া পাঠ করিলে ইহাই প্রতিভাত হয় যে, তৎকালে অতীশের বয়স ৪৩ বৎসরের ন্যূন ছিল না, অর্থাৎ ১০২৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তিনি উক্ত পদে নিযুক্ত হয়েন নাই। এতদ্ব্যতীত, মহীপাল যে ১০২০ খৃষ্টাব্দেও গৌড়ের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন—তাহার প্রমাণ আমরা তিরুমলয়-পর্ব্বতলিপিতে প্রাপ্ত হই; এবং বারাণসীতে (সারনাথ?) প্রাপ্ত একখানি শিলালিপি হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ১০২৬ খৃষ্টাব্দেও তিনি গৌড়ের সিংহাসনেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারানাথের অনুসরণ করিয়া যদি আমরা মহীপালের রাজত্বকাল ৫২ বৎসর বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা হইলে, ৯৭৪ হইতে ৯৮৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই তাঁহাকে সিংহাসনে আরোহণ করিতে হয়।

মহীপালের রাজ্যের অবস্থান ও বিস্তার।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দিনাজপুরের অন্তর্গত রাণগড়ের ভগ্নাবশেষমধ্যে প্রাপ্ত একখানি তাম্রশাসনে লিখিত রহিয়াছে যে,—তিনি অনধিকারী কর্ত্তৃক বিলুপ্ত পিতৃরাজ্যের পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন; ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন,—উহাতে কোনও পার্ব্বত্যজাতি কর্ত্তৃক উত্তর-বাঙ্গালার আক্রমণ সম্বন্ধে, এবং তথায় মোঙ্গলীয় বংশোদ্ভূত কোনও রাজবংশের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ইঙ্গিত রহিয়াছে; এই শেষোক্ত বিষয়ে রাণগড়ে প্রাপ্ত একখানি মন্দিরলিপি হইতেও প্রমাণ লাভ করা যায়।

মহীপালের যে রাজ্য অনধিকারী কর্ত্তৃক বিলুপ্ত হইয়া পরে পুনরুদ্ধৃত হইয়াছিল, তাহার, এবং মহীপাল যে সকল প্রদেশে তাঁহার শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন, তাহাদের অবস্থান ও বিস্তৃতি অনুমান করিবার মত বৎসামান্য সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহীপালের যে তাম্রশাসনের কথায় উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে লিখিত আছে যে,—মহীপাল বিলাসপুরে বাস করিবার সময়, পুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত কোটিবর্ষ বিষয়ের অধীন গোকুলিকা মণ্ডলে অবস্থিত কুরট-পল্লিকা গ্রাম কৃষ্ণাদিত্য শর্ম্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। অন্যান্য বহু তাম্রশাসনের ন্যায় এই তাম্রশাসন হইতেও দেখিতে পাওয়া যায়, পালরাজগণের রাজত্বকালে চারি প্রকার ভূ ভাগ প্রচলিত ছিল—ভুক্তি,

বিষয়, মণ্ডল এবং গ্রাম; কতিপয় গ্রাম লইয়া একটি মণ্ডল, কতিপয় মণ্ডল লইয়া একটি বিষয়, এবং কতিপয় বিষয় লইয়া একটি ভুক্তি গঠিত হইত। এইরূপ ভূমি-বিভাগ-ব্যবস্থা যে শুধু বাঙ্গালাতেই ছিল না, পরন্তু দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে, একাধিক শতাব্দের ব্যবধানেও যে ঐরূপ ভূমি-বিভাগ-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, বহু প্রাচীন ভূমিদানপত্রে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, অশোকের সাম্রাজ্যের ন্যায় কোনও সাম্রাজ্যের অধীনে ভারতবর্ষের অধিকাংশ ভূভাগে একই প্রকার শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং প্রথম প্রবন্ধের উল্লিখিত, পরবর্ত্তী বিভিন্ন রাজবংশের রাজত্বকালে উহা টিঁকিয়া গিয়াছে।

আলোচ্য তাম্রশাসনের উল্লিখিত গোকলিকা মণ্ডলের, বা কুরটপল্লিকা গ্রামের, অথবা মহীপালের তৎকালীন রাজধানী বিদ্যাসপুরের অবস্থান সম্বন্ধে এক্ষণে আমরা কিছুই অবগত নহি। ২০০ বৎসর পরবর্ত্তী-অব্দসংবলিত আর একখানি পালরাজ-প্রদত্ত তাম্রশাসন দিনাজপুর জেলাতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহাতেও পুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত কোটিবর্ষ বিষয়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দে হর্ষের সাম্রাজ্যে পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তি যে একটি নিত্যরাজ্য ছিল, ইউয়ান চুয়াঙ্গ তাঁহার ভ্রমণকাহিনীতে তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহার বর্ণনা-অনুসারে বগুড়া জেলার মহাস্থান নামক স্থান পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির রাজধানীর অবস্থানভূমি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কোনও কোনও স্থলে এই ভুক্তি—প্রদেশ বা রাজ্যের ন্যায় বিপুলায়তন হইত; যথা,—জেজাকভুক্তি—চন্দেল্লগণের আদিম রাজ্য, এবং তীরভুক্তি—বর্ত্তমান ত্রিহুত। পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তিও উত্তর-বাঙ্গালার এইরূপ একটি দেশবিভাগ ছিল, এবং সম্ভবতঃ বর্ত্তমান বগুড়া ও দিনাজপুর জেলার সম্পূর্ণ অথবা কতকাংশ তাহার অন্তর্গত ছিল; মহীপালের রাজশক্তি যে উত্তর-বাঙ্গালায় সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাম্রশাসনেই তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। দিনাজপুর জেলার যে প্রকাণ্ড সরোবর বংশপরম্পরায় মহীপালদীঘি নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে, তাহা, এবং হয়ত মহীসন্তোষের (?) এবং মহীপুরের ধ্বংসাবশেষও উহাই সপ্রমাণ করিতেছে।

বরেন্দ্রভূমির যে সকল প্রদেশে মহীপাল রাজত্ব করিতেন, তত্তাবৎই, অথবা তাহার অধিকাংশই যে তিনি তত্র-প্রতিষ্ঠিত কাম্বোজ রাজশক্তির নিকট হইতে পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ সম্ভব বলিয়া মনে হয়; কিন্তু তাহা হইতে এরূপ অনুমান করা যায় না যে,—কাম্বোজ রাজশক্তি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়াছিল।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, যে তাম্রশাসনখানির উল্লেখ করিয়াছি, তাহার অর্দ্ধের পাঠোদ্ধার করিতে পারা যায় না; তাই, মহীপাল যে ঠিক কবে কাম্বোজদিগের হস্ত হইতে স্বতরাজ্যের পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই।

মহীপাল-রাজত্বের সম-সময়ে উত্তর-পশ্চিমে ভারতের অবস্থা।

আমার বিবেচনায়, মহীপালের সুদীর্ঘ রাজত্বকালে বাঙ্গালার ঘটনাপরম্পরার একটা ধারণা করিতে হইলে, তৎকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে কি হইতেছিল, এই স্থলে তাহার আলোচনা করিয়া দেখা সুসঙ্গত হইবে। মহীপালের রাজ্যপ্রাপ্তির সম-সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দের শেষে, এবং একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, উত্তর-পশ্চিম ভারতে বিপুল পরিবর্ত্তন চলিতেছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ৯১৬ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্র-কূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্র কান্যকুব্জরাজ মহীপাল-প্রতীহারকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়া কান্যকুব্জ অধিকার করেন। জেজাকভুক্তিরাজ হর্ষ চন্দেল্লর সহায়তা-গ্রহণে মহীপাল-প্রতীহার হৃত রাজধানীর পুনরুদ্ধারে সমর্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু প্রতীহার-রাজশক্তি রাষ্ট্রকূটের হস্তে যে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা হইতে আর কখনই আপনাকে সম্পূর্ণরূপে সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই। এই কারণেই গৌড়াধিপ দ্বিতীয় গোপাল মগধরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইতে পারিয়াছিলেন, এবং পরবর্ত্তী কালে চন্দেল্ল রাজশক্তি প্রতীহার রাজশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছিল। ইহার পর স্বাভাবিক কারণেই চন্দেল্লগণের সহিত বাঙ্গালার পালরাজগণের বিরোধ ঘটিল; এবং আমরা প্রাচীন চন্দ (চন্দেল্ল) রাজধানী খজুরাহোতে প্রাপ্ত দুইখানি শিলালিপিতে চন্দেল্লগণের সহিত বিহার ও বাঙ্গালার মহা সামন্তগণের যুদ্ধের উল্লেখ দেখিতে পাই। ৯৫৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম শিলালিপিখানিতে, হর্ষের উত্তরাধিকারী যশোবর্ম্মা চন্দেল্ল লতা-সদৃশ গৌড়গণের ছেদনক্ষম অসি-রূপে, এবং মৈথিলগণের শক্তি-শিথিলকারীরূপে বর্ণিত হইয়াছেন; এবং ১০০২ খৃষ্টাব্দের অপর শিলালিপিতে, যশোবর্ম্মার উত্তরাধিকারী ধঙ্গদেব কর্ত্তৃক রাঢ়ের ও অঙ্গের রাজমহিষীগণের, এবং কাঞ্চীর রাজমহিষীর ধৃত হইবার গর্ব্বোদ্ধত উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কাঞ্চী-রাজমহিষী কোনও পল্লবরাজের, অথবা চোলরাজের পত্নী হইতে পারেন।

এই দুইখানি শিলালিপি গৌড়ীয় লিপিকর কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছিল, ইহা কৌতূহলের বিষয়। যেরূপ সতর্কতা অবলম্বনে এই শ্রেণীর প্রমাণ গ্রহণ করিতে

হয়, তাহাতে, যশোবর্ম্ম-পরিচালিত চন্দেল্লগণের সহিত গৌড়ের, এবং যশোবর্ম্মর উত্তরাধিকারী ধঙ্গদেবের সহিত রাঢ়ের ও অঙ্গের মহারাজগণের যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল, লিপিপ্রমাণে ইহার অধিক প্রমাণিত হইতেছে বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। চন্দেল্লগণ কর্ত্তৃক বাঙ্গালার অথবা বিহারের কোনও অংশ স্থায়িভাবে বিজিত হইবার কোনও প্রমাণই নাই।

দশম শতাব্দের শেষভাগে, কান্যকুব্জের প্রতীহার রাজগণ কার্য্যতঃ জেজাকভুক্তির চন্দেল্লরাজগণের অধীন-মিত্ররাজা হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কচ্ছপঘাত (কচ্ছহওয়া)-বংশীয় মহাসামন্ত বজ্রদামন কান্যকুব্জের প্রতীহার-রাজকে পরাভূত করিয়া গোপাদ্রি বা গোয়ালিয়র দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। এই বজ্রদামন তত্রত্য একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, তিনিও চন্দেল্লরাজের মিত্রশক্তি হইয়াছিলেন। দশম শতাব্দের শেষ দিকে, চন্দেল্লরাজগণের ও তাঁহাদের করদ নৃপতির ও মিত্রশক্তির সহিত, উত্তরাগত মুসলমান আক্রমণকারিগণের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। গজনী-অধিপতি সবুক-তাগীনের গতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে বঙ্গ চন্দেল্ল কান্যকুব্জের প্রতীহার-রাজ রাজ্যপালের সহিত পঞ্চনদ প্রদেশের ভাতিন্দা রাজ্যাধীশ্বর জয়পাল-প্রবর্ত্তিত শক্তিসঙ্ঘে যোগদান করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা ৯৯০ খৃষ্টাব্দের সম-সময়ে কুরম উপত্যকার নিকটে সবুক-তাগীন কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। ১০১৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সবুক-তাগীনের উত্তরাধিকারী সুপ্রসিদ্ধ সুলতান মামুদ কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ সহসা অধিকৃত ও লুণ্ঠিত হইয়াছিল; রাজ্যপাল তাহাতে বিশেষ বাধা প্রদান করেন নাই। রাজ্যপাল তখন নগরকুল পরিত্যাগ করিয়া, গঙ্গার অপর পারে বারিতে চলিয়া গিয়াছিলেন। সুলতান মামুদের নিকট রাজ্যপালের এই অধীনতা-স্বীকার বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য বলিয়া চন্দেল্লরাজ কর্ত্তৃক বিবেচিত হইয়াছিল, এবং সেই বৎসরেই বঙ্গের উত্তরাধিকারী চন্দেল্লরাজ গণ্ডের ভাবী উত্তরাধিকারী বিদ্যাধর, প্রতীহার-রাজ রাজ্যপালকে আক্রমণ করিয়া নিহত করিয়াছিলেন।

যে বিপুল গুর্জ্জর-প্রতীহার-সাম্রাজ্য দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙ্গালার পালরাজগণের সহিত উত্তর-ভারতের সার্ব্বভৌম-রাজশক্তি লইয়া বিরোধ করিয়া আসিয়াছিল, তাহার এইরূপ অভাবনীয় পরিণাম ঘটিল। ১০১৯ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে, সুলতান মামুদ চন্দেল্লরাজকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার বিরুদ্ধে এক অভিযান লইয়া অগ্রসর হইলেন, এবং ১০২০ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে তিনি বারি অধিকার করিলেন, এবং তৎপরে চন্দেল্লরাজ্য আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিলেন। ১০২৩ খৃষ্টাব্দে

সুলতান মামুদ চন্দেল্লদিগের প্রবীণ কালঞ্জর দুর্গ অধিকার করিলেন, কিন্তু উহা অধিক কাল আপন অধিকারে রক্ষা করিলেন না।

মুসলমান আক্রমণকারীর গতিরোধের নিমিত্ত গৌড়াধিপ মহীপাল উত্তরাপথের হিন্দু রাজন্য-সঙ্ঘের সহিত যোগদান করেন নাই বলিয়া রমাপ্রসাদ চন্দ আক্ষেপ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, মহীপাল সেই সঙ্ঘে যোগদান করিলে হয় ত ভারত-ইতিহাস অন্যরূপ আকার ধারণ করিত। রমাপ্রসাদ বাবু অনুমান করিয়াছেন,—কাম্বোজগণের কবল হইতে বরেন্দ্র উদ্ধার করিয়া, মহীপাল যুদ্ধ-বিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া, অশোকের ন্যায় ধর্ম্মকর্ম্মে এবং পরহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। উত্তরাপথের হিন্দু রাজন্য-সঙ্ঘের সহিত যোগদান না করাই মহীপালের পক্ষে স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। চন্দেল্লগণের ও প্রতীহারগণের সহিত সঙ্ঘবদ্ধ হইলে, তাহার বংশপরম্পরাগত শত্রুদেরই সাহায্য করা হইত; এতদ্ব্যতীত ইহাও মনে রাখিতে হইবে,—মহীপাল হিন্দু ছিলেন না, বৌদ্ধ ছিলেন। সম্ভবতঃ সবুক-তাগীনের এবং সুলতান মামুদের চন্দেল্ল ও প্রতীহার-রাজগণের উপর আক্রমণ, মহীপালের রাজ-শক্তি বিস্তৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষে মহলপরিমাণে সহায়তা করিয়াছিল।

মহীপাল ও মগধ।

মহীপালের রাজ্যারম্ভে, নালন্দার মহাবিহার নহ, অন্ততঃ মগধের একাংশ যে তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল, তদ্বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার, তাঁহার রাজ্যকালের ষষ্ঠবর্ষে লিখিত একখানি পুঁথি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া, বুদ্ধগয়ার একটি বুদ্ধ শ্রীমূর্ত্তিতে মহীপালের রাজ্যকালের একাদশ বর্ষ সংবলিত একটি শাসননিপি ক্ষোদিত আছে; এবং নালন্দা মহাবিহারের ভগ্নাবশিষ্টের মধ্যে প্রাপ্ত একখানি পাষাণরচিত দ্বারফলকে উৎকীর্ণ লেখগর্ভে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে,—নালন্দার সুবৃহৎ মন্দির ভস্মীভূত হইয়া যাইবার পর বলাদিত্য নামক জনৈক ব্যক্তি কর্ত্তৃক মহীপালদেবের রাজ্যকালের একাদশ বর্ষে উহা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

নালন্দা এবং বুদ্ধগয়া যে গৌড়াধিপতি দ্বিতীয় গোপালের অধিকারভুক্ত ছিল, সে বিষয় পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। মগধরাজ্য কান্যকুব্জের প্রতীহার-রাজ কর্ত্তৃক সাময়িক ভাবে স্বাধিকারভুক্ত হইলেও, কান্যকুব্জের মহীপাল যখন রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্র কর্ত্তৃক পরাভূত হন, দ্বিতীয় গোপাল কর্ত্তৃক সেই সময়ে মগধের পুনরুদ্ধার সংসাধিত হইবার সম্ভাবনা দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ

এরূপও বলিতে চাহেন যে,—দ্বিতীয় গোপাল কর্ত্তৃক মগধের পুনরধিকার অস্থায়ী হইয়া থাকিবে, এবং যশোবর্ম্মা চন্দেল্লর সাহায্যে হয় ত মহীপাল প্রতীহার তৎপ্রদেশ পুনর্ব্বার অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ অনুমান করিবার কোনও বিশিষ্ট হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না; পরন্তু, দ্বিতীয় গোপালের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় বিগ্রহপালের এবং মহীপালের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত মগধ যে বরাবর গৌড়রাজ্যের অভিভুক্ত ছিল না, এরূপ অনুমান করিবারও কোনও কারণ নাই।

মজঃফরপুর জেলায় ইমাদপুর গ্রামের নিকট কতকগুলি ধাতুমূর্ত্তির উৎকীর্ণ লেখ হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহীপালের রাজ্যকালের অষ্টচত্বারিংশৎ বর্ষে উহাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, এবং মহীপাল যে ত্রিহুতের কতক অংশে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন, ঐ সকল উৎকীর্ণ লেখমালা হইতে তাহার নিশ্চিত জ্ঞান না হইলেও, তৎসম্বন্ধে অনুমান করা যাইতে পারে। এরূপ হওয়াও অসম্ভব নহে যে, ঐ মূর্ত্তিগুলি অন্য কোনও স্থান হইতে ইমাদপুরে আনীত হইয়া থাকিবে। গৌড়ের পালনৃপতিগণ কর্ত্তৃক ত্রিহুতের উল্লেখ নারায়ণপালের ভাগলপুর তাম্রশাসনে আছে;—তাহার সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি।

বারাণসীর সন্নিকটে সারনাথের ভগ্নাবশিষ্টের মধ্যে ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত একটি বুদ্ধ-মূর্ত্তির পাদপীঠে ১০২৬ খৃষ্টাব্দের লিখিত একখানি শিলালিপিতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে,—গৌড়াধিপ মহীপালের রাজত্বকালে, স্থিরপাল এবং বসন্তপাল নামক দুই সহোদর সারনাথের ধর্ম্মরাজিকা ও ধর্ম্মচক্রের জীর্ণ-সংস্কার করেন, এবং অষ্টমহাস্থান-যুক্ত একটি অভিনব শৈলগন্ধকুটি নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ইহা হইতে অনুমান হয়,—স্থিরপাল এবং বসন্তপাল, মহীপালের অনুজ্ঞানুসারেই কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং কেহ কেহ আন্দাজে ইহাও ধরিয়া লইয়াছেন যে,—তাঁহারা পরস্পরের আত্মীয় ছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ দৃষ্ট হয় না।

মহীপাল ও বারাণসী।

বৌদ্ধসাহিত্যে স্তূপের সাধারণ নাম ধর্ম্মরাজিকা। পাদপীঠলিপি সারনাথের কোন্ স্তূপের উল্লেখ করিয়াছে, তাহার নিশ্চয় নাই; তবে, কিম্বদন্তী অনুসারে বুদ্ধদেব যে স্থানে তাঁহার প্রথম ধর্ম্মোপদেশ প্রচার করেন, তাহারই সান্নিধ্যে সম্রাট অশোকের নির্ম্মিত প্রধান স্তূপের বিষয়ই উল্লিখিত হইয়া থাকিবে বলিয়া মনে হয়। বারাণসীর জগৎগঞ্জ মহল্লার নির্ম্মাণ কার্য্যের উপাদান-সংগ্রহের নিমিত্ত কাশীনরেশ মহারাজ চৈতসিংহের দেওয়ান জগৎসিংহ

১০৯০ খৃষ্টাব্দে শুভঙ্কর অবস্থান করেন, এবং তাঁহারই মতে, উহা তথাগতদেবের কর্ণ বলিয়াই পরিচিত হইয়া আসিতেছে। বুদ্ধের নামে পরিচিত সারনাথের বিপুল বৌদ্ধ বিহারের সাধারণ নাম ধর্ম্মচক্র। অষ্টমহাস্থান হয় ত বুদ্ধদেবের জীবনের আটটি প্রধান ব্যাপারের সংঘটনক্ষেত্র, এবং বৌদ্ধগণের তীর্থস্থান।

বারাণসী যে মহীপালের রাজ্যাধিকারের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, তাহাও এই শিলালিপি হইতেই অনুমিত হয়; এবং চন্দ্রের ও প্রতীহার রাজশক্তির দুর্ব্বলতার সুযোগে যে মহীপাল বারাণসী ও মিথিলা পর্য্যন্ত আপনার পূর্ব্বতন প্রসারিত করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমানও অসঙ্গত নহে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালে যে হস্তলিখিত রামায়ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে যে, উহা তীরভুক্তির অধীশ্বর গৌড়-বঙ্গ সোমবংশীয় মহারাজাধিরাজ গাঙ্গেয়দেবের সময়ে ১০১৯ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল।—ইহাতে অবশ্য পূর্ব্বোল্লিখিত অনুমানকে দুর্ব্বল করিয়া দেয়। কিন্তু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেন,—এই গাঙ্গেয়, চেদীবংশীয় সুপ্রসিদ্ধ কর্ণের পিতা কলচুরিরাজ গাঙ্গেয়; এবং ১০১৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই এই গাঙ্গেয় মহীপালের নিকট হইতে তীরভুক্তি অথবা মিথিলা কাড়িয়া লইয়াছিলেন; মিথিলা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই বারাণসী তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল; এবং সারনাথের যে শিলাশাসনের একমাত্র উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহার লিপিকার্য্য, মহীপালের আজ্ঞানুযায়ী সংস্কারাদি সম্পন্ন হইবার অন্যূন ছয় বৎসর পরে সম্পাদিত হইয়াছিল।

কলচুরি বা হৈহয়বংশীয় নৃপতি কোক্কল্ল কর্ত্তৃক খৃষ্টীয় নবম শতাব্দের শেষ-ভাগে চেদী-রাজ্য ও তাহার রাজধানী ত্রিপুরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বর্ত্তমান মধ্যপ্রদেশের কতক অংশ লইয়াই এই চেদীরাজ্য গঠিত ছিল, এবং জব্বলপুরের নিকটে বর্ত্তমান তেবরেই রাজধানী ত্রিপুরী অবস্থিত ছিল। কোক্কল্ল হইতে আরম্ভ করিয়া গৌড়াধিপ প্রথম মহীপালের উত্তরাধিকারী নয়-পালের সমসাময়িক কর্ণের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত, এই রাজবংশের বিশেষ তথ্য আমরা অবগত নহি। গৌড়াধিপ প্রথম মহীপালের ১০৪২ খৃষ্টাব্দের একখানি তাম্রশাসন বারাণসীতে পাওয়া গিয়াছে। আমার দ্বিতীয় প্রবন্ধেও ইহার উল্লেখ করিয়াছি—কিন্তু লক্ষ্ণৌ উহা তেবরে প্রাপ্ত বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। এই তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়,—কোক্কল্ল ভোজকভুক্তির অর্থ চন্দ্রের সন্ধিবিগ্রহিক মিত্র ছিলেন। তাহার পর, গৌড়ের প্রথম বিগ্রহপাল বা সুরপাল যে কলচুরি-

বাল্যকালে যে-রাজদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও আমরা অবগত আছি; এবং শাসনাদি হইতে ইহাও অবগত হইয়াছি যে,—রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণ কোকল্লের দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; দ্বিতীয় কৃষ্ণের পুত্র জগত্তুঙ্গ কোকল্লের দুইটি পৌত্রীর সহিত পরিণীত হইয়াছিলেন; এবং জগত্তুঙ্গের পুত্র যে সুপ্রসিদ্ধ রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্র প্রতীহার-রাজ প্রথম মহীপালকে পরাভূত করিয়া কান্যকুব্জ অধিকার করেন, তিনি কোকল্লের একটি প্রপৌত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব, দশম শতাব্দের প্রথম ভাগে, গৌড়ের পাল-নৃপতিগণের এবং দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট-নৃপতিগণের ন্যায় পরাক্রমশালী রাজবংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধস্থাপনের উপযুক্ত পদমর্য্যাদা যে চেদীর কলচুরি রাজবংশের বর্ত্তমান ছিল, তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে। আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে, কলচুরিগণ প্রথমতঃ চন্দেল্লগণের সহিত সন্ধিবদ্ধ হইয়াছিলেন কিন্তু উপরি-উল্লিখিত বৈবাহিক সম্পর্ক হইতে অনুমান হয় যে, তাঁহারা পরে রাষ্ট্রকূটরাজের সহিত ও রাষ্ট্রকূটের সন্ধিবদ্ধ মিত্র ও চন্দেল্ল-প্রতীহার-রাজগণের চিরশত্রু গৌড়ের পাল-রাজের সহিত মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

বারাণসী যে কর্ণের অধিকারভুক্ত ছিল, বারাণসীতে প্রাপ্ত কলচুরিরাজ কর্ণের ১০৪২ খৃষ্টাব্দের তাম্রশাসন হইতে তাহার কিঞ্চিৎ সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়;—কিন্তু তাহা নিঃসংশয় প্রমাণ নহে। এতৎসম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোনও নিশ্চয় প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। ক্রমশঃ।

শ্রীবিনয়াচরণ মৈত্রেয়।

আলোচনা।

রবীন্দ্র-সংবাদ।*

"রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গ" আমরা পড়িয়াছি, এবং হাসিয়াছি। এমন হাস্যরসাত্মক (?) গ্রন্থ অনেক দিন পড়ি নাই, সেই জন্য ইহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বোধ করি। যাঁহারা রবি বাবুকে "রবি" ভাবেন, তাঁহারা তাঁহার কথাগুলি ঋষিবাক্য ভাবিতে পারেন।

* * * *

* 'রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গ' 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকায় ১৩২৩ সালের ফাল্গুন-সংখ্যা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। নানা কারণে এতদিন ইহার পরিচয় দিতে পারি নাই। 'রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গে' সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র হইতে 'সাহিত্যাচার্য্য' চন্দ্রশেখর পর্য্যন্ত অনেকের প্রতি রবিবাবু অভিযোগ করিয়াছেন, তাহা দেখানই এই আলোচনার উদ্দেশ্য।—লেখক।

রবিবাবু বলিয়াছেন, 'হাঁ, ঐ রেভ্যু, আমি তখনই তাহা করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না যে 'উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম' বঙ্কিমবাবু কেন ভাল বলিতেন। কিন্তু এটা ঠিক যে, তিনি ঐ উচ্ছ্বাস-গুলিকে খুব পছন্দ করিতেন। চন্দ্রশেখর বাবুও ইদানীং আমায় বলিতেন যে, তাঁহার ও লেখাটা ভাল হয় নাই, ওটার ভিতর বিশেষ কিছুই নাই।'—ইহাতে রবিবাবু এক ঢিলে দুই পাখি মারিয়াছেন। বঙ্কিমবাবুর রসবোধ ছিল না, তাহা দেখাইবার জন্য তিনি উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেমের লেখককেই সাব্যস্তের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে উদ্‌ভ্রান্তপ্রেমের অসারত্ব বিষয়ে সন্দিহান হইবার কোনও কারণই কেহ দেখাইতে পারিবেন না!

কিন্তু আমরা চন্দ্রশেখর বাবুকে 'রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গ' দেখাইয়াছি।

চন্দ্রশেখর বাবু বলিলেন, 'উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম-সম্বন্ধে রবিবাবুর সঙ্গে আমার কখনও কোনও কথা হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গের এতদ্‌বিষয়ের কথাগুলি সর্ব্বৈব মিথ্যা। নিজের সুখ-দুঃখের কথা সাধারণে প্রকাশ না করিলেই ভাল হয়, এমন কথা অন্য তাঁহারও তাঁহারও কাছে শুনিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয়, কিন্তু আমার কোনও রচনা বা পুস্তকের Literary merit সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা আমি কখনও তাঁহারও সহিত করি নাই।'

বলিয়া রাখা ভাল, চন্দ্রশেখর বাবু তামাতুলসী-গঙ্গাজল হাতে না লইয়াই কথাগুলি বলিয়াছেন; সুতরাং কে সত্যবাদী, কে মিথ্যাবাদী—সে মীমাংসা আমরা করিব না। তবে দেখা যাইতেছে, রবিবাবুর এই উক্তি ১৩১৮ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র গত মাঘ-সংখ্যার বিজ্ঞাপনে দেখা যায়, রবিবাবু ইহা পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ইতোমধ্যে চন্দ্রশেখর বাবুর পরলোকপ্রাপ্তি হইলে কোনও গোলই থাকিত না, এই নীরস আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকেও সময়ের অপব্যবহার করিতে হইত না।

যাহা বিজ্ঞাপনেই যে পুস্তকের অনেকগুলি সংস্করণ বাহির হইয়াছে, তাহার Literary merit আমরা বিচার করিব না। তবে বঙ্কিমবাবু ইহার উচ্ছ্বাসগুলি খুব পছন্দ করিতেন বলিয়াই উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম ভাল বলিতেন, বলিলে, বঙ্কিম-প্রতিভার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়। মার্শম্যান-বক্তৃতা-প্রণেতা শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের New Essays in Criticism পুস্তকখানি পড়িলেই বুঝা যায়, উদ্‌ভ্রান্তপ্রেমে 'উচ্ছ্বাস' ছাড়া আরও এমন অনেক জিনিস আছে, যাহার জন্যই সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের কেন, সাহিত্যসেবিমাত্রেরই ইহা আদরের বস্তু হইয়াছে। সাধারণের অবগতির জন্য আমরা ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম-সম্বন্ধীয় উক্তির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। শীল মহাশয়ের মূল প্রবন্ধখানি পাঠ করিলে উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম সম্বন্ধে আরও অনেক কথা জানিতে পারা যাইবে। শীল মহাশয় বলিয়াছেন—

The first remarkable product of Bengali literature of the Neo-romantic type, would fill a remarkable place in the full sense of the term in the history of any literature, Western or Eastern. The *Udbhranta Prema* of Babu Chandra Sekhar Mukherji, a prose rhapsody, suggests by its very title that curse of doubt and despair, that blight of disillusion and disenchantment, that eats into the very vitals of the

Neo-romantic life and consciousness. If, omitting the direct romantic revival that had preceded in the Gotz Von Berlichingen, and other works, Goethe's Werther may be regarded as the prototype of the Neo-romantic School, the leader of the forlorn hope, the *Udbhranta Prema* may, with equal truth, be assigned a similar position in relation to that movement in Bengali literature. * * * The magic of the *Udbhranta Prema* lies in its emotional transfiguration. * * * The *Udbhranta Prema* eschews realism and socialism altogether. * * * The *Udbhranta Prema* is one of the best examples in literature of the compound style, a style which employs, as its unit, starry clusters of Associated images and feelings, "trailing clouds of glory", as they come, or rich trains of harmonious suggestion, with their many coloured fountain-play and evanescent rainbow hues. * * *

তাহার পর বিপিনবিহারী বাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 'আপনার বঙ্গদর্শনে চন্দ্রশেখর বাবু ত সমালোচক ছিলেন।' রবিবাবু বলিয়াছেন, 'হাঁ। সমালোচনা করিতে আমি একেবারেই রাজি ছিলাম না। শৈলেশ যখন সমালোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করিল, আমি বলিলাম, "আমি সমালোচনা করিব না; যদি সমালোচনা প্রকাশ করা আবশ্যক বিবেচনা কর, তাহা হইলে তুমি আলাদা লোক ঠিক কর, তাঁহার স্বাক্ষর দিয়া সমালোচনা প্রকাশিত হইবে।" শৈলেশের প্রস্তাবে চন্দ্রশেখর বাবু রাজি হইয়াছিলেন।'

যে কথার উত্তরে হাঁ বা না বলিলেই চলিত, তাহাতে রবিবাবু এত কথা বলিয়াছেন কেন, বুঝিলাম না। বেশী কথা বলার বেশী দোষ কি, বলিতেছি।

"তুমি আলাদা লোক ঠিক কর, তাঁহার স্বাক্ষর দিয়া সমালোচনা প্রকাশিত হইবে।" ইহাতে স্বাক্ষর শব্দটির দিকে লক্ষ্য করিলে দুইটি অর্থ পাওয়া যায়।

(১) রবিবাবু সমালোচনা করিবেন, কিন্তু তাহা আলাদা লোকের নাম দিয়া প্রকাশিত হইবে।

(২) রবিবাবু সমালোচনা করিবেন না; যিনি সমালোচনা করিবেন, তিনি নাম গোপন করিতে পাইবেন না।

কিন্তু এখানে প্রথম অর্থটি খাটে না। কারণ, রবিবাবু ত পূর্ব্বেই সমালোচনা করিতে অসম্মত হইয়াছেন। দ্বিতীয় অর্থটি বঙ্কিম-যুগের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবী চন্দ্রশেখর বাবুর পক্ষে কলঙ্কের কথা। সমালোচনার নীচে নামপ্রকাশে কুণ্ঠাবোধ করেন কোন্ শ্রেণীর লেখক? যাঁহারা নিজে ত্রুটীর বোঝা বহেন, অথচ সমালোচনায় হাতী-ঘোড়া মারিতে চাহেন, কল্পিত নাম গ্রহণ করিতে সেই শ্রেণীর লেখকই বাধ্য হন। নিজের শক্তিতে যাঁহার আস্থা নাই, অথচ হাম-বড়া হইবার সাধ বেজায়, সেই রকমের লেখকই সাধারণতঃ নাম গোপন করিবার জন্য ব্যস্ত হন। যে চন্দ্রশেখরের প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করিতে পারিলে এ যুগের অনেক গ্রন্থকার কৃতার্থ হন, এবং বাজারে তাঁহাদের পুস্তকের যথেষ্ট কাটতি হয়, সেই নির্ভীক ও নিরপেক্ষ চন্দ্রশেখর কি এই শ্রেণীর সমালোচক?

শৈলেশ বাবু চন্দ্রশেখর বাবুকে বঙ্গদর্শনের সমালোচক নির্ব্বাচিত করিবার পূর্ব্বে ভাবী সমালোচক সম্বন্ধে রবিবাবু এইরূপ মত প্রকাশ করিতে পারিতেন, করিয়াও ছিলেন,—তাহাতে দোষ দৌষ নাই। কিন্তু চন্দ্রশেখরবাবুকে সমালোচক পাইয়া বঙ্গদর্শন গৌরবান্বিত হইয়াছিল কি না, তাহা স্মরণ করিলে মহাভারত অশুদ্ধ হইত কি?

যিনি কলম ধরিয়াই অমর কবি মধুসূদনের অক্ষয় কীর্ত্তি লোপ করিবার প্রয়াসী হইয়াছিলেন, যিনি চষা মাঠের উপর দিয়া পাল্কী চড়িয়া যাইবার সময় 'রাজসিংহ' পড়িয়াই সমালোচনা করিয়াছিলেন, যিনি 'কৃষ্ণচরিত্র'-ও আরও কত কি পুস্তকের সমালোচনা করিয়া মক্ষিকাবৃত্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন, আমাদের সেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনের সম্পাদক হইয়া—বঙ্কিমচন্দ্রের গদীতে বসিয়া,—সমালোচনা করিতে রাজি হন নাই কেন? পরে ১৩১৮ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ যে রবীন্দ্র মুখে মুখে বঙ্কিম বাবুর 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'র সমালোচনা করিয়াছেন, আরও কত লোকের সম্বন্ধে কত কথা বলিয়াছেন, সেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনে সমালোচনার ভার লন নাই। বঙ্গদর্শন-সম্পাদনকালে রবিবাবুর এই বৈরাগ্যব্রতের কারণ কি? কে এই রহস্যদ্বার উদ্ঘাটিত করিবে? *

* * * *

'রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গে' আরও অনেক কথা আছে।—শাস্ত্র সম্বন্ধে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে, সাহিত্য সম্বন্ধে—সকল রকমের তথ্যই আছে। কুচবিহারের মহারাণী ভূতের গল্প শুনিতে ভালবাসেন, তাহাও ইহাতে আছে।

* * * *

প্রথমেই তাঁহার 'অচলায়তনে'র কথা। রবিবাবু বিপিনবিহারী বাবুকে বলিয়াছেন, "আমার সমালোচকেরা গায়ত্রীমন্ত্র জপ করেন কি না জানি না, কিন্তু আমি আমার পিতৃদেবের নিকট যে গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলাম, সেই মন্ত্রসাধনে আমি কত দূর উপকৃত হইয়াছি তাহা আপনাকে কি বলিব।"

(১) রবিবাবুর সমালোচকেরা গায়ত্রীমন্ত্র জপ করেন কি না, তাহা রবিবাবু জানেন না বলিয়াই এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে, তাঁহারা গায়ত্রীমন্ত্র জপ করেন না!

(২) রবিবাবু তাঁহার পিতৃদেবের নিকট যে গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, সেই মন্ত্রসাধনে তিনি কত দূর উপকৃত হইয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করিতে তিনি সঙ্কোচবোধ করিলেও, সমালোচক সঙ্কোচ বোধ করিবে না।

কতকগুলি গল্প বা কবিতা লেখা বা গান রচনা করা বা নোবেল প্রাইজ পাওয়া যদি গায়ত্রীমন্ত্র-সাধনের ফল হয়, তবে এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই। আর যদি গায়ত্রী-মন্ত্র-সাধনের ফলে আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভের সম্ভাবনা থাকে, তবেই ত সমস্যার উৎপত্তি হয়। এই সমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত হইবার যোগ্যতা আমাদের নাই।

* * * *

* 'বঙ্গদর্শনে'র পাঠকবর্গ জানেন, রবিবাবু 'বঙ্গদর্শনে' সমালোচনার ভার না লইলেও, দুই একবার সমালোচনা করিয়াছিলেন।—লেখক।

রবিবাবু শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের কথা তুলিয়া বলিয়াছেন, "ধর্ম্মের একটা অবস্থা আসে, যখন সাধারণ লোকের বিশ্বাসগুলি আর স্বাভাবিক থাকে না, যখন সেগুলিকে জোর করিয়া তর্কে ও যুক্তিতে খাড়া করিতে চেষ্টা করা হয়, তখন মানুষ কতকটা জাগ্রত হইয়াছে, কতকটা বুঝিতে পারিয়াছে যে প্রাণহীন আচার-ব্যবহারের উপর যে আঘাত আসিয়া পড়িয়াছে, সেই আঘাত হইতে তাহাকে বাঁচাইতে হইলে যুক্তি-তর্কের আবশ্যক. তখন বুঝিতে হইবে সেই সকল মন্ত্রতন্ত্র, আচার-ব্যবহার, অনুষ্ঠানের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। সকল দেশেই ইতিহাসে এইটি প্রত্যক্ষ করা যায়।"

"ধর্ম্মের একটা অবস্থা আসে, যখন সাধারণ লোকের বিশ্বাসগুলি আর স্বাভাবিক থাকে না।"—কথাটা কেমন, বুঝিলাম না। ধর্ম্ম কি একটা মানুষ, না, পার্থিব কোনও জিনিস যে তাহা এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় আসিতে পারে? একধর্ম্মাবলম্বী সাধারণ লোকের ধর্ম্মবিশ্বাস স্বাভাবিক না থাকিলে অর্থাৎ শিথিল হইলে, তাহাদের ধর্ম্মভাব অবশ্যই পাকা হইতে পারে,—আমরা ইহাই জানি। ধর্ম্ম অবিনশ্বর, ধর্ম্মের আদর্শ চিরকালই এক,—সেই সত্যযুগে যাহা ছিল, এখন এই কলিযুগেও তাহাই আছে। ধর্ম্মপালনে অনাস্থা জন্মিলে ধর্ম্মের অধোগতি হয়, আর সূর্য্য পূর্ব্বে উঠিয়া পশ্চিমে অস্ত যায়!—একই কথা। কতকগুলি আচার-নিয়মকে ধর্ম্ম ভাবিয়া ধর্ম্মের রূপ ও গতি নির্ণয় করিয়া সম্প্রদায়ভেদে ধর্ম্মকে ভাগাভাগি করা মানুষের স্বভাব। দোষ দিতে হয়, সে দোষ মানুষের, ধর্ম্মের নহে।

রবিবাবুর অন্যান্য কথাও থাপছাড়া। তিনি যে সকল আচার-ব্যবহারকে প্রাণহীন ভাবেন, বাস্তবিকই তাহা প্রাণহীন বটে কি না, ভাবিয়া দেখা উচিত। একটা জাতির মন্ত্র-তন্ত্রের, আচার-ব্যবহারের ও অনুষ্ঠানের দিন যতদিন পর্য্যন্ত না ফুরায়, ততদিন তাহা প্রাণহীন হয় না, এই সহজ কথাটাও তিনি বুঝেন না। কোনও পতনোন্মুখ সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য যুক্তি-তর্ক আবশ্যক হয়, আবার নবগঠিত সমাজের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যও যুক্তি-তর্ক আবশ্যক হয়। ব্রাহ্মসমাজের নেতারা বিবিধ যুক্তি ও তর্কের অবতারণা করিয়া নিজের সমাজকে পুষ্ট করিতেছেন দেখিয়া কেহ কি বলিতে পারেন, ব্রাহ্মদের আচার-ব্যবহার ও অনুষ্ঠানের দিন ফুরাইয়া আসিতেছে? সকল দেশের ইতিহাস পড়িলে মানুষের মনে কিরূপ চিন্তার উদয় হয়, জানি না; ভারতবর্ষের ইতিহাসেরই সকল কথা আমাদের জানা নাই, যেটুকু জানি, তাহাতে মনে হয়, এক সমাজের কতকগুলা লোক অপথে পথ করিয়া লইতে ব্যস্ত হইলে তাহাদিগকে যুক্তি ও তর্কের দ্বারা আসল পথটি দেখাইয়া দেওয়া উচিত। যুক্তি ও তর্কের দ্বারা বিপথগামী সকলকেই ফিরাইতে পারা যায় না, কিন্তু দশ জনের মধ্যে এক জনকে ফিরাইতে পারিলেও বুঝা যায়, সমাজের হিতের জন্যই যুক্তি ও তর্ক আবশ্যক।

আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে যাঁহারা আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, এখন তাঁহাদেরই দুই এক জনকে আমরা ফিরিয়া পাইয়াছি। যাঁহারা এক দিন হিন্দুর আচার-নিয়মকে হয় ত প্রাণহীন ভাবিয়াই হিন্দুসমাজের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই কেহ কেহ ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া হিন্দুরই আচার-নিয়ম শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া হিন্দুসমাজে অনুষ্ঠিত আচার নিয়মে চলিতেছেন। ইহাতে কি বুঝিব—হিন্দুর মন্ত্রতন্ত্র, আচার-ব্যবহার ও অনুষ্ঠান প্রাণহীন?

* * * *

তাহার পর রবিবাবু চন্দ্রনাথ বাবুর সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "চন্দ্রনাথ বাবু অনেক লিখিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছুই রহিল না, তাঁহার লেখার মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা দিনকতকের জন্যও টিকিতে পারে।"

রবিবাবু ব্যতীত অন্য কেহ চন্দ্রনাথ বাবুকে এইরূপ সার্টিফিকেট দিয়াছেন কি না, জানি না। রবিবাবুর যাহা ভাল না লাগে, তাহা টিকিয়া নাই, এইরূপ ধারণা রবিবাবুর পক্ষেই সম্ভব।

"চন্দ্রনাথবাবুর 'শকুন্তলাতত্ত্ব' সমালোচনা-হিসাবে অসার।"—ইহাও রবিবাবু বলিয়াছেন।

কিন্তু চন্দ্রনাথ বাবুর রচনা-সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় শীল মহাশয় তাঁহার New Essays in Criticism গ্রন্থে বলিয়াছেন—

It is refreshing to turn to Babu Chandranath Bose's secret of Sákuntala and his essays on love, religion, marriage, and cognate subjects. Here * * * in the best style of art-criticism, following in the wake of Friedrich Schlegel, the profound interpreter of the grand old masters of romantic art and a distinguished leader of the fourth European movement of romantic revival, our author lights up with a fine moral and spiritual significance the conventional structure and characters of the Hindu drama.

"রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গে" চন্দ্রনাথবাবুর সম্বন্ধে আরও একটি কথা আছে। এক দিন চন্দ্রনাথবাবু রবিবাবুকে লিখিয়াছিলেন, "তুমি হিন্দুর ছেলে, ও রকম লেখো কেন?" রবিবাবু উত্তর দিয়াছিলেন, 'হিন্দুত্ব সম্বন্ধে আপনার মত লইতে প্রস্তুত নহি।"

এই অবিনয়ের দৃষ্টান্তটি চাপিলে চলিত না কি?

* * * *

তাহার পর বঙ্কিমচন্দ্রের কথা।

রবিবাবু বলিয়াছেন, "তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) যেখানে মানুষের সমষ্টি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন, সেইখানেই সমস্তটা একটা পিণ্ডবৎ তাল পাকাইয়া গিয়াছে, কোনও ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার চেষ্টা আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না।"

রবিবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় ত্রুটী দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন বলিয়া আমরা বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ হই নাই। আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের গুণের পক্ষপাতী হইলেও, তাঁহার রচনায় যে দোষ আছে, তাহাও দেখিতে চাহি। আনন্দমঠে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য নাই বলিয়াই রবিবাবুর তাহা ভাল না লাগিতে পারে; কিন্তু দেখিতে হইবে, ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য দিবার মানসেই কি বঙ্কিমবাবু আনন্দমঠ লিখিয়াছিলেন? বেলতলায় আম পাওয়া যায় না, এই সরল সত্যটুকুও রবিবাবুর জানা নাই। আনন্দমঠে যে উন্নত আদর্শ ও একপ্রাণতার পরিচয় পাওয়া যায়, রবিবাবুর কোনও উপন্যাসে তাহা পাওয়া যায় কি? বিষবৃক্ষের শেষই বিষবৃক্ষ, আনন্দমঠের গোড়াই আনন্দমঠ। রবিবাবু সে দিকে লক্ষ্য করেন নাই। তিনি আনন্দমঠের পূর্ব্বসূচনার দিকে—'আনন্দ'-গঠনের দিকে—লক্ষ্য করিয়াছেন, বিষয় বা উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করেন নাই। দেবীচৌধুরাণী উপন্যাসের প্রারিপার্শ্বিক ঘটনার দিকে লক্ষ্য করিয়াই, অন্ধের হস্তিদর্শনের ন্যায় তিনি দেবীচৌধুরাণীতেও এই দোষ দেখিয়াছেন, 'পোড়ারমুখী' প্রফুল্লর কথা ভুলিয়া দেবীচৌধুরাণীকে দেখিয়াছেন, কিন্তু বঙ্কিমবাবু দেবীচৌধুরাণীর মুখেই বলাইয়াছেন—দেবীচৌধুরাণী মরিয়াছে! বঙ্কিমবাবুর

প্রফুল্লকে চিনিতে হইলে রবিবাবুর কমলার দিকে চাহিতে হয়। কমলার স্থায় প্রফুল্লও তাহার গৃহ, সমাজ ও হৃদয়ের আরাধ্য দেবতাকে খুঁজিয়াছে। কমলার আরাধ্য দেবতা তপাকথিত বিশ্বরূপেরই একটা রূপ, সে রূপ কমলা কখনও চোখে দেখে নাই, কল্পনায় আনিতে পারে নাই, প্রমাণকেই সত্য ও সংস্কারকেই সার ভাবিয়া আবর্জ্জনাস্তূপের মধ্যে কত অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া রমেশের সঙ্গে ঘুরিয়াছে। রূপ ও যৌবন উদ্দিষ্ট পাত্রে সমর্পণ করিয়াই কমলার তৃপ্তি। যজ্ঞহীন সমাজের এক কোণে একটু স্থান পাইয়া কমলা "দেবী" সাজিয়াছে। আর প্রফুল্ল? প্রফুল্ল-নরকের রাণী হওয়ার চেয়ে স্বর্গের দাসী হওয়াই ভাল, বুঝিয়া, কঠোর সাধনা করিয়াছে। এই সাধনার ফলেই লাঞ্ছিতা প্রফুল্ল "দেবী" হইয়াছে। কমলায় নারীপ্রকৃতিসুলভ চাঞ্চল্য আছে,—বর্ষার স্রোতস্বিনীর স্থায় তাহা আবিল ও আবর্ত্তময়। প্রফুল্লতে নারীপ্রকৃতির উদ্দামগতি নাই, তাহাতে আশা আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু সকলই সংযমের গণ্ডীর মধ্যে। যে পবিত্রতা ও শীলতা নারীচরিত্রের গৌরব-পরিচায়ক, কমলার চরিত্রে তাহার নিদর্শন নাই; কিন্তু সে নিদর্শন প্রফুল্ল-চরিত্রকে সমুজ্জ্বল করিয়াছে।

কৃষ্ণচরিত্র-প্রণেতার সহিত শশধর তর্কচূড়ামণির মিলন স্থায়ী হউক আর নাই হউক, দেবীচৌধুরাণী-প্রণেতার সহিত নৌকাডুবি-প্রণেতার মতভেদ হওয়াই স্বাভাবিক, তাহারই একটু আভাস দিলাম।

* * * *

রবিবাবু তাঁহার নিজের উপন্যাসের চরিত্রগুলির বিষয় চিন্তা করেন কি? তাঁহার যে কোনও উপন্যাস পড়িলেই বুঝা যায়, তাঁহার উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা সকলেই যেন কলেজ-ফেরত, তাহাদের আড়ষ্ট আড়ষ্ট কথাগুলা তর্জ্জমা করা,—ঠিক যেন যুথস্থ-করা বুলি আওড়াইবার জন্যই রঙ্গমঞ্চে দাঁড়ায়। সেগুলা কি আমাদের ঘরের ছবি? চোখের বালি ও নৌকাডুবির মত ছায়াবাজি আর কোনও বাঙ্গালী ঔপন্যাসিক বাঙ্গালী পাঠককে উপহার দিয়াছেন কি না, জানি না। 'ধরি ধরি ধরা নাহি যায়', অথবা 'বলি বলি বলা হ'ল না'—এই কথাই ত রবারের মত বাড়াইয়া রবিবাবু উভয় উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। উহাকে সামাজিক বিশৃঙ্খলার ছবি ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। অধিকাংশ নায়ক-নায়িকাই কদর্য্যভাবে বিভোর। তাঁহার এই ছায়াবাজির সহিত আমাদের সমাজের নাড়ীর কোনই সংযোগ নাই, সংযোগের আশাও নাই। যিনি কেবলই বাঙ্গালার মাটীতে বিলাতী গাছের চারা রোপণ করিতেছেন, তিনিই শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কথা স্মরণ করিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন, "আমার বরাবর মনে হইত যে আমাদের বাংলা (বাঙ্গালা) দেশে কি এমন লোক নাই, যে আমাদের ঘরের ছবিটি নিপুণহস্তে অঙ্কিত করে?"— ইহা শুনিলে কে হাসি চাপিতে পারে?

* * * *

যাহা হউক, 'রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গে' একটা সুসংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সাধনার যুগ ফিরাইবার সাধ রবিবাবুর এখনও—জাপানে আপানী রীতিতে ভোজের পর—আছে কি না, বলা যায় না, তবে ১৩১৮ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত ছিল।

কিন্তু এ কোন্ সাধনা? গায়ত্রী-সাধনা, না, সাহিত্য-সাধনা; না, 'আর-কিছু'-সাধনা?

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আয়ুঃ।

২

আমরা দেখিলাম যে, মৃত্যু জীববিবর্ত্তনের ফল, এবং মৃত্যু জীবরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত না হইলে জীব বাঁচিতেই পারিত না, উন্নতও হইতে পারিত না। আমরা ইহাও দেখিলাম যে, বহুকোষ দেহ মরে, বংশরক্ষক কোষ মরে না।

দেহ মরে; কারণ, বহুকোষ দেহ বড়ই জটিলভাবে বিবর্ত্তিত। জটিল যন্ত্র শীঘ্রই বিকল হয়। ইহার সহিত আর একটি কথাও বিবেচনা করা আবশ্যক। বহুকোষ দেহ যে সকল অসংখ্য জীবকোষ দ্বারা গঠিত, সে সকল জীবকোষ জীববস্তু (১) দ্বারা নির্ম্মিত। বলিয়াছি, জীববস্তু প্রধানতঃ অম্লজান, উদজান, যবক্ষারজান ও অঙ্গার দ্বারা গঠিত। এ সকলের সংমিশ্রণ নিতান্তই অস্থায়ী। ইহারা সর্ব্বদাই বিশ্লিষ্ট হইতেছে, আবার (আহারসংযোগে) গঠিত হইতেছে। ইহারা ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং জীবকোষও ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং জীবকোষের সমষ্টি, অর্থাৎ দেহও ক্ষণস্থায়ী।

এই দিক হইতে দেখিলে, মৃত্যুকে দ্বিবিধ বলা যাইতে পারে;—কৌষিক ও দৈহিক। কতকগুলি কোষ স্বধর্ম্মবশতঃই বিকল হইয়া পীড়িত, এবং অবশেষে মৃত হইতে পারে। স্বধর্ম্ম বলিতে, কোষের ক্ষণভঙ্গুরত্ব বুঝিতে হইবে। এরূপে দেহের কোনও বিশেষ (২) স্থানের কোষগুলি মরিয়া গেলে, কৌষিক মৃত্যু বলা যায়। ইহা হইতে দৈহিক মৃত্যু আসিতেও পারে, না-ও পারে। দৈহিক মৃত্যুকেই আমরা সচরাচর মৃত্যু বলি। কতিপয় কোষ মরিয়া গেলে, সে সকল পরিত্যক্ত হইতে পারে, এবং তাহার স্থানে নূতন সুস্থ কোষ জাত হইতে পারে। (৩)

যদি এমন কোনও স্থানে কৌষিক মৃত্যু হয় যে, সে স্থান, অথবা সে অঙ্গ, জীবিত থাকিবার পক্ষে অত্যাবশ্যক, তবে জীব মরিয়া যায়। হৃৎপিণ্ড, শ্বাসযন্ত্র, মূত্রকোষ ইত্যাদি স্থানে কৌষিক মৃত্যু হইলে, এবং নূতন সুস্থ কোষ জাত না হইলে, জীব বাঁচিয়া থাকিতে পারে না; কারণ, এ সকল যন্ত্র জীবিত থাকিবার

(১) Protoplasm.

(২) দেহের কোনও স্থান অবশ হইতে পারে; কোনও একটি স্থানের কতিপয় কোষ মরিয়া পচিয়া যাইতে পারে। এ সকল কৌষিক বিকলতা।

(৩) ইহা granulation দ্বারা সিদ্ধ হয়।

নিমিত্ত অত্যাবশ্যক, কিন্তু হস্তের অথবা পদের কোনও স্থানে কৌষিক মৃত্যু হইলেও জীব মরিবে না। ঐ সকল অঙ্গ ত্যাগ করিয়াও জীবিত থাকা যায়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কৌষিক মৃত্যু হইতে দৈহিক মৃত্যু আসিতেও পারে, না-ও পারে।

এ স্থলে কোষ সম্বন্ধে আর একটি গুরুতর কথা স্মরণ করা আবশ্যক। কোষগুলির অস্থায়ী স্বভাববশতঃ যে বিকলতা, অর্থাৎ পীড়া এবং মৃত্যু হইতে পারে, তাহা কোষস্থ জীববস্তুর স্বধর্ম্ম। কিন্তু বাহ্য কারণেও কোষগুলি বিনষ্ট হইতে পারে, এবং তাহা হইতেও মৃত্যু আসিতে পারে। বাহ্য কারণবশতঃ কোষগুলির বিকলতা দুই প্রকারে উৎপন্ন হয়। (১) আহারের অভাব, বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব; (২) বিষাক্ত পদার্থের সংযোগ। এই সকল কারণে কোষগুলি ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে পারে, অথবা এককালে বিনষ্ট হইতে পারে। এই সকল বাহ্য কারণ কতক পরিমাণে নিবৃত্ত করা সম্ভব, কিন্তু সম্পূর্ণ নিবৃত্ত করা বড়ই দুঃসাধ্য। এ কারণেও (৪) মৃত্যু হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে মৃত্যুর আর একটি গুরুতর কারণ উল্লেখ করিতে হয়। যকৃতের, মূত্রকোষের, মস্তিষ্কের কোষ সকল ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া এত বিকল হইতে পারে যে, মৃত্যু সে ক্ষেত্রে অনিবার্য্য হইয়া উঠে। ইহা প্রধানতঃ বার্দ্ধক্যেই হয়, অথবা ঈদৃশ ক্ষয়প্রাপ্তির নামই বার্দ্ধক্য। ইহা বিশদভাবে বুঝিতে পার্শ্বের চিত্রটি দেখিতে হইবে। বিন্দুগুলি কোষ, আর লাইনগুলি কোষসূত্র (Fibrous tissue)। বার্দ্ধক্যে কোষসূত্র শক্ত, অর্থাৎ কঠিন হয়, এবং কোষগুলি ক্রমে সঙ্কুচিত, এবং তাহাদিগের ক্রিয়া ক্রমে মন্দীভূত হয়। (৫) বৃদ্ধ মৎস্য, ছাগ ইত্যাদির মাংস শক্ত হইয়া থাকে। বার্দ্ধক্যের বহু পূর্ব্ব হইতেই কোষসূত্রগুলিতে কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ যুক্ত হইতে থাকে; উহারা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত না হইয়া কিয়দংশ কোষসূত্রে যুক্ত হয়; তন্নিমিত্ত সূত্রগুলি কঠিন হয়, এবং যেন জমিয়া (packed) যায়। তখন কোষবিন্দুগুলিও ক্রমে ছোট ও তাহাদিগের ক্রিয়া ক্রমে কম (৬) হইতে থাকে। বহুকোষ দেহের অনেকগুলি পীড়ার ইহাই প্রধান লক্ষণ। কোষসূত্রের কাঠিন্য ও কোষক্ষয়-(sclerosis)-বশতঃ যে সকল পীড়া হয়, তাহা

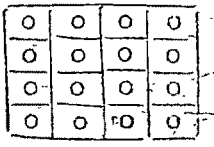

(৪) ইহাই necro-biosis.
(৫) Atrophy.
(৬) ইহাকে sclerosis বলে।

এখন পর্য্যন্ত অচিকিৎস্য। যে স্থানে এই পীড়া হয়, সে স্থানের স্বাভাবিক শক্তি লুপ্ত হইয়া যায়। এ পীড়ায় মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

কতিপয় অসাধ্য পীড়ার লক্ষণ,—কোষসূত্রের কাঠিন্য এবং কোষক্ষয়। স্বাভাবিক বার্দ্ধক্যের লক্ষণও উহাই। সুতরাং বার্দ্ধক্যকে পীড়া বলিলে দোষ কি? উহা বর্ত্তমান সময়ে অসাধ্য পীড়া; উহার পরিণাম মৃত্যু। ইহাই স্বাভাবিক মৃত্যু। ইহা ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হয়।

মৃত্যু (১) বার্দ্ধক্যবশতঃ হয়; (২) অকস্মাৎ মৃত্যুও হয়; যেমন সর্পাঘাত-বশতঃ; এবং (৩) মৃত্যু অসাধ্য পীড়ার পরিণামেও হয়। এই তিন প্রকারে মৃত্যু হইয়া থাকে। দেহে অলক্ষিতে ক্যান্‌সারের বীজ প্রবেশ করিল; পরিণামে ক্যান্‌সারেই মৃত্যু হইল। এ মৃত্যুকে স্বাভাবিক মৃত্যু বলা সঙ্গত নহে। সর্পাঘাত-মৃত্যু এবং ক্যান্‌সারের কীটাঘাত-(৭)-মৃত্যু একই শ্রেণীর। লাঠীর আঘাতে মাথা ফাটিয়া মরাও এই শ্রেণীর। কেবল বার্দ্ধক্যবশতঃ ক্রমে যে মৃত্যু হয়, তাহাই "স্বাভাবিক মৃত্যু" নামে অভিহিত হইবার যোগ্য।

ক্যান্‌সারের বীজ, অর্থাৎ কীট (germ) দেহে প্রবেশ করিলে ঐ পীড়া হইবেই, এমন কোনও কথা নাই। কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি কীট-জ পীড়া অনেকের দেহেই প্রবেশ করে, কিন্তু সকলের ঐ সকল পীড়া হয় না। ক্যান্‌সারের রোগীর সুশ্রূষা করিয়া, কলেরার রোগীর পরিচর্য্যা করিয়া, কিংবা বসন্ত-রোগীকে স্পর্শ করিয়া কেহ কেহ ঐ সকল পীড়া প্রাপ্ত হয়, কেহ কেহ হয় না। যাহারা প্রাপ্ত হয় না, তাহাদিগের দেহ ঐ সকল বীজের অনুকূল নহে। আর যাহাদিগের দেহ ঐ সকল বীজের অনুকূল, তাহারাই ঐ সকল পীড়া প্রাপ্ত হয়, এবং পরিণামে মারা যাইতে পারে। এ শ্রেণীর মৃত্যু দেহের অবস্থার উপর নির্ভর করে। আমরা পীতজ্বরে, দীর্ঘকালব্যাপী নিদ্রাবিহ্বলতায় (sleeping sickness) নিশ্চয় মারা যাই; কিন্তু আফ্রিকার নিগ্রেটো জাতি নিশ্চয় মারা যাইবেই, এমন কথা নাই। ব্যক্তিগত দৈহিক অবস্থাভেদ, এবং জাতিগত দৈহিক অবস্থাভেদ, এতদুভয় কারণেই কেহ অথবা কোনও জাতি এক প্রকার পীড়া সহ্য করিতে পারে, অপরে তাহা পারে না। ম্যালেরিয়াতে আমরা যত মরি, ইংরেজগণ তদপেক্ষা অনেক অধিকপরিমাণে মারা যায়। এ শ্রেণীর মৃত্যু ব্যক্তিগত, অথবা জাতিগত দৈহিক অবস্থার উপর নির্ভর করায়, ইহাকে বংশানুক্রমের অনুগত বলা যাইতে পারে। এই সকল পীড়ায় যাহারা মরে না, তাহাদিগের দেহ বংশানুক্রমে বিশেষভাবে গড়িয়া উঠে।

(৭) এ শব্দটি ব্যবহার করা সঙ্গত হইল না; তথাপি অর্থবোধে কাঠিন্য হইবে না।

বার্দ্ধক্যবশতঃ যে স্বাভাবিক মৃত্যু হয়, তাহাও বংশানুক্রমের সহিত সংসৃষ্ট; অন্ততঃ অনেক স্থলে সংসৃষ্ট, এরূপ বলা যাইতে পারে। অকস্মাৎ মৃত্যু, অল্প বয়সেই হউক, অথবা অধিক বয়সেই হউক, অকস্মাৎ মৃত্যু বার দিলে, স্বাভাবিক মৃত্যু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বংশানুগত। কীট-জ পীড়া, সুরুত-অত্যাচারজনিত পীড়া, কিংবা পিতৃমাতৃ-অত্যাচারজনিত পীড়া, অথবা বিকলতা,—এ সকল কারণে যাহাদিগের মৃত্যু হয়, তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে দেখা যায় যে, অপরে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূর্ব্বপুরুষের আয়ুঃ প্রাপ্ত হয়। আমি ৮।৯ বৎসর পূর্ব্বে একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলাম; দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছি। তাহাতে ৫০।৬০ জন ব্যক্তির মৃত্যুর বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম। যত দূর স্মরণ হয়, তাহাতে ঐ তালিকায় অধিকাংশ ব্যক্তিই বংশানুক্রমে প্রায় এক বয়সে নাশ গিয়াছিলেন; এবং এক অথবা তুল্য রোগে মৃত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে বিভিন্ন জীবের আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে যে প্রবাদ-(৮)-বাক্যটী লিখিয়াছি, তাহা হইতেও বুঝা যায় যে, ভিন্ন-ভিন্ন-জাতীয় জীবের ভিন্ন ভিন্ন আয়ুঃ মোটামুটি স্থির করা সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং সেই-জাতীয় ব্যক্তিগণেরও এক একটা মোটামুটি জীবিতকাল স্থির করা সম্ভব হইয়াছে। আয়ুঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাতিগত অথবা বংশগত না হইলে, কোনও জাতীয় জীবেরই আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে প্রবাদ-বাক্য-রচনা করা সম্ভব হইত না। মৃত্যু, যাহা জীববিবর্ত্তনের ফল, তাহা জাতিগত অথবা বংশগত হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

বার্দ্ধক্যজনিত যে মৃত্যু, তাহাই স্বাভাবিক মৃত্যু; পীড়ায় মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নহে, উহাকে অকস্মাৎ মৃত্যু বলা যাইতে পারে। বার্দ্ধক্যজনিত মৃত্যুতে কোনও কোনও ক্ষেত্রে আমরা সচরাচর যাহাকে পীড়া বলি, তাহার কোনও সংস্রবই থাকে না। কোনও পীড়া নাই, অথচ বৃদ্ধ ক্রমে অবসন্ন হইতেছে; ইহাতে বৃদ্ধ অনেক সময় মৃত্যুকাল উপস্থিত হওয়া নিজে অনুভব করিতে সমর্থ হন। অবশেষে সকলকে বলিয়া কহিয়া ঘুমাইয়া পড়িবার মত দেহত্যাগ করে। এ মৃত্যু এক দিনে হয় না; পূর্ণযৌবন গত হইবার সময় হইতেই ক্রমে কৌষিক বিকলতা উপস্থিত হয়; তাহা হইতে ক্রমে শারীরক্রিয়ার ক্ষীণতা ও অবসাদ; পরে কোষ সকলের ক্রিয়াহীনতা ও কোষসূত্রের কাঠিন্য, এবং ভগ্নপ্রবণতা উপস্থিত হয়। এইরূপে ক্রমে স্নায়ুসূত্র, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি অত্যাবশ্যক যন্ত্র সকল অবসন্ন ও নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়; তাহাকেই আমরা মৃত্যু বলি। কিন্তু তখনও প্রকৃত-

(৮) ২২ বৎসর, ১৩ বৎসর ইত্যাদি।

পক্ষে ঐরূপ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয় নাই। মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া আত্মীয় স্বজন স্থির করিলেও, চিকিৎসকগণ মত দিলেও, দেখা যায় যে, নখ, কেশ ইত্যাদি বাড়িতে ক্ষান্ত হয় নাই। কিছুক্ষণ মৃতদেহ রাখিয়া দিলে নখ বাড়িতে, এবং শ্মশ্রু গজাইতে দেখা যায়। সুতরাং শারীরক্রিয়া তখনও আছে, বলিতে হইবে। তাহার পর, সম্পূর্ণ মৃত্যু হইলেও, যদি ঐ মৃতদেহ হইতে হৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া লওয়া যায়, এবং যদি উহাকে লবণাক্ত জলের মধ্যে কিছুক্ষণ রাখিয়া দেওয়া হয়, তবে ঐ নিষ্ক্রিয় হৃৎপিণ্ড পুনরায় ক্রিয়া করিতে থাকে; অর্থাৎ, ঐ হৃৎপিণ্ড জীবিত দেহে থাকা কালে যেরূপ স্পন্দিত ও প্রসারিত হইত, তদ্রূপই হইতে থাকে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, (দৈহিক) মৃত্যু হইলেও যান্ত্রিক মৃত্যু না হইতে পারে। যেমন কৌষিক মৃত্যু হইলেও দৈহিক মৃত্যু না হইতে পারে, তেমনই দৈহিক মৃত্যু হইলেও কৌষিক মৃত্যু (তৎক্ষণাৎ) না হইতে পারে; কারণ-কোনও কোনও কোষসমষ্টি তখনও ক্রিয়াবান থাকিতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকাল তাহা থাকে না। কিয়ৎপরেই ঐ ক্রিয়াশক্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন ষোল আনা মৃত্যু হইল, ইহা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

তবেই বুঝিলাম,

(১) স্বাভাবিক মৃত্যু জীব-বিবর্ত্তনের ফল।

(২) মৃত্যু দেহকোষের দুর্ব্বলতা ও ক্রিয়াক্ষীণতার ফল।

(৩) মৃত্যু কোন সকলের দীর্ঘকালব্যাপী দুর্ব্বলতার ও ক্রিয়াক্ষীণতার ফল। উহা ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হয়; এক দিনে হয় না।

(৪) প্রধান দুইটি লক্ষণ সম্বন্ধে, মৃত্যু (sclerosis নামক) পীড়ার সহিত তুলনীয়। উহা দীর্ঘকালব্যাপিনী পীড়া। সম্প্রতি অচিকিৎস্য পীড়া।

আমরা প্রথমে যে দুইটি প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে স্মরণ করা আবশ্যক। (১) আয়ুঃ কিসের উপর নির্ভর করে? (২) শেষই বা হয় কেন? তৎপরে আমরা আর একটি আনুষঙ্গিক প্রশ্ন করিয়াছিলাম, "বহুকোষ জীবকেও কি অমর অথবা অত্যন্ত দীর্ঘায়ুঃ করা যায়?" এ প্রশ্নও এক্ষণে স্মরণ করা আবশ্যক। উপরের আলোচনা হইতে এই কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব নহে, বরং সম্ভব হইতেছে। সে উত্তর পশ্চাৎ দিবার চেষ্টা করিব। *

শ্রীশশধর রায়।

* গত আষাঢ় সংখ্যায় ১৬১ পৃষ্ঠায় যে চিত্রটি 'বালোর মস্তিষ্ক' বলিয়া লিখিত হইয়াছে, তাহা যৌবনের মস্তিষ্ক; এবং যে চিত্রটি 'যৌবনের মস্তিষ্ক' লেখা হইয়াছে, তাহা বাল্যের মস্তিষ্ক।

স্থাপত্য-শিল্প।

৩

স্থাপত্যের অভ্যুদয় ও উন্নতির অনেকগুলি কারণের মধ্যে ধর্ম্ম অতিশয় কার্য্যকারী। ধর্ম্মজগতের ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে দেখা যায় যে, এক একটি ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে শিল্পের, বিশেষতঃ স্থাপত্য-শিল্পের নূতন ধারা বহিতে থাকে। এ ধারার গঙ্গোত্রীর সন্ধান সেই বহু পুরাতন জাতিসমূহের অন্ধতমসাচ্ছন্ন ইতিহাসে মিলিলেও, কোথাকার অদৃশ্য ও অজ্ঞের উৎস হইতে সেই ধারার বেগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের ও তৎসহিত বৌদ্ধসাম্রাজ্যের ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইবে না যে, ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শিল্প ও সাহিত্যের কিরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ইহাদের মূল ও ভিত্তি প্রাচীনতর ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা ও আদর্শের উপর স্থাপিত হইলেও, ইহাকে আমরা নিতান্ত অভিনব আকারে দেখি। এই অভিনব ভাব এমনই দৃষ্টিবিভ্রম উপস্থিত করে যে, আমরা ইহার পারম্পর্য্য-ধারাকে হারাইয়া ফেলি। য়ুরোপে স্থাপত্যের উপর ধর্ম্মের প্রভাব বুঝিতে হইলে, খৃষ্টধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করা উচিত। কন্‌স্টান্‌টাইনের সময় পর্য্যন্ত খৃঃ ধর্ম্মের তেমন প্রচার হয় নাই, কিন্তু ৩১৩ অব্দে রোমসম্রাট কন্‌স্টান্‌টাইন্ যখন খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, তখন হইতেই ইহার বহুলপ্রচার হইতে লাগিল, এবং ইহা রাষ্ট্রীয় ধর্ম্মস্বরূপ পরিগণিত হইল। এই সময় হইতেই আমরা প্রকৃত খৃষ্টীয় স্থাপত্যের অভ্যুদয় দেখি। ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা পুরাতন রোমক স্থাপত্যের মধ্যে দেখা যাইলেও, ইহাতে অনেক নব অঙ্গের যোজনা ও সমাবেশ, এবং নানাবিধ বর্ণসৌষ্ঠবের পরিচয় পাই। প্রাচীন ব্যাসিলিকার (Basilica) গঠনপ্রণালী অনুসরণ করিয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্মমন্দিরগুলি নির্ম্মিত হইলেও, আমরা এই সকলে atrium বা বহিরঙ্গন, অনুতপ্তদিগের জন্য narthex, শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা করিবার জন্য ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবস্থা দেখি। অনুতাপ করা খৃষ্টধর্ম্মের বিশেষ অঙ্গ; সুতরাং অনুতপ্তের জন্য উপযোগী স্থানের বন্দোবস্ত অবশ্যম্ভাবী; নানাবিধ আচারানুষ্ঠান ও শাস্ত্রপাঠ প্রভৃতির জন্য choirএর প্রয়োজন; হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া শুচিভাবে উপাসনায় যোগদান করিবার জন্য জলাধারের প্রয়োজন; এই জলাধার-স্থাপনের জন্য বহিরঙ্গনের বন্দোবস্ত; এই জন্য আমরা এই সকল পুরাতন খৃষ্টীয় মন্দিরের সম্মুখভাগে atrium বা অঙ্গনের ব্যবস্থা দেখি।

প্রাচীন খৃষ্টীয় যুগে Baptistery নামক আর এক প্রকার গৃহের পরিচয় পাই; খৃঃ ধর্ম্মে অভিষেক করিবার জন্য ইহার কল্পনা হইয়াছিল; ইহাও আবার রোমক সময়কার বৃত্তাকার মন্দির ও সমাধিহর্ম্ম্যের অনুকরণে নির্ম্মিত। এই baptisteryগুলির অঙ্গসংস্থান-কল্পনায় রোম্যান্‌দিগের বৃত্তাকার মন্দির হইতে বৈসাদৃশ্য দেখা যায়; রোমক মন্দিরের স্তম্ভের সহিত খৃষ্টীয় baptisteryগুলির স্তম্ভের তুলনা চলে না; তথাপি উভয়ের মধ্যে আকৃতিগত সাদৃশ্য যথেষ্ট বর্ত্তমান। আমরা দেখিলাম যে, খৃষ্টধর্ম্মের অভ্যুত্থানে রোমক স্থাপত্যের বিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। শুদ্ধ যে আকারগত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল, তাহা নহে; বর্ণগৌরব ও 'মোজেয়িক' প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কার-সম্পাদনে এক নূতন রীতির অভ্যুদয়ও দৃষ্ট হয়।

খৃঃ ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে স্থাপত্যের পরিবর্ত্তন-সাধনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কালক্রমে ক্রমশঃ খৃঃ ধর্ম্মের মধ্যে দুই শাখার আবির্ভাব হইল—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য। স্থূলতঃ বলিতে গেলে, প্রাচ্যশাখার লীলাক্ষেত্র কন্‌ষ্টাণ্টিনোপ্‌ল্ হইতে এসিয়ামাইনর পর্য্যন্ত। এই দুইটি শাখা-স্থাপনের কারণনির্ণয় করিতে হইলে আমরা দেখি যে, ধর্ম্মসম্বন্ধে মতদ্বৈধই ইহার মূলে নিহিত। প্রাচ্য-শাখান্তর্গত খৃষ্টানেরা বিশ্বাস করিতেন যে, আত্মা ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত; ইহা কখনই ঈশ্বরপুত্র' খৃষ্ট হইতে উদ্ভূত নহে। প্রতীচ্যেরা বিশ্বাস করিতেন যে, আত্মা ঈশ্বর ও তৎসহ তৎপুত্র খৃষ্ট হইতে উদ্ভূত নহে। এই মতদ্বৈধ খৃষ্ট-ধর্ম্মেতিহাসে Filioque controversy নামে কথিত; ইহা খৃষ্টীয় ধর্ম্মজগতে এক মহা বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল; ইহার সংঘর্ষে স্থাপত্য প্রভৃতি যাবতীয় শিল্পে পরিবর্ত্তনের সূচনা হইল। বাইজাণ্টাইন (Byzantine) স্থাপত্যে আমরা এই পরিবর্ত্তনের চরম পরিণতি দেখি। খৃষ্টীয় স্থাপত্যে আমরা এইবার 'ডোম' (Dome) বা গম্বুজের প্রথম পরিচয় পাই।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শিল্পে বা সাহিত্যে যখন নূতন ধারার প্রবর্ত্তনা দেখি, তখন অনুসন্ধান করিলে ইহার সহিত পুরাতন উৎসের যোগ দেখিতে পাই; নূতনে-পুরাতনে সম্বন্ধ অনেকটা অবিচ্ছেদ্য; এই বাইজাণ্টাইন্ স্থাপত্যের কল্পনা ও নির্ম্মাণ-প্রণালীর মধ্যে আমরা প্রাচীন রোম্যান্ ও খৃষ্টান্ স্থাপত্যের বহুল নিদর্শন প্রাপ্ত হই; কিন্তু ইহা ভেদ করিয়া ইহার নিজমূর্ত্তি, আপনার যাহা নিজস্ব, তাহা দেখাইতে যেন সর্ব্বদা উৎসুক; বাইজাণ্টাইন্ স্থাপত্যের যাহা নিজস্ব, তাহা পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সংঘর্ষ হইতে উদ্ভূত; ইহার নিজস্ব কি,

[illegible]াহা বুঝিতে হইলে আমি খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্ম্মিত St. Sophiaর গির্জ্জার প্রতিকৃতি নিরীক্ষণ করিতে বলি। ইহার স্থাপনবিন্যাসে আমরা রোমান ও প্রাচীন খৃষ্টান পদ্ধতির পরিচয় পাইলেও, ইহার আকৃতিসম্পৎ ইহার নিজস্ব এবং ইহার জন্যই St. Sophia চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ইহার মধ্যস্থ গম্বুজ ও তাহার দুই পার্শ্বস্থ অর্দ্ধ-গম্বুজ অতিশয় কৌশলের সহিত স্থাপিত করা হইয়াছে। ১০৭ ফিট্ আয়তনের চতুরস্র প্রকোষ্ঠের উপরের খিলান্ ও pendentiveএর সাহায্যে যে বিশাল গম্বুজের নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়ের উদ্রেক করে; এবং এই গম্বুজের পাদদেশে যে জানালা-শ্রেণী চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, ইহাতে ভিতরে আলোক-প্রবেশের কথা ছাড়িয়া দিলেও, সৌন্দর্য্যের বিকাশে বিশেষ সহায়তা করে; পূর্ব্বে যে দুইটি অর্দ্ধ-গম্বুজের কথা বলিয়াছি, ইহাতে কেমন নির্ম্মাণকৌশল দৃষ্ট হয়; মধ্যস্থ গম্বুজটির সাম্যরক্ষা ব্যাপারে (equilibrium) ইহাদের কিরূপ প্রয়োজন। ভিতরের ভিত্তিগাত্র নানা বর্ণের মর্ম্মর প্রস্তর দ্বারা মণ্ডিত; বৃহত্তর নানা আকৃতির ও বর্ণের 'মোজেয়িক' দ্বারা শোভিত। শিল্পের রসাপ্লুত ভক্তশ্রেণী-মনে এক অনির্ব্বচনীয় বিস্ময় ও আনন্দের উদ্রেক করে। এই গুম্বনির্ম্মাণ ও তাহার বিস্তার বাইজাণ্টাইন্ স্থাপত্যের আর এক নিদর্শন।

য়ুরোপে খৃষ্টান মহান্ত ও মঠধারী সাধুরা সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি পার্থিব বিদ্যার সহিত স্থাপত্য-শিল্পের বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন; ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহারাই য়ুরোপে স্থাপত্য-শিল্পের নামাকে রক্ষা করিয়াছেন, এবং ইহার অনুশীলনকে ধর্ম্মশাস্ত্রচর্চ্চার অঙ্গীভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। য়ুরোপে খৃষ্ট-ধর্ম্মাভ্যুদয় ও তৎসহ মঠধারী সন্ন্যাসীদিগের ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে আমরা দেখি যে, এই সন্ন্যাসীরা সমস্ত জ্ঞান, বিদ্যা, শিল্প আপনাদের করায়ত্ত রাখিয়া তাহার বিশেষ উৎকর্ষসাধন করিয়াছিলেন; তাঁহারা যাহা স্পর্শ করিয়াছিলেন, তাহা বিস্ময়ের বিষয়। য়ুরোপি ব্যাপিয়া মঠগুলির শাখা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং কেন্দ্রস্থানীয় হিসাবে পোপের অধীনস্থ হইলেও, প্রত্যেক শাখার এক বিশেষত্ব ছিল। 'বেনেডিক্টাইন্' (Benedictine Order) ও "সিষ্টারসিয়ান্" (Cistercian Order) শাখার মধ্যে এক হিসাবে সাম্য বর্ত্তমান থাকিলেও, ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে বিশিষ্টতা বর্ত্তমান। এই এক একটি শাখা স্থাপত্যে নানা বৈচিত্র্যের অবতারণা করেন, সেই বৈচিত্র্যময় স্থাপত্য একই রোমাণেস্ক (Romanesque) বিভাগের অন্তর্গত হইলেও,

তাহাদের স্থাপনবিন্যাস ও অঙ্গবিন্যাসের মধ্যে এত পার্থক্য দৃষ্ট হয় যে, ইহাদিগকে একই বিভাগের বিভিন্ন অঙ্গস্বরূপ পরিগণিত করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বে সিষ্টারসিয়ান্ শাখার কথা উল্লেখ করিয়াছি; ইহার অন্তর্গত অনেকগুলি গির্জ্জায় সাধারণতঃ দৃষ্ট দালান বা Aisle দৃষ্ট হয় না, এবং Transeptগুলি ক্ষুদ্রায়তনের। ক্লুনিয়াক্ শাখার (Cluniac Order) অন্তর্গত গির্জ্জাগুলিতে দুইটি করিয়া Transept বর্ত্তমান। এই প্রকার কত প্রকারের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় স্থাপত্যের মধ্যে বৈচিত্র্যের ধারা প্রবাহিত করাইয়া ইহাকে কলুষিত ও পঙ্কিল হইতে দেন নাই।

সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত য়ুরোপের পশ্চিম খণ্ডে স্থাপত্য গ্রীক্ ও রোমক আদর্শের উপর স্থাপিত ছিল; পূর্ব্বাংশে বাইজাণ্টাইন্ স্থাপত্য এশিয়ার আদর্শের সহিত মিশ্রণব্যাপার সংঘটিত করিয়াছিল। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সম্রাট সার্লামন্ (Charlemagne) যখন জার্ম্মানীর বা সাক্সনীর অধিবাসীদিগকে খৃঃ ধর্ম্ম গ্রহণ করাইলেন, তখন হইতেই স্থাপত্যের আদর্শেরও পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে লাগিল; এই পরিবর্ত্তনের মূল উপদেষ্টা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়। তাঁহারা প্রচলিত পদ্ধতিতে সন্তুষ্ট ছিলেন না; প্রচলিত পদ্ধতিসমূহের, অর্থাৎ গ্রীক ও রোমান্ মিশ্রণে, এক নব আদর্শের সৃষ্টি করিলেন। গ্রীকস্থাপত্যের অঙ্গবিন্যাসে কোনও জটিলতা নাই; কিন্তু রোমান্ গৃহগুলির ছাদ যেখানে দালান-সংবদ্ধ, সেখানে অঙ্গবিন্যাস-ব্যাপারে যথেষ্ট জটিলতা বিদ্যমান; শুদ্ধ যে স্থাপনবিষয় দুরূহ ছিল, তাহা নহে; ইহাতে উপকরণের অনেক অপব্যয় ঘটিত, এবং অনেক প্রকারের যন্ত্রেরও প্রয়োজন ছিল। সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের পক্ষে প্রথম প্রথম ইহা সম্ভবপর ছিল না। সুবিধা ও অন্যান্য কারণে তাঁহারা পূর্ব্বকথিত ব্যাসিলিকার (Basilica) স্থাপনবিন্যাস গ্রহণ করিলেন, এবং তাহার ছাদকে খিলান-সংবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইলেন, এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন,—কি প্রকারে পূর্ব্বোক্ত রোমক জটিলতা হইতে অঙ্গবিন্যাস ব্যাপারকে বিমুক্ত করা যাইতে পারে। এই উপায়ের উদ্ভাবন করিতে গিয়া তাঁহাদিগকে তিন শতাব্দী ব্যাপিয়া ধীরে ধীরে অনেকগুলি পরীক্ষা করিতে হইল; তাহার ফলে, এক বৈচিত্র্যময়, অবিচ্ছিন্ন বহিঃ-ভিত্তিহীন ও তৎস্থলে খণ্ড খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন বহিঃ-রক্ষিত স্তম্ভ বা Buttress-যুক্ত স্থাপত্যের উদ্ভব হইল।

এ স্থলে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য; প্রাকৃতিক সমস্ত ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিলে আমরা দেখি যে, প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি প্রতিক্রিয়া আছে, যাহার

পরিমাণ ক্রিয়ারই সমান। পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসী সম্প্রদায় অতিশয় উৎসাহ ও অনুরাগের সহিত শিল্পের উৎকর্ষসাধন করিতে লাগিলেন; কিন্তু মঠধারী সন্ন্যাসী হইলে কি হয়? মানবের প্রকৃতিগত দৌর্ব্বল্য হইতে রক্ষা পাওয়া বড় কঠিন; বিশেষ সাধনের প্রয়োজন। তাঁহারা শিল্পের উন্নতিসাধন করিতে করিতে ইহাকে অস্থিহীন, মজ্জাহীন, মাংসপিণ্ডস্বরূপে পরিণত করিলেন; কালক্রমে ইহাদের নির্ম্মিত সৌধগুলি তত সুদৃঢ় হইল না; কিন্তু তাহাদের বহিঃগাত্র ও অভ্যন্তরদেশ নানাবিধ কারুকার্য্যে শোভিত হইতে লাগিল। ইহাতে তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য ও গরিমা প্রকাশের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু স্থাপত্যের যাহা প্রাণ, তাহার তিরোধানের উপক্রম হইল। এই অবস্থায় সাধু বার্ণার্ড (St. Bernard) স্থাপত্যের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় দেখিয়া মহা চিন্তিত হইলেন, এবং প্রতিক্রিয়ামূলক আদর্শের সৃষ্টি করিলেন। তিনি স্থাপত্য-সম্বন্ধীয় অঙ্গবিন্যাসে কঠিন বিধি-নিষেধের প্রবর্ত্তনা ও নির্ম্মাণবিষয় সুদৃঢ় করিবার উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তাঁহার মতে, অনাবশ্যক অংশ সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়; তিনি স্থাপত্যকে নিয়মের কঠোর নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া এক মহদুপকার সাধিত করিলেও; স্বাভাবিকতার বিলোপসাধন করিয়া এক অনিষ্টেরও সূচনা করিলেন।

য়ুরোপে এক্ষণে বৈশ্যবৃত্তি প্রবল হইলেও, সে সময় প্রকৃত ক্ষাত্রধর্ম্মের সম্মান ছিল; এবং সকলে সেই সম্মান আকাঙ্ক্ষা করিত; সুতরাং সে কালের মঠধারী সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে ক্ষাত্রধর্ম্মের যে মিশ্রণ দৃষ্ট হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই; এই মিশ্রণের ফলে এক নব শাখার অভ্যুদয় হইয়াছিল; ইঁহারা ইতিহাসে Knights Templars নামে বিখ্যাত; ইঁহাদের জীবন অদ্ভুত ও উত্তেজনাময়ী কাহিনীতে পূর্ণ বলিয়া, ইঁহারা স্থাপত্যের উপর নিজ শাখার বৈচিত্র্য মুদ্রিত করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসীরা নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া তথাকার স্থাপত্য, শিল্প প্রভৃতি দেখিয়া, তাহা হইতে নানা অংশ স্ব স্ব দেশে বা শাখান্তর্গত কেন্দ্রগুলিতে প্রতিষ্ঠা করিতেন; এইরূপে বৈচিত্র্যের অবতারণা হইত; উদাহরণস্বরূপ Knights Templarsদের কথাই উল্লেখ করিতেছি; ইঁহারা জেরুসালেমস্থ Holy Sepulchreর অনুযায়ী তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত গির্জ্জাগুলি বৃত্তাকারে নির্ম্মিত করিয়াছেন।

ধর্ম্ম যে স্থাপত্য-শিল্পের বিকাশে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল, তাহা

ভারতবর্ষের মন্দিরগুলি নিরীক্ষণ করিলেই বুঝা যায়। দাক্ষিণাত্যস্থ কাঞ্চী-নগরীর কথাই ধরা যাউক। কাঞ্চী দাক্ষিণাত্যের বারাণসীস্বরূপ, ইহাতে সর্ব্বধর্ম্মের মন্দিরায়তন দৃষ্ট হয়। ভারতের দক্ষিণাংশে শৈব-বৈষ্ণবে বা স্মার্ত্ত-বৈষ্ণবে বিষম বিরোধ; শৈবসম্প্রদায়াবলম্বীরা যেমনই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন, অমনই বৈষ্ণব সম্প্রদায় তদপেক্ষা অধিকতর মনোহর ও শিল্প-শ্রীযুক্ত মন্দির স্থাপন করিবার প্রয়াস করিলেন। আধ্যাত্মিকতা হিসাবে এ বিরোধ বাঞ্ছনীয় না হইলেও, শিল্পহিসাবে ইহার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। সঙ্ঘর্ষ ও বিক্ষোভ না হইলে কোনও কিছুতেই উন্নতি হয় না; শিল্পসম্বন্ধে এই নীতি অধিকতর প্রযোজ্য। শৈবে বৈষ্ণবে বিরোধ না থাকিলে, শিবকাঞ্চী অপেক্ষা অধিকতর মনোজ্ঞ বিষ্ণুকাঞ্চীর স্থাপন কখনই সম্ভবপর হইত না। কাঞ্চীস্থ প্রাচীন 'পল্লব' স্থাপত্য অনুশীলন করিলে আমরা দেখি যে, এ বিরোধ ছিল বলিয়াই কৈলাসনাথ মন্দির অপেক্ষা বৈকুণ্ঠ পেরুমলের মন্দিরে বৈচিত্র্য ও স্থাপনবিন্যাসের প্রকৃষ্টতর পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকে প্রকৃষ্টতার কারণ অনুসন্ধান করিয়া বলিবেন যে, বৈষ্ণব-স্থাপত্যে রাজানুগ্রহ অধিকতর বর্ষিত হইয়াছিল বলিয়াই ইহা অধিকতর সম্পৎশালী। দাক্ষিণাত্যের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, তথাকার বৈষ্ণবদিগের ইতিহাসের একটা পারম্পর্য্যধারা আছে, যাহা তাঁহাদের মতে, কলি-যুগের বহু পূর্ব্ব হইতে প্রবাহিত। এই পারম্পর্য্যধারা 'আলোয়াড়' (ভক্ত) ও আচার্য্যগণের জীবন-কাহিনীতে সুরক্ষিত। এমনটি আর ভারতের কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তামিল ভাষায় লিখিত আলোয়াড়দিগের 'দিব্যপ্রবন্ধ' এখনও বৈষ্ণবদিগের মন্দিরে মন্দিরে পঠিত হয়; তাঁহাদিগের ইহার প্রতি ভক্তি অসাধারণ। আমার বোধ হয়, সংস্কৃত-ভাষানিবদ্ধ বেদাদিশাস্ত্র অপেক্ষা ইহা অল্প আদরে গৃহীত হয় না।

রামানুজ, বেদান্তবেদ্য, লোকাচার্য্য, শ্রীশৈলেশ, বেদান্তদেশিক প্রভৃতি যে সমস্ত আচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়া সমস্ত দাক্ষিণাত্যের সমাজ ও ধর্ম্ম আলোড়িত করিয়া গিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত 'আলোয়াড়'দিগের বহু প্রাচীন পারম্পর্য্য-ধারাকে সার্থক ও রক্ষা করিবারই ফল। দেশস্থ রাজা শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উপরই অনুগ্রহ বর্ষণ করিতেন; বৈষ্ণবসমাজ সেই অনুগ্রহকে আপন অভীষ্টসাধনে নিয়োজিত করিতে জানিতেন; রাজানুগ্রহ যদি সামাজিক কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত সম্মিলিত হয়, তাহা হইলে যে প্রকারের

ফল-প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, শুদ্ধ রাজানুগ্রহে ততটা আশা করা যায় না; ইহা আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় জীবনের আলোচনা করিলে আমরা বেশ বুঝিতে পারি। পুনশ্চ, কাঞ্চীনগরীর নিকটবর্ত্তী বেগবতী নদীর অপর পার্শ্বস্থ তিরুপরুত্তি কুণ্ডম্ গ্রামের জৈনমন্দিরগুলি সন্দর্শন করিবার সময় আমি কয়েকটি অনুশাসন পাঠ করিয়া বিস্মিত হই। ইহাতে চোলরাজ কুলতুঙ্গচোলের সাহায্য-কথা ক্ষোদিত রহিয়াছে; উহার সন্নিকটে বিজয়নগর রাজ্যের প্রসিদ্ধ কৃষ্ণদেব মহারায়ের এক অনুশাসন রহিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত হিন্দুনরপতিদিগের অনুশাসন বিষ্ণুকাঞ্চীর বরদরাজের মন্দিরে দেখিয়াছি; অথচ দুইটির অবস্থার মধ্যে বৈষম্য দৃষ্ট হয়; রাজানুগ্রহ সত্ত্বেও একটির তেমন শ্রীবৃদ্ধি দৃষ্ট হয় না। এ স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি যে, চিদম্বরস্থ শিবমন্দিরেও শ্রীকৃষ্ণদেব মহারায়ের অনুশাসন দেখিয়াছি; ইহার অনেক অংশ তাঁহার অনুগ্রহে নির্ম্মিত ও সংস্কৃত; কিন্তু বিষ্ণুকাঞ্চীস্থ বরদরাজ মন্দির ও এ মন্দিরে কত প্রভেদ। ইহা হইতে আমরা বুঝিলাম যে, বৈষ্ণবস্থাপত্যের উন্নতি রাজানুগ্রহের উপর ততটা নির্ভর করে নাই; ইহা তখনকার ধর্ম্মানুপ্রাণিত সমাজের নিকটই অধিকতর ঋণী।

পৃথিবীস্থ সর্ব্বদেশের মধ্যে ভারতবর্ষে স্থাপত্যশিল্পের উপর ধর্ম্মের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়; এই ধর্ম্মের প্রভাববশতঃই স্থাপত্যে এত বিধিনিষেধের ও নানাবিধ আচারানুষ্ঠানের প্রবর্ত্তনা; ইহাতে অনেক কৃত্রিমতার সৃষ্টি হইয়াছে, স্বীকার করিলেও, এক হিসাবে ইহাই নানাবিধ অত্যাচারের মধ্যে ইহাকে রক্ষা করিয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, য়ুরোপের মধ্যযুগেও সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় স্থাপত্যশিল্পকে ধর্ম্মবিধানে নিয়ন্ত্রিত করিয়াও ইহার চর্চ্চাকে ধর্ম্মানুশীলনের অঙ্গীভূত করিয়া ইহার ধারাকে অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। ভারতে ইহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। শাস্ত্রকারেরা শাস্ত্রের বিধান দ্বারা মন্দিরায়তন প্রভৃতির নির্ম্মাণে সাধারণের প্রবৃত্তি উদ্রিক্ত করিতেন। সংহিতাগুলি পাঠ করিলে আমরা দেখি যে, এই নির্ম্মাণব্যাপারকে ধর্ম্মাচরণের অঙ্গীভূত করা হইয়াছে। যে দেবতার উদ্দেশে মন্দির নির্ম্মিত হইবে, নির্ম্মাতা সেই দেবতার জন্য নির্দ্দিষ্ট লোক প্রাপ্ত হইবেন। ইহা অপেক্ষা উত্তেজক আর কি হইতে পারে? যমসংহিতায় উল্লেখ আছে—

কৃত্বা দেবালয়ং সর্ব্বং প্রতিষ্ঠাপ্য চ দেবতাম্।
বিধায় বিধিবচ্চিত্রং তল্লোকং বিন্দতে ধ্রুবম্॥

বিষ্ণুসংহিতা প্রভৃতিতে এইরূপ বচনের উল্লেখ দেখা যায়; পুরাণাদিতেও

এইরূপ বিধিব্যবস্থা আছে। ব্রাহ্মণ্য সমাজ চিরকালই দেবায়তন প্রভৃতির নির্ম্মাণবিষয়ে শাস্ত্র দ্বারা এইরূপ আদিষ্ট ও উত্তেজিত হইয়া আসিয়াছেন। সময়ে সময়ে যুগাচার্য্যেরা অবতীর্ণ হইয়া বিস্মৃত ও লুপ্তপ্রায় শাস্ত্রগুলির বচন ও উপদেশগুলির উদ্ধারসাধন করিয়া স্থাপত্যশিল্পের উৎকর্ষবিধানের সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। রঘুনন্দনের স্মৃতিশাস্ত্র যৎসামান্য পাঠ করিয়া দেখিয়াছি যে, তিনি কত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়সহকারে পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন ও লুপ্তপ্রায় শাস্ত্রবচনগুলির উদ্ধারসাধন করিয়া বিক্ষুব্ধ ও আচারানুষ্ঠানবিরত হিন্দুসমাজে মঠ, দেবায়তন প্রভৃতি নির্ম্মাণের কেমন উপদেশ দিয়া গিয়াছেন; তাঁহার মঠপ্রতিষ্ঠাদিতত্ত্বম্, বাস্তুযাগতত্ত্বম্ ও জলাশয়োৎসর্গতত্ত্বম্ এ স্থলে উল্লেখযোগ্য। এইরূপ নানা কারণে হিন্দুস্থাপত্যের একটা পারম্পর্য্যধারা বরাবর রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। সেই জন্য বলিতেছিলাম যে, এ দেশে যেমনটি হইয়াছে, এমন আর কোথাও হয় নাই। ইহাতে অনেক আবর্জ্জনা আসিয়া জুটিয়াছে বটে, এবং স্থূলত্রমতার সৃষ্টি হইয়াছেও সত্য, কিন্তু মামুদগজনী, আলাদীন, মালিককাফুর প্রভৃতির এত নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও যে নির্ম্মাণপ্রবৃত্তির সমূল নাশ সাধিত হয় নাই, এই শাস্ত্রীয় উপদেশ ও বিধিবিধানই তজ্জন্য প্রশংসার্হ।

জীর্ণ ও ভগ্ন দেবায়তনগুলির সংস্কারের জন্যও শাস্ত্রকারেরা আদেশ দিয়া গিয়াছেন, এবং পাছে কেহ সংস্কার দ্বারা নির্ম্মাণসদৃশ-কর্ম্মজাত পুণ্যলাভ হইবে না, এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করেন, এবং এই কারণবশতঃ মন্দিরগুলি সংস্কারাভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, এই আশঙ্কা করিয়া, শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যে, মন্দির-সংস্কার ও মন্দির-নির্ম্মাণে সমান ফল, সমান পুণ্য। ইহাও সামান্য উত্তেজক নহে। এই সম্বন্ধে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন বিষ্ণুসংহিতা হইতে নিম্নলিখিত বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন:—

"কূপারামতড়াগেষু দেবতায়তনেষু চ।
পুনঃসংস্কারকর্ত্তা চ লভতে মৌলিকং ফলম্।"

এ স্থলে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য। প্রস্তরে স্থাপত্যশিল্পের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষ সাধিত হয়; কিন্তু ইহা ব্যয়সাধ্য বলিয়া পাছে অনেকে নিরস্ত হন, এই আশঙ্কা করিয়া শাস্ত্রকারেরা পুণ্যের কেমন একটা মাত্রা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং এই ক্রমনির্দ্ধারণ দ্বারা প্রস্তরায়তন-নির্ম্মাণে কেমন উত্তেজনা করিয়াছেন। ধর্ম্মের এই আদেশ ও উত্তেজনায় আবিষ্ট হইয়া সকলেই দেবায়তন-নির্ম্মাণে মন দিলেন। কিন্তু একটি মহদনিষ্ট সাধিত হইয়াছিল। আবাসস্থানীয় স্থাপত্যে

লোকের তত মনোযোগ রহিল না। প্রাসাদ প্রভৃতিতে নির্ম্মাণের উৎকর্ষসাধনে অবশ্য তেমন শৈথিল্য দেখা যায় নাই, কিন্তু সাধারণের আবাসস্থলে দেবায়তন-সদৃশ উন্নতি দেখা যায় না; আমরা ক্রমশঃ এই সব কথার আলোচনা করিব।

এখন যেমন যে সে লোক স্থপতি হইতে পারে, প্রাচীনকালে তদ্রূপ ছিল না। স্থাপত্যশাস্ত্র আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের অঙ্গীভূত বলিয়া স্থপতির বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন হইত। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিরূপ ছাপ ধারণ করিলেও, সে শিক্ষার সামান্য অংশেরও উপযুক্ত নহি। সে শিক্ষায় সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ হওয়া চাই। "বাস্তবিদ্যা"য় কথিত আছে যে, "স্থপতিঃ স্থাপনাহ্বঃ স্যাৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ"। স্থপতির গুণাগুণ সম্বন্ধে বাস্তবিদ্যা হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইল; ইহা হইতে বুঝা যায় যে, স্থপতিরা অবজ্ঞার পাত্র ছিলেন না, পরন্তু বিশেষ সম্মানার্হ ছিলেন।

"ন হীনাঙ্গোঽতিরিক্তাঙ্গো ধার্ম্মিকস্তু দয়াপরঃ।
অমাৎসর্য্যোঽনসূয়শ্চ তান্ত্রিকস্তুভিজাতবান্॥
গণিতজ্ঞঃ পুরাণজ্ঞ আনন্দাত্মাপ্যলুব্ধকঃ।
চিত্রজ্ঞঃ সর্ব্বদেশজ্ঞঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
অরোগী চাপ্রমাদী চ সত্তব্যসনবর্জ্জিতঃ।
অনাম্যা দৃঢ়বক্ষুশ্চ বাস্তবিদ্যাদ্বিপারগঃ॥" (১)

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলি হইতে বুঝা গেল যে, স্থপতি হইতে হইলে ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সন্তব্যসনবর্জ্জিত, পুরাণজ্ঞ, অলুব্ধক প্রভৃতি হওয়া চাই; সুতরাং এ বিদ্যার চর্চ্চা যে ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ, ইহাতে আর বিস্ময়ের কারণ কি? "বিশ্বকর্ম্মপ্রকাশ" গ্রন্থে (২) উল্লেখ আছে যে, স্বয়ং শিবশম্ভু কর্ত্তৃক প্রাচীন বাস্তুশাস্ত্র কথিত হইয়াছিল।

"বহুক্তং শম্ভুনা পূর্ব্বং বাস্তুশাস্ত্রম্ পুরাতনম্।"

পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি হইতে বুঝা গেল যে, ভারতবর্ষ স্থাপত্য বা বাস্তবিদ্যা ধর্ম্মশাস্ত্রের অঙ্গীভূত ছিল, এবং এই কারণেই ইহা কত শতাব্দী ধরিয়া বিজাতীয় সংসর্গ ও তজ্জনিত বিক্ষোভে আপনার বিশেষত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

---

(১) বাস্তবিদ্যায়াম্ সাধনকথনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।
শ্রীযুক্ত গণপতি শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সম্পাদিত বাস্তবিদ্যা (Trivandrum Sanskrit Series.)

(২) বিশ্বকর্ম্মপ্রকাশ, প্রথম অধ্যায় (Benares Edition.)

আমার দেখিয়াই বলা যায়—'চিনি চিনি গো তোমায় ওগো বিদেশিনী'—চলিত বাজার হইলে সকলে সহজেও মুখে পড়িতে পারিত। কিন্তু এমন প্রবন্ধ কষ্ট করিয়াও পড়া উচিত। এর ভাষার কৌটায় কপাল চড় চড় করে বটে,—কিন্তু কাশীর পেয়ারাতেও বীচি থাকে।

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষের 'প্রথম দাগ' একটি গল্প।—অগত্যা। শ্রীনগেন্দ্রনাথ চন্দ্রের 'আমার' চারি চরণে সম্পূর্ণ কিন্তু সুন্দর। শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 'মহতের নিন্দা'য় দুই লাইনে দিব্য উপদেশ দিয়াছেন,—

'মহতের নিন্দা শুনি রেগো না হে কেউ,—
বাঘেরই পিছনে সদা ডেকে থাকে কেউ।'

মহৎ তাহা হইলে হইলেন—বাঘ। তা গৃহস্থকে সাবধান করিবার জন্য যদি কেউ ডাকে, তার মহতের ভক্তরা না চটেন, ত মন্দ কি? এ রফা বন্দোবস্তে, আশা করি, কাহারও আপত্তি হইবে না। শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর 'সেকেন পণ্ডিত' গল্পটি চলনসই। 'দেশের কথা' বেশ হইয়াছে। 'আলোক-দূত' একখানি সুরঞ্জিত চিত্র। চারু-রচিত ব্যাখ্যায় প্রকাশ, এই চিত্রের নারী ঘোর রাত্রি। মুখখানি অমাবস্যার রাত্রির মত 'গোমসা' বটে। এই অপরূপ আলোর অপেক্ষা করিতেছে।—অন্ধকারেই এই, আলো আসিবার পূর্ব্বেই আমরা সরিয়া পড়ি।

নারায়ণ। আষাঢ়।—'ধর্ম্মপ্রচারে রবীন্দ্রনাথ' কে লিখিয়াছেন, তাহা প্রকাশ নাই। বাণীর সৃষ্টিকর্ত্তা রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ লেখক হেঁয়ালিচ্ছলে নিষ্পন্ন করিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন,—গোপ্যং যোগেন যোগয়েৎ। 'বর্ম্মস্য তত্ত্বং' যেমন 'নিহিতং গুহায়াম্', তেমনই রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মপ্রচারের তত্ত্বও লেখকের বাগাড়ম্বরে, অপপ্রযুক্ত নজরুপে নিহিত—প্রচ্ছন্ন। তাই 'নারায়ণে'র নৈবেদ্যের চূড়ায় সন্দেশ! ইহাতে অনেক নূতন ও সাংঘাতিক সিদ্ধান্ত আছে। উপসংহারের সিদ্ধান্ত এই যে, 'আদর্শ মানুষ যিনি, আদর্শ মনুষ্যত্বের সাধক যিনি, তিনি জগতের সমস্ত দ্বন্দ্বে পা ঢালিয়া দিয়া, জীবনের শত-অসুন্দর ব্যাপারের কাদা-মাটিতে লিপ্ত হইয়া তাহারই মধ্য হইতে নিজের অন্তরে বাহিরের জগতে একটা উচ্চতর মহত্তর সুন্দর সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন সৃষ্টি করিয়া চলিবেন।' অবশ্য, ইহার সবটার মানে হয় না। যতটুকু অর্থ বুঝা যায়, তাহাই কি 'নারায়ণে'র creed? আদর্শ মনুষ্যত্বের সাধক বলিয়াই কি 'নারায়ণ' 'জীবনের শত অসুন্দর ব্যাপারের কাদা মাটী' একচেটিয়া করিতেছেন? শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষের 'নিঝুম রাতে' পড়িয়া বুদ্ধি নিঝুম হইয়া গেল। 'নিঝুম রাতে আমার হাতে কাঁপে পরশ তার।' 'প্রতি অঙ্গ কাঁদে মোর প্রতি অঙ্গ লাগি' নয়। শুধু কবির হাতে তার পরশ কাঁপে! আবার কবির 'নিঝুম চোখের আলোক বেয়ে তাহার অভিসার।' আশ্চর্য্য নয়? তাহার পর, তাঁর মুখটি কবির দৈন্যে মাখা, তাহা আবার ঘোমটায় ঢাকা। কবির দৈন্যের ঘেরাটোপের উপর আবার ঘোমটা। সুতরাং, বক্তব্যটুকু ঢাকাই রহিয়া গেল। 'রাতে সিঁথে তারা আঁকা ঝলে মাণিক-হার।' 'সিঁথে' ছন্দের অনুরোধে 'সিঁথ' হইয়া গিয়াছে।—'সিঁথেয়' 'সিঁথিই' পরে। কিন্তু কবি মাণিক-হার পরাইয়া দিয়াছেন। ইনিও রবীন্দ্রনাথের মত বলিতে পারেন,—'জানই স্যারের সকল কাজে originality!' 'অসাড় আঁধার হৃদয়ের উপমা,—তার

তাহাতে অনাহত গান ! নার—ব্রহ্ম। সুতরাং এইখানে কাব্যে দার্শনিকতা, সুতরাং সাত্ত্বিকতা মিলিয়া গেল। কবির 'বুকে মুখটি ঢাকি' এই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় জ্ঞানোদ্ধার, জীব-অভিব্যক্তির—বা ঘটস্থ কূট-চৈতন্য—ব্যাখ্যাই বলুন—'ঘাসিয়া উঠে থাকি থাকি !' ঘসিয়া নয়, 'ঘাসিয়া'। অর্থাৎ, তাহার ঘাস উপস্থিত। আবার—'নিবিড় তাহার কালো আঁখি বেড়ে চারি ধার।' কালো আঁখি 'নিবিড়' হইল ; সে আঁখি আবার চারি ধার—পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ—ঘিরিয়া ফেলিল। আট লাইনে যিনি এত অঘটন ঘটাইতে পারেন, তিনি শুধু কবি নন,—অঘটন-ঘটন-পটীয়ানও বটে। শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল 'আদিরসে' উপনিষৎ, অলঙ্কার, দর্শন, বিজ্ঞান, কল্পনা ও অনুভূতি দিয়া আদি-রসের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'সার্ব্বজনীন বাল-বর্ষা-প্রভাবে জীবের প্রজনন-প্রয়াসেও আনন্দ আছে।' শুধু তাই নয়, নিশ্চয়ই বৃদ্ধবয়সে তাহার আলোচনা-প্রয়াসেও আনন্দ নিতান্ত অল্প নহে। বিপিনবাবু গভীর গবেষণাসহকারে প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—'ইন্দ্রিয়সুখের লালসায় যেখানে নরনারী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট সেখানে এই আকর্ষণকে কাম কহে। এই কামও হেয় বস্তু নহে।' নিশ্চয়ই তাহা প্রেয়—আস্বাদন পড়িলে সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিবে না। বিপিনবাবু শাস্ত্রদর্শী। নিশ্চয়ই অধিকারী ও অনধিকারী কাহাকে বলে,—তাহা তাঁহার অবিদিত নাই ;- রসতত্ত্ব ও 'প্রজনন-তত্ত্ব' কি সর্ব্বজনপাঠ্য মাসিকের পৃষ্ঠায় এমন মুক্ত-ভাবে আলোচনা করিবার যোগ্য ? ইহাতে 'চিত্তে বিপরীত' হইবার সম্ভাবনা নাই ? রস—বিশেষতঃ এইরূপ গাঢ় আদিরস—যদি চুনিয়ায় এই ভাবে পড়াইয়া যায়, তাহা হইলে 'নারায়ণে'র মন্দিরও একটু পিছল হইয়া উঠিবে না ? মেঘদূতে যক্ষের কামই বুঝি আমাদের 'নারায়ণে'র মূলমন্ত্র। শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'উত্তরাধিকারী' গল্পে দেখিতেছি, 'যে কাঠ খাবে, সে আঙ্গরা * * *।' আমরা বাদ দিলাম, লেখক ও সম্পাদক সে জন্য দায়ী নহেন। চিত্তবাবু অসঙ্কোচে যাহা দু'হাতে 'নারায়ণে'র গায়ে মাখাইতে পারেন, আমরা তাহা সাহিত্যে মাখাইতে পারি না। এখনও চন্দনে ও উক্ত বস্তুতে 'গন্ধ-জ্ঞান' হয় নাই। তার পর, 'চালুনী বলে ছুঁচ তোর—' দ্রব্যটিতে অফুটি নাই, তাহার ধনিটি বাদ পড়িয়াছে। এমন পক্ষপাত ত 'নারায়ণে' শোভা পায় না। গল্পটি মন্দ নয়। শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের 'শ্রীমঙ্গলরসকারিকা' পড়িয়া আমরা পরম কৌতুক অনুভব করিয়াছি।

'যত ছিল নাড়া-বুনে, সব হলো কীর্ত্তনে ;
কাস্তে ভেঙ্গে গড়ালে কর্ত্তাল।'—

নমুনা দেখুন।—'আমরা ইহার যে প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা ১২৮৫ সালে লিখিত ; সুতরাং ইহা শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। অতএব, মূলগ্রন্থ যে ইহারই কিছু পূর্ব্বে বা সমসময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহা বলিতে কোনও বাধা নাই।' তোমার পক্ষে বাধা থাকিতে পারে না, তাহা এক আঁচড়েই বুঝা যাইতেছে। নকলের 'কিছু পূর্ব্বেই বা 'সমসময়েই' যে আসল রচিত হয়, তাহা নলিনী পণ্ডিতের পূর্ব্বে কেহ জানিত—না রাজেন্দ্রলাল, না হরপ্রসাদ, এমন কি সিল্‌ভ্যান লেভীও এ তত্ত্ব অবগত নন, তাহা আমরা হলপ্ করিয়া বলিতে পারি।—'এই আকারের ক চণ্ডি-(!)-দাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথিতে দেখিতে পাওয়া যায়।' শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথি কি জগতে একখানিই আছে ? তাহার পর পণ্ডিত সহস্রিয়া মতের

ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'এই সকল বিষয় * * বর্ণন করিতে অক্ষম' বলিয়াই বলিনী উপসংহার করিয়াছেন,—

'অতএব শুন ভাই পরকীয়া রঙ্গ।
রসিক হইয়া সবে পরকীয়া ভজ।'

এইটি নারায়ণের 'মটো' করিলে হয় না? শেষটা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপর অত্যাচার। এমন অনধিকার-চর্চ্চা সচরাচর দেখা যায় না। শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের 'মানস-বৃন্দাবন' বৈষ্ণব ভক্তগণের চিত্তবিনোদন করিবে। ইহা সেকালের ধরণে রচিত রূপক। উপভোগ্য। কমলের দুঃখের আর অন্ত নাই। 'প্রাণের সমস্ত আবেগ, মনের সকল কথা, হৃদয়ের সমস্ত মাধুর্য্য এক চুম্বনে নিঃশেষ হয়ে যায়', কিন্তু কমলের দুঃখ কিছুতেই শেষ হয় না। 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরে' দেখিতেছি, 'রাজনারায়ণ বাবু দুই নায়কের মধ্যে গৌরব ভাগাভাগি করিয়া দিবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু আধুনিক চেষ্টা ইহাকে ডিঙ্গাইয়া প্রায় সমস্ত গৌরবটাকেই দেবেন্দ্রনাথের হস্তে তুলিয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর।' এই অন্যায় দেখিয়া শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লাঠী-হস্তে পদীর ভাগ করিতে অগ্রসর। আশা করি, কিঞ্চিৎ গৌরব ওয়ারিসের জন্য অবশিষ্ট থাকিবে। কিন্তু কথা এই, এ গৌরব গেলেই কি দেবেন্দ্রনাথ নিঃস্ব হইয়া পড়িবেন? শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী 'অচিন-পাখী'র গান ধরিয়া 'অচেনা পাখী'কে নারায়ণের মন্দিরে ডাকিয়া দিয়াছেন। দেবকুমার ইতিমধ্যেই বৈরাগ্য-বিপিন-বিহার আরম্ভ করিলেন? 'যৌবনে যোগিনী' হইলেন? এখনও যে 'এক ছাত রোদ'। ৪র্থ শ্লোকে দেখিতেছি—'মিনতি করে জিগাই তোরে—' 'জিগাই' কি? শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'কোমলে কঠোর' উপভোগ্য। ইহাতে একচুল আঁশটে গন্ধ নাই, এই জন্য এই সংখ্যায় যেন একটু বাপছাড়া হইয়াছে। 'একটি মোকদ্দমার রায়' বেশ হইয়াছে।—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চল্‌তি ভাষা—বনাম সাধু ভাষা'র মামলায় ডিক্রী দিতেছেন,—'বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে কলিকাতায় চল্‌তি ভাষার title (স্বত্ব) স্বীকার্য্য হইল, কিন্তু possession (দখল) আপাততঃ সাধু ভাষারই থাকিবে। সাধু ভাষাকে চল্‌তি ভাষা eject (উচ্ছেদ) করিতে পারিবে না। উভয় পক্ষ নিজ নিজ খরচা বহন করিবে।' —আমরা বলি, তথাস্তু। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী ব্যারিষ্টার, তিনি আপীল না করিয়া ছাড়িবেন কি? 'দুনিয়ায় দুদিন' শুনিলেই ভয় হয়, তবু অগ্রসর হইয়াছিলাম; কিন্তু সব ধোঁয়া। শ্রীজগদম্বা দেবী বলিয়াছেন,—'এ ধোঁয়া মিটলে তবে আমার নিষ্কৃতি।' শুধু তাঁহার নয়, আমাদেরও ঐ কথা। এক সঙ্গে দু' কথা মিলিয়া গেল, দেখ, যদি ফলে। শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তে' একটিও নূতন কথা নাই। তবে অনেক 'কোটেসন' আছে। ইস্তক কাব্যপ্রকাশ, নাগাদ 'সারদামঙ্গল' ও 'পলাশীর যুদ্ধ।' তার পর মাইকেলের রচনার ত ছড়াছড়ি। ঠিক যেন 'কেট্-কেট্-পরম'। ঘি আছে, চিনি আছে, সুজী আছে, জল নাই। অর্থাৎ নিজের 'বস্তু' নাই। চিত্তরঞ্জন ত 'পার্ম্মানেণ্ট' সভাপতি হইয়াছেন। 'এগ্‌জামিনার' না হইয়াও কি ছাড়িবেন না?

পাঠান-যুগের একখানি সংস্কৃত প্রশস্তি।

দিল্লী মহানগরীতে সংস্থাপিত মিউজিয়ম বা সংগ্রহালয়ে পাঠান ও মোগল যুগের অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন রক্ষিত আছে। পাঠান আমলের যে ছয়খানি শিলাফলক-লিপি তথায় সংরক্ষিত আছে, তন্মধ্যে চারিখানি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। দিল্লীর পাঠান সুলতানগণের রাজত্ব-সময়েও যে মুসলমান নরপতিগণের কীর্ত্তিকথা সংস্কৃত ভাষায় কীর্ত্তিত হইত, এই লিপিচতুষ্টয়ই তাহার একটি প্রধান প্রমাণ। এই শিলালিপিচতুষ্টয়ের প্রথমখানি পাঠান সম্রাট্ গিয়াসুদ্দীন বল্‌বানের সময়ের, দ্বিতীয়খানি খিলজী-বংশের জালালুদ্দীন ফীরোজ শাহের সময়ের, এবং তৃতীয় ও চতুর্থখানি মহম্মদ শাহ তোগলকের সময়ের লিপি। তন্মধ্যে বল্‌বানের সময়ের লিপিখানি অবলম্বন করিয়া, বিগত ১৩ই আষাঢ় তারিখে "পূর্ব্ববঙ্গ সাহিত্য-সমাজে"র এক মাসিক অধিবেশনে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। সেই প্রবন্ধে শিলালিপির পাঠ ও বঙ্গানুবাদও প্রদত্ত হইয়াছে। প্রবন্ধটি "ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন" পত্রে যথা-সময়ে মুদ্রিত হইবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই শিলালিপিখানির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ, ইহাতে উল্লিখিত কয়েকটি ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের আলোচনা উপস্থাপিত হইতেছে।

এই প্রশস্তি-পাষাণ পঞ্জাবের রোহতক জেলার বোহর নামক গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা প্রথমতঃ দিল্লী সিটীর (Old Delhi) ১২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত পালম-নামক গ্রামে প্রতিষ্ঠিত একটি বাপী বা পুষ্করিণীর সহিত সম্পর্কিত ছিল। পাষাণখণ্ডের পূর্ব্ব অবস্থা প্রায় অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে। সমগ্র লিপি ২২ পংক্তিতে সম্পূর্ণ। ইহাতে সংস্কৃত ভাষায় নানা ছন্দে বিরচিত ৩০টি শ্লোক আছে। কেবল লিপি-প্রারম্ভে 'গণপতি ও শিবের নমস্কার ও ২১ পংক্তিতে লিপির রচনা-কাল-বিজ্ঞাপক সন-তারিখ সংস্কৃত গদ্যে লিখিত হইয়াছে। লিপির সংস্কৃত অংশ ত্রয়োদশ-শতাব্দীর নাগরী অক্ষরে লিখিত; কিন্তু শেষ পংক্তির ও তৎপূর্ব্ব পংক্তিদ্বয়ের কতক অংশ স্থানীয় ভাষায় [সম্ভবতঃ তৎস্থানে প্রচলিত আধুনিক নাগরী ভাষার অনুরূপ কোনও ভাষায়] রচিত, এবং নাগরী অক্ষরে লিখিত। লিপি-রচয়িতা কবি যোগীশ্বরের রচনা-রীতি মধ্যযুগের

সংস্কৃত-কাব্য-রচনা-রীতির তুল্য। লিপিতে যমক, অনুপ্রাস, শ্লেষ প্রভৃতি অলঙ্কারের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। এই পালম-লিপির শেষাংশে শারদা-অক্ষরের ব্যবহার দেখিয়া ডাক্তার ভোগেল লিখিয়াছিলেন যে, কেবল কাশ্মীরে ও পঞ্জাবের পার্ব্বত্য-প্রদেশেই যে এই অক্ষর প্রচলিত ছিল, তাহা নহে; ইহা পঞ্জাবের দক্ষিণে অবস্থিত সমতল ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হইত। সম্ভবতঃ কৃতবিদ্য-শ্রেণী নাগরী অক্ষরের ও জনসাধারণ শারদা অক্ষরের ব্যবহার করিতেন। এই জন্যই হয় ত, পালম-লিপির সংস্কৃত-অংশ নাগরীতে ও প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত অংশ শারদা-অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল। লিপির সংস্কৃত অংশের তাৎপর্য্য সংক্ষেপে প্রাদেশিক ভাষায় সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য লিখিত হইয়া থাকিবে।

পাঠান সুলতান গিয়াসুদ্দীন বল্‌বানের সময়ের দিল্লী ("ঢিল্লী") মহানগরীর "পুরপতি" উড্‌ঢর ঠক্কুর কর্ত্তৃক পালম বা পালম গ্রামে একটি বাপী বা পুষ্করিণীর প্রতিষ্ঠার কথাই এই প্রশস্তির প্রধান কথা। প্রশস্তির ২৬, ২৭ ও ২৮ শ্লোকে এই পুষ্করিণী বা বাপিকার কথা বিশদ ভাবে বর্ণিত আছে। তথাপি ডাক্তার ভোগেল কেন যে এই "বাপী" শব্দের ইংরেজিতে "well" শব্দ দ্বারা অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা চিন্তনীয়। উড্‌ঢরের পিতা হরিপাল "উচ্চাপুরী" নামক স্থানে বাস করিতেন বলিয়া লিপিতে উক্ত হইয়াছে। এই উচ্চাপুরী বর্ত্তমান সময়ে পঞ্জাবের বহাওয়ালপুর ষ্টেটের উচ্-নামক স্থান। ইহা এখন শতদ্রু, বিপাশা, চন্দ্রভাগা ও সিন্ধুনদের সঙ্গমস্থল হইতে কিছু দূরে অবস্থিত। কিন্তু প্রশস্তির ১৫ ও ১৬ শ্লোক হইতে পাওয়া যাইতেছে যে, এই "উচ্চাপুরী" তখন (অর্থাৎ লিপি-সম্পাদন-কালে) এই নদ-নদী-সঙ্গম-স্থলে অবস্থিত থাকিয়া স্বসৌন্দর্য্যে "সুরধুনী-তট-বাসিনী" অমরাপুরীকেও উপহাস করিত। উড্‌ঢরের পিতা হরিপালের বাসস্থান এই "উচ্চাপুরী"কে ডাক্তার ভোগেল কেন যে একটি গ্রাম মনে করিয়াছেন, তাহাও চিন্তনীয়। ত্রয়োদশ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, উড্‌ঢর ঢিল্লীপুরের "পুরপতি" ছিলেন। ডাক্তার ভোগেল "পুরপতি" শব্দের কি অর্থ হইতে পারে, তাহা বলিতে পারেন নাই। এই শব্দে পুরাধিপ বা "City Governor", অর্থাৎ নগর-শাসক বা নগর-রক্ষক হইতে পারে কি না, তাহাও বিবেচ্য। মনে হয়, সুলতান বল্‌বানের সময়ে উড্‌ঢর ঠক্কুরই দিল্লীর নগর-শাসক ছিলেন। নচেৎ, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করাইতে যাইয়া, ঠক্কুর মহাশয় কবি যোগীশ্বর দ্বারা এত প্রশস্ত প্রশস্তি রচনা করাইয়া লইয়া, তাহাতে সুলতানের গৌরব-ক্ষু

এত প্রকৃষ্টভাবে লিখাইয়া লইবেন কেন, এবং তাহাতে দিল্লী বা ঢিল্লী নগরীর পূর্ব্ব ইতিহাস ও বর্ত্তমান অবস্থার কথা এত বিশদভাবে রচনা করাইবেন কেন? উড়চর-ঠক্কুর মহাদেবের ভক্ত ছিলেন ["ইন্দুকলাবতংস-চরণদ্বৈধৈক-নিষ্ঠাত্মনে"]। তাই, নমস্কার-শ্লোক দুইটিতে "ভবতাপহর" হরের বন্দনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তৃতীয় হইতে পঞ্চম শ্লোকে দিল্লীর চতুর্দ্দিকে অবস্থিত ভূভাগের অর্থাৎ "হরিয়ান-ভূ" নামক প্রদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। যথা,—

"অভোজি তোমরৈরাদৌ চৌহাণৈস্তদনন্তরং।
হরিয়ানকভূরেষা শকৈর্নৈঃ শাস্যতেধুনা ॥ ৩ ॥
আদৌ সাহবদীনস্ততঃ পরং যু(খু)টুবদীন-ভূপালঃ।
জাতোথ সমুসদীন × পেরুজসাহির্ব্বভূব ভূমিপতিঃ ॥ ৪ ॥
পশ্চাজ্জলালদীনস্তদনন্তরমজনি মৌজরীন-নৃপঃ।
শ্রীমানালাবদীনো নৃপতিবরো নসরদীন-পৃথ্বীন্দ্র. ॥ ৫ ॥"

"এই হরিয়ান-ভূমি পূর্ব্বে তোমর-গণ-কর্ত্তৃক, এবং তদনন্তর চৌহান-গণ-কর্ত্তৃক শাসিত হইত। সম্প্রতি [লিপিসম্পাদন-কালে] ইহা শক-নরপতিগণ-কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছে। সর্ব্বপ্রথম সাহবদীন [Shahabu-d-din Ghori, A. D. 1191-1205] রাজা ছিলেন; তৎপর ভূপাল খুটুবদীন [Qutbu-d-din Aibak, A. D. 1205-1210], তৎপর সমুসদীন [Shamsu-d-din Altimash, A. D. 1210-1235], এবং (তৎপর) পেরুজসাহি [Rukmu-d-din Firoz Shah, 1235-1236], ভূমিপতি হইয়াছিলেন। তাহার পর, জলালদীন [Jalalu-d-din Raziyya, 1236-1240], তৎপরে মৌজদীন [Muizzu-d-din Bahram, A. D. 1239-1241] নরপতি হইয়াছিলেন; (তৎপরে) শ্রীমান নৃপতিশ্রেষ্ঠ আলাবদীন [Alau-d-din Mas'ud, A. D. 1241-1246] এবং তৎপরে পৃথ্বীন্দ্র নসরদীন [Nasiru-d-din Mahmud, A. D. 1246-1265] (রাজত্ব করেন)।"

ইতিহাসে দাস-বংশীয় বলিয়া প্রখ্যাত "শক" বা মুসলমান সুলতানগণের মধ্যে যে প্রথম আট জনের নাম এই শ্লোকত্রয়ে উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সুলতান রেজিয়া বেগমের [Sultan Raziyya] নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই প্রশস্তিতে সুলতানগণের নামগুলি সংস্কৃত আকারে অভিহিত হইয়াছে। ষষ্ঠ হইতে একাদশ শ্লোক পর্য্যন্ত কবি লিপি-সম্পাদন-কালের পাঠান সুলতান

গয়াসদীনের [Ghiyasu-d din Balbon, 1265-1287] সৌরাজ্য-গৌরব-কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। অষ্টম শ্লোকে এই সুলতান "হম্মীর" বা আমীর উপাধিযুক্ত অভিহিত হইয়াছেন; যথা, "শ্রীহম্মীর-গয়াসদীন-নৃপতিস্ সম্রাট্ সমুজ্জৃম্ভতে"। ষষ্ঠ শ্লোকের মর্ম্ম হইতে অবগত হওয়া যায় যে, এই সুলতানের রাজ্য পূর্ব্বদিকে গৌড়দেশ পর্য্যন্ত, পশ্চিমে গজ্জণ বা গজনী পর্য্যন্ত, এবং দক্ষিণে দ্রবিড়জনপদ ও সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সম্রাটের সৌরাজ্য-বিধানে সকল জনপদেই যে সুখশান্তি বিরাজ করিত, প্রজাবর্গও যে "অন্তঃসন্তোষপূর্ণ" ছিল, এবং অন্যান্য অনেক "ক্ষিতিপতি"ও যে তাঁহার সেবার জন্য রাজধানীতে গতায়াত করিতেন, তাহা এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। সপ্তম শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই নরপতির সৈন্যের গতি প্রাচ্যদেশে গঙ্গা-সাগর-সঙ্গম পর্য্যন্ত ও প্রতীচ্য-দেশে সিন্ধু-সমুদ্র-সঙ্গম পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। যথা—

"গংগাসাগরসংগমং প্রতিদিনং প্রাচ্যাং প্রতীচ্যামপি
স্রাড়ুং সিংধু-সমুদ্র-সংগমমহো যৎসৈন্যমাধাবতি।"

অষ্টম ও নবম শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, এই সুলতানের সেনা-তুরঙ্গের নিকট শত্রুসেনা অগ্রসর হইতে পারিত না, এবং অন্য দেশের নরপতিগণ তাঁহার প্রতাপাগ্নি সহ্য করিতে সমর্থ হইতেন না। গিয়াসুদ্দীনের অসামান্য রাজকীয় প্রভাবে সেই সম্রাটের অন্যান্য দেশের লোকেরা কিরূপ ভীত ও বিকম্পিত থাকিত, প্রশস্তির দশম শ্লোকে তাহার এক সজীব চিত্র সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। যথা,—

"যস্মিন্ দিগ্বিজয়-প্রয়াণকপরে গৌড়া নিরাড়ংবরা
অংধ্রা রংধ্র-পরায়ণা ভয়বশান্নিক্কেলয় × কেরলাঃ।
কর্ণা [টা *] অপি কংদরাশ্রয়পরা ভ্রষ্টা মহারাষ্ট্রকা-
স্ত্যক্তোর্জ্জা × কিল গূর্জ্জরাঃ সমভবন্ লাটা × কিরাটা ইব।"

"যিনি দিগ্বিজয়প্রয়াণে বহির্গত হইলে পর, ভয়বশতঃ গৌড়ীয়গণ আড়ম্বর-রহিত হইত, অন্ধ্র দেশীয়গণ রন্ধ্র পরায়ণ হইত, কেরলগণ কেলিলীলা পরিত্যাগ করিত, কর্ণাটগণ কন্দরে আশ্রয় লইত, মহারাষ্ট্রীয়গণ পলায়ন-রত হইত, গূর্জ্জরগণ বল-শূন্য হইত, এবং লাটদেশীয়গণ কিরাততুল্য হইয়া পড়িত।"

একাদশ শ্লোকেও কবি সুলতানের সুশাসনের বর্ণনা করিয়াছেন। শত শত মহাপুরীর অধিপতি গিয়াসুদ্দীনের রাজধানীর নাম ছিল "ঢিল্লী-মহাপুরী"। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শ্লোকে এই মহাপুরীর বর্ণনা আছে। এই সময়ে ঢিল্লীর অপর নাম ছিল "যোগিনীপুর"। এই নগরীর "পুরপতি" ছিলেন উদার-

চিত্র, দশরথস্তোত্র, দেবীবিরচিত উত্তরচরিত-নাম সুরক্ষা পুরুষ। [illegible] যে, পৃথ্বীরাজের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া মোগল সম্রাট শাহ-জহানের [illegible] পর্য্যন্ত বিভিন্ন সময়ে রাজধানী দিল্লী অনেক বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। যথা, "কইল রায় পিথোরা", "সিরি", "তোগ্লকাবাদ", "আদিলাবাদ", "মহম্মদপুর", "ফিরোজাবাদ", "পুরাণা কুইল", "সাহজহানাবাদ" ইত্যাদি।

তৎপর চতুর্দশ হইতে ষোড়শ শ্লোক পর্য্যন্ত, পূর্ব্বোল্লিখিত "উচ্চাপুরী"র বর্ণনা তৎপরে চতুর্বিংশ শ্লোক পর্য্যন্ত কবি প্রশস্তির প্রধান পুরুষ উত্তরের বিভিন্ন পুরুষের ও তাহার নিজ সন্ততির নামাদির বর্ণনা করিয়াছেন। তৎপরে ২৫ হইতে ২৯ শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, পথশ্রান্ত পথিকজনের ক্লান্তিবিনোদনের জন্য [illegible] ইরিণ গ্রামের পূর্ব্বে ও কুসুম্ভপুরের পশ্চিমে তট-বৃক্ষ-পরিশোভিত অতি রমণীয় বাপী বা পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি যে [illegible] অনেক অনেক বিশাল ধর্ম্মশালা ও সত্রাদি নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, [illegible] এই শ্লোকগুলিতে তাহারও উল্লেখ আছে। এই স্থলে বলা যাইতে পারে যে, "ঠট্টন" শব্দে সেই অঞ্চলের জমীদারকে বিজ্ঞাপিত করিত। ২৭-২৮ শ্লোকে বাপীর রমণীয়তা বর্ণিত হইয়াছে। ২৯শ শ্লোকে সংবিধাব উত্তরের [illegible] পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ৩০শ শ্লোকে প্রশস্তি-রচয়িতা কবি [illegible] নাম উল্লিখিত হইয়াছে। অবশেষে লিপির সন-তারিখ এইরূপে লিখিত আছে "সংবৎসরেষ্বিন্ বৈক্রমাদিত্যো সংবৎ ১৩৩৭ শ্রাবণ বদি ১৩ বুধে"। ইহা হিজরী মতে, এই তারিখ ১২৮০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুন, অথবা ১২৮১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট। সর্ব্বশেষে স্থানীয় ভাষায়, শারদা অক্ষরে, লিপিকর [illegible] আদেশ তাহাতে লিখিত হইয়াছে।

তখনকার "টিল্লী" নগরী "হরিয়ান" ["Military Memoirs of Mr George Thomas" নামক গ্রন্থে "Hurrianah" নামে উল্লিখিত] প্রদেশে অবস্থিত ছিল। এই "হরিয়ান প্রদেশ" বর্ত্তমান হিসার ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগকে সূচিত করিত। সুতরাং পূর্ব্বোল্লিখিত পাঠান-যুগের সংস্কৃত [illegible] লিপিতে উল্লিখিত "হরিয়ান" প্রদেশ বর্ত্তমান দিল্লীর চতুষ্পার্শ্বস্থ [illegible] ভাগকেই সূচিত করে। কিন্তু এখন যে স্থানে দিল্লী-মহানগরী অবস্থিত, [illegible] ত্রয়োদশ-চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই হরিয়ান-প্রদেশেই সন্নিবিষ্ট ছিল কি না, [illegible] নিঃসংশয়ে বলা কঠিন। ভৌগোলিক নাম যে অনেক সময় পূর্ব্বসূচিত স্থান [illegible] সরিয়া পড়িয়াছে, এই প্রশস্তির "টিল্লী" বা "টিল্লিকা" [প্রাদেশিক ক্ষুদ্র,

১১ পংক্তিতে "ঢিল্লী" বলিয়া উল্লিখিত] নামটি তাহার একতম উদাহরণ হইতে পারে। অদ্য পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত প্রাচীন লিপির মধ্যে "ঢিল্লী" নগরীর নাম এই প্রশস্তিতে সর্ব্বপ্রথম উল্লিখিত বলিয়া সম্প্রতি ধরা যাইতে পারে। প্রশস্তিতে পালম-গ্রামের নামও একবার সংস্কৃতে "পালম্ব" নামে (১৭ পংক্তিতে) এবং পরে আর একবার স্থানীয় ভাষায় "পালম"-নামে (২১ পংক্তিতে), অভিহিত হইয়াছে। এই স্থান Delhi বা Shah-Jehanabad হইতে ১২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত, এবং ইহা Rajputana-Malwa Railwayএর দিল্লী হইতে দ্বিতীয় ষ্টেশন। লিপির "ভুসুণ্ডপুর" কোন্ স্থান, তাহা জানা যায় নাই।

এই স্থলে প্রশস্তিতে সংক্ষেপে বর্ণিত দুই একটি ঐতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধে দুয়েকটি কথার আলোচনা হইতে পারে। যত বার হিন্দু-সাম্রাজ্যের সংহতি-শক্তি শিথিল বা লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তত বারই ভারতবর্ষের কি উত্তরাপথে, কি দক্ষিণাপথে, স্থানীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহের নরপতিগণ স্বয়ং-প্রধান হইয়া পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ-পরবশ হইয়া সাম্রাজ্যের অধঃপতনের কারণ হইয়াছিলেন। বাস্তবিকই হিন্দু-সাম্রাজ্যের অধঃপতনের কারণ রাজগণের পরস্পরের অন্তর্বিদ্রোহ, এবং এই জন্যই বহিঃশত্রুর আক্রমণ-পথও পরিষ্কৃত হইত। ভারতীয় আর্য্যগণের শক্তিক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বিজাতীয় শক-প্রভৃতির বংশোৎপন্ন রাজপুতজাতির অভ্যুদয় হইয়াছিল। খৃষ্টীয় নবম-শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজপুত-জাতীয় চৌহান বংশের অধীনে আজমীর প্রদেশ শাসিত হইত, এবং মালবের পর-মারগণ, গুজরাটের চৌরাগণ, মেওয়ারের গিহলটগণ ও বুন্দেলখণ্ড-অঞ্চলের চন্দেলগণ, সকলেই রাজপুত-জাতীয় ছিল। আলোচ্য শিলালিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, দুর্জ্জনপাল রাজত্বের পূর্ব্বে হরিয়ান-প্রদেশ প্রথমতঃ তোমরগণ ও পরে চৌহাণগণ শাসন করিয়াছিল। ইতিহাস-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, প্রায় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে অনঙ্গপাল-নামক তোমরবংশীয় এক রাজপুত-প্রধান শক-বিধ্বস্ত দিল্লীনগরীকে কেন্দ্র করিয়া একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি এই বংশের প্রায় ১৯ জন নরপতি কোনও প্রকারে রাজ্য চালাইবার পর, দ্বাদশ শতাব্দীতে এই তোমরবংশেরই আর এক জন—অনঙ্গপাল-নামধারী শেষ নরপতি, আজমীরের চৌহাণবংশীয় বিশালদেব নামক নরপতি কর্ত্তৃক পরাজিত হন। এই যুদ্ধের ফলে দিল্লী-নগরী চৌহাণগণের হস্তগত হয়। তোমর-নরপতি অনঙ্গপাল বিজেতা বিশালদেবের পুত্র সোমেশ্বরকে স্বজামাতৃপদে বরণ করেন। দিল্লীর তোমরপতি অনঙ্গপাল আজমীরের চৌহাণপতি বিশাল-

দেবের সহিত এইরূপ এক সন্ধিসর্ত্তেও আবদ্ধ হইলেন যে, এই বৈবাহিক-মিলন হইতে তোমর-রাজের যে দৌহিত্র জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনিই তোমর-শাসিত দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন। এই দৌহিত্রই পৃথ্বী-বিজ্রুত পৃথ্বীরাজ। তিনি চৌহাণরাজের পৌত্ররূপে আজমীর, এবং তোমররাজের দৌহিত্ররূপে দিল্লী প্রাপ্ত হইয়া, যুক্তরাজ্য দিল্লী-আজমীরের অধিপতি হইলেন। চৌহাণপতি পৃথ্বীরাজ কিরূপে কান্যকুব্জাধিপতি রাঠোর জয়চন্দ্রের সহিত শত্রুতা করিয়া বিদেশীয় মুসলমানগণের আক্রমণের সহায়তা করিয়াছিলেন, ইতিহাস-পাঠকের তাহা অবিদিত নাই। উভয় রাজপুতের পরস্পর-সংঘর্ষের ফলে, তাঁহাদের রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে, সমগ্র ভারতবর্ষই একরূপ শক বা মুসলমান বিজেতাদের হস্তগত হইয়াছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, এই উভয় রাজপুত নরপতির এক সাধারণ শত্রু উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু উভয়ের মিলিত চেষ্টায় সেই সাধারণ-শত্রুর বিপক্ষতাচরণের শক্তি বা সঙ্কল্প, উভয়ের কাহারও ছিল না। এই শত্রু সাহবদ্দীন মহাম্মদ ঘোরী, অর্থাৎ পালন-লিপির চতুর্থ শ্লোকে উল্লিখিত "সাহবদীন" নামক পাঠান সুলতান। এই শত্রু প্রথমতঃ একবার চৌহাণ-নরাধিপ পৃথ্বীরাজের সঙ্গে স্থাণ্বীশ্বর প্রাঙ্গণে যুদ্ধ করিয়া পরাভূত হন, কিন্তু সেই প্রাঙ্গণেই দ্বিতীয় যুদ্ধে চৌহাণপতি পরাজিত হইয়া বিজেতাদের হস্তে প্রাণত্যাগ করেন। এই যুদ্ধের ফলেই ভারতে পাঠান-সাম্রাজ্যের বা মুসলমান-সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। হিন্দুবিজেতা সাহবদ্দীনের পর কোন্ কোন্ পাঠান নরপতি দিল্লী হইতে সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, আলোচ্য লিপির ৪।৫ শ্লোকে আমরা তাঁহাদের নামোল্লেখ প্রাপ্ত হইয়াছি। সাহবদ্দীনের রাজ্যসময়েই গৌড়বঙ্গের শেষ হিন্দু-নরপতি লক্ষ্মণসেনের রাজ্যও সাহবদ্দীনের সেনাপতি কুতুবদ্দীনের সহায়ক বখ্‌তিয়ারের হস্তগত হয়। লিপিতে উল্লিখিত তৃতীয় নরপতি সমসুদ্দীন [Shamasu-d-din Altimash] বাঙ্গালায় এক বিদ্রোহ নিবারণ করেন। তিনি প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল সুলতান-রূপে রাজত্ব করেন। এই নরপতির সময় হইতেই ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে মোগলগণ সময়ে সময়ে ভারত-আক্রমণের সূচনা করিয়াছিল। কিন্তু লিপিতে উল্লিখিত অষ্টম সুলতান নসরদ্দীন [Nasiru-d-din Mahmud] তদীয় প্রধান অমাত্যের সাহচর্য্যে মোগলগণের অত্যাচার হইতে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসিবর্গকে কিয়ৎপরিমাণে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পাঠান সুলতানগণের মধ্যে এই নসরদ্দীন তাঁহার সততা, সদাশয়তা, ধর্ম্মপরায়ণতা ও বিদ্যানুরাগের

জন্য প্রখ্যাত ছিলেন। তিনি রাজা হইয়াও ফকীরের মত কালাতিপাত করিতেন। তাঁহার সম্বন্ধেই আখ্যান শ্রুত হয় যে, তিনি সামান্যরূপ আহারেই পরিতৃপ্ত থাকিতেন, এবং গ্রন্থ-প্রতিলেখ প্রস্তুত করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, তদ্দ্বারাই তাঁহার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি মনে করিতেন,—রাজা—রাজকোষের অধিকারী নহেন—কেবল তাহার সংরক্ষকমাত্র। সুলতানের হইয়া, অধিকাংশ সময়ে তাঁহার ভগিনীপতি গিয়াসুদ্দীন বল্‌বানই রাজ্যশাসনকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। নসরুদ্দীন অনপত্য-অবস্থায় পরলোকে গমন করেন, এবং তৎপরে তাঁহার রাজ্য বল্‌বানের হস্তগত হয়। বল্‌বান ১২৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। পালম-লিপিতে উক্ত হইয়াছে যে, বল্‌বানের সময়ে ভারতের সর্ব্বত্রই সৌরাজ্য অনুভূত হইত; সকল জনপদের প্রজাবর্গই তাঁহার সুশাসন-ফলে অন্তঃসন্তুষ্ট ছিল। লিপিতে বল্‌বান-সম্বন্ধে বর্ণিত বিষয়ে অতিরিক্ত অতিশয়োক্তি আছে বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ নাই। কারণ, ইতিহাস-পাঠেও জানা যায় যে, বাস্তবিকই বল্‌বানের প্রভাব অল্প ছিল না। ভারতে মুসলমান-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছায়, তিনি নানারূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। তুরুষ্ক দাসগণের আধিপত্য কমাইবার জন্য তাঁহাকে অনেক হত্যাকাণ্ডেও লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। দাসরাজপদ্ধতি দূর করিয়া বংশানুক্রমিক রাজত্বপদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। নিজের প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত করিবার জন্য তিনি সৈন্য-সংস্কার করিয়াছিলেন। লিপিতেও তাঁহার সেনার উৎকর্ষ-কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। গৌড়ীয়গণ তাঁহার অভিযান-ভয়ে ভীত হইয়া নিরাড়ম্বর বা নির্গর্ব্ব হইত, লিপির এই কথা পাঠ করিয়া বল্‌বানের সময়ের একটি ঘটনায় কথার স্মরণ হয়। তিনি গৌড়ে তুগ্রল খাঁ কৃত বিদ্রোহের দমন করিয়া, তাঁহাকে নিহত করেন, এবং তৎপরে তাঁহার স্থলে নিজপুত্র বগ্‌রা খাঁকে গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। এই সুলতান মেউয়াটের রাজপুতগণকে পরাভূত রাখিয়াছিলেন। মোগলগণের অত্যাচারে ও আক্রমণে মধ্য-এসিয়ার বিভিন্ন-জাতীয় নরপতিগণ লাঞ্ছিত হইয়া ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন; তাঁহাদের অনেককে সম্রাট্ বল্‌বান আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। অদম্য উৎসাহের ফলেই তিনি সর্ব্বত্র অপ্রতিহত আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মোগলগণের সহিত পঞ্জাবে যুদ্ধ করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হত হইলে পর, সম্রাট্ স্বয়ং পুত্রশোকে ১২৮৭ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সংবরণ

করেন। ইহার সময়েই প্রাচীন হিন্দুরাজধানী দিল্লী-নগরী মুসলমান-সভ্যতার কেন্দ্র হইয়াছিল। এই নগরীকে কবি কি মনে করিয়া ১২শ শ্লোকে "পাতাল-পুরীর দৈত্যনিলয়া" অর্থাৎ পাতালপুরীর ন্যায় দৈত্যগণের আশ্রয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বলা কঠিন। বল্‌বানের রাজ্যসময়ে মেওয়াটের রাজপুতগণও এই নগরী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া উৎপাত করিত। তাহারাই কি দৈত্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে? মোগলগণও যে এই নগরীতে আসিয়া অত্যাচার উৎপাত না করিত, তাহাও বলা যায় না।

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।

বাঙ্গালার প্রাচীন মহাকাব্যের প্রকৃতি।

(১)

[সার:—মহাকাব্য—প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন মহাকাব্য—শ্রব্যকাব্য—প্রাচীন মহাকাব্য ও পঞ্চলক্ষণাত্মক পুরাণ—মহাকাব্যে দেশের ও দশের কথা—গান বা পালা—ভাষা ও ভাব—আখ্যান-বস্তু এবং Execution—বাস্তবত্ব ও আদর্শ-সৃষ্টি—বিশিষ্ট দেবদেবীর পূজা-প্রচলন—বিভিন্ন মহাকাব্য-শ্রেণী ও তাহাদের প্রতিপাদনীয় বিষয়—শ্রীকৃষ্ণচরিত ও পদাবলী সাহিত্য কেমন করিয়া এক অখণ্ড মহাকাব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে—জাতীয় রক্ষণশীলতা ও সংস্কৃত সাহিত্যের নিকট বাঙ্গালা মহাকাব্যের ঋণ—স্বপ্নে প্রত্যাদেশ—বাঙ্গালা মহাকাব্য-কারগণের পুঙ্খানুপুঙ্খ গ্রাহিতা ও কাব্যবিষয়ের ক্রমবিকাশ—মহাকাব্য ও সাধনা—ভক্তিভাবের নিদর্শন—প্রাচীন মহাকাব্য ও কাব্যকলা—কাব্যকলাবিষয়ে ত্রুটী—বর্ণনায়, চরিত্রচিত্রণে অদ্ভুত কৃতিত্ব—বাঙ্গালা জীবন এবং বাঙ্গালা মহাকাব্যের প্রভাব—বাঙ্গালার ইতিহাস ও প্রাচীন বাঙ্গালা মহাকাব্য—উপসংহার।]

অতীতের সহিত বর্ত্তমানের সম্বন্ধ বড়ই ঘনিষ্ঠ। বর্ত্তমান, অতীতের গৌরবময় সত্তাকে আচ্ছন্ন করিলেও, তাহার পুণ্যস্মৃতি, উজ্জ্বল কীর্ত্তি, বা বিশাল শক্তিকে অবহেলা করিয়া দাঁড়াইতে পারে না; তাই মানবের আচারে বিচারে, আহারে বিহারে, অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে চিরনবীনতার অভিব্যক্তির অন্তরালে আমরা প্রাচীন শক্তির অঙ্গুলিসঙ্কেত লক্ষ্য করিতে পারি। মানবের যাহা সৃষ্টি, তাহা ঈশ্বরের সৃষ্টির ধারাকেই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। মানবের চিন্তা বিশ্বসৃষ্টি আদ্যন্তহীন সমস্যায় আপনাকে হারাইবার প্রয়াস পায় নাই। বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। প্রতীচীর জ্ঞান-গবেষণা, বিজ্ঞান দর্শন ও শিল্পকলার প্রভাবে প্রভাবান্বিত বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যও বুঝি এ চিরন্তন

বিধি লঙ্ঘন করিতে পারে নাই। অতুল-প্রতিভান্বিত বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা কবিও দেশ-বিদেশের বনভবনে প্রচারিত জ্ঞান, ধর্ম্ম, কাব্য-কাহিনী'র মমতা মহিমা, গাম্ভীর্য্যগরিমা হইতে আপনাকে—আপনার চিন্তাশক্তিকে দূরে রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার সাধনা, তাঁহার বন্দনা-ছন্দ এ দেশেরই জিনিস। তবে কালের অগ্রগতির শক্তি, রুচি ও রসের তারতম্যে ও শিক্ষাদীক্ষার বৈলক্ষণ্যে প্রাচীন নবীন আকার ধারণ করিয়াছে; কোথায়ও বা প্রাচীন অন্ধ, অজ্ঞান, দিশাহারা হইয়া কোথাকার নিভৃত কোণে আশ্রয় লইয়া গুমরিয়া মরিয়াছে। নবীন বিদেশী বন্ধুর মত আসিয়া, হাসিয়া, উজ্জ্বল, উদাত্ত, গম্ভীর বেশে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাই রামপ্রসাদ, রজনীকান্ত, রবীন্দ্রনাথের আদি দেশের মধ্যেই মিলে—মধুসূদনের বা হেমচন্দ্রের চিন্তাশক্তির আদি উৎসের জন্য দেশান্তরে অন্বেষণ করিতে হয়। বুঝি বা প্রাচীন বাঙ্গালা মহাকাব্য-সাহিত্যের ভাবনদী অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত লোকলোচনান্তরালে আছে, শুধু ভবিষ্যতে বিমলোজ্জ্বল-ভাবে নব-শক্তিতে বহিবার জন্য।

সাহিত্য হইল শক্তির অভিব্যক্তি। সকল প্রকৃত জাতীয় সাহিত্যই এক হিসাবে যেমন সনাতন, যেমন তদ্দেশকালের দৃঢ় বন্ধনকে লঙ্ঘন করিয়া থাকে, অন্য হিসাবে তেমনই উহারা স্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট, অর্থাৎ দেশ-কালের ভিতর দিয়া জাতির প্রকৃতির উপচয়-অপচয়ের, আচার-বিচারের, যোগ-বিয়োগের, এক কথায় যুগধর্ম্মিত্বের আভাস-উহাদের মধ্য দিয়াই মিলিয়া থাকে। বাঙ্গালার প্রাচীন মহাকাব্যের সাহায্যে আমরা বাঙ্গালীর—কোনও বিশিষ্ট-সম্প্রদায়ভুক্ত বাঙ্গালীর নহে—সারা জাতিটার স্বরূপ চিত্র পাইয়া থাকি, সে চিত্র লইয়া জগতের দরবারে দেখাইতে গেলে আমাদের লজ্জায় বা ঘৃণায় নিতান্ত অবনত হইতে হয় না। আজ আমরা সভ্যজগতের দরবারে আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্যের পশরা লইয়া যিয়া বড় আদর পাইয়াছি বলিয়া যেন আমরা অতীত সাহিত্যের শক্তি ও গুরুত্বের বিষয়ে সন্দিহান বা উদাসীন না হই। বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে প্রকৃতিতে ও আকৃতিতে অনেকটা বিভিন্ন;—একের পক্ষে যাহা শক্তির পরাকাষ্ঠা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, অন্যের পক্ষে তাহা নগণ্য বিশেষত্ব, একের পক্ষে যাহা দুর্ব্বলতা, অন্যের পক্ষে তাহা নিন্দনীয় না হইতে পারে। এক আসিয়া অন্যের স্থানে বসিয়াছে মাত্র—একই কার্য্য একই ভাবে করিতেছে কি না, ইহার বিবেচনাই সমালোচকের ও ঐতিহাসিকের নিকট বিকট সমস্যা।

লোকশিক্ষার আকর, দেশের ও দশের ভাবের দর্পণ মহাকাব্য কালবলে অন্তর্হিত। এখন তাহার স্থানপূরণ করিতে কত নবাগত বস্তু চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সে অভাব তেমন ভাবে পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া ত মনে হয় না। নাটক, নভেল, সংবাদপত্র অনন্ত শক্তি লইয়া বিদেশ হইতে আসিয়াছে, কিন্তু এ দেশের চিন্তারাজ্যের অরাজকতার সহিত দ্বন্দ্বে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, অশান্তির স্থানে শান্তিস্থাপন করিতে পারিয়াছে বলিয়া, মনে হয় না। তাই মধ্যে মধ্যে চিন্তাশীল মনস্বিগণের পল্লীকবি কবিকঙ্কণ ও কৃত্তিবাসের জন্য করুণ পরিদেবনা পাষাণকঠিন বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যকে ভেদ করিয়া ফুটিয়া উঠে; আর প্রাচীন কীটদষ্ট পুঁথির সঙ্কলয়িতা আপনার কঠোর পরিশ্রমকে ধন্য জ্ঞান করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন। সত্যসত্যই বাঙ্গালা প্রাচীন মহাকাব্যের প্রকৃত প্রকৃতির পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যাহা গিয়াছে, তাহার মূল্য ও সারবত্তা কত অধিক। তে হি নো দিবসা গতাঃ—বাঙ্গালার সাহিত্যিক যে শক্তিকে কালের কঠোর বিধানে হারাইয়াছেন, তাহার পুনঃপ্রাপ্তির পক্ষে কত সাধনা, কত উদ্বোধনের প্রয়োজন।

সংস্কৃত সাহিত্যের পঞ্চলক্ষণাত্মক পুরাণের মত বাঙ্গালা মহাকাব্যগুলি দেশের লোকশিক্ষার চরম উপাদান ছিল। আদি কবি বাল্মীকির পুণ্যরামায়ণী কথা সম্বন্ধে আর্য্যকবি যে আশার আকাঙ্ক্ষার ভাব অভিব্যক্ত করিয়াছেন—

পাপ্মভ্যশ্চ পুনাতু বর্দ্ধয়তু চ শ্রেয়াংসি নেয়ং কথা
মঙ্গল্যা চ মনোহরা চ জগতো মাতেব গঙ্গেব চ।

প্রাচীন বাঙ্গালা মহাকবিগণের পুণ্যস্মৃতি, নিসর্গসুন্দর কাব্যকাহিনী তাহা অপেক্ষা ন্যূনশক্তির বা হীন আদরের দাবী করে নাই। সমাজের শ্রেয়ঃ, সমাজের মঙ্গল, সমাজের শক্তি, সমাজের জ্ঞান তাঁহাদেরই কাব্যে নিবদ্ধ, এবং তাঁহাদের কাব্যসমূহই আবার ঐ সকলের পরিমাণনির্দ্দেষ্টা। দেবদেবীর সহিত হিন্দুর দৈনন্দিন জীবনের কর্ম্মসূত্র নিবদ্ধ ছিল। তাই বন্দনা বা বন্দনা হইতেই সকল মহাকাব্যের আরম্ভ সূচিত হইয়াছে। জগৎসৃষ্টির সম্বন্ধে বৈদিক ঋষির ঋত ও সত্যের উদারতর চিন্তা সম্বন্ধে তখনকার কবির কাব্য দেশবাসীকে সহজভাবে সরল প্রণালীতে দার্শনিক যৎকিঞ্চিতের অবতারণা করিয়া শিক্ষা দিয়াছে। শ্রীচণ্ডীমঙ্গলের বা শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের সরলচিত্ত কৃষক শ্রোতৃগণ অল্পবিস্তর হইলেও,

আদি দেব নিরঞ্জন যাঁর সৃষ্টি ত্রিভুবন পরম পুরুষ পুরাতন।
৬ শূন্যেতে করিয়া স্থিতি সৃজিলেন মহামতি সৃজনের উপায় কারণ॥

নাহি কেহ সহচর দেবতা অসুর নর সিদ্ধ নাগ চারণ কিন্নর।
নাহি তথা দিবানিশি না উদয় রবি শশী অন্ধকার আছে নিরন্তর। * * * * *
পৃথিবী-পাতাল স্বর্গ নাহি সুরাসুরবর্গ দিবানিশি রবিশশী নাই।
নাহি জল জীবজন্তু বিষম প্রলয়ে কিন্তু এক প্রথা আছেন গোঁসাই।
শূন্যভরে সনাতন মনে হলো ত্রিভুবন সৃজনপালন অভিলাষ।
কে বুঝিতে পারে মর্ম্ম আপনি হ'লেন ব্রহ্ম বিশ্ববীজে শরীর প্রকাশ।
নবীন নীরদশ্যাম জিনি কত কোটী কাম রূপ অনুপম কত তাঁর।
জিনি কত কোটী ভানু অতিশয় শোভা জনু তনুরুচি খণ্ডে অন্ধকার।

প্রভৃতি পালার বা গানের অংশ হইতে, সৃষ্টি সম্বন্ধে ধর্ম্মসংহিতাজ্ঞানবিদগ্ধ ব্যক্তিগণ যে তত্ত্বের মর্ম্ম গ্রহণ করিতেন, তাহার আভাস পাইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিত। * ধর্ম্মের মর্ম্ম, পুরাণের পুণ্য-কথা, সংসারের বৈষয়িক উপদেশ, সকলই তাহারা কবির গানের দ্বারা লাভ করিত। তাহাদেরও হৃদয়ের কথা সহৃদয় কবি নিপুণভাবে ফুটাইয়া তুলিতেন; সমবেত রাজশক্তি, পাত্রমিত্র সভাসদ্ তাহা হইতে শিক্ষা, দীক্ষা, লোকহিতৈষণার প্রেরণা পাইতেন। আজকাল দৃশ্যকাব্যে যাহা ফুটাইবার চেষ্টা হয়, তখন শ্রব্যকাব্যে সে উদ্দেশ্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত। কবির কাব্য দেশের ও দশের জিনিস। কাজেই তাহা প্রকাশ্য লোকসভায় গীত হইত। কবির কাব্য গায়ক-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সর্গ, অথবা চলিত কথায় পালা, দিনের পর দিন আসরে গীত হইত; শিষ্ট অশিষ্ট, রাজা প্রজা সকলে সাদরে আগ্রহসহকারে সে গান, সে পালা শ্রবণ করিয়া ধন্য হইতেন। গায়কের দল ধর্ম্মের নামে কবির কবিত্বের প্রসারকল্পে চেষ্টা করিত। তাহাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী কবির বিনয়ে সময়ে সময়ে বেশ মিলিয়া যাইত। কোনও কোনও এরূপ কবির apology বড়ই প্রাণস্পর্শী বলিয়া মনে হয়। চণ্ডীমঙ্গলের অন্যতম কবি মাধবাচার্য্যের গ্রন্থে পাই—

তাঁহার তনুজ আমি মাধব আচার্য্য। ভক্তিভরে বিরচিনু দেবীর মাহাত্ম্য॥
আমার আসরে যত অশুদ্ধ গায় গান। তার দোষ ক্ষমা কর, কর অবধান॥
ত্রুটি তালভঙ্গ (অন্ত) দোষ না নিবা আমার। তোমার চরণে মাগি এই পরিহার॥

শুধু বঙ্গসাহিত্যে কেন, পৃথিবীর যে কোনও জাতীয় সাহিত্যের মহাকাব্যসমূহে এই সরলে সুন্দরে, উজ্জ্বলে মধুরে মিলন লক্ষ্য করিয়া থাকি। এই

* বৌদ্ধযুগের পুঁথি রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ ধর্ম্মপূজাপদ্ধতির গ্রন্থ হইলেও, তাহাতে স্থানে স্থানে মহাকাব্য-প্রকৃতি ভরপুর (predominent); কাজেই প্রসঙ্গক্রমে সে রচনাতেও সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে বৌদ্ধ-মত-প্রকাশ-দ্বারা সাধারণ শ্রোতার চিত্তবিনোদনের চেষ্টা লক্ষিত হয়।

সকল গ্রন্থে উদারতা আছে, সঙ্গে সঙ্গে নৈসর্গিকতা আছে, প্রাচীনতা আছে, কৌলীন্যও—(কাঞ্চনকৌলীন্য নহে)—আছে,—কল্পকলার সত্যসুন্দর দীপ্তি আছে, বাস্তবতার তরল বিলাসও আছে। কিন্তু ভণ্ডামী নাই, উচ্ছৃঙ্খলের উল্লাসতা নাই, নটনটীসুলভ বাচালতা ও কৃত্রিমতা নাই;—সে সকল এক্ষণে সমাজের ছবি। সমাজের অবস্থাই কাব্যের বর্ণনীয় বস্তুর বিচার-প্রণালী স্থির করিয়া দিয়াছে। Teutonic French Epicএর সমালোচনা প্রসঙ্গে এক জন সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক * বলেন—

"The form of society in an heroic age is aristocratic and magnificent. At the same time, this aristocracy differs from that of later and more specialised forms of civilisation. It does not make an insuperable difference between gentle and single. The heroic age cannot dress up ideas or sentiments to play the part of characters. If its characters are not men, there are nothing, not even thoughts or allegories; they cannot go on talking unless they have something to do; and so the whole business of life comes bodily into the epic poem."

প্রাচীন বাঙ্গালা মহাকাব্য সম্বন্ধে এই মন্তব্য কত সুন্দররূপে প্রযুক্ত হইতে পারে। আর বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশালতা সার্ব্বজনীনতা ও পরিণতির হ্রাসের জন্য উহার ভাবুকতা ও উৎকট রূপকানুরাগ কত পরিমাণে দায়ী, তাহা অনুধাবনের বিষয়। সাহিত্য আদর্শের সৃষ্টি ও পুষ্টি করিবে সত্য বটে, কিন্তু শুধু মায়াবালীর কল্পিত ধাত্রীধর্ম্মিত বাল্যকথাধিকার মত † ফাঁকা আকাশে ভাসিয়া বেড়াইলে কল হইবে কি? আদর্শ ও বাস্তবতার সুন্দর সমতল ভূমির উপর কাব্যকে অভিষিক্ত করিয়া লইতে হইবে; তবেই তাহা দেশের চিত্তিদশের উপভোগ্য হইতে পারিবে।

দেশের সাহিত্য দশের উপভোগ্য করিতে হইলে অলঙ্কার ও ভাবের পারিপাট্যের দিকে দৃষ্টি কম রাখিয়া আখ্যানবস্তু (plot) ও সর্ব্বসাধারণের প্রতি সাধারণের মনোযোগ অধিকপরিমাণে আকৃষ্ট করিতে হইবে। এই সাহিত্যিক সত্যের সন্ধানে কবির লোকশিক্ষা-শক্তি খর্ব্ব হইয়া পড়ে। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর এবং রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রভৃতিতে ভাব ছাড়িয়া ভাষায় আলিঙ্গনের প্রয়াস, সমাজের দলের কথা ছাড়িয়া কতক অংশের ছায়া-প্রতিচ্ছায়ায় রসচর্ব্বণতার সৃষ্টি প্রভৃতি নানা কারণে বাঙ্গালায় মহা

* W. P. Ker—Epic and Romance—Eversely Erhon P. 7.

† প্রবন্ধী—১৩শ পরিচ্ছেদ।

কাব্য সাহিত্য আপনার বিশাল ব্যাপ্তি ও শক্তি হারাইতে বসিল; বিলাসপ্রিয় নৃপাত্মজদের ও তাঁহাদের চিত্তানুবর্ত্তী পারিষদ্‌গণের তুষ্টিসাধনেই কবির লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে যে শক্তির ক্রিয়া দেখি, সেই ক্রিয়া এখানেও পরিলক্ষিত হয়। বাঙ্গালার Popular Epic ধীরে ধীরে Court Epicএ পরিণত হইয়া আপনার মহিমা হারাইতে বসিল। Emaciation (অভাব-দণ্ডীর ভাষায় 'অমন্দ অভিযোগ') নৈসর্গিক প্রতিভার স্বাভাবিক হইয়াও প্রাচীন মহাকাব্যের প্রসাদ ও প্রভাবের পথে কণ্টক সঞ্চারিত হইল। সে স্রোতের গতি আর ফিরিল না, এখনও ফিরে নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা এপিকগণের মহাকাব্য, ভিন্ন পথে হইলেও, সেই এক প্রবাহের দিকে, সাধারণের উদ্দেশ্য হারাইয়া সম্প্রদায়বিশেষের মন যোগানর দিকেই ধাবিত হইয়াছে;—সকল ফুলের মধুকণা সংগ্রহ করা, বিভিন্ন পাত্রের সাহায্যে মধু-বিতরণ, বারভূঁয়া যোগ পাত্রের নিখিল ক্রিয়াকলাপ, ও বিরাটের প্রভার মর্ম্মবেদনা, (গোগালা সোমঘোষের করুণ কাহিনী), নিত্য নৈমিত্তিক বিলম্বস্তুতিবাদী, পঞ্চকেশ নীতিবিদের তরলচপল নীতি, এ সকলই বঙ্গীয় সাহিত্যলক্ষ্মীর হৃদয় হইতে বিদায় লইয়াছে। পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের পরিবর্ত্তন কতক পরিমাণে ইহার কারণ হইলেও, সকল স্থলে এগুলির বিদায়ে আমাদের গৌরবের নহে;—সর্ব্ব-মানবের হৃদয়ে অর্দ্ধ-আদর্শবিগতের যে উজ্জ্বল ছবি নয়ন মন ভরিয়া কবি ফুটাইয়া তুলিতেন, তাহা স্থূল মানবের Realism (বস্তুতন্ত্র) ও আদর্শজগতের idealism (আদর্শতন্ত্র) রূপ তুলিকার সহিত বর্ত্তমান যুগের মহাকবিগণের নিত্যপরিবর্ত্তনশীল চিত্রসমূহে মিলে না। তখনকার চিত্রে একটা তৃপ্তি, একটা শান্তির উপাদান ছিল। এখনকার চিত্রে উন্মাদনা ও অতিক্রিয়ার বিকট প্রকাশ। একটীতে হৃদয়ের সহিত পূর্ণমাত্রায় পরিচয় হয়; অন্যটীতে অনেকাংশে মস্তিষ্কের চিন্তার সাক্ষাৎ উপলব্ধি ঘটে। সেই জন্যের মন directly তদ্গতভাবে স্পর্শ করিবার প্রয়াস বর্ত্তমান যুগের মহাকাব্যে খুব অল্পই দেখা যায়।

সংস্কৃত সাহিত্যের পুরাণ গ্রন্থসমূহের সহিত সাদৃশ্য আরও বিস্তৃত ভাবে উল্লেখ করা চলে। সংস্কৃত পুরাণ যেমন সকল পৌরাণিক দেবদেবীর প্রতি ভক্তি জন্মাইলেও, বিশেষ কোনও এক দেবতার—ত্রিমূর্ত্তির কোনও এক নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তির প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তির প্রচার করিয়াছে, বাঙ্গালা মহাকাব্যও সেইরূপ ভাবে মধ্যযুগের প্রধানপর্য্যায়গণ্য দেবতাসমূহের উৎকর্ষখ্যাপন করিলেও,

কোনও এক বিশিষ্ট দেবতাকে (শিব, লক্ষ্মী, চণ্ডী, মনসা প্রভৃতি) সাধনীয় ও অবলম্বনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। কোনও কোনও পুরাণে (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত) যেমন কোনও এক বিশিষ্ট দেবতার লীলার ব্যাখ্যা ও বিচার আছে, প্রাচীন বাঙ্গালার এক শ্রেণীর মহাকাব্যেও সেইরূপ কোনও এক সাধনার ধনের উপাসনা-তত্ত্ব নিহিত আছে। বিশিষ্ট-দেববিদ্বেষী পুরাণসমূহের মত বিশিষ্ট-দেববিদ্বেষী বাঙ্গালা মহাকাব্যও আছে। আপন দেবতার অদ্বিতীয় শক্তি-খ্যাপনে তাহারা নিত্য উন্মুখ। পদ্মাপুরাণের কবি মনসার সর্ব্বদেবাতিশায়ী মহিমার কথা কি সরল ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—

মনসার ঘট যেবা করয়ে স্থাপন। তিন কুল হয় তার স্বর্গেতে গমন।

* * * *

শ্রীপদ্মাপুরাণ পুঁথি থাকে যার ঘরে। গৃহদাহ নাহি হয় মনসার বরে॥—বিজয়গুপ্ত।

পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে পুরাণ-গ্রথন, লৌকিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও গৌরবের জন্য মহাকাব্য-রচনা। বাঙ্গালার ঘরে ঘরে লোকাচারের যে ধর্ম্মমূলত্ব ও ধর্ম্মপ্রাণত্বের প্রকটন সম্পন্ন বা সন্তর হইয়াছে, এই মহাকাব্যরচয়িতা কবিগণ তাহার কতক সহায়তা করিয়াছেন। শ্রুতি যেমন স্মৃতির মূল অবলম্বন, পৌরাণিক ধর্ম্মও সেইরূপ পরবর্ত্তী যুগে লৌকিক ধর্ম্মের অনন্ত শাখা-প্রশাখা-ক্রমে বিস্তারের মুখ্য অবলম্বন। স্মৃতির চর্চ্চাপ্রসঙ্গে যেমন শ্রুতির চর্চ্চা অতুলন সহায় হইয়াছিল, লৌকিক ধর্ম্মে বিস্তারের কার্য্যেও পৌরাণিক ধর্ম্ম ও পৌরাণিক সংস্কৃত গ্রন্থ তেমনই আদরের ও আগ্রহের জিনিস হইয়াছিল। তাই চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল প্রভৃতি মহাকাব্যের পার্শ্বেই আমরা মূল রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের 'ভাষা' অনুবাদ পাইয়া থাকি। বস্তুতঃ সংস্কৃত পৌরাণিক সাহিত্যই বাঙ্গালার মহাকবিগণের আদর্শ ও মূলস্বরূপ ছিল বলিলে অসঙ্গত বলা হয় না।

অনুবাদ-গ্রন্থসমূহের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক। সংস্কৃত কাব্যসমুদ্র হইতে ভাবরত্ন, ভক্তিশক্তি মন্থন করিয়াই বাঙ্গালার মহাকাব্য সাহিত্য ধন্য হইয়াছে। বৈষ্ণব সাধকের পদাবলী সাহিত্য এক কৃষ্ণমঙ্গল মহাকাব্য * ব্যতীত আর কি? পূর্ব্বরাগ, অভিসার, মিলন, বিহার, প্রেমবৈচিত্ত্য, রসোদ্গার, বিরহ, পুনর্ম্মিলন প্রভৃতি বিভিন্ন পালার ভিতর দিয়া বিরাট

* পদকল্পতরু, পদসমুদ্র প্রভৃতি কোষকাব্য হইতে (বিভিন্ন পদাবলী-রচয়িতার পদসমূহে যে মহাকাব্যের বীজ ও চরিত্র বর্ত্তমান) তাহা স্পষ্ট প্রতিভাত হইবে।

পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের এক ভক্তিচিত্র, সাধনা রাজ্যের মহিমময়ী মানসী প্রতিমা, বিশ্বপ্রেমের অফুরন্ত ভাণ্ডার, ললিত মধুর ভাষায় অমলোজ্জ্বল ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। নবদ্বীপচন্দ্র প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মহাকাব্য-চরিত সমূহেই বল, মনসামঙ্গলে, চণ্ডীকাব্যে, শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে, শীতলামঙ্গলেই বল, সকল কাব্যেই ছন্দে, ভাবে, উপাখ্যানে সংস্কৃত সাহিত্যের দ্বার হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া, সংস্কৃত শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, কবিগণ আপনাদিগকে চরিতার্থ মনে করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর পণ্ডিতী বাঙ্গালা ভাষা যেমন ভব্য-সংস্কৃত-বেশ-পরিধানেই অভ্যস্ত ছিল, তেমনই এই সকল প্রাচীন মহাকবিগণের ভাবাবলী সংস্কৃতগর্ভ হইয়াই নিতান্ত মহিমময়ী হইত। কাব্যকলার দিক্ দিয়া এ অনুকরণের একটী মাত্রা, একটা সীমানির্দ্দেশ থাকা বাঞ্ছনীয় বটে; কিন্তু প্রাচীন কবি কখনও কখনও এ বিষয়ে সকল গণ্ডী অতিক্রম করিয়া মুক্তহস্তে দেবভাষার প্রাপ্য দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। পৌরাণিকের অবতার-বাদ বাঙ্গালা মহাকাব্যরচয়িতার নিকট নবভাবে জাগ্রত হইলেও, পুরাতনের গন্ধ তাহাতে আছে। বাঙ্গালা মহাকাব্য-সমূহের নায়কনায়িকাগণ প্রধানতঃ শাপগ্রস্ত স্বর্গভ্রষ্ট দেব, অপ্সরা, কিন্নর;—সাধনার কাব্যে (ভক্তি-কাব্যে) তাঁহারা স্বয়ং ভগবান্, বা তাঁহারই ঈশ্বর। কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান্ স্বয়ং—আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পতিতপাবন দয়াল ঠাকুর তাঁহারাই পরম প্রেমের চরম অবতার। যেখানে কাব্যকাহিনীর আখ্যানবস্তুতে ঐতিহাসিক ধারার (historical element) সত্তা আছে, সেখানেও কবি (উদাহরণ—শ্রীধর্ম্মমঙ্গল কাব্য) অতিপ্রাকৃত দিব্য শক্তির অবতারণা করিয়া বর্ণনীয় বিষয়ের গাম্ভীর্য্য ও স্বকীয় দেবভক্তির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। প্রাচীন মহাকাব্যের প্রকৃতিনির্ণয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের নিকট তাহার ঋণ, অবশ্য উল্লেখযোগ্য কথা;—ইহাকে জাতীয় রক্ষণশীলতার (conservatism) দৃষ্টান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। মূল সংস্কৃত মহাকাব্যের আলঙ্কারিক-প্রদত্ত লক্ষণেও এই রক্ষণশীলতার অংশ বিচক্ষণ কাব্যালোচকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকিবে।

শুধু সংস্কৃত সাহিত্যের নিকট কেন, প্রত্যেক কবি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের রচনা হইতে অবাধে যথেচ্ছ সাহায্য পাইয়াছেন। উপাখ্যানভাগের শিল্পকলায়, ঘটনাবিন্যাসে প্রায়ই পরবর্ত্তী কবিগণ পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের প্রদর্শিত পথে চলিয়া তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়াছেন। কোনও বিশিষ্ট লৌকিক ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট মহাকাব্যেরই সকল রচয়িতা ক্রমে ক্রমে সেই ঘটনাগ্রথনকে

প্রতিপাদ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার শ্রীচণ্ডীকাব্যে বলরাম, মাধবাচার্য্য প্রভৃতির সাধনার উপাদানের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র, শঙ্কর প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী কবির পালার অনুসরণেই কবি রামেশ্বরের 'শিবায়ন' রচিত হইয়াছে। কাণা হরিদত্ত, বিজয়গুপ্ত প্রভৃতি কত কর্ম্মিগণের পুঞ্জীভূত চেষ্টার ফল লইয়া কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ তাঁহাদের মনসার পালা বাঁধিয়াছেন। রামাইপণ্ডিত, ময়ূরভট্ট, মাণিক গাঙ্গুলী, খেলারাম, রূপরাম, সীতারাম প্রভৃতিরই মালমশলা কবিরত্ন ঘনরামের শ্রীশ্রীধর্ম্মমঙ্গলে সযত্নে বিন্যস্ত হইয়াছে। ইংরেজী বা সংস্কৃত সাহিত্যে এরূপ পুচ্ছগ্রাহিতা মিলে না—এবং তাহার কারণ এই,—ইংরেজী বা সংস্কৃত সাহিত্যে কোনও মহাকাব্য স্পষ্ট-রূপে কোনও বিশিষ্ট লৌকিক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের দেবতা বা তাহার কীর্ত্তিকলাপ লইয়া রচিত নহে।—এই পুচ্ছগ্রাহিতার ফলে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের দৃঢ়ত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে;—দেবতা যুগে যুগে এই ভাবের কবিসম্প্রদায়কে পাইয়া তাহার উপর আপনার কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়াছেন।

আর এরূপ না করিয়াও কবিগণের গত্যন্তর ছিল না। কবিগণেরই কাব্যে পাইয়া থাকি, দেবতা তাঁহাদের শরণাপন্ন হইয়া পড়েন, স্বপ্নে তাঁহারা অভীষ্ট দেবতাবিষয়ক মহাকাব্য রচনা করিতে প্রত্যাদিষ্ট হন। এই প্রত্যাদেশের গোহাইএর কথা বিভিন্ন লৌকিক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সাহিত্যিক প্রবর্ত্তকগণ সকলেই স্বীকার করেন। কেবল বৈষ্ণব কবি শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিচিত্র-পদাবলীতে বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চরিত-মহাকাব্যে এরূপ কোনও প্রত্যাদেশের উল্লেখ নাই। স্বনামধন্য কবিকুলাগ্রগণ্য কবিকঙ্কণ কি বলিতেছেন, শুনুন :—

শুন ভাই সভাজন, কবিত্বের বিবরণ এই গীতি হইল যেমতে।
উরিয়া নায়ের বেশে কবির শিয়রদেশে চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে॥
* * * * *
ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে নিদ্রা গেনু সেইখানে চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে॥
—করিয়া পরম দয়া দিয়া চরণের ছায়া আজ্ঞা দিল করিতে সঙ্গীত।
করে লয়ে পত্রমসী আপনি কলমে বসি নানাছন্দে লিখিল কবিত॥

মনসার ভাসানের রচয়িতা বিজয়গুপ্তের প্রত্যাদেশ-কথা বা স্বপ্নকথা আরও কৌতূহলপ্রদ। তাহা হইতে একটু উদ্ধৃত করা যাউক্—

শ্রাবণ মাসের রবিবারে মনসাপূজনী। দ্বিতীয় প্রহর রাতি নিদ্রা যায় স্বামী॥
নিদ্রায় ব্যাকুল লোকে না জাগে এক জন। হেনকালে বিজয়গুপ্ত দেখিল স্বপন॥
* * * * *

গা তোলো রে আমার পুত্র কত নিদ্রা যাও। শিয়রে বসনা তোমার চক্ষু মেলি চাও॥
আজু নিশি অবসানে এড়িয়া বসন। গীতছন্দে রচ কিছু আমার স্তবন।
মনে কিছু না ভাবিও মুই দিলাম বর। না বুঝিয়া বল যদি হবে মিত্রাক্ষর॥

সত্যসত্যই তখন দেবদেবীর উপর দৃঢ় বিশ্বাস এইরূপই ছিল। দেবতার প্রত্যাদেশ লঙ্ঘন করা কঠোর প্রত্যবায় বলিয়া গণিত হইত। মধ্যযুগের বঙ্গদেশের, অথবা বঙ্গদেশে কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের সভ্যতাতে এই দেবভক্তি অপূর্ব্বরূপে ফুটিয়া উঠিয়া সাহিত্যকে সার্থক করিয়াছিল। পুরাণকার বলেন—'কবিত্বং দুর্লভং লোকে শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা'। এই সুদুর্লভা শক্তিই মানুষের ঈশ্বর-সাধনার পথ-নির্দ্দেশে অদ্ভুত সহায় ছিল। সেদিনও, প্রাচীন যুগের অবসানে, রামপ্রসাদ প্রভৃতি কবিগণের সঙ্গীতে যে সাধনার ধারার লক্ষ্য পাই, তাহা প্রাচীন মহাকাব্যকারগণের কাব্যসমূহে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। যদৃচ্ছাক্রমে উদ্ধৃত একটী সন্দর্ভ হইতে এ সাধনের মহত্ত্বের ও অকপটতার পরিচয় মিলিতে পারে। শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের কবি ঘনরাম নায়ক লাউসেনের মুখ দিয়া যে সাধনসাম গাহিয়াছেন, তাহা তাঁহার অকৃত্রিম ইষ্টদেবতার প্রতি ভক্তির পরিচায়ক ;—

প্রেমে অঙ্গ গদগদ প্রমাদে প্রভুর পদ-পঙ্কজ পরম পরিসর।
সেবিয়া সোনার কায় ধ্যান করি বর্ম্মরায় ধরাতলে ধূলায় ধূসর॥
প্রভু পরাৎপর ব্রহ্ম অনাদি অনন্ত ধর্ম্ম বিশ্ববীজ অখিল আধান।
সূক্ষ্মশূন্য সনাতন নিরাকার নিরঞ্জন নিত্যানন্দ নির্গুণ নিধান॥
তোমার মহিমা শেষ ভবধিধি হৃষীকেশ সনক সনন্দ সনাতন।
না পেলে নিগম ভেদ আগম পুরাণ বেদ তপে জপে যোগে যোগিগণ॥
আমি নিন্দ্য মন্দমতি কি জানি স্তুতি স্তুতি কিবা মোর ভকতির দশা।
চারি বেদে অনুপাম পতিতপাবন নাম শুনে সবে হয়েছে ভরসা॥

বৈষ্ণবের পদাবলীর প্রতি পত্রে—শ্রীকৃষ্ণচরিত-মহাকাব্যের প্রতি অংশে প্রত্যংশে, এবং উহাদেরই আদর্শ রচিত ভক্তিসুধাপানবিহ্বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর চরিত-কাব্যসমূহের প্রতি অধ্যায়ে এই ভাবের—ভক্তিসরলতার, পুণ্যকোমলতার, পূর্ণ পতিতপাবনী ধারার লীলা দেখিতে পাই। প্রাচীন মহাকাব্যের—প্রাচীন বাঙ্গালার ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনে এই লোকধর্ম্মের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা জাতীয় জীবনে অস্পষ্ট ছাপ রাখিয়া গিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে একটী প্রয়োজনীয় কথার অবতারণা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। যাঁহারা প্রাচীন গ্রীক্ আদর্শের মহাকাব্যের প্রকৃতির পর্য্যালোচনা

করিয়াছেন,—Aristotleএর মতে An epic treats of one grand, complex, entire action,—অথবা যাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে একরসপ্রধান উদাত্ত-ঘটনা-বহুল সংস্কৃত সাহিত্যের মহাকাব্যের ওজস্বিতার ও প্রাণশক্তির নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে প্রাচীন বাঙ্গালা মহাকাব্যে art অথবা কলা-কৌশলের অভাব দেখিয়া বিস্মিত ও হতাশ হইবেন। তুলনা সকল ক্ষেত্রে সুখদায়ক নহে। শুধু artএর দিক্ দিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা মহাকাব্যের বিচার করা চলে না। Art (কাব্যকলা) যাহা করিতে পারে না; প্রকৃতির সুন্দর লীলা-খেলা তাহাও সুন্দরভাবে মিলাইয়া দিতে পারে। Art বা criticism এর কঠোর আইনকানুন দ্বারা প্রাচীন বাঙ্গালা মহাকাব্যের দোষোদ্ঘাটন করাতে বিশেষ নৈপুণ্য বা শক্তির সূচনা হয় না। নির্ম্মম সমালোচক অধিকাংশ গ্রন্থে কবিপ্রয়াসের একটা লক্ষ্যহীন উদাসীনতা (diffusion and indifference) একটা অনতিরসাল বাচালতা, একটা সমতাজ্ঞানের হানির (want of proportionএর), একটা বিরাট কেন্দ্রশূন্যতার আভাস পাইয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে কবি-প্রতিভার বিচার হয় না। ইংরাজী সমালোচক There is an art that defies all art, এই প্রবচনের দ্বারা যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, প্রধান বাঙ্গালা মহাকবিগণকেও সেই শক্তিটীর অদ্বিতীয় অধিকারী বলিয়া মনে হয়। কাব্যকলার একান্ত অভাব যে তাঁহাদের গ্রন্থে আছে, তাহা কোনও দুরন্ত সমালোচকও জোর করিয়া বলিতে ভরসা করিবেন না। বর্ণনার নিখুঁত পারিপাট্যে, সৌন্দর্য্যের ললিতোজ্জ্বল চিত্রে, চরিত্র-চিত্রণের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্যে বিস্মিত, মুগ্ধ, পুলকিত হইবেন না, এমন পাঠক বিরল। কবিকঙ্কণের 'কলিঙ্গকামিনী'-বর্ণনের নিম্নোদ্ধৃত বাক্যচিত্রটী কোন সহৃদয় সৌন্দর্য্যসেবী পাঠক নয়ন মন হইতে অপসৃত করিতে পারিয়াছেন?—

অপরূপ হের আর দেখ ভাই কর্ণধার কামিনী কমলে অবতার।
ধরি ঘানা বাম করে উগরয়ে করিবরে পুনরপি করয়ে সংহার॥
কমল কনকরুচি যাহা রথা কিবা শচী মদনসুন্দরী রমাবতী।
নরবতী কিবা রমা চিত্রলেখা তিলোত্তমা সত্যভামা রম্ভা অরুন্ধতী॥
রাজহংসবর জিনি চরণে নূপুরধ্বনি দশ নখে দশ চন্দ্র ভাসে।
কোকনদ-গর্ব্ব হরি বেষ্টিত আর কস্তুরী অঙ্গুলি চম্পক পরকাশে॥

বাঙ্গালা মহাকাব্যের সহিত বর্ত্তমান নাটক নভেলের সামঞ্জস্যের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই বিষয়ে বাঙ্গালার কবি তাঁহাদের আদর্শ সংস্কৃত পৌরাণিক কবিগণকে বহু দূরে ফেলিয়া রাখিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে কালিদাস

কবির কাব্যে খাঁটী বাঙ্গালার ছবি দেখিয়া আমাদের মনে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দের উদয় হয়। অবশ্য সকল কবিই যে এ 'ফোটো' সুন্দররূপে তুলিতে পারিয়াছেন, তাহা নহে। তবে কবিকঙ্কণের ভাঁড়ুদত্ত, ঘনরামের কর্পূর সেন প্রভৃতি চরিত্র হইতে বর্ত্তমান অধঃপতিত বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশের মূল কারণ লক্ষ্য করিতে পারি। অন্য দিকে মনসাকাব্যের চাঁদ সদাগর, ঘনরামের কালকেতু প্রভৃতি চরিত্র-চিত্র হইতে বাঙ্গালীর স্থিরপ্রতিজ্ঞা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও দেবদ্বিজে ভক্তির স্পষ্ট আভাস পাইয়া থাকি। বাঙ্গালীর চরিত্রে কতক গুণ ছিল বলিয়া বাঙ্গালী তখনও নিতান্ত অধঃপতিত হয় নাই। বাঙ্গালার সাহিত্যিক তাঁহার আবেষ্টনের চতুঃপার্শ্বস্থ বাস্তব ব্যক্তিবৃন্দের চরিত্র চিত্রিত করিয়া তাঁহার গ্রন্থকে কাব্যসম্পদে, তত্ত্বে, সত্যে, সারে সবল, ঐশ্বর্য্যশালী ও সুন্দর করিতে পারিয়াছেন। বর্ত্তমান বাঙ্গালার ঔপন্যাসিক ও নাটককারকে উদাত্ততার গৌরবের বাস্তব ছবি দেখাইতে হইলে, নিজের দেশকাল হইতে দূরে, বহু দূরে, অনন্ত অতীতে পাখা লইয়া উড়িতে হয়;—রাজস্থানের কর্ম্মিগণ, মহারাষ্ট্রের বীরবৃন্দ, প্রতীচ্য মহাদেশের কর্ম্মকুশল কীর্ত্তিশালী জননায়কসংঘ, অথবা রামায়ণ মহাভারতের পুণ্যশ্লোক মনীষিসবরাই তাঁহাদের প্রধান উপজীব্য হইয়া থাকে। বর্ত্তমানের আবেষ্টনের কলুষ জলবায়ুতে মহত্ত্বের শক্তিসঞ্চার ঘটে না।

পুরুষচরিত্র সম্বন্ধে প্রাচীন মহাকবিগণের পক্ষ হইতে যে দাবী করা হইল, স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধেও তাহা অপেক্ষা অধিকতর গৌরবের দাবী করা যায়। বাঙ্গালী নরনারী খুল্লনা, কুল্লরাকে সতী, সাবিত্রী, সীতা অপেক্ষা কম আদরের ও ভক্তির চক্ষে দেখেন না। বাঙ্গালার মজ্জায় মজ্জায়, ধাতুতে ধাতুতে এই মনস্বিনী রমণীগণের চরিত্রশক্তি স্বচ্ছসুন্দরপ্রবাহে খেলা করিয়াছে, এবং করিতেছে।

যাঁহারা বাঙ্গালা সমাজের গতিস্থিতির ধারা-পর্য্যবেক্ষণে নিপুণ, তাঁহারাই বর্ত্তমান বাঙ্গালীর গৃহধর্ম্মে এই মহাকাব্যসমূহের প্রভাব বুঝিতে পারিবেন। বাঙ্গালী হিন্দুর মহাকাব্যের ভিতর দিয়া তাহার কালক্রমাগত, রীতি, নীতি, লোকাচার, তাহার গৃহের সরল দুর্ব্বলতা ও সমাজের উজ্জ্বল মধুর পবিত্রতা শান্ত-সুন্দর-ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। বাঙ্গালার অতীত ইতিহাসের গঠনকল্পে এই সকল মহাকাব্য হইতে যথেষ্ট উপাদান সংগৃহীত হইতে পারে। এগুলি পাকা ঐতিহাসিকের মূল্যবান দলীল। আবার বাঙ্গালার প্রকৃত ধাতু বুঝিয়া যাঁহারা বাঙ্গালায় জাতীয়তার নবীন উদ্বোধনের পুরোহিত হইতে চাহেন, তাঁহাদেরও এগুলিকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। বাঙ্গালী

কতদিনে এইগুলির প্রকৃত সার্থকতা বুঝিয়া উঠিতে পারিবে, আপনার ঘরের জিনিসের দাম জানিয়া পরের দ্বারে দ্বারী হইবার অবমাননা ও অপরাধ হইতে নির্মুক্ত হইবে, তাহা কে বলিবে? *

শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

বাগদাদ।

১

ইতিহাস, উপন্যাস ও কবিতা—এই তিনের সংযোগে কল্পনা এক একটি স্থানের সঙ্গে এক একরূপ স্মৃতির সংযোগ করে; নামের সঙ্গে সঙ্গে সেই স্মৃতি মনে উদিত হয়। 'বৃন্দাবন'—মনে করিলেই কলনাদিনী কালিন্দীর কূলে বিহগ-বিরাবমুখরিত কদম্বতমালকুঞ্জে বিশালায়তলোচনা কৃষ্ণপ্রেমবিলাসিনী গোপাঙ্গনা-দিগের বিলাসক্ষেত্রে রাসবিহারীর রাসলীলার কথা মনে পড়ে। 'মক্কা'—বলিলেই আরবের মরুমধ্যে মেঘলেশহীন নীলাম্বরের চিত্রপটে মসজেদ-মিনারের গলিত-কাঞ্চনদ্যুতিরবিকরদীপ্ত শোভা মনে পড়ে। 'আগ্রা'—বলিলেই নদীকূলে স্থাপত্যবিলাসী সাহজাহানের অক্ষয় প্রেমের মূর্ত্ত্য-নিদর্শন তাজ-সমাধির কথা মনে হয়। পারসী প্রবাদের কথায় যে ইস্‌পাহান লাহোর না থাকিলে, "নিসফ্ জাহান" অর্থাৎ অর্দ্ধ-পৃথিবী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত, সেই ইস্‌পাহানের নামে গোলাববাগের সৌরভ মনে পড়ে। আর 'বাগদাদ' বলিলে আরব্য-উপন্যাসের সেই স্বপ্নপুরীর কথা স্মৃতিপথে সমুদিত হয়। এক দিন সমগ্র প্রাচীখণ্ডে বাগদাদের মত সমৃদ্ধ নগর আর ছিল না। এই পথে প্রাচী-প্রতীচীর বাণিজ্যপ্রবাহ প্রবাহিত হইত; উষ্ট্রপৃষ্ঠে সকল দেশের মূল্যবান দ্রব্য এই বাগ-দাদের বাজারে নীত হইত; টাইগ্রীসের প্রবাহে সহস্র সহস্র তরণী পণ্য বহন করিয়া বাগদাদের বিরাট বন্দরে উপনীত হইত। যে ঐতিহাসিক ১০৫৮ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন, সেই কাতিব বলিয়াছেন,—এক সময়ে বাগদাদে ৬০ হাজার হামাম—অর্থাৎ স্নানাগার ছিল; প্রত্যেক হামামে অন্ততঃ পাঁচ জন করিয়া চাকর ছিল; প্রত্যেক হামামের কাছে পাঁচটি করিয়া মসজেদ ছিল। এই বাগদাদে চারিটি সুফীসম্প্রদায়ের দুইটির প্রবর্ত্তন; আবদুল কাদের ও ওমর সোরাবার্দ্দী—উভয়েই এই বাগদাদে সমাহিত। এই বাগদাদের খালিফাদিগের

* দশম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

ঐশ্বর্য্যের কথা আজ প্রবাদের মত সর্ব্বত্র পরিচিত। এই বাগদাদের প্রাসাদের দ্বার হইতে বাহির হইয়া নিশীথে খালিফা হারুণ-রসিদ প্রজার মনের ভাব জানিবার জন্য ছদ্মবেশে তাহাদের সঙ্গে মিশিতেন। আর এই বাগদাদের প্রাসাদে জোবেদা বাস করিতেন। প্রাসাদের বিলাসকক্ষে বিচিত্র নক্সায় বর্ণ-বৈচিত্র্যবহুল কোমল পারস্যদেশজাত গালিচা শোভা পাইত—কক্ষপ্রাচীর ও হর্ম্ম্যতল সেই গালিচায় আবৃত। গালিচার উপর জরীর কাজ-করা মখমলের গদীতে বসিয়া জোবেদা হারুণ-রসিদকে যে সব গল্প শুনাইতেন, বুঝি সেই সবই একত্র গ্রথিত হইয়া সাহারজাদীর (নগরজাতার) আরব্যোপন্যাসে পরিণতি লাভ করিয়াছে। এই বাগদাদের ধনীর প্রাসাদে—হাবসীরক্ষিরক্ষিত অন্তঃপুরে বারাণসীর জরীর কাজ-করা রেশমের পোষাকে অঙ্গ আবৃত করিয়া—"কাজল আঁকা উজল আঁখি"—হেনার বর্ণে রঞ্জিতচরণ সুন্দরীরা ভূগর্ভস্থ সারদাবে নিদাঘের মধ্যাহ্ন যাপন করিতেন। সারদাবের হাওয়া-ঘরের মধ্য দিয়া সূর্য্য-কিরণ ফাঁকে ফাঁকে আসিয়া গালিচার উপর লুটাইয়া পড়িত—যেন আরব্যোপ-ন্যাসের রাজকন্যা অভিমানে কণ্ঠাভরণ রত্নহার ছিন্ন করিয়া রত্নগুলি ছড়াইয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহাদের তৃষ্ণা-নিবারণের জন্য সুদূর পর্ব্বত হইতে উষ্ট্রের ডাক বসাইয়া বরফ আনিয়া সরবৎ প্রস্তুত হইত। আর সেই সব অন্তঃপুরে কত লীলারই অভিনয় হইত! হরিণ-নয়না, দাড়িম্বোরজা, কুসুমকোমলা বাগদাদ-নারীর সৌন্দর্য্য-কীর্ত্তনে মুসলমান কবিরা কখনও শ্রান্তি অনুভব করেন নাই।

বাগদাদ অতি প্রাচীন নগর। ৭৬২ খৃষ্টাব্দে খলিফ মনসুর এই স্থানে রাজধানী স্থাপিত করেন। তখনও বাগদাদ নিতান্ত অপরিচিত ছিল না। সার হেনরী রলিন্‌সন ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে টাইগ্রীস নদীর পশ্চিম কূলে একটি পোস্তপ্রাচীরে নেবুকাড্‌নেজারের নামাঙ্কিত পুরাতন বেবিলনীয় ইষ্টক পাইয়া-ছিলেন। তাহাতে মনে হয়, নেবুকাড্‌নেজারের সময়েও বাগদাদ সমৃদ্ধ নগর ছিল। তাহার পর সিসানীয়দিগের প্রাধান্য-যুগেও পারসী বাগদাদ প্রসিদ্ধ বাজার ছিল—মুসলমানগণ ইহা লুণ্ঠিত করে। মহম্মদের পরবর্ত্তী (খালিফা) আবু বকরের প্রাধান্যকালে আরব সেনাপতি খালিদ এই বাজার লুণ্ঠিত করিয়া প্রচুর ধনলাভ করেন। সে ৬৩৪ খৃষ্টাব্দের কথা। তাহার পর—৭৬২ খৃষ্টাব্দে মনসুরের রাজধানীনির্ম্মাণের পূর্ব্বে ইতিহাসে বাগদাদের আর বড় উল্লেখ দেখা যায় না। কিন্তু মনসুরের এই রাজধানীস্থাপনব্যাপারের সঙ্গে মুসলমান ইতিহাসের দুইটা বড় ব্যাপার জড়িত;—প্রথম, শিয়া ও সুন্নী, দুই সম্প্রদায়ে

মুসলমানদিগের বিভাগ; দ্বিতীয়, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী জাতিসমূহকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য মুসলমানদিগের প্রবল আগ্রহ ও অসাধারণ আয়োজন। আমরা সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিব।

কে তাঁহার পরবর্ত্তী (খালিফা) অর্থাৎ প্রধান হইবেন, মহম্মদ তাহার নির্দ্দেশ করিয়া যায়েন নাই। তাঁহার ভক্তদল তাঁহার পার্শ্বচরদিগের মধ্য হইতে প্রথমে আবু বাকরকে, তাঁহার পরে ওমারকে ও তাঁহার পরে ওসমানকে খালিফা করেন। ইঁহারা সকলেই মদিনা হইতে শাসনকার্য্য পরিচালিত করিতেন। ইঁহাদের পর আলি খালিফা হয়েন। এই আলি মহম্মদের জামাতা, তাঁহার শিয়া অর্থাৎ বন্ধুরা মনে করিতেন, মহম্মদের পর তিনিই খালিফা হইবার কথা—মধ্যবর্ত্তী তিন জন খালিফা খালিফাই নহেন। এই সময় হইতে মুসলমানদিগের মধ্যে দুই দলের সৃষ্টি হয়। আলি খালিফা হইলে ওমায়ীয়াবংশের মোয়াইয়া তাঁহার সেই পদলাভের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া আপনাকে খালিফা বলিয়া ঘোষিত করেন। তিনি দামস্কাসে রাজপাট স্থাপিত করেন। এ দিকে আলি মদিনা ত্যাগ করিয়া মেসোপোটেমিয়ায় কুফায় রাজধানী স্থাপিত করেন। ইহাতে আরবদিগের শাসনের শক্তি কেন্দ্রচ্যুত হইয়া পড়ে। মোয়াইয়া খালিফা ওমার কর্ত্তৃক সিরিয়ার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া খালিফা হইবার জন্য দশ বৎসর ধরিয়া আয়োজন করিয়া আসিতেছিলেন। কাজেই আলির পক্ষে তাঁহাকে জয় করা দুঃসাধ্য হইল। শেষে কুফায় আততায়ীর অস্ত্রাঘাতে আলির মৃত্যু হইল, এবং পরে তাঁহার দুই পুত্র হোসেন ও হাসান নিহত হইলে মোয়াইয়ার বংশধরগণই খালিফা হইলেন। শিয়াসম্প্রদায়ের বিশ্বাস, আলির পুত্রদ্বয়ের মৃত্যুতেই খালিফাদিগের শেষ—আর কেহ খালিফা হইতে পারেন না। তাঁহারা চিরদিনই আলির পুত্রদ্বয়ের জন্য বিলাপ করিয়া আসিতেছেন। শিয়া ও সুন্নী দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদে এ পর্য্যন্ত যে কত লোকের মৃত্যু হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

ওমায়ীয়াবংশের খালিফাগণ দামাস্কস হইতে মুসলমানদিগকে শাসন করিতে লাগিলেন। ৭৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের বংশের শেষ খালিফা দ্বিতীয় মারওয়ান আব্বাসী সাফ্ফা কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। সাফ্ফা অর্থে রক্তপাতকারী। তিনি ওমায়ীদিগের সকলকে নিহত করিয়া সাফ্ফা নাম লাভ করেন। সে বংশের এক জন মাত্র পলাইয়া স্পেনে গিয়াছিলেন। তিনিই কর্ডোভার খালিফাদিগের বংশপতি।

সাফ্‌ফা খালিফা হইয়াই বুঝিলেন, রাজধানী দামস্‌কস হইতে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। দামস্‌কসে ওমায়ীদিগের অনুরক্তদিগের বাহুল্য; বিশেষ যে পারস্য হইতে আব্বাসীদিগের শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে, দামস্‌কস সেই পারস্য হইতে বড়ই দূরে। আবার দামস্‌কস গ্রীক-সীমান্তের নিকটবর্ত্তী, এবং তথা হইতে খৃষ্টানরা পূর্ব্বকৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে মধ্যে মধ্যে মুসলমানদিগকে আক্রমণও করিয়া থাকে। দামস্‌কস জলপথ হইতে দূরে—বাণিজ্যকেন্দ্র হইতে পারে না। ভবিষ্যতে পূর্ব্বদিকে মধ্য-এসিয়াই ইসলাম-ধর্ম্মপ্রচারের উপযুক্ত স্থান হইবে। তাই তিনি টাইগ্রীসের বা ইউফ্রেটিসের তীরে রাজধানী-স্থাপন যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। তিনি ইউফ্রেটিসের পূর্ব্বকূলে পারস্যনগর আনবারের পার্শ্বে হাসিমিয়া প্রাসাদ-নির্ম্মাণ করিলেন। ৭৫৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় ভ্রাতা মনসুর খালিফা হইলেন। মুসলমান-বিজয়ের পর মেসোপোটেমিয়ায় দুইটি আরব নগর স্থাপিত হইয়াছিল—বসরা ও কুফা। নানা কারণে মনসুর হাসিমিয়া ত্যাগ করিয়া নূতন-রাজধানী-সংস্থাপনে কৃতসংকল্প হয়েন। তিনি দেখিলেন, রাজধানী টাইগ্রীস-তীরে সংস্থাপিত হইলে উর্ব্বরস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে। তখন টাইগ্রীস বা ইউফ্রেটিস বর্ত্তমান খাতে প্রবাহিত হইত না। মনসুর স্বয়ং দেখিয়া এই স্থানে রাজধানী-স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। ৭৬২ খৃষ্টাব্দে নূতন নগরের পত্তন হইল। এই স্থানে প্রাকৃতিক সংস্থানহেতু খাদ্যদ্রব্যের অভাব হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প; ইহা বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইতে পারিবে, এবং শত্রুর পক্ষে অনধিগম্য রহিবে; এই স্থানে গ্রীষ্মের তাপ ও মশকের অত্যাচারও অধিক নহে। এই সব বিবেচনা করিয়া দূরদর্শী মনসুর বাগদাদে রাজধানী সংস্থাপিত করিলেন। মধ্যযুগেও কনস্তান্তিনোপল ব্যতীত এত বড় নগর আর ছিল না। ইহার ঐশ্বর্য্যের তুলনা ছিল না; নানারূপ ভাগ্যবিপর্য্যয়, এমন কি, ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে মোঙ্গলদিগের দ্বারা ধ্বংস সহ্য করিয়া আজও বাগদাদ বিদ্যমান—আজও তাহা মেসোপোটেমিয়ার রাজধানী। তুর্কীর আমলেও মনসুরের রাজধানী মেসোপোটেমিয়ার রাজধানী—শাসনকর্ত্তার বাসস্থান।

এই অঞ্চলে কাষ্ঠ দুষ্প্রাপ্য, সুতরাং ইষ্টক প্রস্তুত করা কষ্টসাধ্য। নিকটে কোথাও প্রস্তর পাইবার সুবিধা নাই। সুতরাং অদূরে টেসিফনে সসানীয় নৃপতিদিগের বিরাট প্রাসাদের ভগ্নাবশেষও মনসুরের পক্ষে এই স্থান-নির্ব্বাচনের অন্যতম কারণ হইয়াছিল কি না, বলা যায় না। অদূরে টাইগ্রীসের তীরে

পারস্যের এই রাজবংশের রাজধানী ছিল। যে রাজবংশ এই রাজধানীর প্রতিষ্ঠাতা, আদেশীর তাহার বংশপতি। তখন আলেকজাণ্ডারের উত্তরাধিকারী সেলিউকসের নামে পরিচিত সেলিউকিয়াই টাইগ্রীস্ উপত্যকায় সর্ব্বপ্রধান নগর। নানা কারণে মেসোপোটেমিয়ায় রাজধানী-সংস্থাপন প্রয়োজন বুঝিয়া তাঁহারা টেসিফনে নগরপ্রতিষ্ঠা করেন। চসরস খৃষ্টীয় ৫৫০ খৃষ্টাব্দে এই টেসিফনে এক বিরাট প্রাসাদ নির্ম্মাণ করান। অদ্যাপি সেই প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ টাইগ্রীসের বাঁকের মুখে বিদ্যমান। সমগ্র প্রাচীতে এই জাতীয় গৃহ আর নাই। বৃহৎ কক্ষের খিলান করা ছাত ৮৬ ফিট বিস্তৃত গৃহ আবৃত করিয়া আছে—ইহা ৯৫ ফিট উচ্চ। এই কক্ষের সম্মুখভাগ অনাবৃত। আরব ঐতিহাসিক তাবারী বলেন, ইহা একটি পর্দ্দায় আবৃত থাকিত। পর্দ্দায় একটি সিংহাসনের নক্সা ছিল—তাহার জমী স্বর্ণের—পথ রৌপ্যের—প্রান্তর মরকতের—নদী মুক্তার—বৃক্ষলতাফুলফল হীরকাদি বহুমূল্য মণির। মুসলমানের বিজয়-বাত্যা যখন মরুভূমির প্রলয়-বাত্যার মত প্রবাহিত হইয়া টেসিফনের প্রতিষ্ঠাতা রাজবংশের ও তাঁহাদের রাজধানীর সর্ব্বনাশ-সংসাধন করে, তখনও বিজেতারা এই প্রাসাদের বিরাটত্বে অভিভূত হইয়া কক্ষপ্রাচীরের চিত্রগুলিও নষ্ট করে নাই। মনসুর এই প্রাসাদের উপকরণ লইয়া নূতন-নগর-নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাঁহার মন্ত্রী খালিদ তাঁহাকে সেই কার্য্য হইতে বিরত হইতে পরামর্শ দেন। তিনি খালিফাকে এমন কথাও বলেন যে, মহম্মদের পরবর্ত্তী চতুর্থ খালিফা আলী এই স্থানে নামাজ পড়িয়াছিলেন বলিয়াও ইহা রক্ষা করা কর্ত্তব্য। মনসুর মনে করিলেন, এই প্রাসাদ পারস্যদেশীয় নৃপতির কীর্ত্তি বলিয়াই পারস্যদেশীয় খালিদ তাঁহাকে এইরূপ পরামর্শ দিতেছেন। তিনি সে পরামর্শে কর্ণপাত করিলেন না। কিন্তু সেই প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া উপকরণ আনিবার চেষ্টা করিয়া তিনি বুঝিলেন, তাহাতে যে ব্যয় পড়িবে, তদপেক্ষা অল্পব্যয়ে নূতন উপকরণ সংগ্রহ করা যায়। তিনি টেসিফনের প্রাসাদ ধ্বংস করিতে বিরত হইলেন। তখন খালিদ বলিলেন, সে প্রাসাদ ধ্বংস করাই খালিফার কর্ত্তব্য—নহিলে লোক বলিবে, চসরস যে প্রাসাদ নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন, মনসুর তাহা ভাঙ্গিতেও পারিলেন না। কিন্তু বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন মনসুর লোকনিন্দার ভয়ে অর্থ নষ্ট করিতে অসম্মত হইলেন।

এ দিকে মনসুরের উদ্যোগে বাগদাদের বিরাট বৃত্তাকার নগর ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালসৃষ্ট স্বপ্নপুরীর মত রচিত হইতে লাগিল। এই নগর ৩০ ফিট উচ্চ

৮ ফিট প্রশস্ত প্রাচীরে বেষ্টিত হইল—পুরপ্রাচীরে ভিন্ন ভিন্ন দ্বার রক্ষিত হইল। আব্বাসী নগরনির্ম্মাতা নগরে ২৪ হাজার রাজপথ রচিত করিলেন—প্রত্যেক পথের স্বতন্ত্র মসজেদ ও হামাম (স্নানাগার) রচনার ব্যবস্থা হইল। ১শত ৫০টি খালে নগরের সর্ব্বত্র টাইগ্রীস হইতে জল লইবার উপায় করা হইল—প্রত্যেক খালের উপর সুগঠিত সেতু রচিত হইল। আর নগরের বাহিরে, প্রমোদ-উদ্যান-সমূহে জল দিবার জন্য ৬ শত খালে জল লইতে যে বৃহৎ খাল খনিত হইয়াছিল, তাহার চিহ্ন আজও ধূলিধূসর প্রান্তরমধ্যে লক্ষিত হয়। এই সৌন্দর্য্যের স্বপ্ন-পুরীর মধ্যে প্রাসাদ। তাহার বর্ণনা পাঠ করিলে সত্যসত্যই বলিতে ইচ্ছা হয়—

"কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা
স্বহস্তে গঠিলা তুমি তুষিতে পৌরবে ?"

নবম শতাব্দীর শেষভাগে বাগদাদের জনসংখ্যা ২০ লক্ষ ছিল। শিল্পে, সাহিত্যে বাগদাদ পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরীতে পরিণত হয়। ইমাম আজম খালিফা মনসুরকে এই নগরনির্ম্মাণে সাহায্য করিয়াছিলেন। মুসলমানদিগের সুন্নী-সম্প্রদায় ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত, অর্থাৎ তাহারা চারি জন প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকারের মতানুবর্ত্তী। এই চারি জনের অনুবর্ত্তীদিগের জন্য মক্কার মসজেদগর্ভের (কিবলার) চারি দিকে চারিটি স্থান (মুসল্লা) আছে। এই চারি জনের মধ্যে ইমাম আজমের অনুবর্ত্তীর সংখ্যাই অধিক। আর এক জন ইমাম হাম্বল। আজম ও হাম্বল উভয়েই বাগদাদে সমাহিত হইয়াছিলেন। হাম্বলের সমাধি টাইগ্রীসগর্ভে বিলুপ্ত হইয়াছে। আজমের সমাধিসৌধ আজও নদীর পূর্ব্বকূলে—বর্ত্তমান বাগদাদের উপকণ্ঠে মুয়াজ্জম নামক স্থানে বিদ্যমান। পশ্চিমে নগরোপকণ্ঠে কাজমেনে শিয়াদিগের দুই জন ইমামের ও পূর্ব্বে নগরোপকণ্ঠে মুয়াজ্জমে আজমের সমাধিসৌধ যথাক্রমে শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ের পুণ্যতীর্থে পরিণতি লাভ করিয়াছে। উভয় সৌধই বাগদাদের মিনাকরা নীল টালি দিয়া গঠিত—সৌন্দর্য্যে নয়নমুগ্ধকর। কিন্তু কাজমেনের সৌধ ঐশ্বর্য্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে।

কাজমেনের বর্ত্তমান মসজেদের সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য বিস্ময়কর। মুসলমান ব্যতীত অপর লোকের সিংহদ্বার অতিক্রম করিবার অধিকার নাই। তবে মুক্ত দ্বার-পথেও ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার দ্বার রৌপ্যের, বৃত্তি রৌপ্যের; গম্বুজ স্বর্ণপত্রাবৃত। উপরে মেঘহীন—রৌদ্রদীপ্ত—নীলাম্বর, নিম্নে গাঢ়-নীল বর্ণের মিনাকরা ইষ্টকে রচিত মসজেদের প্রাচীর, মধ্যে স্বর্ণপত্রাবৃত গম্বুজের

সৌন্দর্য্য শিল্পীর প্রলোভনীয়, সন্দেহ নাই। কাজমেনে শিয়াসম্প্রদায়ের সপ্তম ইমাম অল-কাজিম ও তাঁহার পৌত্র নবম ইমাম মহম্মদ সমাহিত। ৮০২ খৃষ্টাব্দে খলিফ হারুন-রসিদ কর্ত্তৃক নিহত হয়েন। কাজমেনে কে প্রথম মসজেদ নির্ম্মিত করান, তাহা জানা যায় না। তবে ১২২৬ খৃষ্টাব্দে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। তখন এই নগরোপকণ্ঠ স্বতন্ত্র প্রাচীরপরিবেষ্টিত নগর। এই মন্দির যে কতবার লুণ্ঠিত হইয়াছে, তাহা কে বলিবে? তখন খালিফাদিগের রাজধানীতে শিয়ায় ও সুন্নীতে প্রায়ই বিবাদ বাধিত। শিয়ারা সে সময় এই কাজমেনেই সমবেত হইত। মরুভূমিব আরবরা স্বভাবতঃ বিরোধপ্রিয়; তাহাদের বিবাদ বিতর্কে নিষ্পন্ন হয় না, পরন্তু রক্তপাতে পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং কোনও বিবাদে শিয়ারা পরাভূত হইলে সুন্নীরা এই মন্দির লুণ্ঠিত করিত। আবার শিয়া ধনীরা ইহার ক্ষতসম্পদ পূর্ণ করিয়া দিতেন। ৯৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ৯৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যিনি খালিফা ছিলেন, সেই টাই স্বয়ং এই মসজেদে শুক্রবারে উপাসনায় ইমামের মত পৌরোহিত্য করিতেন। ১০৫১ খৃষ্টাব্দে একবার এই মন্দির লুণ্ঠিত ও দগ্ধ হয়। সেই বৎসর শিয়া ও সুন্নী দুই সম্প্রদায়ে বিরোধ বাধিয়া উঠে। শিয়ারা একটি দ্বারে খালিফা আলীর গুণকীর্ত্তন-সংবলিত একখানি লিপি প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে। সুন্নীরা তাহা পৌত্তলিকতার পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া তাহাতে আপত্তি করে। সেই বিবাদে সুন্নী নেতা নিহত হয়েন। সুন্নীরা তাঁহার সমাধিস্থান লইয়া ইচ্ছা করিয়া আবার বিবাদ বাধায়, এবং মন্দিরের সঞ্চিত ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিয়া মন্দিরে অগ্নিযোগ করে। সেই অগ্নিযোগেই হারুণ-রসিদের প্রিয় পত্নী জোবেদার ও তাঁহার পুত্রের সমাধি দগ্ধ হয়। তাহার পর নূতন করিয়া মসজেদ নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমানে পুরাতন বাগদাদের জীর্ণ বাজার পার হইয়া বৃহৎ দ্বিতল ট্রামগাড়ীতে উঠিতে হয়। ট্রাম কাজমেনের বাজারের বাহিরে যায়। তথায় অবতরণ করিয়া কাজমেনের বাজারের স্বচ্ছান্ধকারাবৃত পথে কিছু দূর অগ্রসর হইলে সহসা সম্মুখে মুক্ত স্থানে উপনীত হওয়া যায়, আর নয়নের সম্মুখে কাজমেনের মসজেদের সৌন্দর্য্যস্বপ্ন সাকার হইয়া আবির্ভূত হয়।

৭৬৬ খৃষ্টাব্দে নদীর পশ্চিম কূলে চক্রাকার বাগদাদ নগর নির্ম্মিত করিয়াও মনসুরের সাধ মিটিল না। তিনি নদীর পরপারে, অর্থাৎ পারস্যের দিকে, রুসাফায় মসজেদ ও প্রাসাদ গঠিত করিলেন। বর্ত্তমানে এই নগরই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে; নদীর পশ্চিম কূলে মনসুরের স্বপ্নপুরীর "কেবল নাম আছে"।

মনসুরের সময় হইতে হারুণ-রসিদের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত বাগদাদ খালিফা-

দিগের রাজনীতিক রাজধানী ও বিলাসপুরী ছিল। তাঁহারা শত শিল্পীর সাধনায় ও অজস্র অর্থব্যয়ে মরুমধ্যে এই নন্দনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই মায়াপুরীর রচনা করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত করিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। বাগদাদ ব্যবসায়ের কেন্দ্র হইয়াছিল—এই পথে প্রাচীর সহিত প্রতীচীর বাণিজ্য হইত—নানা দিগ্দেশের শিল্পী ও বণিক পণ্য লইয়া এই বাগদাদে উপনীত হইত। রাজনীতির ও বাণিজ্যের গঙ্গাযমুনা-প্রবাহ এই বাগদাদে মিলিত হইয়া ইহাকে প্রয়াগে পরিণত করিয়াছিল। খালিফাদিগের যত্নে শিল্প উন্নতি লাভ করিত। আবার এই বাগদাদ তখন মুসলমানের "ভারতীর বাসধানী—ক্ষিতির প্রদীপ"; সকল স্থান হইতে মুসলমান পণ্ডিতগণ এই কেন্দ্রে সমাগত হইতেন। সর্ব্বপ্রকারেই বাগদাদ তখন "জগৎ-বাসনা" আর "সুখের সদন" ছিল। কিন্তু আজ সে বাগদাদ হৃতগৌরব—বিরাটকীর্ত্তির ভগ্নস্তূপ—অসীম উচ্চাকাঙ্ক্ষার ধূলিবিলুণ্ঠিত অবশেষ। আজ টাইগ্রীসের তীরে বাগদাদ দেখিলে মানবকীর্ত্তির পরিণাম চিন্তা করিয়া হৃদয় ঔদাস্যে পূর্ণ হয়; আর মনে পড়ে—

"যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা।"

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

আলোচনা।

রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে'।

কবিবর রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসরচনায় যুগান্তরের সৃষ্টি করিতে পারুন আর নাই পারুন, মতান্তরের সৃষ্টি ভালই করিয়াছেন। যে রুচি ও নীতি সার্ব্বজনীন, তাহার প্রতি সঙ্কীর্ণতার আরোপ করিয়া, তাঁহার রচনার রসগ্রাহী তথা গুণগ্রাহিগণ তাঁহার সৃষ্টিকৌশল-প্রদর্শনে ব্যস্ত হইয়াছেন। ইহাতে সৎসাহিত্যের ক্ষতি হইতেছে। সাহিত্যের কুঞ্জবন ক্রমেই আগাছায় ভরিয়া উঠিতেছে।

রবীন্দ্রনাথের মতাবলম্বিগণের ধারণা, তাঁহার কি 'চোখের বালি', কি 'নৌকাডুবি', কি 'ঘরে বাইরে'—সকল উপন্যাসই বাঙ্গালা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ দান। 'ঘরে বাইরে'-র কোনও অনুকূল সমালোচক নায়িকা বিমলার চরিত্রে সতীত্বের নূতন আদর্শ আবিষ্কার করিয়াছেন। আজ 'ঘরে বাইরে'-র কথাই বলিব।

'ঘরে বাইরে'-র বিষয়টি এই,—নিখিলেশ ও সন্দীপ দুই বন্ধু। উভয়েই উচ্চশিক্ষিত। বিমলা নিখিলেশের বিবাহিতা পত্নী। নিখিলেশ তাহার পত্নীকে ঘরে পাইয়া সন্তুষ্ট নহে; কারণ সে উচ্চশিক্ষিত। কারণ সে বুঝিয়াছে, বিমলা ঘরে আবদ্ধ না থাকিয়া একবার বাহিরে আসিয়া বিশ্বের পণ্যশালায় তাহাকে চিনিয়া ও দর যাচাই করিয়া লয়। আচার ও সংস্কারের কৃত্রিম আবরণ ভেদ করিয়া, মনুষ্যত্বের যে পূর্ণতর রূপ, নিখিলেশ তাহাই দেখিতে চাহে তাহাই হইল। বিমলা শিক্ষিতা মহিলা, কাজেই মনের কুণ্ঠা ঘুচাইয়া ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিল, স্বামীর অন্তরঙ্গ বন্ধু নকল স্বদেশপ্রেমিক সন্দীপের স্বদেশী বক্তৃতা শুনিয়া মন ও প্রাণ সন্দীপকে বিলাইয়া দিল। উভয়ের দেহের মধ্যে একটু ব্যবধান রহিল মাত্র। কিন্তু তাহার পর সে যখন তাহার ভুল বুঝিল, তখন কি টানাটানি—প্রাণ ছিঁড়িয়া যায় আর কি। নিখিলেশ সমস্তই দেখিত, শুনিত, এবং বুঝিত, বুঝিয়া মর্ম্মে মরিত; কিন্তু বিমলার কাজে বাধা দিত না। নিখিলেশের হৃদয় এতই উদার ছিল। যাহা হউক, শেষে বাহিরের বিমলা আবার ঘরে ফিরিল এইবার নিখিলেশ বিমলাকে ও বিমলা নিখিলেশকে পাইল।

এই বিষয় লইয়া অন্য কেহ উপন্যাস রচনা করিলে সৎসাহিত্যে তাহার কতটুকু আসন হইত, তাহা অধিকাংশ বাঙ্গালী পাঠক সহজে বুঝিবেন। কিন্তু এই উপন্যাসের রচয়িতা প্রতিভাশালী কবি রবীন্দ্রনাথ, সুতরাং হঠাৎ রাবিশ বলিবার উপায় নাই। রাবিশ হইলেও, রাবিশ বলিবার প্রয়োজন হইত না; প্রয়োজন হইয়াছে, কারণ, কেহ কেহ অনুকূল মন্তব্যের সাহায্যে 'ঘরে বাইরে'-কে বাঙ্গালা সাহিত্যে উচ্চস্থান দিবার জন্য যথাবিহিত চেষ্টা করিতেছেন।

উপন্যাসে যিনি যতই কেরামতী দেখাইয়া বাহাদুরী লইবার চেষ্টা করুন, উহার স্থান অসৎসাহিত্যের 'অচলায়তনে'-র মধ্যেই। অর্থাৎ, উপন্যাস উপন্যাসই। সতীকে সতী, প্রেমিককে প্রেমিক ও রসিককে রসিক সাজাইয়া যাঁহারা উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, এবং করিতেছেন তাঁহাদের উপর টেক্কা দিতে হইলে অসতীকে সতী, অপ্রেমিককে প্রেমিক ও অরসিককে রসিক করিয়া উপন্যাস রচনা করিতে হয়; নতুবা সে উপন্যাসের বৈচিত্র্য থাকে না। রবীন্দ্রনাথ এই বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়াছেন; কোথাও চরিত্রবিশ্লেষণের, কোথাও মনস্তত্ত্বের, কোথাও আর্টের দোহাই দিয়া উপন্যাসের আকাশে সত্যের কুসুম ফুটাইবার চেষ্টা করিতেছেন। এখন বিশ্বমনুষ্যত্বের রাজ্য ছাড়িয়া কবির নিমন্ত্রিত বিশ্বমানব বাঙ্গালা দেশে হঠাৎ আবির্ভূত হইলে হয়! কেহ কি বলিতে পারেন, কোন্ কালে বিশ্বমানব ত্রিতাপদগ্ধ আমাদের পাশে বসিয়া হারমোনিয়মের পর্দা টিপিয়া গান ধরিবেন—'বাংলার মাটী, বাংলার জল, সত্য হোক্, সত্য হোক্, হে ভগবান' ?

যুগধর্ম্মের প্রভাবে বাঙ্গালী যদি কোনও কালে ইংরাজ হয়, তবে তখনকার কথা তখনই হইবে। বর্ত্তমানে যে যুগ চলিতেছে, সেই যুগের কথার আলোচনা করাই এ ক্ষেত্রে সমীচীন। সবুজ পত্রে রবীন্দ্রনাথ দেশ ও কালকেই তাঁহার উপন্যাসের 'বিশ্বকর্ম্মা' বলিয়াছেন। এই দেশ—বাঙ্গালা দেশ বা ভারতবর্ষ, এই কাল—বর্ত্তমান কাল। ভবিষ্যতে কোনও অনির্দ্দিষ্ট যুগে কোনও বিশ্বমানব বিশ্বমনুষ্যত্বের প্রভাবে যদি বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালীর ভিন্ন ভিন্ন সমাজের

এক সমাজে পরিণত করিতে পারেন, করিবেন; কিন্তু এখনও—এই বর্ত্তমান যুগে—বাঙ্গালী সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে। প্রত্যেক সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলার রক্ষার জন্য বিভিন্ন আচার, নিয়ম ও তন্ত্রমন্ত্র আছে। এখন ভবিষ্যৎকে আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা কেন? দেশ ও কালকেই যদি উপন্যাসের বিধিকর্ম্মা ভাবিতে হয়, তবে দেশ ও কালেরই অনুশাসন মানিয়া চলা উচিত। দেশ ও কালের উপযোগী করিয়াই উপন্যাস রচনা করা উচিত।

সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবন অপেক্ষা ব্যক্তির জীবন দীর্ঘকালস্থায়ী; সুতরাং সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় শাসনের নাগপাশে বাঁধিয়া রাখিলে ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ অসম্ভব। ব্যক্তিত্বের দরিয়ায় মানবজীবনকে উচ্ছৃঙ্খলভাবে ভাসাইয়া দেওয়া ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের অনুকূল নহে। মুক্তির আনন্দের জন্য মানবাত্মা চিরকালই ব্যাকুল, কিন্তু গৃহধর্ম্মকে অবহেলা না করিয়া পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধের মূলে মানবাত্মা যে আনন্দ লাভ করে, গৃহীর পক্ষে তাহাই কাম্য। ত্যাগীর কথা স্বতন্ত্র। ত্যাগমার্গের আনন্দ অধিকতর প্রশস্ত। 'ঘরে-বাইরে'-র বিমলা ও সন্দীপ উভয়েই ভোগপরায়ণ গৃহী, উভয়েই সাধারণ মানুষ, গৃহীর আদর্শে উভয়েই মানসব্যভিচারী।

এমন কথাও শুনা যাইতেছে, যে, সন্দীপের সহিত বিমলার যে ভালবাসা, তাহা প্রেম। ইহাকে আমরা প্রেম বলি না, কাম বলি। সব চেয়ে 'লঙ্' বলাই সঙ্গত। প্রেম এক জনকে অপরের অনুরাগী করে; কামও তাহাই করে। কিন্তু কামের ভোগ অস্থায়ী; প্রেমের ভোগ স্থায়ী। আত্মভাবই সত্যকার প্রেম। প্রবল বাধা, দারুণ বেদনা, স্থায়ী বা অস্থায়ী বিরহের মধ্যে ভালবাসার দর যাচাই না করিলে, তাহা প্রেম কি কাম বুঝা যায় না। সত্যকার প্রেম অপরের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লয়; যাহা লয়, তাহা আর ফিরিয়া দেয় না; যাহা পায়, তাহাতেই সে বিভোর থাকে। বিমলা সন্দীপকে সর্ব্বস্ব দেয় নাই, দিতে গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং কামোন্মত্ততায় ছটফট করিয়াছে। পরিবার, সমাজ, বা রাষ্ট্র তাহাকে সন্দীপের সহিত মিলনে বাধা দেয় নাই; তথাপি সে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া মিলিতে পারে নাই। বিমলা-জীবনের বিরহের ঝাপানী অসতী-জীবনেরই একটা পরিচ্ছেদ—মায়াকান্না। এইরূপ সর্ব্বজনগর্হিত কুৎসিত নারীজীবনকে আশ্রয় করিয়া কোনও সভ্য দেশের সভ্য জাতির সাহিত্যের আদর্শ সৌন্দর্য্যগর্ব্বে ফুলিয়া উঠিতে পারে না। এ চিত্রে আদর্শ নারীজীবনের অবমাননা করা হইয়াছে। প্রেম ছাড়িয়া যদি কামের কথাই বলা যায়, তবে কামের পূর্ণতাই বা বিমলায় কোথায়? পতনের সে উদ্দাম বেগ কোথায়? নরকের কাম ও স্বর্গের প্রেমের মধ্যে হরিশ্চন্দ্রের কাঁটকের ন্যায় অবস্থানে আদর্শ নারীজীবন সৃষ্ট হয় না।

নিখিলেশের চরিত্রে অভিনবত্ব আছে। আর কোনও প্রশংসিত উপন্যাসের কোনও উচ্চশিক্ষিত নায়ক 'যাকে হৃদয়ের দ্বার করব তাকে চিরদিন আমার হৃদয়ের বোঝা করতে পারব না'—এমন কথা বলিয়া, তাহার বিবাহিতা পত্নীকে বাহিরের আগুনে ঝলসিয়া, সতীত্বের নূতন আদর্শের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছে কি না, জানি না। ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য ঔপন্যাসিকই জানেন, কিন্তু কোনও গ্রন্থগ্রাহী লেখকের মতে, 'নিখিলেশের এই আদর্শের উপর যে দাম্পত্য প্রতিষ্ঠিত, এই মুক্তিপ্রধান যুগে তাহা অবজ্ঞার জিনিস নহে।' কেন? ভদ্রা জিনিসটি কি এতই সুলভ যে,

এক জন পাপী ও হীনচার মধ্যে তাহার স্ত্রীকে চুবাইয়া ধরিবে, আর বিষের আঘাত হইতে তাহার উপর পুষ্পবর্ষণ হইবে? নিখিলেশ সত্যরূপের সাধক হউক, ক্ষতি নাই; কিন্তু সে যদি শিক্ষিত হয়, জ্ঞানী হয়, তবে সে বুঝিবে না কেন, মিথ্যার জগতে সত্যের প্রকৃত রূপ দেখা যায় না? নিখিলেশ তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু সন্দীপকে উত্তমরূপেই চিনিত। সে অবশ্যই বুঝিত, জগতে যদি কোথাও সত্যের রূপ দেখা যায়, তবে তাহা সন্দীপের কাছে নহে। তথাপি সে সন্দীপের সহিত বিমলার মিলনে বাধা দেয় নাই কেন? অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতা কোনও কালেই আত্মার মুক্তির পথ সরল করিতে পারে না, ইহা নিখিলেশ না বুঝিলেও, নিখিলেশের চরিত্রস্রষ্টার—যিনি নিখিলেশের হৃদয়ে মোহ ও সত্যপ্রীতির মধ্যে বিরোধ স্থাপন করিয়াছেন—বুঝা উচিত ছিল। রবীন্দ্রনাথের মতের সমর্থন বা 'ঘরে বাইরে'-র উপাদেয়তা সপ্রমাণ করিতে গিয়া এক লেখক স্পষ্টই বলিয়াছেন,—'দেবতা না হইলেও স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করা আর অধিক দিন এ যুগে চলিবে না; কারণ, ইহা যুগধর্ম্মের প্রতিকূল।' ইহার উত্তরের সুর কোমল পর্দ্দায় উঠে না। যুগধর্ম্ম কি এতই প্রতিকূল হইয়াছে যে, স্বামী তাহার স্ত্রীকে পরকীয় প্রীতির গরল পান করিতে বাধ্য করিয়া সতীদিগের পর্য্যায়ভুক্ত করিবে? না, মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশে বাধা দিয়া মানবসমাজে পশু-ভাব জাগিয়া উঠিবে? উদ্দামলালসা চরিতার্থ করিবার পথ খুলিয়া যাইবে? যদি তাহাই হয়, তবে তথাকথিত যুগধর্ম্মের প্রতিকূলে বিদ্রোহী হইয়া দেবতা না হইলেও স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতে নারীজাতিকে বাধ্য করা কর্ত্তব্য হইয়াছে।

এই কর্ত্তব্যপালনের বিধিদত্ত শক্তি অধিকাংশ পুরুষ এখনও হারায় নাই। পুরুষের শক্তির কাছে নারী তাহার কর্ত্তব্য ভুলিয়া থাকেন, ইহা সমর্থনযোগ্য না হইলেও, নারী যখন আত্মোন্নতি বা আত্মার মুক্তির মোহাই দিয়া মানবজাতির অকল্যাণের হেতু হইবেন, তখন শক্তিপ্রয়োগে তাঁহাকে সুপথে আনাই কর্ত্তব্য। পুরুষের ন্যায় নারীরও কর্ত্তব্য বিচার করা যাইতে পারে। নারী শুধু স্ত্রী নহেন, তিনি জননী, তিনি ভগিনী, তিনি প্রতিবেশিনী। শক্তি ও অধিকারের বিচার করিয়া আত্মার প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্যবোধও থাকা উচিত; কিন্তু পুরুষের ন্যায় সকল রকমের কর্ত্তব্য সমানভাবে পালন করা নারীর পক্ষেও অসম্ভব। অর্থদানে দরিদ্রের দুঃখমোচন করা ব্যক্তিবিশেষের সাধ্যায়ত্ত হইলেও, যে ব্যক্তি সৎপথে থাকিয়া নিজের উদরান্নেরই সংস্থান করিতে পারে না, সে কিরূপে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিবে? যে নিজে দুর্ব্বল, সে কি কখনও সবলের হাত হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিতে পারে? আরও এক কথা, মানবজীবনের কর্ত্তব্যগুলির একটি ক্রম আছে। ধাপের পর ধাপে উঠিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হয়। স্বামী যদি দেবপ্রকৃতির লোক না হইয়া পশুপ্রকৃতির লোক হয়, স্ত্রীর ধর্ম্মাচরণে বিঘ্ন হয়, তবে স্বামীকে সুপথে আনিবার চেষ্টা করা স্ত্রীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। স্বামী পাপী, অতএব পত্নীকেও পাপিনী হইতে হইবে, ইহা যুক্তিযুক্তও নহে, হিন্দু বা অন্য কোনও সুসভ্য জাতির আদর্শের অনুকূলও নহে। রবীন্দ্রনাথ সত্যভ্রষ্ট নিখিলেশকে আদর্শ জগতের মানুষ গড়িবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সত্যভ্রষ্ট নিখিলেশ বিমলার প্রতি তাহার নিজের কর্ত্তব্য কতটুকু পালন করিয়াছে? বিমলা যাহাতে বুঝের বোঝা না হয়, এ রকমের চিন্তা আদর্শ জগতের লোকের

থাকে সত্য হইলেও যাহাকে হৃদয়ের হার করিবার জন্য তাহার এতই আগ্রহ, সেই বিমলার প্রতি তাহার কর্ত্তব্য কি শুধু অন্যের কর্ত্তব্যের সঙ্গে বিমলার কর্ত্তব্যের যোগ করিয়া দেওয়া? তাহা হইলে স্বামীর এত বড় অকর্ত্তব্য এ জগতে আর কিছুই নাই। কোনও শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক নায়কের চশমা চোখে দিয়া নায়ক-নায়িকার সৃষ্টি না করিলেও, তিনি স্ত্রী ও পুরুষে আত্মা সমভাবে বিদ্যমান ভাবিয়া, একের কর্ত্তব্যের জন্য অন্যের কর্ত্তব্য বলি দিতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ বিমলার আত্মার মুক্তির পথ খুঁজিতে গিয়া নিখিলেশের চরিত্র কিন্তুতকিমাকার করিয়াছেন; কাজেই নিখিলেশকে অজ্ঞানী ও অশিক্ষিতের রূপেই পাওয়া যায়।

বিমলার কথায় হিন্দুর সতীত্বের আদর্শের কথাও উঠিয়াছে। এমন কথাও ছাপার অক্ষরে দেখিতেছি—'সীতা ও দময়ন্তীর পাতিব্রত্য ও স্বামীভক্তি মাত্র অন্ধনিয়মানুবর্ত্তিতা নহে। স্ত্রী পুরুষের যে সমান প্রেমের সম্বন্ধ, স্বামী যে কেবল স্বামী বলিয়াই দেবতাজ্ঞানে পূজার যোগ্য নহেন, তাঁহার নিজের গুণ ও চরিত্রবলেই পূজার যোগ্য, তাহা তাঁহাদের কাহিনী হইতে বেশ বুঝা যায়।' কিন্তু হাটে, মাঠে ও ঘাটে প্রেমের দর যাচাই করিয়া বেড়াইয়া আত্মার মুক্তির পথ সরল করিবার চেষ্টা সীতা ও দময়ন্তীর চরিত্রে আমরা পাই না। রাম ও নলের চরিত্র অত্যন্তই উদার, কিন্তু তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় স্ত্রীবর্জ্জন করিয়াছিলেন। সীতার অগ্নিপরীক্ষা হইয়াছিল। রাম বুঝিয়াছিলেন, সীতা সতী, তথাপি তিনি প্রজার মনস্তুষ্টির জন্য সীতাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। আর 'বুকের বোঝা' পরপুরুষের প্রণয়মুগ্ধা বিমলাকে জানিয়া ও চিনিয়া নিখিলেশ হৃদয়ের হার করিয়াছিল। উভয় আদর্শের সমতা নাই? আছে—যেমন রামে আর নলে। বিনা অপরাধে নল দময়ন্তীকে ত্যাগ করিয়া গেলেন, তথাপি নলের প্রতি দময়ন্তীর একান্ত অনুরক্তি—তাহা কি অন্ধনিয়মানুবর্ত্তিতা নহে? এই 'কবির চিত্তফুলবন-মধুর রূপে' অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবুদ্ধির মাপকাঠীতে স্বামী ও স্ত্রীর সমান প্রেমের মাপ নির্দ্দেশ করা হইতেছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবুদ্ধির খিড়কী দরজা খুলিয়া অভিসারে যাত্রা করার ফেরে সে যুগের সতীরা অন্ধনিয়মানুবর্ত্তিতার 'অচলায়তনে'র মধ্যে পড়িয়া থাকাই গৌরবের বিষয় মনে করিতেন। সে যুগের প্রেম ছিল—মিলনবিরহ-জগতের অতুলনীয় কবিত্ব, বিশ্বের অপূর্ব্বসঙ্গীত। সে প্রেমে এ যুগের স্বার্থ ছিল না, সে যুগের পরার্থ ছিল। সে যুগের প্রেমের ভাবোন্মাদ সর্ব্ববন্ধনমুক্তিত তন্ময়তার আদর্শের সহিত এ যুগের প্রেমের 'ভালবাসতে এসে ভাসা ভেলা সই!' এই আদর্শ খাপ খায় না। সে যুগের লোক দেশাচার ও লোকাচারের মধ্যে সত্যের পূর্ণ রূপ দেখিতেন। তাঁহারা বুঝিতেন, যাঁহারা আচারনিয়মের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিশ্বজ্ঞানী ও সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। এ যুগেও অনেকে তাহা বুঝেন; বুঝেন না কেবল তিনি, যিনি 'অচলায়তনে'র বাহিরে কল্পনার হাওয়ার মধ্যে বিশ্বরূপ তথা নিজের পূর্ণ মূর্ত্তি দেখিবার আশা করেন, এবং তাঁহার ভাবকবর্গ। সে কথা যাউক। তাহার পর ইহাও শুনিতে হইতেছে,—'সীতা ও দময়ন্তী অসাধারণ গুণমুগ্ধ হইয়াই রাম ও নলের গলায় বরমাল্য দান করিয়াছিলেন। অর্থাৎ শুধু ঘরে নহে, বাহিরের মধ্যেও তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে পাইয়াছিলেন। নিখিলেশের আদর্শও তাহাই।" কথাটা কত দূর সত্য, বিচার করা আবশ্যক। বিবাহের পূর্ব্বে নলের প্রতি দময়ন্তীর অনুরাগসৃষ্টির কারণ আছে,

কিন্তু তাহা ঘরেরই মধ্যে, ঘরের বাহিরে নহে। জনকের ধনুর্ভঙ্গ পণ সীতাকেও ঘরের বাহিরে আসিবার অবসর দেয় নাই। সীতা রামকে পাইয়াছেন, রামকেই ভালবাসিয়াছেন। সীতা ও দময়ন্তী ঘরে নহে, বাহিরেও তাঁহাদের প্রণয়পাত্রের প্রেমের সহিত অন্য পুরুষের প্রেমের তুলনা করিয়া প্রকৃত প্রেমের আস্বাদ পাইয়াছিলেন, এমন কথা এ দেশে শুনিলেও পাপ হয়। 'অসাধারণ গুণমুগ্ধ হইয়াই সীতা রামের গলায় বরমাল্য দিয়াছিলেন' কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। অসাধারণ গুণমুগ্ধ না হইলেও সীতা রামচন্দ্রের গলায় বরমাল্য দান করিতে বাধ্য হইতেন; কারণ, রাম হরধনু ভাঙ্গিয়াছিলেন। পূর্ব্বে স্বয়ংবর-সভায় রাজকুমারীদের (সাধারণ গৃহস্থকুমারীদের নহে) পাত্রনির্ব্বাচন হইত। রাজকুমারী সভায় উপস্থিত হইয়া বিবাহার্থী সমবেত রাজন্যবর্গের পরিচয় লইতেন; তাহার পর এক জনের গলায় বরমাল্য দিতেন; কিন্তু কোনও বিবাহিতা রাজকন্যার জন্য স্বয়ংবর-সভার অনুষ্ঠানের কথা শুনা যায় না। স্বয়ংবর-সভায় 'নিমেষের তরে দেখা'র মধ্যে পাত্রের প্রকৃত গুণবিচার অসম্ভব। তবে রূপবিচার অল্প সময়েই হয়। বরের রূপই কন্যার বরণীয়। সে রূপের মধ্যে গুণ থাকিতে পারে, না থাকিতেও পারে। কোনও কোনও স্থলে রাজকুমারী লোকের মুখে পাত্রের রূপগুণের কথা শুনিতেন, কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে পাত্রের শৌর্য্যবীর্য্য ছাড়া অন্য কোনও গুণের পরীক্ষা হইত না। পুরাণে যে সকল রাজকুমারীর স্বয়ংবরের কথা শুনা যায়, তাঁহাদের কেহ এক জনকে পতিত্বে বরণ করিয়া পরে আত্মার মুক্তির জন্য পরপুরুষের ভজনা করিয়াছেন, এমন কথা শুনা যায় না। যে দিক্ দিয়াই দেখা যাউক, হিন্দুর সতী রমণীরা সকল অবস্থাতেই পতির অনুগামিনী ছিলেন। সুতরাং 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে বিমলা-চরিত্রে সতীত্বের যে নূতন আদর্শ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সহিত হিন্দুর সতীত্বের আদর্শের কোনও যোগই নাই। কিন্তু হিন্দুর সতীত্বের আদর্শ যতই উন্নত হউক, তাহা সার্ব্বজনীন নহে, কাজেই সত্যের দিক্ দিয়া এই আদর্শের বিচার করা অশোভন হইবে। 'ঘরে বাইরে'-র আদর্শ মানুষের পূর্ণ পরিণতি ও বিকাশের দিক্ দিয়াই সত্যের কত দূর সমর্থন ও প্রচার করিয়াছে, তাহা দেখিলেই যথেষ্ট হইবে।

নিখিলেশের আদর্শ—স্ত্রী পুরুষ সকলেই আপন আপন জীবনের সম্ভাবনাকে সত্য করিয়া তুলুক, অর্থাৎ—চলিত কথায়—'চাচা আপন বাঁচা'। ইহা মানুষের পূর্ণ পরিণতি ও বিকাশের অনুকূল নহে। পরের সাহায্য না লইয়া মানুষ নিজে নিজে পূর্ণ হইতে পারে না। নিজের স্বার্থের গণ্ডীর মধ্যে পড়িয়া থাকিলে মানুষের পূর্ণ বিকাশ হয় না। পরের প্রতি যে কর্ত্তব্য, তাহার সম্পাদনেই মনুষ্যত্বের সার্থকতা। মানুষ যখন পূর্ণ হয়, তখন সে বুকের বোঝাকে বুকের হার করিয়া লইবার প্রয়াসী হয়; তখন সে বলে—'মেরেছ কলসীর কানা, তাই বলে' কি প্রেম দিব না?' আর নিখিলেশ? সে নিজের আদর্শে স্থির থাকিতে পারে নাই, জীবনে উৎকট সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া অপূর্ণ জীবনের মোহে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। কোনও নায়কের মুখে 'মিথ্যা কথা বলা বড় দোষ' বলাইয়া তাহাকে মিথ্যা কথা বলাইলে, তাহার চরিত্রকে যেমন খর্ব্ব করা হয়, নিখিলেশের চরিত্র সেইরূপই হইয়াছে। কেবল কথা শুনিয়া নহে, কাজ দেখিয়াও—ঘরে ও বাহিরে—নায়কের চরিত্রের বিচার করিতে হয়।

মৃত্যু দেহকোষের দুর্ব্বলতা ও ক্রিয়াক্ষীণতা হইতে ক্রমে ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হয়; (৩) প্রধান দুইটী লক্ষণ সম্বন্ধে স্বাভাবিক মৃত্যু Sclerosis নামক পীড়ার ন্যায়।

পূর্ব্বের আলোচনা স্মরণ করিলেই (ক) সুতরাং (খ) প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইতেছে। মৃত্যু * জীববিবর্ত্তনের ফল; সুতরাং বংশানুক্রমের অনুগত। বিবর্ত্তনবশতঃ দেহের যে জটিলতা ঘটিয়াছে, মৃত্যু তাহার উপর নির্ভর করিতেছে। দেহস্থ ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের ক্রিয়ার মধ্যে কালক্রমে যে অসামঞ্জস্য উপস্থিত হইয়াছে, মৃত্যু তাহার উপরও নির্ভর করিতেছে। দেহস্থ কোষ সকলের ক্রিয়াক্ষীণতাও এই শ্রেণীর কারণ। দেহে যে সকল শ্বেত রক্তকীট আছে, তাহারা এককোষ জীব; দেহের কোনও যন্ত্র দুর্ব্বল কিংবা তাহার ক্রিয়া ক্ষীণ হইলেই উহারা সে যন্ত্র খাইয়া ফেলে। ইহার উপরও মৃত্যু নির্ভর করিতেছে। জীবকোষ স্বভাবতঃই ভাঙ্গা-গড়ার অধীন; কারণ, জীবজন্তু অস্থায়ী পদার্থ। এ নিমিত্ত ও সুখাদ্য ও সদ্বায়ুর অভাবে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। খাদ্যবস্তু হইতে যে সকল রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে বিষবৎ পদার্থও আছে; তদ্দ্বারা কোষ সকল দূষিত হইয়া ক্রমে মৃত্যু আসিতে পারে। ঐ সকল রাসায়নিক পদার্থ মলমূত্রের সহিত পরিত্যক্ত না হইয়া কোষসূত্রে যুক্ত হইলে, এবং রক্ত-সঞ্চালনের ত্রুটী হইলে, Sclerosis পীড়ার লক্ষণ সকল দেখা যায়। হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক প্রভৃতি অত্যাবশ্যক দেহযন্ত্রে ঐ সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই পরিণামফল, মৃত্যু।

সুতরাং মৃত্যু এতগুলি অনিবার্য্য (?) কারণের উপর নির্ভর করিতেছে। এ সকল পূর্ব্বেও বলিয়াছি। কিন্তু এ সকল উল্লেখ করিলেই যে মৃত্যুর কারণ নিঃশেষে বলা হইল, তাহা নহে। আমি কেবল অতি সংক্ষেপে সহজবোধ্য কতিপয় কারণের উল্লেখ করিয়াছি। যাহা হউক, যত দিন দেহস্থ ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের ক্রিয়ার জটিলতা ও অসামঞ্জস্য বদ্ধ না হইতেছে; যত দিন দেহস্থ রক্তকীটগুলির দুঃস্বভাব সংশোধিত না হইতেছে; যত দিন আহার্য্যবস্তু দেহে প্রবেশ করিয়া নানাপ্রকার দুষ্ট রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা কোষ সকলকে আক্রমণ করা বন্ধ না হইতেছে,—তত দিন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার আশা করা সঙ্গত হয় না। দেহের বিভিন্ন যন্ত্রের ক্রিয়ার রোধ অথবা প্রায় রোধ করিতে পারিলে, খাদ্যবস্তু ও বায়ু দেহ-মধ্যে গ্রহণ না করিতে পারিলে, অমর অথবা দীর্ঘায়ুঃ

* অন্য কোনও বিশেষণ না থাকিলে, মৃত্যু শব্দে স্বাভাবিক মৃত্যু বুঝিতে হইবে।

হইবার আশা করা যায়। কিন্তু তাহা কি সম্ভব? আমি দেখাইব যে, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক উপায়ে, অসম্ভব হইলেও, বস্তুতঃ অসম্ভব নহে।

শ্বাসের সহিত অম্লজান দেহমধ্যে যাইয়া অপরিষ্কারকে পরিষ্কৃত করে, দুর্ব্বল যন্ত্রকে সবল করে; কিন্তু চিরদিন করিতে পারে না। শ্বাসযন্ত্রই ক্রমে বিকল হয়; সুতরাং শ্বাসের অম্লজানের দ্বারা দেহের ক্ষতিপূরণের কোনও আশা করা যায় না। আহারের উপরও কোনও আশা করা যায় না। বাল্যকাল হইতে যৌবনকাল পর্য্যন্ত আহার দ্বারা দেহের দুর্ব্বলতা দূর হইতে পারে; কিন্তু যৌবনের শেষভাগে এমন এক সময় উপস্থিত হয় যে, তখন আর দেহকোষের দুর্ব্বলতা খাদ্যবস্তুর সার দ্বারা সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব নহে। ইহারই পরিণামফল, মৃত্যু। আহার দ্বারা দেহকোষ যে পরিমাণে পুষ্ট হইবে, অন্যান্য কারণে তদপেক্ষা অধিকপরিমাণে দুর্ব্বল হইবে। সুতরাং জমা অপেক্ষা খরচ বেশী হইলে যাহা হয়, দেহস্থ কোষ সকলেরও তাহাই হয়। পরিণামফল,—"দেউলে পড়া", অর্থাৎ, অবসাদ ও মৃত্যু।

দেহকোষের মৃত্যু হইলে তাহা পরিত্যক্ত হয়, এবং তৎ-স্থলে নূতন কোষ জাত হয়। নচেৎ মৃত কোষ পার্শ্ববর্ত্তী সুস্থ কোষকেও দূষিত করে। কিন্তু নূতন কোষ সকল পূর্ব্বের কোষের ন্যায় অবসন্ন ও ক্ষীণ হইলে, উহারাও পরিত্যক্ত হয়, এবং উহাদিগের স্থানেও পুনরায় নূতন কোষ জাত হয়। এইরূপে বহুবার কোষপরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। যত দিন এইরূপ হয়, তত দিন মৃত্যু আসিতে পারে না। কিন্তু চিরদিন কোষপরিবর্ত্তন হয় না। এ পরিবর্ত্তনের সংখ্যা [ন্যূনাধিক] বংশানুগত। এই সংখ্যা স্বভাবতঃ শেষ হইয়া গেলে, মৃত্যু উপস্থিত হয়। এ দিক হইতে দেখিলে, বলিতে হয় যে, মৃত্যু কোষ-পরিবর্ত্তনের সংখ্যার উপর নির্ভর করে। ইহা সুখাদ্য ও সদ্বায়ু দ্বারা নিবৃত্ত হইতে পারে না।

কোষের দুর্ব্বলতা এবং অক্ষমতার দিক হইতে মৃত্যুকে এই ভাবে বিবেচনা করা যায়। কিন্তু যাহাকে ডাক্তারগণ Sclerosis পীড়া বলেন, বার্দ্ধক্য যখন তাহাই, তখন মৃত্যু চিরদিন অচিকিৎস্য থাকিতে পারে না। Sclerosis রোগ বর্ত্তমান সময়ে অচিকিৎস্য। বার্দ্ধক্যেরও যখন প্রধান লক্ষণ দুইটী ঐ পীড়ার ন্যায়, তখন বার্দ্ধক্যও বর্ত্তমান সময়ে অচিকিৎস্য; অর্থাৎ, বর্ত্তমান সময়ে কোনও প্রকারেই বার্দ্ধক্যের আক্রমণ হইতে দেহকে রক্ষা করা সম্ভব নহে। বলিয়াছি, কতিপয় রাসায়নিক পদার্থ কোষসূত্রে যুক্ত হইয়া উহাদিগকে শক্ত, ভঙ্গপ্রবণ এবং কোষগুলিকে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলে; তাহাতেই কোষ এবং কোষসূত্রের

ক্রিয়া ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসে। ইহারই নাম বার্দ্ধক্য; ইহারই পরিণাম, মৃত্যু। সুতরাং ইহাকে নিবৃত্ত করিতে হইলে কোষসূত্রের সহিত এ সকল রাসায়নিক পদার্থের যোগ বন্ধ করিতে হয়। ঐ সকল পদার্থ আহার্য্যবস্তুর সহিত দেহে প্রবেশ করে। প্রথম বয়সে উহারা প্রায় সর্ব্বদাই মলমূত্রাদির সহিত পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু ঐ বয়সের শেষে আহারবিষয়ক অসংযম হইতে ক্রমে ঐ সকল পদার্থ দেহমধ্যে কিছু কিছু জমিতে থাকে, আর পূর্ব্বের ন্যায় সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয় না। সুতরাং ক্রমে কোষ এবং কোষসূত্র সকলকে আক্রমণ করিয়া উপরের লিখিত লক্ষণগুলি উৎপন্ন করে; ইহারই স্থূল এবং সংক্ষিপ্ত নাম—বৃদ্ধাবস্থা। তবেই দেখা যাইতেছে যে, এ স্থলে আহারই মৃত্যু ডাকিয়া আনিতেছে। স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ কবিরাজ দেশবিখ্যাত; তিনি এক দিন আমাকে বলিয়াছিলেন, "ওগো বাবু, মানুষ খাইয়াই মরে, না খাইয়া মরে না।" কথাটী তখন বুঝি নাই, কিন্তু উহা অত্যন্ত সত্য কথা। যদি কোনওরূপে আহারটী একবারেই বন্ধ করা যায়, তবে ঐ সকল দুষ্ট রাসায়নিক পদার্থ জমিতেই পারে না। তাহার পর, কোষগুলির ক্লান্তি ও দুর্ব্বলতা, যাহা নানা কারণে উৎপন্ন হয়, তাহাও যদি বন্ধ করা যায়, তবে "খরচ" বন্ধ হইল; সুতরাং "জমা"র অর্থাৎ আহারের আবশ্যকতাই থাকিল না। এইরূপে মৃত্যুকে স্থগিত করা সম্ভব হয়; অন্ততঃ দীর্ঘায়ুঃ লাভ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার পন্থা কি? কি কি উপায়ে তাহা করা যায়?

বলিয়াছি, দেহের বিভিন্ন যন্ত্রের ক্রিয়ার রোধ অথবা প্রায় রোধ করিতে পারিলে, এবং খাদ্য ও বায়ু দেহমধ্যে গ্রহণ না করিলে, অমর অথবা দীর্ঘায়ু হইবার আশা করা যায়। মানবেতর প্রাণিগণের মধ্যে এরূপ অনেকেই করিয়া থাকে; কিন্তু তাহারা দুই তিন মাসের অধিক কাল এরূপ করিতে সমর্থ হয় না। ঊর্দ্ধসংখ্যা দুই তিন মাস পর্য্যন্ত অনেক কীট, পতঙ্গ, শম্বূক, সরীসৃপ, মৎস্য ও স্তন্যপায়ী জীব অনাহারে [শ্বাসরোধ করিয়া] পড়িয়া থাকে; * তাহাতে মরে না। নানা শ্রেণীর জন্তু দেশভেদে কেহ বা শীতকালে, কেহ বা গ্রীষ্মকালে শ্বাস বন্ধ করিয়া পড়িয়া থাকে; তখন তাহাদের রক্তের গতি ক্ষীণ হয়, দেহের তাপ কিছু কমিয়া যায়। মানুষ এই ক্ষমতা প্রায় হারাইয়াছে; কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ হারায় নাই। রুসিয়ার Pskov প্রদেশের কৃষকগণ শীতকালটা ঘুমাইয়া কাটাইয়া দেয়; প্রতি দিন একবার জাগিয়া একটু রুটী খায়। আর জাগে না।

* ভেক ও সর্পের কথা সকলেই জানেন

সকল দেশেই কেহ কেহ ৮।১০ দিন অথবা তাহারও কিছু অধিক কাল একটু একটু জলমাত্র পান করিয়া থাকিতে পারেন। এই সময় তাঁহাদিগেরও দেহ-তাপ কমে, রক্তের গতির হ্রাস হয়, কিন্তু নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চলে। পঞ্জাবের হরিদাস সাধু অনাহারে শ্বাসরোধ করিয়া প্রায় এক মাস মাটীর নীচে ছিলেন। সুতরাং ইহা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে, মানবেতর প্রাণীর যে শক্তি স্বভাবতঃ আছে, মানব যাহা বিবর্ত্তনবশে প্রায় হারাইয়াছে, চেষ্টা করিলে তাহা পুনরায় লাভ করা অসম্ভব নহে। এ চেষ্টায় যোগিগণের কেহ কেহ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ আছে।

মেক্‌নিকফ্ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্বাস করেন যে, বৈজ্ঞানিক প্রণালী-মতেই মানবকে দীর্ঘায়ুঃ করা যায়; অমরও করা যাইতে পারে; কারণ, জীবনের সহিত মৃত্যুর নিত্য সম্বন্ধ নাই। ইহার সাক্ষী এক-কোষ জীব, যাহারা অমর; Sclerosis পীড়ার ঔষধ আবিষ্কৃত হইলে বার্দ্ধক্য অনেকপরিমাণে নিবৃত্ত করা যাইতে পারে, ইহা বিশ্বাস হয়। কিন্তু মৃত্যু [রোগের প্রক্রিয়া ব্যতীত] নিবৃত্ত হইতে পারে, এ কথা এখনও বিশ্বাস করিতে পারি না। এই সংকীর্ণ ধরাপৃষ্ঠে মৃত্যু নিবৃত্ত হইলে মানবের বাস করা সম্ভব, বিবেচনা হয় না। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে জীবনযাত্রা নিয়মিত করিতে পারিলে দীর্ঘায়ুঃ হইবার আশা করা অসঙ্গত নহে। ইহাও কম লাভের বিষয় নহে। অন্য প্রতিকূল কারণ না থাকিলে, বাছিয়া বাছিয়া দীর্ঘায়ুঃ বংশের নরনারীদিগকে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ করিতে পারিলে দীর্ঘায়ু অপত্যলাভের আশা করা যায়। দেহ স্বকর্ম্মজনিত দোষে ধ্বংস করা মহা পাপ। বিলাসিতা বর্জ্জন করিয়া, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম সকল প্রতিপালন করিয়া, পানে ভোজনে সংযত হইয়া, ধার্ম্মিক-জীবন যাপন করিতে পারিলে, দীর্ঘায়ুঃ হওয়া যায়। যে দেশে ১২ লক্ষ লোক একমাত্র জ্বর রোগেই প্রাণত্যাগ করে, যে দেশে শিশুমরণ প্রায় শতকরা ২৫, সে দেশে এ কথা অবহেলা করা যায় না, ইহা সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত। নচেৎ জাতীয় ধ্বংস নিবৃত্ত করিবার আশা সুদূরপরাহত। মহাত্মা গ্যাল্টন বলিয়াছেন,—"The next influence to be considered is that of healthy homes. These and a simple life certainly conduce to fertility. They also act indirectly by preserving lives that would otherwise fail to reach adult ages." অর্থাৎ, মোটামুটি "গরিবী চালে" চলিয়া শান্তভাবে জীবনযাপন করিলে বংশবৃদ্ধিও হয়, এবং অকালমৃত্যুর আশঙ্কাও প্রায় থাকে না। এতদ্দেশে বর্ত্তমান সময়ে এই উপদেশ গৃহে গৃহে স্মরণ রাখা অত্যাবশ্যক।

শ্রীশশধর রায়।

ভালবেস।

["Love me for ever"—by *R. Browning.*]

এইরূপে কেটে গেল সারাটা বছর,—
ভালবেস চির দিন হায়!
সমস্ত বসন্ত গেল আরম্ভ উদ্যোগে,
সুদীর্ঘ নিদাঘ গেল আকুল চেষ্টায়।—
ভালবেস চির দিন হায়!
বসন্তে পরিয়াছিনু যেই ফুলমালা—
গ্রীষ্মশেষে শুষ্ক ঝরে যায়;
এখন বরষা ঝরে,
তুহিন-বর্ষণ পরে
নিবাইবে নিদাঘের দারুণ জ্বালায়।—
ভালবেস চির দিন হায়!

শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাস।

৪

[গৌড়ধ্বজ গাঙ্গেয়দেব;—মহীপাল ও মিথিলা;—চোল-আক্রমণ;—চোল, পাণ্ড্য, এবং চের বা কেরলরাজ্য;—চালুক্যরাজ্য;—পল্লব রাজ্য;—খৃষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দে দক্ষিণ-ভারতের অবস্থা;—মহীপালের সমসাময়িক চোলরাজ্য;—রাজেন্দ্র চোলের বাঙ্গালা-আক্রমণ ও তিরুমলয়-পর্ব্বতলিপি;—তিরুমলয়-লিপির মহীপাল কে?—তিরুমলয়-লিপির উল্লিখিত ওড্র, দক্ষিণ রাঢ় ও বঙ্গাল দেশ;—মহীপালের গৌড়রাজ্য;—বৌদ্ধধর্ম্মসংস্কারক অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান;—বৌদ্ধ তিব্বতের সহিত বাঙ্গালার সম্পর্ক;—বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎপত্তি-আলোচনা;—প্রাচীন পাল-রাজত্বের সুকুমার শিল্প।]

পূর্ব্বোদ্ধৃত রামায়ণের হস্তলিখিত পুঁথিতে গাঙ্গেয়দেবের গৌড়ধ্বজ বিশেষণ হইতে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, তিনি গৌড়রাজ্যে আপনার প্রাধান্য দাবী করিতেন। কলচুরি-বংশীয় অপর কোনও রাজা কর্ত্তৃক গৌড়ধ্বজ-উপাধি-ধারণের প্রমাণ নাই। কলচুরি-বংশীয় নৃপতি সোমদেবের ১০৭৯ খৃষ্টাব্দের যে তাম্রশাসনখানি গোরক্ষপুর

'গৌড়ধ্বজ' গাঙ্গেয়দেব।

জেলার কহলা-গ্রামে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে এইরূপ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় যে,—খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দে মিথিলাতেও একটি কলচুরি রাজবংশের অস্তিত্ব ছিল। উহাতে উল্লিখিত হইয়াছে,—কলচুরি-বংশীয় গুণাম্বোধিদেব বা গুণসাগর, ছয় পুরুষ পূর্ব্বে, গৌড়রাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

রমাপ্রসাদ চন্দ বলেন,—মগধ যে সময় নিঃসংশয়রূপে গৌড়াধিপ প্রথম মহীপালের অধিকারভুক্ত ছিল, এবং মগধের পশ্চিমদিগ্‌বর্ত্তী জেজাকভুক্তি যে সময় চন্দেল্লরাজগণের অধিকৃত ছিল, সে সময় কলচুরিগণ কখনই মধ্যপ্রদেশ হইতে তাহাদের ডিঙ্গাইয়া মিথিলা অধিকার করিতে পারেন নাই; এবং রমাপ্রসাদ বাবু অনুমান করেন, নেপালী রাজাবলীর উল্লিখিত গাঙ্গেয়দেব হয় ত গৌড়রাজ মহীপালের কোনও সামন্ত নরপাল ছিলেন।

সত্য কথা এই যে, এই সকল প্রশ্নের নিঃসংশয় মীমাংসার উপযোগী যথেষ্ট প্রমাণ এক্ষণে আমাদিগের নিকট উপস্থিত নাই।

গৌড়াধিপ প্রথম মহীপাল যে কোনও সময়ে বারণসীতে শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন, সারনাথ প্রস্তর-লিপি তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ নহে। বর্ত্তমানের ন্যায় সারনাথ যে তৎকালেও বৌদ্ধগণের তীর্থস্থান ছিল, এবং নানা দিগ্‌দেশ হইতে বৌদ্ধগণ তথায় আগমন করিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; এবং সারনাথ আপন অধিকারে না হইয়া কোনও বিদেশীয় মিত্র নৃপতির রাজ্যান্তর্ভুক্ত থাকিলেও, মহীপালের পক্ষে নিষ্ঠাবান্ বৌদ্ধ-রূপে সারনাথের জীর্ণসংস্কার করাইয়া দেওয়া, এবং বহু মন্দির ও শৈলগন্ধকুটি নির্ম্মাণ করাইয়া দেওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। আবার, মজঃফরপুরে ধাতব-মূর্ত্তিতে যে লেখ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা দ্বারাও ইহা নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হয় না যে, মিথিলার কোনও অংশ মহীপাল কর্ত্তৃক শাসিত হইয়াছিল। মিথিলার কতক অংশ মহীপালের শাসনাধীন থাকা, এবং কতক অংশ চেদীর মূল রাজবংশীয় কলচুরিগণের অথবা তাহার কোনও শাখার কলচুরিগণের শাসনাধীনে থাকা আদৌ অঘটন ব্যাপার নহে।

মহীপাল ও মিথিলা।

সুতরাং, কলচুরিগণের শাসিত রাজ্য যে এক অবিচ্ছিন্ন অখণ্ড ভূভাগ ছিল, এরূপ অনুমান করা যায় না; প্রতীহারদিগের, চন্দেল্লদিগের, অথবা গৌড়ের পালদিগের অধিকৃত প্রদেশ কর্ত্তৃক বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন প্রদেশ তাঁহাদিগের শাসনাধীন ছিল—ইহা অসম্ভব নহে। গৌড়াধিপের বশংবদ কোনও মিত্রনৃপতির পক্ষে 'গৌড়ধ্বজ'-উপাধি অনুপযোগী নহে, এবং কলচুরি-বংশীয় কোনও সামন্তরাজ

ঐরূপ মিত্র-নৃপতি হওয়াও বিচিত্র নহে। মূল কলচুরি-বংশীয়দিগের, স্বাধিকৃত প্রদেশের কতকাংশের নিমিত্ত গৌড়েশ্বর মহীপালের অধীনতা-স্বীকার করাও সম্ভব হইতে পারে।

দক্ষিণ দিক হইতে পরাক্রান্ত রাজা রাজেন্দ্রচোল কর্ত্তৃক বাঙ্গালা-আক্রমণই মহীপালের রাজত্বকালের একটি প্রধান ঘটনা; মান্দ্রাজ প্রদেশের উত্তর আরকট জেলার পোলুরের নিকট তিরুমলয় পর্ব্বতের গাত্রে তামিল ভাষায় তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এই আক্রমণ হইতে সাক্ষাৎভাবে কোনও স্থায়িপ্রকৃতির ফলোদ্ভব না হইলেও, ইহার পর দক্ষিণাঞ্চল হইতে ক্রমাগত এইরূপ আক্রমণ-হেতু পালরাজ-বংশের অধঃপতন ঘটিয়াছিল; এবং, এই স্থলে, দক্ষিণ-ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের প্রধান লক্ষণগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা সঙ্গত হইবে।

চোল-আক্রমণ।

দক্ষিণ-ভারতের পূর্ব্ব-উপকূলের নাম চোলমণ্ডলম্, তাহাই ইয়ুরোপীয়দিগের নিকট "করোমাণ্ডেল কোষ্ট" নামে পরিচিত হইয়াছে; ইহারই কতকাংশের প্রাচীন নাম চোল। এই চোলদেশের চিরপ্রচলিত চৌহদ্দী,—উত্তরে পেন্নর নদী, দক্ষিণে ভেল্লারু নদী, এবং পশ্চিমে কুর্গের প্রত্যন্ত-প্রদেশ। সুতরাং, মান্দ্রাজ, পন্দিচারী ও ত্রিচীনপল্লী, এবং বর্ত্তমান মহীশূর রাজ্যের অধিকাংশ উহারই অন্তর্ভুক্ত ছিল, দেখা যাইতেছে। ইহার দক্ষিণে পাণ্ড্যরাজ্য অবস্থিত ছিল; বর্ত্তমান মাদুরা ও তিনেভেল্লী জেলা তাহার অন্তর্গত ছিল। উত্তরে দক্ষিণ-ভেল্লারু নদী হইতে দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত সে রাজ্য বিস্তৃত ছিল, এবং মাদুরা নগরে তাহার রাজধানী ছিল।

চোল, পাণ্ড্য, এবং চের, বা কেরল রাজ্য।

চের বা কেরলরাজ্য হইতে উত্তর-দক্ষিণমুখী একটি রেখাই পাণ্ড্যদেশের পশ্চিম সীমা নির্দ্দেশ করিত; বর্ত্তমান মালাবার জেলা, এবং ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন কেরলরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ঐ সীমা-রেখা উত্তরে চন্দ্রগিরি নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং এই চন্দ্রগিরি নদী মাঙ্গালোরের দক্ষিণে ভারত-সাগরে নিপতিত হইয়াছে; অতএব পশ্চিমঘাট প্রদেশ, এবং পশ্চিমঘাট ও সমুদ্রের অন্তর্বর্ত্তী স্থানও, পাণ্ড্যরাজ্যের অভিভুক্ত ছিল।

সম্ভবতঃ দক্ষিণ-ভারতের এই চোল, পাণ্ড, এবং চের বা কেরলরাজ্য মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। মৌর্য্য-সাম্রাজ্য বিখণ্ডিত হইলে, উপরোক্ত রাজ্যসমূহের উত্তরস্থ দাক্ষিণাত্য ও অন্যান্য ভূভাগে অন্ধ্র রাজবংশ প্রভাব বিস্তার করে। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দের প্রথম

চাক্যে রাজ্য।

ভাগে অন্ধ্ররাজ্যের পতন হইতে ষষ্ঠ শতাব্দের মধ্যভাগে চালুক্য রাজবংশের পরাক্রম-লাভ পর্য্যন্ত, ঐ সকল দেশের ইতিহাস অস্পষ্ট ও অবোধ্য। চালুক্য-জাতি উত্তরাঞ্চলের রাজপুতদিগের বংশোদ্ভব বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিত। সম্ভবতঃ, তাহারাও গুর্জ্জরদিগের ন্যায় উদ্ভূত হইয়া রাজপুতানা হইতে দাক্ষিণাত্যে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা প্রথমে বিজাপুর জেলায় বাতাপীতে (বর্ত্তমান বাদামী) এবং তৎপরে নাসিকে রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছিল; এবং তাহাদিগের পরাক্রান্ত নৃপতি দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজত্বকালে, তাহারা উত্তরাপথের অধীশ্বর হর্ষের দক্ষিণ-ভারতে রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া সমগ্র দাক্ষিণাত্যে তাহাদিগের অধিকার-বিস্তার করিয়াছিল। কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর নিম্নপ্রবাহের মধ্যবর্ত্তী বেঙ্গীপ্রদেশে, কুব্জ বিষ্ণুবর্দ্ধন নামে পুলকেশীর এক সহোদর আপনাকে স্বাধীন নরপতি-রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূর্ব্ব-চালুক্য রাজবংশের ভিত্তিস্থাপন করেন।

পল্লব-রাজ্য।

পল্লব নামক একটা জাতি নিরন্তরই চালুক্যদিগকে শক্তি-পরীক্ষায় নিমিত্ত আহ্বান করিত। তাহাদিগের উদ্ভব-বৃত্তান্ত নিঃসন্দিগ্ধরূপে নির্ণীত হয় নাই। পূর্ব্বে তাহারা লুণ্ঠনপরায়ণ জাতি ছিল বলিয়াই অনুমান হয়। তাহাদের আদিম নিবাস যে কোন্ স্থানে ছিল, সে সম্বন্ধে কোনও প্রবাদও প্রচলিত নাই। সপ্তম শতাব্দের প্রথম ভাগে চালুক্যদিগের সহিত পল্লবদিগের অবিরত যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিত; এই সকল যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণ উভয় পক্ষই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু ইহাদের পরস্পরের লিখিত বৃত্তান্ত স্বভাবতঃই পরস্পর-বিরুদ্ধ। যাহা হউক, ইহা সত্য যে, পল্লবগণ প্রথম নরসিংহ বর্ম্মার রাজত্বকালেই উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। নরসিংহ বর্ম্মা কাঞ্চীতে (বর্ত্তমান কঞ্জিবেরম্) রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং কার্য্যতঃ সমগ্র চোলদেশ শাসন করিতেন। ৬৪০ খৃষ্টাব্দে যখন ইউয়ান্ চুয়াঙ্গ কাঞ্চী দর্শন করেন, তখন নরসিংহ বর্ম্মাই কাঞ্চীতে আধিপত্য করিতেছিলেন।

খৃষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দে দক্ষিণ-ভারতের অবস্থা।

এক শত বৎসর পরে, দ্বিতীয়-বিক্রমাদিত্য-পরিচালিত চালুক্যগণ পল্লবদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগের রাজধানী কাঞ্চী অধিকার করিয়াছিল। আবার, অনতিদীর্ঘকাল পরে অষ্টম শতাব্দের মধ্যভাগে দাক্ষিণাত্যের এই চালুক্য রাজশক্তি রাষ্ট্রকূটগণ কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াছিল। রাষ্ট্রকূটগণ তদ্দেশোদ্ভব জাতি। তাহারা নবম

শতাব্দের প্রথম হইতেই প্রতীহারগণের শত্রুরূপে এবং প্রায়শঃই বাঙ্গালার পালরাজগণের সন্ধিবদ্ধ-মিত্র-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল। নবম শতাব্দের শেষে, ভারতবর্ষের সুদূর দক্ষিণে আদিত্যচোলের অধীন চোলগণ কর্ত্তৃক পল্লবরাজশক্তি অধিকৃত হইয়াছিল।

এইরূপে, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দের স্থূলতঃ প্রথম ত্রিপাদে দক্ষিণ-ভারতের প্রধান প্রধান রাজশক্তি বলিতে দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটগণ, এবং তাহারও দক্ষিণস্থ প্রদেশের চোলগণ বিদ্যমান ছিল। এই উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী রাজশক্তির ভিতর সময় সময় সংঘর্ষ উপস্থিত হইত। ৭৯৩ খৃষ্টাব্দে, প্রাচীন চালুক্য রাজবংশের বংশধর দ্বিতীয় তৈল বা তৈলপ কর্ত্তৃক রাষ্ট্রকূটদিগের শেষ নৃপতি দ্বিতীয় কোক্ক পরাভূত হয়েন। এই তৈল বা তৈলপ একটি স্বতন্ত্র চালুক্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। উহা, তাঁহার পরবর্ত্তী কালের রাজধানী, (বর্ত্তমান হায়দারাবাদ রাজ্যে স্থিত) কল্যাণী নগরী হইতে কল্যাণীর চালুক্য রাজবংশ নামে পরিচিত হইয়াছিল। এই স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, প্রাচীনকালে দক্ষিণ-ভারতের নিজস্ব সভ্যতা অতিমাত্র উন্নত অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল। তামিল ভাষায় এক বিপুল প্রাচীন সাহিত্য অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী দক্ষিণ-ভারতের ইতিহাসের উপাদান বিরল হইলেও, নবম শতাব্দের পরবর্ত্তী কালে দক্ষিণ-ভারতের রাজ্যসমূহের লেখমালা সংখ্যায় অতি বহুল—এ পর্য্যন্ত উত্তর-ভারতে যে সকল লেখমালা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাও বহুলতর—এবং তাহাদিগের কতকগুলি অতিশয় দীর্ঘ। ইহাদিগের একখানি মূল্যবান্ লিপি, একটি প্রকাণ্ড বলয়সংবদ্ধ একত্রিশখানি তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ হইয়াছে। দক্ষিণ-ভারতের এই সকল লেখমালার পাঠোদ্ধার ও অনুবাদ-কার্য্যের উপর এখনও অনেক নির্ভর করিতেছে।

মহীপালের সমসাময়িক চোলরাজ্য।

এইরূপে, প্রথম মহীপাল যখন গৌড়ের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন, অর্থাৎ, ৯৮০ খৃষ্টাব্দের সমসময়ে, কল্যাণীর চালুক্য রাজবংশ বাঙ্গালার পালরাজগণের সহিত খৃষ্টীয় দশম শতাব্দের অধিকাংশ সময়ে ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধযুক্ত রাষ্ট্রকূটগণের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। প্রায় ঐরূপ সময়ে প্রবল পরাক্রান্ত চোলনৃপতি রাজরাজের ও তদীয় পুত্র রাজেন্দ্রের দিগ্বিজয় দ্বারা চোলরাজশক্তি প্রসার লাভ করিয়াছিল; রাজেন্দ্র চোল ১০১১ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহার পিতার সহিত রাজ্যশাসন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, এবং পিতার অভাব হইলে ১০১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ

করেন। রাজরাজ চের ও পাণ্ড্যদেশ, সিংহল, দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ স্থান, এবং উত্তরের কলিঙ্গরাজ্য (বর্ত্তমান উত্তর-সরকার যাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল) বিজয় করিয়া তৎসমুদয় স্বাধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্র চোল বঙ্গোপসাগর অতিক্রমপূর্ব্বক ব্রহ্মের পেগু-প্রদেশ জয় করিয়া তাহা কিয়ৎকালের নিমিত্ত স্বরাজ্যের অন্তর্গত করিয়াছিলেন।

রাজেন্দ্র চোলের বাঙ্গালা-আক্রমণ ও তিরুমলয় পর্ব্বত-লিপি।

এই রাজেন্দ্র চোলই একাদশ শতাব্দের প্রারম্ভে বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়াছিলেন; এবং তাহা তিরুমলয় গিরির পর্ব্বত-লিপিতে তামিল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই পর্ব্বত-লিপির কাল ১০২৪ খৃষ্টাব্দ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। মেলপাড়ির চোলেশ্বর-মন্দিরে ১০২০ খৃষ্টাব্দের একখানি শিলালিপিতে রাজেন্দ্রের দিগ্বিজয়-কাহিনী বর্ণিত থাকিলেও, তাহাতে বাঙ্গালার অভিযান সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ না থাকায়, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, তাহা ১০২০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ঘটিয়াছিল।

তিরুমলয় পর্ব্বত-লিপিতে লিখিত রহিয়াছে,—রাজেন্দ্র-চোল প্রথম ওড্ড-বিষয় এবং তৎপর কোশল-নাড়ু অধিকার করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপালকে সমরক্ষেত্রে নিহত করিবার পর, এবং তক্কণলাড়ম-বিষয়াধিপতি রণসূরকে আক্রমণ করিবার পর, তিনি তদ্দবুত্তি জয় করিয়াছিলেন। তৎপর তিনি নিয়ত-বর্ষণ-প্লাবিত বঙ্গাল দেশ আক্রমণ করিলে, উহার অধিপতি গোবিন্দচন্দ্র পলায়ন করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে, তিনি মহীপালকে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়া রমণী ও মাতঙ্গনিচয় হস্তগত করিয়া উত্তিরলাড়ম্ প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। এই আক্রমণ বা অভিযানে গঙ্গা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে হইয়াছিল বলিয়া রাজেন্দ্র চোল গঙ্গাইকন্দ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই তিরুমলয়-লিপির ওড্ড শব্দ সংস্কৃত ওড্র শব্দের তামিল অপভ্রংশ। উড়িষ্যার কতকাংশের নাম ওড্র; এবং কোশল-নাড়ু বলিতে, উড়িষ্যার বর্ত্তমান করদ মিত্ররাজ্যসমূহের অন্তর্গত পার্ব্বত্য প্রদেশকেই বুঝায় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহাই প্রাচীন কালে মহাকোশল বা দক্ষিণ-কোশল নামে পরিচিত ছিল। প্রথম প্রবন্ধেই বলিয়াছি, বর্ত্তমান অযোধ্যা ও বারাণসী প্রদেশ প্রাচীন কালের কোশলরাজ্য ছিল। হয় ত তাহারই সহিত প্রভেদ বুঝাইবার নিমিত্ত উড়িষ্যার কোশল দক্ষিণ-কোশল নামে অভিহিত হইয়াছিল; কিন্তু, এতদুভয়ের মধ্যে কে কি সম্পর্ক ছিল, এবং কি কারণেই বা উহাদের কোশল-নামকরণ হইল, তাহা

অজ্ঞাত রহিয়াছে। তন্দবুত্তি সম্ভবতঃ দণ্ডভুক্তির তামিল অপভ্রংশ। তন্দবুত্তি বলিতে কোন্ প্রদেশকে বুঝায়, তাহা লইয়া তর্ক আছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী উহাকে উদণ্ডপুর (বর্ত্তমান ক্ষুদ্র নগর বিহার) বলিয়াই স্থির করিয়াছেন,—এই স্থানে গৌড়ের পালরাজবংশের প্রথম নৃপতি গোপাল কর্ত্তৃক একটি বিহার স্থাপিত হইয়াছিল, প্রথম প্রবন্ধেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি; কিন্তু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—এবং তাঁহার কথা যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই বোধ হয় যে, সম্ভবতঃ উড়িষ্যার উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে, অথবা বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার কতকাংশই দণ্ডভুক্তি নামে পরিচিত ছিল, এবং তিনি অনুমান করেন যে, বর্ত্তমান দাঁতন সহরের সহিত দণ্ডভুক্তি নামের সংস্রব থাকিতে পারে। রামচরিত কাব্যের টীকায়, দণ্ডভুক্তিরাজ জয়সিংহ কর্ত্তৃক উৎকলরাজ কর্ণকেশরী পরাজিত হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। তক্কণ-লাড় অবশ্য দক্ষিণ-রাঢ়, অর্থাৎ রাঢ়দেশের দক্ষিণ অংশ,—বর্ত্তমান হুগলী জেলা, বর্দ্ধমান জেলার দক্ষিণাংশ, এবং মেদিনীপুর জেলার কতক অংশ। বঙ্গাল দেশ বলিতে গঙ্গা বা ভাগীরথীর উত্তরস্থ মধ্যবাঙ্গালা বা উত্তর-বাঙ্গালা, এবং উত্তিরলাড়ম্—উত্তররাঢ়ম অর্থাৎ উত্তর রাঢ়-প্রদেশ; বর্দ্ধমানের উত্তরাংশ, বীরভূম, এবং মুর্শিদাবাদ জেলার ভাগীরথীর পশ্চিম তীরের অংশবিশেষ (যে স্থানে মহীপাল ও সাগরদিঘী অবস্থিত) এই উত্তররাঢ়ের অন্তর্গত ছিল।

আমার বিবেচনায়, তিরুমলয়-লিপির মহীপাল যে গৌড়াধিপ মহীপাল, তৎসম্বন্ধে কোনরূপ সঙ্গত সন্দেহ থাকিতে পারে না।

তিরুমলয়-লিপির মহীপাল কে?

মহীপালের রাজত্বকালে আর্য্য ক্ষেমেশ্বর কর্ত্তৃক চণ্ডকৌশিক নামে একখানি সংস্কৃত নাটক রচিত হইয়াছিল; ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে নেপাল হইতে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাহার একখানি হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। ইহা যে কোনও কর্ণাট-রাজ-পরাজয়-উৎসব উপলক্ষে রচিত হইয়া মহীপালের সমক্ষে অভিনীত হইয়াছিল,—তাহা নাটকখানির প্রস্তাবনা দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়; এবং ইহাতে রাজেন্দ্র চোলের বাঙ্গালা-আক্রমণের শেষ প্রতিরোধ-ব্যাপার উল্লিখিত হওয়াই বিশেষ সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইহাও বলিয়াছেন যে, চণ্ডকৌশিক নাটকের উল্লিখিত কর্ণাটরাজ কল্যাণীর কোনও চালুক্য নৃপতিও হইতে পারেন। এরূপ বলিবার হেতু এই যে,—চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য বা কল্যাণীরাজ

বিক্রমাঙ্ক গৌড়াধিপ প্রথম মহীপালের মৃত্যুর সম্ভবতঃ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দ পরে ১০৯৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন; কোনও কোনও লিখিত প্রমাণে তাঁহার 'কর্ণাট'-আখ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু চণ্ডকৌশিক কাব্যে উল্লেখ ব্যতীত, মহীপালের রাজত্বকালে কল্যাণীর চালুক্যরাজগণ কর্ত্তৃক বাঙ্গালার আক্রমণ সম্বন্ধে, বা মহীপালের সহিত তাঁহাদিগের কোনরূপ সংঘর্ষ সম্বন্ধে, আর কোনও লিখিত প্রমাণ বিদ্যমান নাই। পক্ষান্তরে, রাজেন্দ্র চোল যে বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা তিরুমলয়-লিপি হইতে জানিতে পারি;—এবং রাজেন্দ্র চোল তাঁহার রাজশক্তি বাঙ্গালায় স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত না করায়, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, তিনি অবশেষে মহীপাল কর্ত্তৃক পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়াছিলেন। এই বিরোধের পরিণাম সম্বন্ধে তিরুমলয়-লিপির সহিত চণ্ডকৌশিক কাব্যের যেরূপ অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়, সেরূপ থাকাই স্বাভাবিক ও সম্ভাবিত।

রাজেন্দ্র চোলকে বহু দূরদেশ হইতে আগমন করিতে হইলেও, এবং তাঁহার বাঙ্গালা-অভিযান ব্যর্থ হইবার নানা কারণ থাকিলেও, মহীপাল কর্ত্তৃক তাঁহার ন্যায় একটি প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতির পরাজয়-ব্যাপার—নিরতিশয় শক্তির পরিচায়ক। ইহাও অসম্ভব নহে,—আক্রমণের হিসাবে আক্রমণ করিবার, অথবা ঐরূপ আক্রমণকে স্থায়ী দেশ-বিজয়ে পর্য্যবসিত করিবার সঙ্কল্প রাজেন্দ্র চোলের আদৌ ছিল না;—রাজেন্দ্র চোলের এ আক্রমণ হয় ত বিশেষ-উদ্দেশ্য-হীন আক্রমণ-মাত্র। গঙ্গার তীরভূমি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া তাহারই স্পর্দ্ধা করিবার অভিলাষে চোলরাজ এরূপ আক্রমণ করিয়া থাকিবেন। তথাপি, এই আক্রমণের সময়, অর্থাৎ ১০২০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, মহীপালের রাজশক্তি যে অন্ততঃ উত্তররাঢ়ে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। ইহারই কিছুদিন পরে, ১০২৬ খৃষ্টাব্দে, মহীপাল বারাণসীর মঠ ও মন্দিরের বিপুল সংস্কার-কার্য্য সম্পন্ন করিবার মত শক্তিসম্পন্ন ছিলেন; ইহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আমরা প্রাগুক্ত অনুমানেরই সমর্থন প্রাপ্ত হই।

তিরুমলয়-লিপির মহীপাল, গৌড়াধিপ মহীপাল না হইয়া কান্যকুব্জের মহীপাল-প্রতীহার হইতে পারেন, এইরূপ একটি সিদ্ধান্তও উপস্থাপিত হইয়াছে। এ সিদ্ধান্ত সত্য হইলে, রাজেন্দ্র চোলের আক্রমণ-কালে উত্তর-রাঢ় প্রদেশ মহীপাল-প্রতীহারের অধিকারভুক্ত থাকা আবশ্যক, এবং, গঙ্গাসাগর-সঙ্গম পর্য্যন্ত

রাঢ়ভূমি মহীপাল-প্রতীহারের রাজত্বকালে গুর্জ্জর-সাম্রাজ্যে অভিভুক্ত ছিল বলিয়া রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যে অনুমান করিয়াছেন, তাহাও অসঙ্গত হয় না। তাহা হইলে, মুর্শিদাবাদ জেলার মহীপাল নামক স্থানকে ও সাগরদীঘীকে গৌড়াধিপ মহীপালের সহিত সংযুক্ত না করিয়া, মহীপাল-প্রতীহারের সহিত সংযুক্ত করিতে হয়। কিন্তু এই উপন্যস্ত সিদ্ধান্তকে আমরা বর্জ্জন করিতে বাধ্য। কারণ, মহীপাল-প্রতীহার কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিবার সময় ৯১৬ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূটাধিপতি তৃতীয় ইন্দ্র কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছিলেন, ইহা আমাদিগের অবিদিত নাই; এবং ১০২০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০২৪ খৃষ্টাব্দের ভিতর রাজেন্দ্র চোলের আক্রমণ-কালে যে তিনি কান্যকুব্জের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেন না, ইহাও নিঃসন্দেহ। রাঢ় কোনও সময়ে গুর্জ্জর-প্রতীহার-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল,—এরূপ মত কর্ণাটকশব্দানুশাসন নামক গ্রন্থের একটিমাত্র স্থানের উপর নির্ভর করে বলিয়া বোধ হয়; সে স্থান আমি আমার দ্বিতীয় প্রবন্ধেই উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। তাহাতে আছে—রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্রের নরসিংহ নামক এক করদমিত্র নৃপতি মহীপাল-প্রতীহারের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া গঙ্গার সঙ্গমক্ষেত্রে আপন অশ্বের স্নান বিধান করিয়াছিলেন, এবং আপনার যশঃ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গঙ্গার সঙ্গমক্ষেত্র বলিতে গঙ্গার সাগর-সঙ্গম-ক্ষেত্রকেই বুঝায়—ইহা স্থির-নিশ্চয় নহে, এবং সেরূপ বুঝাইলেও, এরূপ উক্তি কবিজনোচিত উৎপ্রেক্ষাও হইতে পারে। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দে যখন উত্তরের পার্ব্বত্য প্রদেশাগত কাম্বোজ আক্রমণকারিগণ উত্তর-বাঙ্গালার কতক অংশ বিধ্বস্ত করিয়াছিল, হয় ত সেই সময় গৌড়েশ্বর পাল-নৃপতিগণ গঙ্গার দক্ষিণ ও পশ্চিম কূলে রাঢ়দেশে আপনাদিগের রাজধানী সরাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন, এবং মহীপাল হয় ত তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভে মুর্শিদাবাদের মহীপাল নামক স্থানে আপন রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এবং কাম্বোজদিগের হস্ত হইতে বরেন্দ্র-উদ্ধারের নিমিত্ত উত্তর রাঢ় হইতেই তাহার অভিযান আরম্ভ করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান অসম্ভব নহে। গোদাগাড়ীর ঠিক অপর পারেই রাঢ়ের উত্তরসীমা; এই গোদাগাড়ীতে আসিয়াই বরেন্দ্রের মালভূমি গঙ্গা স্পর্শ করিয়াছে, এবং এই গোদাগাড়ীর পার্শ্ব দিয়াই দক্ষিণ বাঙ্গালা হইতে উত্তর বাঙ্গালায় যাইবার বহু প্রাচীন পথ বিদ্যমান আছে।

কেহ কেহ বলিতে চাহেন,—তিরুমলয়-লিপির উল্লিখিত ওড্র, দক্ষিণ রাঢ় এবং বঙ্গাল দেশের নৃপতি মহীপালের অধীন মিত্ররাজ হইতে পারেন;—

তিব্বতীয়-লিপির উল্লিখিত ওড্র, দক্ষিণ রাঢ় ও বঙ্গাল দেশ।

এ সম্বন্ধে বিশদ প্রমাণ না থাকিলেও, ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। লামা তারানাথ লিখিয়া গিয়াছেন,—উড়িষ্যারাজ মহীপালকে কর প্রদান করিতেন। পাল সাম্রাজ্য সামন্তসঙ্ঘে প্রতিষ্ঠিত ছিল; বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নানা স্থানের বহু ক্ষুদ্র সামন্ত নৃপতি, পালরাজগণ শক্তিশালী থাকিবার সময়, তাঁহাদিগকে কর প্রদান করিতেন, কিন্তু সেই কেন্দ্র-শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেই ন্যূনাধিকপরিমাণে আপনাদিগের সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নবান হইতেন।

দক্ষিণ রাঢ়ের অধীশ্বর-রূপে রণশূরের উল্লেখ কৌতুকাবহ। 'শূর'-পদান্ত যুক্ত এক রাজবংশ যে তৎপ্রদেশে বর্ত্তমান ছিল, রণশূর নাম তাহারই সন্ধান প্রদান করিতেছে। বাঙ্গালার জাতীয় ইতিহাসে এবং কুলশাস্ত্রে যে আদিশূরের প্রখ্যাতি আছে, তাঁহারও এই রাজবংশীয় হওয়া অসম্ভব নহে।

সর্ব্বশেষে, মহীপালের রাজত্বকালের লিখিত প্রমাণের মধ্যে, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরায় প্রাপ্ত একটি বিষ্ণুমূর্ত্তির উৎকীর্ণ-লিপির উল্লেখ করিব।—ইহা মহীপালের রাজ্যকালের তৃতীয় বর্ষে লোকদত্ত নামক জনৈক বৈশ্য বণিক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মহীপালের রাজত্বের প্রারম্ভে পূর্ব্ব-বাঙ্গালার কতক অংশ যে মহীপালের অধিকারভুক্ত ছিল, উহা হইতে তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মহীপালের গৌড়রাজ্য।

মগধের কতক অংশ এবং রাঢ়ের অন্ততঃ উত্তরাংশ যে দ্বিতীয় গোপালের রাজত্বকাল হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত নরবর গৌড়াধিপ পালরাজগণের অধিকারে ছিল, এবং মহীপাল তাহা উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,—এইরূপ সিদ্ধান্তই সম্ভাবিত বলিয়া আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে উপস্থাপিত করিয়াছি। মহীপালের রাজ্যপ্রাপ্তির সময়, উপরি-উক্ত দেশ ব্যতীত মধ্য ও উত্তর বাঙ্গালার কতক অংশও হয় ত গৌড়রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেহ কেহ এই অনুমান সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করেন না;—তাঁহারা বলেন, মহীপাল যখন রাজ্যারোহণ করেন, তৎপূর্ব্বেই চতুষ্পার্শ্বের প্রতিবেশিগণের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে পালরাজ্যের অধিকার-ভূমি বিশেষরূপে খর্ব্বীকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। রমাপ্রসাদ চন্দ বলিয়াছেন,—উত্তর বাঙ্গালার কাম্বোজ-আক্রমণের পর দ্বিতীয় বিগ্রহপাল মগধ বা মিথিলার কোনও সুদূর অঞ্চলে লুক্কায়িত ছিলেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বাঙ্গালার পালরাজগণ-সম্বন্ধীয় ইংরেজী পুস্তকে

কতকটা হেঁয়ালির আকারে লিখিয়াছেন,—"পালরাজবংশের নারায়ণপাল; দ্বিতীয় বিগ্রহপাল এবং মহীপাল নামমাত্র রাজা ছিলেন। বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র রাজ্য-পরিবেষ্টিত একটি নগণ্য রাজ্যে তাঁহারা রাজত্ব করিতেন।" তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসে তিনি লিখিয়াছেন যে, মহীপাল কেবল রাঢ় ও বঙ্গের কোনও কোনও অংশ উত্তরাধিকারক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং রাঢ় অথবা বঙ্গের কোনও সুদূর অঞ্চলে তিনি সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার পালরাজগণের সহিত যে সকল নৃপতিবৃন্দের সময় সময় যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল, তাঁহাদিগের প্রশস্তির আক্ষরিক-অর্থ-গ্রহণে এইরূপ সিদ্ধান্ত কল্পিত হইয়া থাকিবে বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু এইরূপ পদ্ধতি আমাদিগকে কোনও সম্ভাব্য অনুমানে উপনীত না করিয়া অশেষ অসামঞ্জস্যে নিক্ষেপ করিতে পারে, ইহা আমি প্রথম প্রবন্ধেই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। উল্লিখিত গ্রন্থকারগণ সম্ভবতঃ মহীপালের বাণগড়-লিপির উপরও নির্ভর করিয়াছেন; তাহাতে আছে,—মহীপাল অনধিকারী কর্ত্তৃক বিলুপ্ত পিতৃরাজ্যের উদ্ধার করিয়াছিলেন। কিন্তু এ কথা পালরাজগণের আদি-নিবাস উত্তর-বাঙ্গালার অংশবিশেষের পুনরধিকারের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে।

পক্ষান্তরে, আমি যে সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করিয়াছি, অর্থাৎ দ্বিতীয় গোপাল, দ্বিতীয় বিগ্রহপাল, এবং প্রথম মহীপালের অধিকারে বরাবর বঙ্গ বা পূর্ব্ব-বাঙ্গালা নহ, মগধ ও রাঢ়ের অধিকাংশ ভূভাগ ছিল, এবং মহীপাল দেশ-জয় করিয়া এই রাজ্য বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন,—সেই উপন্যস্ত সিদ্ধান্ত যে প্রমাণ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত হইয়াছে, এ কথা বলি না। আমি এইমাত্র বলি যে, বর্ত্তমানে আমাদের সমক্ষে যে সকল প্রমাণ বিদ্যমান আছে, তাহাতে এই সিদ্ধান্তই অধিকতর সম্ভাবিত বলিয়া প্রতিভাত হয়।

এই প্রবন্ধের প্রথমেই বলিয়াছি, ৯৮০ খৃষ্টাব্দে মহীপালের রাজ্যপ্রাপ্তির প্রায় সমসময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম-সংস্কারক অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান জন্মগ্রহণ করেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম-সংস্কারক অতীশ, বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান।

তিনি তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কারক বলিয়াই প্রধানতঃ পরিচিত। কিন্তু তিব্বতের লিখিত প্রমাণ হইতে এইরূপ দৃষ্ট হয় যে, তিনি বঙ্গাল-প্রদেশের বিক্রমণিপুর-নিবাসী ছিলেন। এই বিক্রমণিপুর বাঙ্গালায় ছিল, কেবল ইহাই জানি; কিন্তু কোথায় ছিল, তাহা জানি না। তিব্বতীয় বিবরণে, তাঁহার পিতার নাম কল্যাণশ্রী ও তাঁহার মাতার নাম প্রভাবতী, প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাল্যকালে, তিনি বিদ্যালাভের

নিমিত্ত ঋষিকল্প জিতারির নিকট প্রেরিত হয়েন, এবং দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নের সুবিধার নিমিত্ত তিনি তাঁহার নিকট পাঁচ প্রকার শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বয়োবৃদ্ধি হইলে, তিনি হীনযান শ্রাবকদিগের ত্রিপিটকে, বৈশেষিক দর্শনে, মহাযান সম্প্রদায়ের ত্রিপিটকে, মাধ্যমিক ও যোগাচার্য্যদিগের অধ্যাত্মবিজ্ঞানে, এবং চারি প্রকার তন্ত্রশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তাহার পর, সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য অপেক্ষা ধর্ম্মাচরণই শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়া, কৃষ্ণগিরি বিহারের রাহুল গুপ্তের নিকট তিনি বৌদ্ধদিগের যোগশাস্ত্রের, অর্থাৎ নীতিশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র, এই "ত্রিশিক্ষা"র অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। এই স্থানেই তিনি তাঁহার গুপ্তনাম গুহ্যজ্ঞান বজ্র প্রাপ্ত হয়েন, এবং বৌদ্ধ অধ্যাত্মরহস্যে প্রবেশ লাভ করেন। উনবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে, তিনি উদণ্ডপুরের মহা-সাঙ্ঘিকাচার্য্য শিলা রক্ষিতের নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নাম প্রাপ্ত হয়েন। একত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি ভিক্ষুদিগের সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করেন, এবং ধর্ম্মরক্ষিত তাঁহাকে বোধিসত্ত্বের দীক্ষা দান করেন। তিনি মগধের বহু প্রখ্যাতনামা বৌদ্ধ দার্শনিকের নিকট অধ্যাত্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি সমুদ্রপথে ব্রহ্মে গমন করিয়া সুবর্ণদ্বীপের মহাস্থবির আচার্য্য চন্দ্রকীর্ত্তির নিকট দ্বাদশ বৎসর অধ্যয়ন করেন। বর্ত্তমান পেগুর অন্তর্গত থাটনই প্রাচীন সুবর্ণদ্বীপ, উহাই তৎকালে সুদূর প্রাচ্যভূমির বৌদ্ধ কেন্দ্র ছিল। প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি সিংহল দর্শন করিয়া মগধে প্রত্যাগমন করেন, এবং অবিলম্বেই তৎপ্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মহাজ্ঞানী পণ্ডিত-রূপে পরিগৃহীত হয়েন। তাঁহার পরবর্ত্তী জীবন এবং তিব্বত-গমন প্রকৃতপ্রস্তাবে মহীপালের উত্তরাধিকারী নয়পালের রাজত্বকালের ব্যাপার।

বৌদ্ধ তিব্বতের সহিত বাঙ্গালার সম্পর্ক।

সুবিখ্যাত তিব্বতরাজ স্রোংৎসান-গাম্পোর রাজত্বকালে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দের প্রথম ভাগে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। এতৎসম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। তিব্বতীয় গ্রন্থাদিতে লিখিত আছে,—খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দের প্রারম্ভে তিব্বত-রাজ থিস্রোংদিউৎসান কর্ত্তৃক গৌড়-নিবাসী শান্ত রক্ষিত নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়া তিব্বতে লামাসম্প্রদায় নামে সুপরিচিত সন্ন্যাস-আশ্রমের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করেন। পরে, উক্ত নৃপতি মগধ হইতে কমলশীল নামক এক জন বড় বৌদ্ধ দার্শনিককে তিব্বতে আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন; এই কমলশীল চৈনিক সন্ন্যাসী হোসং মহাযানকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করেন, এবং তিব্বতের

বৌদ্ধধর্ম-সমাজের অধ্যাত্ম বিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দে তিব্বতরাজ রাজ্যপাল ভারতবর্ষ হইতে বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া তিব্বতীয় ভাষায় সংস্কৃত গ্রন্থাদির অনুবাদ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সকল পণ্ডিতগণের মধ্যে সম্ভবতঃ বাঙ্গালা হইতেও কেহ কেহ গমন করিয়া থাকিবেন। তিব্বতীয় বৌদ্ধ ইতিবৃত্ত গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, বালপচনের লওরাম নামে এক পাষণ্ড সহোদর ছিল। সেই তাঁহাকে তাঁহার ঘাড় মুচড়াইয়া নিহত করে। তৎপরে লওরাম সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম-ধ্বংসে ব্যাপৃত হয়। যাহা হউক, এ কার্য্যে সে সম্পূর্ণ সফলকাম হইতে পারে নাই। তাহার মৃত্যুর পর তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়, এবং বিরূপাল, গুণপাল ও প্রজ্ঞাপাল নামক তিনটি শিষ্য বিক্রমশিলা বিহারে প্রাচ্যভারতের সুবিখ্যাত পণ্ডিত ধর্ম্মপাল ১০১৩ খৃষ্টাব্দে তিব্বত গমন করিয়া এই পুনঃপ্রতিষ্ঠা কার্য্যের বিশেষরূপ সহায়তা করেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতীয় বৌদ্ধগণ চীনদেশের ন্যায় তিব্বত-দেশেও কি কি কার্য্য করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে এখনও বহু অনুসন্ধান ও অনুশীলন আবশ্যক। মহীপালের সমসাময়িক তিব্বতাধিপতি—হ্লা লামা।

বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎপত্তি-আলোচনা।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন,—এই সময়েই বাঙ্গালা সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছিল, এবং ইহারই সমসময়ে বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ-গানের প্রচলন হইয়াছিল।—এই বৌদ্ধগান হইতেই সম্ভবতঃ কীর্ত্তন গান উদ্ভূত লাভ করিয়া থাকিবে। তিনি কৃষ্ণাচার্য্য বা কাহ্ন নামক এক গীতি-কার ও দোহা-(দ্বিপথা)-কারের নামোল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, ঐরূপ আরও অনেক দোহাকার বর্ত্তমান ছিল, এবং সমগ্র বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায় বাঙ্গালায় বৌদ্ধগান গাহিত। বাঙ্গালী কৃষকের ও শ্রম-শিল্পীর নিকট কীর্ত্তন গান করিয়া বেড়াইত—এমন উনিশটি সঙ্গীত-রচয়িতার তিনি নাম করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে, ডাকের বচন নামে বিখ্যাত, পদ্য প্রবচনগুলিও এই সময়েই রচিত হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন,—খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দের মধ্যভাগে লিখিত, সংস্কৃত ছায়া সহ বাঙ্গালা দোহা ও প্রবচনের সংগ্রহ গ্রন্থ এখনও নেপালের মঠে ও পুস্তকালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে এইরূপ একখানি সংগ্রহ গ্রন্থ মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

এই সকল গান, দোহা ও প্রবচন যে কি হেতু বাঙ্গালার সামগ্রী, অথ

কি কারণেই বা তাঁহাদিগের কাল একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ, অথবা তাঁহাদিগকে প্রাচীন বাঙ্গালায় রচিত মনে করিবার কারণ কি, তৎসম্বন্ধে তিনি কোনও প্রমাণ প্রদান করেন নাই। ভাষার আকারমাত্র বিবেচনা করিলে, উহাকে তুল্যরূপে মগধের, মিথিলার, অথবা আসামের ভাষাও বলা যাইতে পারে। এ বিষয়টি কৌতুকাবহ, এবং ইহার সম্বন্ধে অধিকতর অনুশীলন আবশ্যক। মহীপাল যে তাঁহার রাজত্বকালে উত্তর-পূর্ব্ব ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন, এবং তাঁহার রাজত্বের অন্ততঃ অধিকাংশ কাল যে বাঙ্গালা-দেশ শান্তি ও সৌভাগ্য-সুখ উপভোগ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে। অতএব, সে সময়ে সাহিত্যের অনুশীলন ও বিকাশ-লাভ বিশেষ সম্ভব বলিয়াই প্রতিভাত হয়।

এই সময়ে ধর্ম্মবিষয়েও উন্নতি ঘটে, এবং সাধারণ বৌদ্ধধর্ম্ম তন্ত্রোক্ত শাক্তে দেশে প্রভাবিত হয়,—এরূপ প্রতীয়মান হয়।

ইহারই সমসময়ে নাথগণ পদস্থ হইয়া উঠেন; নাথ একটা সম্প্রদায়। ইহারা যোগাভ্যাসে সিদ্ধিলাভ করিয়া অতি-মানুষ বলিয়া বিবেচিত হইতেন। ইহাদিগের কতক বৌদ্ধ, এবং কতক শৈব ছিলেন।

বাঙ্গালার প্রাচীন পাল-রাজগণের শাসনকালে সুকুমার-শিল্পের উন্নতি সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করা কর্ত্তব্য হইবে না।

এ বিষয়ের ইতিহাস এখনও কুহেলিকাচ্ছন্ন; কিন্তু উত্তর বাঙ্গালার প্রাচীন এবং রাজসাহীর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সংগ্রহালয়ে সংরক্ষিত কতকগুলি অতি সুন্দর শ্রীমূর্ত্তি হইতে প্রমাণিত হয় যে,—প্রাচীনকালে অন্ততঃ ভাস্কর্য্য বহুলপরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

প্রাচীন পালরাজত্বের সুকুমার শিল্প।

এই সকল ভাস্কর-মূর্ত্তির সকলগুলিই উপাস্য দেবমূর্ত্তি নহে; ইহাদিগের কতকগুলি পুরাপুরি বৌদ্ধমূর্ত্তি, এবং কতকগুলি তান্ত্রিক-বৌদ্ধ বা হিন্দু মূর্ত্তি। তিব্বতীয় ইতিহাসকার তারানাথের বর্ণনানুসারে, ধর্ম্মপাল ও দেবপালের রাজত্বকালে, বরেন্দ্রভূমে ধীমান ও বীতপাল নামক দুই জন সুবিখ্যাত ধর্ম্ম বিষয়াবলম্বী চিত্রকর ও ভাস্কর প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তারানাথ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দের লেখক। তিনি ভারতবর্ষের ধর্ম্মবিষয়ক শিল্প সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন—"যে স্থানেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবলতা লাভ করিয়াছে, সে স্থানেই ধর্ম্মবিষয়ক সুনিপুণ চিত্রকর ও ভাস্করের আবির্ভাব হইয়াছে; যে স্থানে ম্লেচ্ছগণ শাসনদণ্ড ধারণ করিয়াছে, সে স্থান হইতেই তাহারা অন্তর্ধান

বৎসর। তখনও সে চিন্তামণি গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় সর্দ্দারপোড়োর পদ অধিকার করিয়াছিল। অবিনাশের তখন মোক্তারীতে একটু একটু পসার জমিতেছিল। পিতার মৃত্যুর পর অবিনাশ তাহাকে পাঠশালা ছাড়াইয়া গোহাটীর ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। কিন্তু ছুটীতে দাদা যে কয় দিন বাড়ীতে থাকিতেন, সেই কয় দিন ছাড়া বিনোদ স্কুলে যাতায়াতের কষ্ট স্বীকার করিত না। সকালে সন্ধ্যায় পক্ষিশাবকের অন্বেষণ, এবং মধ্যাহ্নে মৎস্যশিকার কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া দিনগুলাকে বেশ সহজভাবেই কাটাইয়া দিত।

বাড়ীতে মা ছিলেন না। তিনি অনেক দিন আগেই—বিনোদকে চারি বৎসরের রাখিয়া, সংসার হইতে ছুটী লইয়াছিলেন। ছিল শুধু বৌদিদি। তাহারও সন্তানসন্ততি ছিল না। সুতরাং এই বন্ধ্যা রমণীর সমগ্র স্নেহ মাতৃহীন দেবরকেই কেন্দ্র করিয়া লইয়াছিল। অপত্যস্নেহটা পরের ছেলের উপর আসিয়া পড়িলে তাহা নিজের ছেলের অপেক্ষা কিছু অতিরিক্তমাত্রাতেই প্রকাশ পায়, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। এই নিয়মের বশে বিনোদ বৌদিদির নিকট যেটুকু তাড়না বা তিরস্কার পাইত, সেটুকু তাহার বুদ্ধির নিক্তিতে বৌদিদির স্নেহ অপেক্ষা একটুও গুরু বলিয়া বোধ হইত না। সুতরাং বিনোদ সুখকর মৎস্যশিকার-প্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়া ক্লেশকর বিদ্যাশিক্ষার দিকে মনোযোগ দিবার আবশ্যকতা আদৌ অনুভব করিত না।

অবিনাশ বাড়ী আসিয়া যখন ভ্রাতার বিদ্যা পরীক্ষা করিতে চাহিতেন, তখন ভাইয়ের বিদ্যার দৌড় দেখিয়া চমৎকৃত হইতেন। তার পর লোকের মুখে তাহার গুণের কথা শুনিয়া রাগিয়া উঠিতেন। রাগিয়া বিনোদকে ধমক দিতেন, মারিতে যাইতেন, দুই একটা চড় চাপড় দিতেও ছাড়িতেন না। তার পর তিনি ভ্রাতাকে পুনরায় স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া কর্ম্মস্থলে যাত্রা করিতেন। দাদা ষ্টেশনে না পঁহুছিতেই বিনোদ পুনরায় ছিপ বঁড়শীর সংস্কারে প্রবৃত্ত হইত, এবং যাহারা দাদার কাণ ভারী করিত, তাহাদের গাছের ফল ও পুকুরের মাছ সমূলে নষ্ট করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে থাকিত।

এমনই করিয়া ছয় সাত বৎসর কাটিয়া গেলেও বিনোদ যখন স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর কঠোর গণ্ডী ভেদ করিতে পারিল না, অধিকন্তু নবোদ্গত গুম্ফরাজি লইয়া অজাতগুম্ফ বালকদের সহিত একাসনে বসিতে লজ্জা অনুভব করিতে লাগিল, তখন অবিনাশ বিরক্ত হইয়া তাহাকে স্কুল ছাড়াইয়া দিলেন। বিনোদ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

বড় বৌ স্বামীকে অনুরোধ করিল, "বেন্দার বয়স হ'য়েছে, বিয়ে দাও।"

দুই একবার স্ত্রীর অনুরোধে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেও, শেষে অবিনাশকে ভ্রাতার বিবাহের চেষ্টা দেখিতে হইল। ছেলের কোনও গুণ না থাকিলেও এ দেশে মেয়ের অভাব হয় না। বেটা ছেলে তো বটে! সুতরাং অনেক জায়গা হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। অবিনাশ তাহাদের মধ্যে একটী ভাল ঘর, ভাল মেয়ে দেখিয়া দেনা পাওনা স্থির করিয়া ফেলিলেন, এবং মাঘ মাসে বিবাহের দিন স্থির করিয়া পূজার ছুটীতে মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন। কিন্তু অগ্রহায়ণের শেষে বিনোদ হঠাৎ এক দিন মামারবাড়ী গিয়া মামার প্রতিবেশী দীনু ঘোষের মেয়েকে বিবাহ করিয়া ঘরে ফিরিল। অবিনাশ রাগে আগুন হইয়া উঠিলেন। বড় বৌ তাঁহাকে শান্ত করিল; বলিল, "বেন্দার কাজটা ভাল হয়নি বটে, বৌ কিন্তু দিব্যি মনের মত হ'য়েছে।" অগত্যা অবিনাশকে তাহা মানিয়া লইতে হইল।

অতঃপর অবিনাশ আদালতে বিনোদের চাকরী করিয়া দিলেন। কিন্তু বিনোদ দুই দিন কাজ করিয়াই বুঝিতে পারিল, এইরূপে দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত এক জায়গায় বসিয়া কলমপেশা তাহার কর্ম্ম নয়। বিশেষতঃ মধ্যাহ্ন উপস্থিত হইলেই নাঠপুকুরের ধারে বটগাছের ছায়ায় বসিয়া চারের চারি পাশে বৃহৎ বৃহৎ রোহিত মৎস্যের উল্লম্ফন একাগ্রচিত্তে নিরীক্ষণ করিবার স্মৃতি আসিয়া তাহাকে বড়ই অধীর করিয়া তুলিত। এ অধীরতা বিনোদ অধিক দিন গ্রাহ্য করিতে পারিল না। এক সপ্তাহ চাকরীর পর অসুস্থ হইয়া বিনোদ সেই যে বাড়ী গেল, আর কর্ম্মস্থলে ফিরিল না। প্রত্যহ সদ্যোধৃত মৎস্য ভোজন দ্বারা রোগের প্রতীকার করিতে লাগিল।

বড় বৌ বলিল, "হাঁ রে বেন্দা, চাকরী করবি নি তো খাবি কি?"

বিনোদ উত্তর করিল, "দাদা জানে।"

বড় বৌ বলিল, "দাদা কি তোকে চিরকাল বসিয়ে খাওয়াবে?"

জোরে মাথা নাড়িয়া বিনোদ বলিল, "নি-শ্চয়।"

বড় বৌ হাসিয়া উঠিল। অবিনাশ শুনিয়া বলিলেন, "নেহাৎ হতভাগা।"

তার পর এক দিন বড় বৌ অন্তিম শয্যায় শয়ন করিয়া স্বামীর হাত দুইটী চাপিয়া ধরিয়া যখন ক্ষীণ কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "ওগো, বেন্দার কি হবে?" তখন অবিনাশ কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "তার জন্য কাতর হ'য়ো না বড় বৌ, আমার যা কিছু সবই তার।"

বড় বৌ নিশ্চিন্তমনে হাসিতে হাসিতে পরলোকে চলিয়া গেল। বৌদিদির মৃত্যুতে বিনোদ তিন দিন তিন রাত্রি অন্নজল স্পর্শ করিল না; দুই মাস মাঠ-পুকুরের ধারে গেল না।

কিছু দিন পরে অবিনাশ পুনরায় দারপরিগ্রহ করিলেন। নূতন বড় বৌ আসিয়া পুরাতন সংসারে জাঁকিয়া বসিল। একটী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল; বিনোদেরও একটী মেয়ে হইল। কিন্তু বিনোদের প্রকৃতির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হইল না। সে মাছ ধরিয়া, তাস পিটিয়া, স্বচ্ছন্দচিত্তে দিন কাটাইতে লাগিল।

এ দিকে হঠাৎ অবিনাশের দিন ফুরাইয়া আসিল। অবিনাশ যখন তাহা বুঝিতে পারিলেন, তখন তিনি তাড়াতাড়ি একখানা উইল করিয়া ফেলিলেন, এবং তাহাতে বিনোদকেই তাঁহার সমগ্র সম্পত্তির অধিকারী করিয়া, সতীসাধ্বীর অন্তিম শয্যাপার্শ্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিলেন। লোকে সে প্রতিজ্ঞার কথা জানিত না, সুতরাং তাহারা অতিমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল।

২

লোকে ভাবিয়াছিল, বিনোদের নামে উইল করিলেও, অবিনাশ আপনার ভূসম্পত্তি বা নগদ টাকাকড়ির কিছু না কিছু স্ত্রীপুত্রকে দিয়া যাইবেন। কিন্তু শ্রাদ্ধশেষে সর্ব্বসমক্ষে যখন উইল পড়া হইল, তখন লোকের বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিল। উইলে স্ত্রীপুত্রের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত ছিল না।

শ্রীপতি ঘোষাল বলিলেন, "তাই তো, অবিনাশ বুদ্ধিমান্ হ'য়ে এমন কাজটা কেন ক'রে গেল?"

ভোলানাথ ঘোষ বলিল, "মাথার ঠিক ছিল কি না, সেটাও দেখা দরকার।"

বুড়া মৃত্যুঞ্জয় দত্ত মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "এখন এই বিধবা আর নাবালক দাঁড়ায় কোথায়, সেইটেই হচ্চে প্রধান ভাবনা।"

বিনোদ রাগিয়া বলিল, "পরের ভাবনা এতটা না ভেবে আপনারা নিজের চরকায় তেল দিন গে দত্ত মশায়।"

দত্ত মহাশয় রাগে মাথা কাঁপাইতে কাঁপাইতে বলিলেন, "থাম হে বাপু, নিজের চরকায় তেল দিয়ে দিয়ে মাথার চুল সাদা ক'রেছি। স্ত্রীপুত্র কেউ হ'লো না, সভাতো ভাই হ'লো আপনার। আমরা সবই বুঝে থাকি।"

বিনোদ চড়া গলায় উত্তর দিল, "বুঝে থাকেন, ঘরের ভাত বেশী ক'রে খাবেন।"

অবিনাশের দ্বিতীয় পক্ষের শ্বশুর মাধব সরকার উপস্থিত ছিলেন। তিনি বিনোদকে লক্ষ্য করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "রাগ ক'রো না বাবাজী, দত্তজা যা বলছেন, তা ন্যায্য কথাই বলছেন।"

বিনোদ বসিয়া ছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল; ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে বলিল, "দাদা যা ন্যায্য বুঝেছেন তাই ক'রে গেছেন; দাদার কথার উপর কথা কইবার অধিকার কোনও বেটারই নাই।"

সরকার মহাশয় বলিলেন, "অপরের না থাকলেও, আইনের সে অধিকার আছে।"

চীৎকার করিয়া বিনোদ বলিল, "আইন? আইন জানে কোন্ বেটা? আমার দাদা ছিল আইনের জহুরী।"

বিনোদ রাগে জোরে জোরে পা ফেলিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। উপস্থিত সকলেই পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন।

বাড়ীর ভিতর গিয়া বিনোদ বড় বৌকে ডাকিয়া বলিল, "শুনেছ বড় বৌ, বেটারা বলে কি না দাদা বে-আইনী কাজ ক'রে গেছেন। আরে বেটারা, আমার দাদা কি যে-সে লোক ছিল? আইনের পাকা জহুরী, বুঝলে বড় বৌ, আইনের পাকা জহুরী।"

বড় বৌ মুখ ভার করিয়া রহিল, কোনও উত্তর দিল না।

মাধব সরকার দত্তজার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপারটা কি—বলুন দেখি; আমার বোধ হয় উইলটা জাল।"

দত্তজা ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিলেন, "উইল যে জাল নয়, তা আমি জানি। তবে সে সময়ে আপনার জামাতার মাথার ঠিক ছিল কি না, সেইটাই হচ্চে কথা। প্রমাণ করতে পারবেন?"

সরকার মহাশয় বলিলেন, "এক জন ভাল উকীলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে দেখি।"

কয়েক দিন কন্যাগৃহে অবস্থানের পর সরকার মহাশয় যে দিন গৃহগমনে উদ্যত হইলেন, সে দিন মেয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমার কি হবে বাবা?"

সরকার মহাশয় কন্যাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "কোনও চিন্তা নাই মা, মাধব সরকার বেঁচে থাকতে আর এক জন যে তোমার বিষয় ফাঁকি দিয়ে নেবে, তা কখনই হবে না।"

ছোট বৌ স্বামীর পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ওগো, রক্ষা কর, বিষয় ছেড়ে দাও।"

দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বিনোদ বলিল, "এক কড়া কাণা কড়িও ছাড়ব না। দেখি, কে আমার দাদার চালের উপর চাল চালতে পারে।"

কয়েক দিন পরে বিনোদ যখন জজের কাছে উইলের প্রোবেট লইতে গেল, তখন বড় বউয়ের পক্ষ হইতে দরখাস্ত পড়িল, উইল প্রকৃত কি না, সে বিষয়ে আবেদনকারিণীর সন্দেহ আছে, এবং উইল করিবার সময়ে উইলকর্ত্তার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিয়াছিল কি না, তাহাও সন্দেহের বিষয়। অতএব হুজুর হইতে ইহার সুবিচারের আজ্ঞা হয়।

সুতরাং হুজুর হইতে বিচারের আজ্ঞা হইল। রীতিমত মোকদ্দমা বাধিল। দিনের পর দিন পড়িতে লাগিল। সরকার মহাশয় মেয়ের গহনা বেচিয়া উকীল মোক্তারের খরচ যোগাইতে লাগিলেন। কেহ কেহ এরূপ মতও প্রকাশ করিল যে, এই সময়ে সরকার মহাশয়ের টানাটানির সংসার বেশ একটু সচ্ছল হইয়াছিল। কিন্তু ইহা বিনোদের পক্ষীয় দুষ্ট লোকের মত, সুতরাং সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য।

৪

মোকদ্দমা করিতে গিয়া বিনোদ মহা বিপদে পড়িল। সে দেখিল, মোকদ্দমায় কেবল টাকার শ্রাদ্ধ হয় না, মানমর্য্যাদারও রীতিমত পিণ্ডদান কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়। এক দিকে মান বজায় করিতে গিয়া, অপর দিকে অপমানের একশেষ হইতে হয়। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আদালতে হাঁটাহাঁটি করিতে করিতে পা ছিঁড়িয়া যায়। সাক্ষীদের বাড়ী দিনে তিন বার যাতায়াত করিতে হয়, তাহাদের মন যোগাইতে হয়, দোকানের দেনা শোধ করিতে হয়, অনেক অন্যায় অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। ছি ছি, লোকে কি সুখে মোকদ্দমা করে?

মোকদ্দমায় সুখ না থাকিলেও বিনোদ কিন্তু তাহা ছাড়িল না। ইহার সকল কার্য্য তাহার সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত হইলেও, সে এমনই ধীরতার সহিত কাজ করিয়া যাইতে লাগিল যে, লোকে তাহার প্রকৃতির বিপরীত আচরণ-দর্শনে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা মত প্রকাশ করিল যে, বিষয়ের লোভে অসম্ভবও সম্ভব হয়।

মোকদ্দমা যখন পূর্ণবেগে চলিতেছিল, তখন সহসা এক দিন বড় বৌ হাঁড়ী পৃথক্ করিয়া লইল; আলাদা রাঁধিয়া খাইল।

ছোট বৌ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি পৃথক্ হ'লে দিদি ?"

বড় বৌ মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "তা হ'লাম বৈকি ভাই। আর দাঁতে জিভে ভালবাসায় কাজ কি !"

বিনোদ শুনিয়া গম্ভীর হইয়া রহিল।

কিন্তু ছেলেটা বড় গোল বাধাইল। সে কাকাবাবুর সঙ্গে খাইবার লোভ কিছুতেই সংবরণ করিতে পারিল না। বড় বৌ ছেলেকে বুঝাইল, ধমক দিল, ছেলে কিন্তু কিছুতেই বাগ মানিল না। বিনোদ আসনে বসিয়া কেলো বলিয়া ডাকিলেই সে মাতার তিরস্কার প্রহার সব উপেক্ষা করিয়া কাকাবাবুর পাশে আসিয়া বসিত। ক্রমে ইহা বড় বোয়ের অসহ্য হইল। শেষে এক দিন কালী কাকাবাবুর পাশে বসিয়া যখন ভোজনে উদ্যত হইয়াছে, তখন বড় বৌ বাঘিনীর মত ছুটিয়া আসিয়া ছেলের পিঠে রীতিমত চড় চাপড় বসাইয়া দিয়া, এবং তাহাকে টানিয়া আনিয়া ঘরে পুরিয়া, ঘরে শিকল তুলিয়া দিল। ছেলে ঘর হইতে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, "কাকাবাবু গো, কাকাবাবু গো !"

বিনোদ হাতের ভাত পাতে ফেলিয়া ডাকিল, "বড় বৌ !"

বড় বৌ কোনও উত্তর দিল না, গুম হইয়া দাবায় বসিয়া রহিল। বিনোদ বলিল, "ওকে ছেড়ে দাও বড় বৌ।"

বড় বৌ গম্ভীরকণ্ঠে উত্তর দিল, "কেন ?"

বিনোদ। ও ভাত খাবে।

বড় বৌ। আর ভাত খাইয়ে কাজ নাই। গোড়া কেটে আগায় জল ঢালতে হবে না।

বিনোদ। ছাড়বে না ?

বড় বৌ। না। বিষয় তো গ্রাস ক'রেছ, আবার ছেলেটাকেও গ্রাস কর কেন ?

বিনোদ বিস্ময়পূর্ণকণ্ঠে বলিল, "তুমি বল কি বড় বৌ, কেলোকে আমি বিষ খাওয়াব ?"

বড় বৌ বলিল, "কি খাওয়াবে না খাওয়াবে, কে দেখছে বল।"

ঘৃণায় নাসা কুঞ্চিত করিয়া বিনোদ বলিল, "ছিঃ, তুমি নিতান্ত ছোটলোক।"

বড় বৌ বলিল, "কে ছোটলোক কে ভদ্রলোক, তা বোঝাই যাচ্চে।"

বিনোদ চীৎকার করিয়া বলিল, "তুমি কিছুই বোঝ না বড় বৌ, তুমি মাধব সরকারের মেয়ে, উমেশ দের ছেলেদের বুঝতে তোমার বাপেরও সাধ্যি নাই।"

বড় বৌ রাগিয়া বলিল, "দেখ ঠাকুরপো, ঠিক দুপুর বেলা বাড়াবাড়ি ক'রো না, তা বলছি।"

বিনোদ আর কোনও কথা না বলিয়া ভোজনে ব্যাপৃত হইল। ছেলেটা তখনও চীৎকার করিয়া ডাকিতেছিল, "কাকাবাবু গো, কাকাবাবু গো!"

বিনোদ হাতের ভাতগুলাকে থালায় আছড়াইয়া ফেলিয়া উঠিয়া গেল। বড় বৌ মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "আহা হা, সোহাগ দেখেও বাঁচি না। বলে—মাছ মরেছে বেরাল কাঁদে শাস্ত কল্লে বকে।"

৫

বছর খানেক পরে মোকদ্দমা মিটিল। বিচারে উইল প্রকৃত বলিয়া সাব্যস্ত হইল। বিনোদ যেদিন রায়ের নকল পাইল, সেদিন তাহার সমর্থ আত্মীয়দের পাড়া কাঁপিতে লাগিল। পাড়ার লোকে বলিল, "বিনোদ, মোকদ্দমায় জিতেছ, এবার এক দিন খাইয়ে দাও।"

গর্ব্বস্ফীতকণ্ঠে বিনোদ বলিল, "মোকদ্দমায় আবার জিত হার কি, জিত তো হ'য়েই ছিল। আমার দাদা উইল লিখে গেছে, কার বাবার সাধ্যি তা রদ করে। দাদা ছিল আইনের গহরী।"

বাড়ীতে আসিয়া বিনোদ উৎফুল্লকণ্ঠে ডাকিয়া বলিল, "শুনেছ বড় বৌ, মোকদ্দমায় জিত হ'য়েছে।"

বড় বৌ কিন্তু তাহার এ আনন্দসংবাদে কিছুমাত্র উৎফুল্লতা প্রকাশ করিল না। সে ঘরের ভিতর উপুড় হইয়া পড়িয়া মৃত স্বামীর উদ্দেশে, ধর্ম্মের উদ্দেশে তীব্র অভিসম্পাত প্রয়োগ করিতে লাগিল।

পর দিন ছোট বৌ বিনোদকে বলিল, "ওগো, দিদি বাপের বাড়ী চললো।"

বিনোদ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

ছোট বৌ বলিল, "কেন আর কি, দিদি বলছে, ওঁর আর এখানে কি, বিষয় আশয় তো সবই তোমার।"

ঈষৎ রুষ্টভাবে বিনোদ বলিল, "হ'লই বা আমার, তাতে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে গেছে?"

ছোট বৌ বলিল, "কি হ'য়েছে না হ'য়েছে, তা আমি জানি না। দিদি কিন্তু যাবার যোগাড় করছে।"

বিনোদ বড় বৌয়ের ঘরের কাছে গিয়া ডাকিল, "বড় বৌ।"

বড় বৌ তখন বাক্স প্যাঁটরা গুছাইতে ব্যস্ত ছিল, বিনোদের ডাকে কোনও

উত্তর দিল না। বিনোদ দাবার উপর উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি বাপের বাড়ী যাবে বড় বৌ?"

বড় বৌ মুখ না ফিরাইয়াই তাচ্ছীল্যের সহিত উত্তর দিল, "হাঁ যাব।"

বিনোদ। কেন যাবে?

বড় বৌ। যাব না তো থাকবো কোথায়?

বিনোদ। তোমার কি থাকবার জায়গা নাই?

বড় বৌ। কৈ আর আছে বল। এমন হতভাগা সোয়ামীর হাতে পড়েছিলাম যে, মাথা গুঁজে থাকবার জায়গাটী পর্য্যন্ত রেখে গেল না।

রাগে চোখ দুইটা কপালে তুলিয়া বিনোদ বলিল, "মুখ সাম্‌লে কথা কও বড় বৌ, আমার দাদা হতভাগা?"

মুখ ফিরাইয়া গর্জ্জন করিয়া বড় বৌ বলিল, "একশো বার হতভাগা। যে স্ত্রী পুত্রকে পথে বসিয়ে ভাইকে সর্ব্বস্ব দিয়ে যায়, সে আবার মানুষ?"

বিনোদ কঠোর দৃষ্টিতে বড় বউয়ের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। বড় বৌ বলিতে লাগিল, "যেমন হতভাগার হাতে প'ড়েছিলাম, তেম্‌নি তো ফলভোগ কত্তে হবে। আমার সব থাকতেও এখন বাপের বাড়ীতে গিয়ে দাসীবৃত্তি ক'রে খাই।"

বিনোদ বলিল, "তা হ'বে না বড় বৌ।"

বড় বৌ জিজ্ঞাসা করিল, "কি হবে না?"

বিনোদ। বাপের বাড়ী যাওয়া হবে না। আমার দাদার স্ত্রী যে মামার সরকারের বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করবে, তা কিছুতেই হতে পারে না।

তীব্র শ্লেষের স্বরে বড় বৌ বলিল, "তবে কি তোমাদের দাসীবৃত্তি করতে হবে?"

বিনোদ বলিল, "তুমি বড় বৌ; তুমি দাসীবৃত্তি করবে?"

কঠোরকণ্ঠে বড় বৌ বলিল, "দাদার বিষয়গুলি হাত করে' দাদার স্ত্রীর উপর যে বড় দরদ দেখছি।"

বিনোদ উচ্চকণ্ঠে বলিল, "বিষয়! বিষয়ের মুখে মারি লাথি। কিন্তু আমি বলছি বড় বৌ, আমি বেঁচে থাকতে তোমাকে বাড়ী ছেড়ে কোথাও যেতে দেব না।"

বড় বৌ বলিল, "একশো বার দেবে। যেখানে আমার মাথা গুঁজে থাকবার স্থানটী পর্য্যন্ত নাই, সেখানে আমি কিছুতেই থাকব না।"

রাগে চীৎকার করিয়া বিনোদ বলিল, "আলবৎ থাকতে হবে। বিনোদলাল বেঁচে থাকতে কার সাধ্যি বাড়ীর চৌকাটের বাইরে পা দেয়।"

গর্জ্জন করিতে করিতে বিনোদ চলিয়া গেল। বড় বৌ বেগতিক দেখিয়া পিতাকে আসিবার জন্য সংবাদ পাঠাইল।

৬

চার পাঁচ দিন পরে সরকার মহাশয় আসিলেন। তিনি কন্যাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "ভয় নাই মা, আমি পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করবো। হাইকোর্টের এক জন বড় উকীলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে এসেছি। তত দিন চল, আমার কাছেই থাকবে।"

বড় বৌ বলিল, "কিন্তু বাবা, ও গুণ্ডা যদি যেতে না দেয়?"

গর্ব্বপ্রফুল্লকণ্ঠে সরকার মহাশয় বলিলেন, "ওর বাবাকে যেতে দিতে হবে। আমি পুলিসে ডাইরী করিয়ে তবে এসেছি। তুমি সব গুছিয়ে নাও।"

বড় বৌ তখন পোঁটলা পুঁটলী বাঁধিতে লাগিল।

বিনোদ ব্যস্তভাবে দাবার উপর উঠিয়া ডাকিল, "কেলো, কেলো!"

কালী মাতামহের কাছে বসিয়াছিল; কাকার ডাক শুনিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া তাহার কাছে আসিল। বিনোদ পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া বলিল, "এই নে।"

কালী কাগজখানা হাতে লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি কাকাবাবু?"

সহাস্যে বিনোদ বলিল, "ফলারের নিমন্ত্রণপত্র। বুঝলি?"

কালী বলিল, "নেমন্তন্ন? কোথায়?"

হাসিতে হাসিতে বিনোদ বলিল, "তোর শ্বশুরবাড়ীতে। তোর শাশুড়ীর বিয়ে, তারই নিমন্ত্রণ। যাবি তো?"

কাকাবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া কালী বলিল, "তুমি যাবে?"

বিনোদ বলিল, "নিশ্চয়। তোর শাশুড়ীর বিয়ে, আমি যাব না?"

উৎফুল্লস্বরে কালী বলিল, "ওহো, আমার শাশুড়ীর বিয়ে!"

বিনোদ তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিল, তার পর ধীরে ধীরে দাবা হইতে উঠানে নামিল।

কালী ঘরের ভিতর গেলে সরকার মহাশয় "দেখি" বলিয়া তাহার হাত হইতে কাগজখানা লইয়া পড়িতে লাগিলেন।

বড় বৌ জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের কাগজ বাবা?"

বিস্ময়ের আতিশয্যে সরকার মহাশয়ের হাতখানা তখন কাঁপিতেছিল, গলাটা শুকাইয়া কাঠ হইয়া আসিয়াছিল। কষ্টে একটা ঢোক গিলিয়া তিনি বলিলেন, "দানপত্র।"

বড় বৌ বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "দানপত্র?"

শুষ্ক মুখে ধরা গলায় সরকার মহাশয় বলিলেন, "জামাই যে সম্পত্তি উইলে বিনোদকে দিয়ে গিয়েছিল, বিনোদ সেই সব সম্পত্তি কালীর নামে দানপত্র ক'রে দিয়েছে।"

বড় বউয়ের বিস্ময়স্তম্ভিত কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল, "সব?"

সরকার মহাশয় বলিলেন, "হাঁ, সব।"

বড় বৌ হাঁ করিয়া বাপের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সরকার মহাশয় কাগজখানা তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "এখানা যত্ন ক'রে তুলে রাখ।"

বড় বৌ কাগজখানা হাতে লইয়া ঘরের বাহিরে আসিল; উচ্চকণ্ঠে ডাকিল "ঠাকুরপো!"

বিনোদ তখন জামা ছাড়িয়া দাবার তামাক সাজিতে বসিয়াছিল। সে এক হাতে কলিকা এবং অপর হাতে তামাক লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং বড় বউয়ের দিকে চাহিয়া উগ্রকণ্ঠে বলিল, "দেখ বড় বৌ, এবার যদি কোথাও যেতে চাও, তা হ'লে ভাল হবে না—ব'লে রাখছি; আমি একটা খুনখারাবী না ক'রে ছাড়ব না।"

বড় বৌ স্তম্ভিতদৃষ্টিতে দেবরের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ঘরের ভিতর বসিয়া সরকার মহাশয় আপন মনে বলিলেন, "আমার বোকারাম। দাদার উপযুক্ত ভাই বটে।"

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

দধীচির দেহত্যাগ।

১

কর্ম্মযজ্ঞ সমাপন, হোমাগ্নির রক্ত-শিখা নিবিছে আকাশে ;
পাটল সন্ধ্যার মত পয়স্বিনী হোমধেনু গোষ্ঠে ফিরে আসে !
মৌনী আজি তপোবন, চঞ্চল-স্বভাব মৃগ— আজি ব্যতিক্রম—
নেহারিছে শান্তনেত্রে— দেবদারু-কুঞ্জ-মাঝে দধীচি-আশ্রম।

২

অবিদূরে মৃগাদন, নততুণ্ডে অচঞ্চল,— গণিছে প্রহর ;
কুণ্ডলিত করি' দেহ স্তিমিতনয়নে চাহি' শ্বসে অজগর ;
পাখী নাহি যায় নীড়ে, বসিয়াছে সারি-সারি অরবে শাখায় ;
নাহি বহে সমীরণ, নড়ে না পল্লব, যেন— চিত্রার্পিত-প্রায় !

৩

ধ্যানমগ্ন মহাঋষি, চক্রাকারে ঘিরি' তাঁরে দেব, ঋষিগণ ;
বাক্যহীন—রুদ্ধকণ্ঠ, কুণ্ঠিত দেবতা—সবে সন্নত-বদন !
অন্তেবাসী শিষ্যগণ কহে পরস্পরে মৃদু সজল নয়ন—
"কহিলা আচার্য্য আজি দেবহিতে করিবেন— দেহ-সমর্পণ !

৪

"পিতৃস্নেহে—গুরুস্নেহে পালিলা মোদের তাত করুণা-নিদান,
জ্ঞান-গোমুখীর ধারা রুদ্ধ হবে, গুরুদেব লভিলে নির্ব্বাণ !"
ঋষি-মুখে চাহে সবে শুনিবারে দধীচির মুখে শেষ বাণী ;
ধ্যান-ভঙ্গ-অপেক্ষায় নতমুখে শিষ্যগণ কৃতাঞ্জলি-পাণি !

৫

ধীরে ধীরে মুক্ত-শ্বাস, উন্মীলিত মহর্ষির যুগল নয়ন ;—
হেরিলেন পুরোভাগে যুক্তকর পুরন্দর— সহ দেবগণ !
"একি ভাগ্য,— দেবগণ !" স্মিতমুখে কহে ঋষি, "পূত পদার্পণে
আশ্রম করিলা ধন্য, সুকৃতার্থ কর দেব, আতিথ্য-গ্রহণে !"

৬

কহিলেন ক্ষণ চিন্তি'— "দেবকার্য্যে—দেবহিতে ত্যজিব এ প্রাণ—
"ততোধিক ভাগ্য কিবা? দেহদানে অতিথির রাখিব সম্মান!
"সার্থক তপস্যা মম, যুগে-যুগে ঋষি, নর করি আত্মজয়—
দেবতার বরগ্রাহী, কোন্ পুণ্যে হেন মোর সৌভাগ্য-উদয়!"

৭

"ভগবন্!"—চাহি দীপ্ত মহর্ষির স্মিতমুখে— কহিলা বাসব,—
"তপস্যার রুদ্রতেজে পূর্ণ তব কলেবর,— অস্থি-মজ্জা তব!
"তব ভূতময় দেহ নহে ভূত-পরিণাম,— তপস্তেজঃসার—
স্বর্গে-মর্ত্ত্যে সুদুর্ল্লভ, সেই দেহে দেবতার আছে অধিকার!"

৮

"মঘবন্!"—গাঢ়কণ্ঠে উত্তরিলা তপোধন, জীর্ণ-বাস দেহ—
নিবেদিব দেবকার্য্যে, ততোধিক পুণ্য নাহি, কি তাহে সন্দেহ!
চাহি শিষ্যগণ প্রতি সস্নেহে কহিলা ঋষি,— "কর শোক গত;
জন্মে মৃত্যু—বৎসগণ, তপস্বীর ত্যাগ ধর্ম্ম, জীবহিত—ব্রত।

৯

বসিলা দধীচি ঋষি রুদ্ধ করি প্রাণবায়ু— মহা যোগাসনে,
ঘিরি তাঁরে চারি দিকে বসিলেন দেবগণ উদ্ভাসি' কিরণে;
হেরিতে মহিমমূর্ত্তি সম্ভ্রমে দাঁড়া'ল রবি অস্তাচল-শিরে;
শিহরিল তপোবন, ঋষি-কণ্ঠে সামগান উঠিল গম্ভীরে।

১০

ক্রমে স্থির—স্থিরতর নাভি-নিম্নে প্রাণবায়ু উঠে সহস্রারে;
ঋষি-ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদি' জ্যোতির্ম্ময় মহাপ্রাণ মিলিল ওঙ্কারে!
দধীচি ত্যজিলা তনু সাধিতে দেবের কাজ, দেবের মঙ্গল,
মহাত্যাগ-মহাচ্ছবি অনন্ত কালের বক্ষে রহিল উজ্জ্বল!

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

নয়, তাহার নাম পর্যন্ত উল্লেখ না করিয়া, গোপনে ইহার কথা চুরি করা হইয়াছে। 'ভারতী'র শতভূত সম্পাদক সৌম্যেন্দ্রমোহনের 'পরদেশী'র সব পরগুলিই বিদেশী ; লেখক না ধরিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন ; দয়া করিয়া অনুবাদ করিয়াছেন ; ছাপিয়াছেন ; বেচিতেছেন। কিন্তু যাঁহাদের দৌলতে এতটা সম্ভব হইল, ঘুণাক্ষরেও তাঁহাদের নাম করিলেন না। সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা নাই, তাহা আর কে অস্বীকার করিবে ? 'পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ' যদি অন্যত্র প্রশংসিত হয়, তবে সাহিত্যে তাহা নিন্দিত হইবে কেন ? 'কণিকা'য় শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বলিতেছেন,—'স্বাধীনতা অবিবেকী নয়, অবিমৃষ্যকারিতার স্থান তার মধ্যে হয় না।' স্বাধীনতার বিবেক থাকিতে পারে, তবে সে চুল চিরিয়া বিচার করিবার সময় পায় না, ইহাও স্থির। 'স্বাধীনতার গতি ঊল্কার মত কক্ষভ্রষ্ট নয়।' কিন্তু কখনও কখনও তাহার গতি ধূমকেতুর মতও হয়। কচ্‌ হরি অর্দ্ধপক্ক কণিকা। শ্রীগুরুদাস সরকার জুল বোয়া নামক এক জন ফরাসী লেখকের গ্রন্থ হইতে 'বিবেকানন্দ-সঙ্গমে' নাম দিয়া স্বর্গীয় স্বামী বিবেকানন্দের প্রসঙ্গের অনুবাদ করিয়াছেন। শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় 'আমাদের নিজস্ব সম্পদ কোথায়'—এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া অনেক মামুলী তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন। তবু মনে হইতেছে, সে সম্পদ যক্ষের ধনের মত প্রচ্ছন্ন—নরেন্দ্রনাথও তাহার সন্ধান পান নাই। জাতিভেদাদি আপাততঃ উঠিবে, এমন সম্ভাবনা ত দেখিতেছি না। কন্যাকুমারী হইতে হিমাচল পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতের মাটী উল্টাইয়া দিয়া যদি ভারতের অভিব্যক্তির বীজ বপন করিতে হয়, তাহা হইলে অন্যরূপ আচার। তাহা দু' দশ যুগের কথা। আপাততঃ, 'হালফিল' এই অবস্থা লইয়া কি করা যায়, তাহাই স্থির করুন। 'ভেদ' সব সমাজেই আছে। তাহারা 'অভেদে'র অপেক্ষায় বসিয়া নাই।—এ দেশে নিশ্চিন্ত থাকিবার একটা উপায় ছিল,—'যা আছে, থাক্।' এখন আর একটা উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে,—'যা আছে, সব যাক।' কিন্তু ভাঙ্গা ত সহজ নয়। কে ভাঙ্গে ? মহাকাল এত কাল যাহাকে ভাঙ্গিতে পারিলেন না, তাহাকে তুমি আমি ভাঙ্গিয়া সমভূম করিয়া, ভারতের উন্নতির বড় রাস্তা রসা রোডের মত আরও চওড়া করিয়া দিতে পারিব কি ? যত দিন এ সমাজটা নূতন মূর্ত্তি ধারণ না করে, তত দিন কি 'বিবর্ত্ত' বন্ধ থাকিবে ? নরেন্দ্রনাথ শেষকালে যে কথাটি বলিয়াছেন, তাহা সত্য। অনেক মহাপুরুষ পুনঃ পুনঃ তাহাই বলিয়া গিয়াছেন।—'যদি আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে সজাগ করিতে পারিতাম, জীবন-সংগ্রামে পৃথিবীর বক্ষে আজ আমরা এতটা হীনতার পরিচয় দিতাম না।' আমাও সেই কুলকুণ্ডলিনীকে, তিনি জাগিলে সব জাগিবে ; সিদ্ধির ভাবনা থাকিবে না। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অস্থি'র বস্তু মনোরম, কিন্তু ভাষা, তাঁহারই ভাষায়, 'আমাদের আপরিচিত খটমটে ঠেকেছে।' গল্পটির পর আর একখানি ব্যঙ্গ-চিত্র।—এখানি 'কার্টুন' বটে। ইহার নাম—

'বস্তুহীন কবিতায় ভরেনাক ভুঁড়ী,
ঝুড়িতে আসল কাব্য হ' পন ছ' বুড়ী।'

চিত্রের উপর 'কবিতা' আছে ; একটা পাত্রে, বোধ হয়, সন্দেশও আছে। চিত্রের হাতে মুখ নাকে, বোধ হয়, সন্দেশই নিরীক্ষণ করিতেছেন। ভুঁড়িটি বেশ অগ্রসর। কাব্যে বেশ

হয়। বৈষ্ণব-কবিতা-রীতি ও বিকাশবর্ত্মানুযায়ীর সূচনা করিতেছে। আর দেখিয়া অনেক ভবানীপুরের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন,—'ঐ মাটীতেই খোল হইয়াছে হইতে পারে। অন্য মাটীতেও খোল না হয়, এমন নয়। এ ছবি দেখিয়াও আমরা বলিব, বৃহত্তর কবিতা অপেক্ষা সন্দেশ সহস্রগুণে শোভনীয়। 'নারায়ণ' কেন ছবি না দেন। তাহা হইলে উত্তর শোনা যায়।—একটা কথা বলিব,—যখন 'ঘুঁটে পোড়ে, তখন গোবর হাসে' যখন গোবর ঘুঁটে হইয়া পুড়িবে, গগনবাবুরা যেন তখন একটু সহিষ্ণুতার—ধৈর্য্যের পরিচয় দেন। শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুরাতন পূজার সাজ' সংক্ষিপ্ত, কিন্তু উপাদেয় প্রবন্ধ। 'মাসকাবারী' চলিতেছে। 'উত্তর-প্রত্যুত্তরে' লেখক প্রশ্ন করিয়াছেন,—'ভারতবর্ষে আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোন ব্যক্তি বৈদেশিক ন্যাশন্যালিজমের বিরুদ্ধে মত প্রচার করিয়াছেন?' অনেকে। আপনাদের দেশেই বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব বিপিনচন্দ্র চৌধুরী আশুতোষ, শ্যামসুন্দর প্রভৃতি অনেকে। বাঙ্গালার বাহিরেও তিলক, লাজপৎ, রামতীর্থ প্রভৃতি ইহার ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে, নানা ভাবে ও নানা ভাবে, 'বৈদেশিক ন্যাশন্যালিজমে'র বিরুদ্ধ মত এ দেশে প্রচারিত হইয়াছে। ঠিক রবীন্দ্রনাথের উক্তির 'প্যারালেল্ প্যাসেজ' না হইতে পারে, আসল বস্তুটার কথা বলিতেছি। অজিতবাবু ভারতবর্ষের 'ন্যাশন্যালিজমে'র ধারা অন্বেষণ করিয়া দেখুন না। রবীন্দ্রনাথ জাতির স্বাতন্ত্র্য-বিকাশের জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহাও অসাধারণ, অসামান্য; সে জন্য আমরা ঋণী। কিন্তু এ ধারার উৎস তাঁহারও অগ্রবর্ত্তী। তাহাতে রবীন্দ্রনাথের গৌরব খর্ব্ব হইতে পারে না।

গৃহস্থ। চৈত্র।—বহুদিন পরে 'গৃহস্থ' পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। এই বোধ হয় প্রথম 'গৃহস্থ' দেখিলাম, যাহাতে শ্রীবিনয়কুমার সরকারের রচনা নাই। 'আলোচনা'য় নানা বিষয়ের আলোচনা আছে। কিন্তু এবার 'আলোচনা'য় দৈন্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। কেবল 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোলশিক্ষা' ও 'আমাদের কর্ত্তব্য' উল্লেখযোগ্য। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষের 'কে আসিবি তোরা আয়' পড়িলাম, বুঝিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বুঝিতে পারিলাম না। কবির কলমে যা আসিয়াছে, তিনি অসঙ্কোচে তাই লিখিয়া গিয়াছেন। মাঝে মাঝে 'সন্ধি' আছে—তাহা বড় অক্ষরে ছাপা। 'রক্তিম ঘন চরণে নূপুর বাজিয়া উঠিছে হায়!'—চরণ অবশ্য 'ঘন' হইতে পারে না। 'রক্তিমে'র বা 'বাজিয়া উঠিছে'র 'ঘন'টি নূপুর টপ্‌কাইয়া চরণের চরণে পড়িয়া লুণ্ঠিত হইতেছে। শ্রীঅনিলচরণ রায়ের 'মানুষ ও প্রকৃতি' উল্লেখযোগ্য। শ্রীকালিদাস রায়ের 'কুত্রাপি' পড়িয়া কবির জন্য শঙ্কিত হইতে হয়! কবি বলিতেছেন,—

অধিকার করে যদি চিত্তরাজ্য কামক্রোধ, মোহ,
দ্বেষ, অহঙ্কার,
কাঁসর-ঘণ্টায় তবে, মুখরিত করিয়া সংসার,
করিও পুকার।'

'পুকার'! যে বুঝিতে চাও, সে শব্দসাগর মন্থন কর। আমরা ভাবেই বিভোর,—'মানে'র জন্য মাথা খুঁড়িব না।—কবি ইন্দ্রিয়জয়ের একটা সহজ পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। অন্য হইতে

বুদ্ধ ও কন্‌ফিউসিয়স হইতে খ্রীচৈতন্য পর্য্যন্ত কেহ ইন্দ্রিয়নিগ্রহের এ পথ দেখিতে পান নাই। রামদাস, নানক, গোরক্ষনাথ এ উপায়ের আভাষও পান নাই। তুকারামের অভঙ্গে, কবীর ও তুলসীদাসের দোঁহায়, অক্ষয়কুমার দত্তের ধর্ম্মনীতিতে, রামকৃষ্ণদেবের উপদেশে, ঠাকুর হরনাথের কেতাবে, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোর নীতিবোধে, দাশু রায়ের পাঁচালীতে, নিধুবাবুর টপ্পায় এ ইঙ্গিত নাই। বাঙ্গালার প্রত্যেক গৃহস্থ ছেলে মেয়েদের কাঁসর-ঘণ্টা কিনিয়া দিন। রাজা রাজড়ারা প্রাইভেট-টিউটার তাড়াইয়া কাঁসর-ঘণ্টা বাজাইবার জন্য এক এক পল্‌টন 'বাজিয়ে' রাখুন। কবি কালিদাস গৌড়দেশে কাঁসর-পন্থী, ঘণ্টা-পন্থী, বা কাঁসর-ঘণ্টা-পন্থী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া সমগ্র গৌড়জনের কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। শ্রীরাখালরাজ রায়ের 'দুইটি কামারের কথা' উপাদেয়। শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মজুমদার বিদ্যাভূষণের 'পঞ্জাবে খেজুর চাষ' উল্লেখযোগ্য। দুইটি প্রবন্ধই 'গৃহস্থে'র বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। শ্রীরমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'বর্ণভেদ' সুচিন্তিত ও সুলিখিত সন্দর্ভ।

স্থাপত্য-শিল্প।

৪

স্থাপত্য বিষয়ে ধর্ম্মপ্রভাবের কথা সংক্ষেপে উক্ত হইল; এইবার অন্যান্য প্রভাবের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখা যাউক। দ্বিতীয় প্রস্তাবে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছি যে, এক ইটালী দেশের মধ্যেই রোম্যাণেস্ক্ রীতির কত বিভিন্ন প্রকারের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। রেণাসাঁস্ রীতি ইটালীতে জন্মিয়া সমস্ত পশ্চিম য়ুরোপে বিস্তৃত হইয়া পড়িল বটে, কিন্তু ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মনী ও ইটালীর মধ্যে ভিন্ন-ভিন্ন-ভাব-যুক্ত রীতির প্রবর্ত্তনা দেখি; ইহার কারণ আমি পূর্ব্বেই স্থূলতঃ নির্দ্দেশ করিয়াছি। বিভিন্ন দেশের আদর্শ স্থাপত্যের একই মূল চরম সত্যকে বিভিন্ন ভাবে অন্বিত করিয়াছিল বলিয়া আমরা স্থাপত্যকে বিভিন্ন আকারে দেখি। প্রত্যেক দেশের যে সনাতনী ঐতিহাসিক-ধারা রহিয়াছে, তাহাকে কোনও নব আদর্শই একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারে না; ইহার নিগড়ে বদ্ধ না হইবার প্রয়াস ব্যর্থ হইতেই হইবে। এ "জলতরঙ্গ" সম্পূর্ণরূপে "রোধিতে" পারা যায় না; আদর্শটি জলপ্রবাহে বিক্ষোভের সৃষ্টি করিবে বটে, কিন্তু পুরাতন তরঙ্গের আবর্ত্তে পড়িয়া তাহারও সলীল উত্থানপতন অবশ্যম্ভাবী, এবং গতিও অবস্থাক্রমে সরল বা তির্য্যক রেখায় চালিত হইবে। এই উত্থান ও পতন, এবং সরল ও তির্য্যক ভাবের নানা গতির সমষ্টি লইয়া এক জটিল গতির সংস্কার হয়। এই কারণেই আমরা ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক আদর্শ দ্বারা অন্বিত স্থাপত্য ভিন্ন ভিন্ন আকারে দেখি।

রেণাসাঁস্ রীতির কথা বলিতেছিলাম; আমি এই রীতিরই ভিন্নদেশীয় অভিব্যক্তিগুলির তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেশমূলক বিভিন্নতার উদাহরণ দেখাইবার চেষ্টা করিব। ইটালী দেশে রেণাসাঁস্ রীতির যে বিশিষ্টতা দেখা যায়, ফ্রান্স দেশে তাহা দৃষ্ট হয় না। প্রথমোক্ত দেশের গৃহগুলির মধ্যস্থলে অঙ্গন অবস্থিত, এবং তাহার চতুর্দ্দিকে খিলান ও স্তম্ভযুক্ত দালান রহিয়াছে, এবং দ্বিতীয় বা তৃতীয় তলের প্রকোষ্ঠগুলি প্রথমতলের প্রকোষ্ঠ ও বারাণ্ডার উপর ব্যাপিয়া অবস্থিত। উহার কারণ এই যে, উপরতলের প্রকোষ্ঠগুলি প্রশস্ত হওয়া চাই।

উদাহরণস্বরূপ ফ্লরেন্সের প্যালাজো (palazzo) নামক প্রাসাদগুলির বিষয় চিন্তা করিতে বলি। রেণাসাঁস্-সময়ে নির্ম্মিত ফ্রান্সদেশের অট্টালিকাগুলির অঙ্গন এ প্রণালীতে স্থাপিত করা হয় নাই; অঙ্গনের দুই পার্শ্বে নাতুচ্চ প্রকোষ্ঠশ্রেণী মধ্যস্থ "চক্" বা গৃহগুলি হইতে বাহির হইয়াছে। অঙ্গনের চতুর্দ্দিকে চক্ মিলাইবার জন্য সৌধের সম্মুখাংশে একটি ভিত্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে; এ পদ্ধতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা Chateaw de Chambord নামক প্রসিদ্ধ অট্টালিকায় প্রাপ্ত হই; এসময়কার গৃহগুলি প্রাসাদ ও দুর্গের মিশ্রণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

ইটালীয় ও ফরাসীস্ রেণাসাঁস পদ্ধতিতে নির্ম্মিত অট্টালিকাগুলির বহির্দৃশ্য এত বিভিন্ন প্রকারের যে, উহাদের প্রতিকৃতিগুলি সম্মুখে স্থাপিত করিলে, কোনটি কোন্ দেশের, তাহা অনায়াসেই অবধারণ করা যাইতে পারে। ইটালীয় হর্ম্ম্যগুলির বহির্দৃশ্যে কোনও জটিলতা নাই বলিলেও চলে; ইহার ভিত্তিগুলি সরল ও লম্বভাবে উঠিয়াছে। কিন্তু ফরাসীদেশস্থ হর্ম্ম্যগুলির মাঝে মাঝে ও কোণাংশে অবস্থিত ক্রমনিম্ন-ছাদ-যুক্ত (Mansard Roof) নাতুচ্চ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠগুলি দর্শকের মনে ইহার বিশিষ্টতা সম্বন্ধে কৌতূহলের উদ্রেক করে। বাটীগুলির সর্ব্বোপরি বৃত্তাকার গবাক্ষযুক্ত যে অল্পোচ্চ প্রকোষ্ঠগুলি রহিয়াছে, তাহা ও চিম্নী-(Chimney)-গুলি ইহার আর এক বিশিষ্টতা। ভিনিস্ প্রভৃতির কথা ছাড়িয়া দিলে, ইটালীর রেণাসাঁস পদ্ধতিতে নির্ম্মিত সৌধগুলির চিম্নী লোকচক্ষুর গোচর নহে; ইটালীস্থ প্রাসাদগুলির ছাদ সমতল, কিন্তু ফরাসী দেশের ছাদগুলি ক্রমনিম্ন এবং গবাক্ষ-সংবলিত; এগুলি Dormer window নামে কথিত। ইটালীয় সৌধগুলির কর্ণিস্ বেশ দীর্ঘ ও স্থূল ও অধিকতর বহিঃবর্দ্ধিত। একটু চিন্তা করিলেই আমরা ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারি। ইটালী দেশে সূর্য্যকিরণ অতিশয় প্রখর; এবং এই প্রখরতার প্রভাব হ্রাস করিবার জন্য এইরূপ দীর্ঘ, স্থূল ও বিপুলকায় কর্ণিসের ব্যবস্থা। আমাদের ভারতেও এইরূপ বহিঃবর্দ্ধিত ও দীর্ঘ কর্ণিসের প্রচলন দৃষ্ট হয়; ইহা "হাজা" নামে কথিত। হিন্দু সৌধ, প্রাসাদ, মস্‌জিদ ও সমাধি—সর্ব্বত্রই "হাজা" বর্ত্তমান। দাক্ষিণাত্যে এ কর্ণিসের নির্ম্মাণ-পদ্ধতি যদিও স্বতন্ত্র, তথাপি সর্ব্বত্রই ইহা প্রয়োজনীয়তা-দ্যোতক। এ স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি যে, দাক্ষিণাত্যের কর্ণিস্‌গুলি অর্দ্ধবৃত্ত বা বৃত্তাংশাকারে ভিত্তিগাত্র হইতে বহিঃবর্দ্ধিত। প্রয়োজনীয় নহে বলিয়া ফ্রান্সদেশের কর্ণিস্ ইটালীদেশের

ন্যায় দীর্ঘ নহে; ইহা গথিক ও প্রাচীন বা Classical রীতির সংমিশ্রণে এক নবমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল।

পুনশ্চ, অলঙ্কারসম্পৎ দ্বারা শোভা-বৃদ্ধি বিষয়ে উভয়ের বিশিষ্টতার বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ফরাসীস্থাপত্যে ভাস্কর্য্যের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে যদি আমরা জর্ম্মনী, ইংল্যাণ্ড, বেল্‌জিয়ম্ প্রভৃতি দেশে প্রবর্ত্তিত রেণাসাঁস্ রীতির আলোচনা করি, তাহা হইলে, ভিন্ন ভিন্ন দেশের স্বতন্ত্র বিশিষ্টতা দেখিতে পাইব।

ভারতবর্ষের স্থাপত্যের আলোচনা করিলেও আমরা প্রদেশ-ভেদে ইহার আকৃতিগত পরিবর্ত্তনের ব্যাপার বেশ বুঝিতে পারি। আর্য্যাবর্ত্তের স্থাপত্য ও দ্রাবিড় স্থাপত্যের মধ্যে আদর্শ হিসাবেও আকাশপাতাল প্রভেদ। আর্য্যাবর্ত্তে অগ্নিপুরাণ-কথিত বিধিনিষেধ পালন করা হইয়াছে, এবং দ্রাবিড় দেশে মানসার, ময়মত প্রভৃতি শিল্পশাস্ত্রের বচন গ্রহণ করা হইয়াছে। উড়িষ্যার মন্দিরায়তনগুলির সহিত মধ্যভারতস্থ বারোলি বা খাজুরাহো প্রভৃতি স্থানের মন্দিরগুলির তুলনা করিলে, আমরা বিমান বা গর্ভগৃহের মধ্যে স্থূলতঃ আকৃতিগত সাদৃশ্য দেখিলেও, তৎসংলগ্ন আয়তনের মধ্যে কোনও সাদৃশ্যই দেখি না। একটু সামান্য প্রণিধান করিয়া দেখিলে আমরা খাজুরাহোর শিবমন্দিরের সহিত উড়িষ্যায় গর্ভগৃহগুলির মধ্যেও বিশেষ পার্থক্য নয়নগোচর করি। পূর্ব্বোক্ত স্থানের মন্দির-শেখর যে প্রকারের চতুরস্রাকৃতি বা আয়তাকার ক্ষেত্রের ভিত্তির উপর সংস্থাপিত দেখি, তাহা উড়িষ্যাস্থাপত্যে আদৌ দেখি না। ইহাদের "অধিষ্ঠানে"র মধ্যেও কোনও সাদৃশ্য নাই. যদিও বারোলিস্থ শিবমন্দিরের শেখরনিম্নের ভিত্তির সহিত উড়িষ্যা-মন্দিরের স্থূলতঃ সাদৃশ্য আছে, তথাপি উড়িষ্যার মন্দিরে সমান্তরাল ও সমোচ্চ বহিঃবর্দ্ধিত রেখা দ্বারা যে পঞ্চবিভাগ দৃষ্ট হয়, তাহা মধ্যভারতের কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এ স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি যে, দাক্ষিণাত্যস্থ চালুক্যস্থাপত্যে ইহার অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়; কিন্তু এখানে পঞ্চবিভাগের স্থলে তিনটি বিভাগের কল্পনা করা হইয়াছে। আমি এই পঞ্চবিভাগ দেখিবার জন্য রামেশ্বরম্ হইতে আরম্ভ করিয়া মহীশূর, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের বহু প্রদেশ ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু কোথাও উড়িষ্যার এ বিশিষ্টতা দেখি নাই।

পূর্ব্বোক্ত মন্দিরগুলি অপেক্ষা গোয়ালিয়রস্থ উদয়পুর গ্রামের, বা চিতোরস্থ কুম্ভরাণার স্থাপিত মন্দিরের বহিরাকৃতি উড়িষ্যার দেবায়তন হইতে আরও

বিসদৃশ; কিন্তু ইহাদের সকলগুলির মধ্যেই খাঁটী ব্রাহ্মণ্যস্থাপত্যের বীজ নিহিত; সকলগুলিতেই একই আদর্শ প্রকটিত, কিন্তু দেশ বিভিন্ন বলিয়া একই আদর্শ ভিন্ন দেশে ভিন্ন আকারে পরিণত।

এইবার মুসলমান স্থাপত্যের বিষয়ে আলোচনা করা যাউক। ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত সিন্ধুদেশীয় সমাধিহর্ম্ম্যগুলি নিরীক্ষণ করিলে আমরা ইহাদের সহিত ভারতবর্ষীয় আর কোনও সমাধিহর্ম্ম্যের সাদৃশ্য দেখিতে পাই না; এতৎসম্বন্ধে আমি সিন্ধুদেশান্তর্গত টাট্টার নিকটবর্ত্তী সমাধিস্থানগুলির প্রতিকৃতির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে বলি; ইহারই পার্শ্বে ইহারই মত রঞ্জিত ইষ্টক ও টালি দ্বারা নির্ম্মিত ও প্রায়ই একই সময়ে নির্ম্মিত * আগ্রাস্থ ইতিমাদ্দৌলার সমাধিভবনের তুলনা করিতে বলি; দুইটির মধ্যে কত পার্থক্য রহিয়াছে। এই দুই প্রকারের সমাধিহর্ম্ম্যের সহিত আবার বিজাপুরস্থ ইব্রাহিম্ আদিল সাহের রৌজার তুলনা করিলে আমরা আর এক প্রকারের স্থাপত্য-কৌশল দেখি।

পাছে কেহ মনে করেন যে, ভিন্নদেশস্থ সমাধিহর্ম্ম্যের মধ্যে বিশিষ্টতা থাকায় কোনও বিস্ময়ের কারণ নাই, এই আশঙ্কায় আমি সর্ব্বত্র একই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত মুসলমানদিগেব মস্‌জিদ্ হইতেও আমার সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করিব। যদি কেহ মালবদেশস্থ মাণ্ডুর মস্‌জিদের সহিত দাক্ষিণাত্যস্থ বিজাপুর মস্‌জিদের তুলনা করেন, তাহা হইলে, ইহাদের মধ্যে স্থাপনবিন্যাস বা আকৃতিগত সম্পৎ, কোনও বিষয়েই বিশেষ সাদৃশ্য পাইবেন না। মধ্যাঙ্গন ও তৎপার্শ্বস্থিত স্তম্ভশ্রেণীযুক্ত উপাসনাস্থলগুলির মধ্যে যে অব্যক্ত গাম্ভীর্য্য বর্ত্তমান, তাহা বিজাপুরস্থ আদিলসাহ নরপতিদিগের তিন পার্শ্বে অবস্থিত প্রকোষ্ঠযুক্ত জামে মস্‌জিদে দৃষ্ট হয় না। বিজাপুরস্থ মস্‌জিদের গম্বুজটি অবশ্য বিশালতর ও অধিকতর নির্ম্মাণ-কৌশল-যুক্ত।

দেশভেদে যে স্থাপত্যের বিশিষ্টতার সৃষ্টি হয়, তাহা আরব, পারস্য, তুরুষ্ক প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের মস্‌জিদগুলির আলোচনা করিলে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। উত্তর-আফ্রিকাস্থ মস্‌জিদের সহিত পারস্যের মস্‌জিদের স্থাপনবিন্যাস ব্যাপারে সাদৃশ্য নাই। ইস্পাহানস্থ সাহ্ আব্বাসের নির্ম্মিত মস্‌জিদ, কিংবা তাব্রিজের সুপ্রসিদ্ধ মস্‌জিদের সহিত সুলতান হাসানের নির্ম্মিত উত্তর-আফ্রিকাস্থ কায়রোর মস্‌জিদের স্থাপনবিন্যাস বা বহিরাকৃতির আদৌ মিল নাই। আবার অষ্টম

* ইতিমাদ্দৌলার সমাধিহর্ম্ম্য ১৬২১ অব্দে ও টাট্টাস্থ নবাব সার্ফরাজ খাঁর সমাধি ১৬৪০ অব্দে নির্ম্মিত।

শতাব্দীতে খালিফ আব্দ্-এল্-রহমান্ নির্ম্মিত স্পেনদেশস্থ কর্ডোভা নগরের মস্‌জিদ্ একেবারে বিভিন্ন পদ্ধতিতে কল্পিত। ইহাতে বিস্ময়ের কোনও কারণ নাই। শুদ্ধ ধর্ম্মে একতা হইলে কি হয়? যে দেশে যে সংস্কার রহিয়াছে, তাহার অনুসরণ মানবের স্বভাবসিদ্ধ। শিল্পেই হউক, সাহিত্যেই হউক, বা আহার-বিহারেই হউক—সর্ব্ববিষয়েই সংস্কারের প্রাধান্য মানিতেই হইবে; এই কারণেই আমি মহীশূর-ভ্রমণকালে শ্রীরঙ্গপত্তনস্থ হায়দর আলি ও টিপুসুলতানের সমাধি-হর্ম্ম্য দেখিতে গিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, মুসলমানযাত্রীরা টিপুর উদ্দেশে সম্মানপ্রদর্শন করিবার জন্য ও আপন অভীষ্টসিদ্ধির জন্য তাঁহাকে পীরস্বরূপ জ্ঞান করিয়া সমাধির দ্বারদেশে দাক্ষিণাত্যবাসী হিন্দুদিগের ন্যায় নারিকেল ভাঙ্গিয়া পূজা দেয়। এ পদ্ধতি দাক্ষিণাত্যের জৈনমন্দিরেও দেখিয়াছি। সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, সংস্কারের প্রভাব সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিতে পারা যায় না। এই কারণেই পঞ্চদশ শতাব্দীতে কন্‌ষ্টাণ্টিনোপ্‌ল্ তুর্কদের করতল-গত হইবার পর যখন নবস্থাপত্যের আবির্ভাব হইল, তখন ইহাতে অবাধে স্থানীয় বাইজাণ্টাইন্ স্থাপত্যাদর্শের মিশ্রণ চলিতে লাগিল। শুদ্ধ ইহাই নহে; এই স্থাপত্যে বাইজাণ্টাইন্ স্থাপত্যের মূল সিদ্ধান্তগুলি স্পষ্টভাবে গৃহীত হইয়া এক নব আদর্শের সৃষ্টি হইল। ইহা বুঝিবার জন্য আমি "সুলেমানিয়া", "আমেদিয়া" প্রভৃতি মস্‌জিদ্‌গুলির স্থাপনবৈচিত্র্য, বহিরাকৃতি ও নির্ম্মাণ-কৌশলের বিষয় চিন্তা করিতে বলি। এই সমস্ত মস্‌জিদে St. Sophiaর অনেকগুলি আদর্শ ও বিশিষ্টতা যেন চিরমুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে; এগুলি দেখিলে St. Sophiaর কথা স্মরণে আসিবেই।

স্থানীয় প্রভাবের কথা চিন্তা করিতে গিয়া পূর্ব্বকথিত হর্ম্ম্যগুলি ভিন্ন ভারতীয় আর কয়েকটি হর্ম্ম্যের কথা স্মরণে আসিতেছে; সেগুলির উল্লেখ করিয়া প্রসঙ্গান্তরের কথা আরম্ভ করিব। জৌন্‌পুরস্থ "মান্দরওয়াজা" মস্‌জিদ্, কিংবা "অটম" মস্‌জিদে হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্যের কেমন বিচিত্র মিশ্রণ দৃষ্ট হয়। ইহাতে যেন এ কথা কেহ মনে না করেন যে, জৌন্‌পুরে যখন পূর্ব্বকথিত সৌধগুলির রচনা আরব্ধ হয়, তখন মুসলমান্ স্থাপত্যের তেমন বিকাশ হয় নাই, কিংবা যে স্থপতিরা ইহার কল্পনা ও নির্ম্মাণ করেন, তাঁহারা তখনও ইস্‌লাম্ স্থাপত্যে ততটা পারদর্শী হইয়া উঠেন নাই।

১১৯৮ অব্দে ব্রহ্মদেশে বুদ্ধগয়াস্থ মন্দিরের অনুকরণে যে "মহাবোধি" নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাও স্থানীয় প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই। যবদ্বীপে যে

সমস্ত দ্রাবিড় ও চালুক্যরীতীর অন্তর্গত মন্দিরায়তন প্রভৃতি নয়নগোচর হয়, তাহা দেখিলে বেশ স্পষ্ট বোধ হইবে যে, এদেশী স্থপতিরা এগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা স্থানীয় সংস্কার অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

উপকরণ, দেশ, কাল, ধর্ম্ম প্রভৃতি সংক্রান্ত যে সমস্ত প্রভাব স্থাপত্যকে বৈচিত্র্য প্রদান করে, তাহা সংক্ষেপে উক্ত হইল। এক্ষণে আমরা এতৎসম্বন্ধীয় আর এক বিষয়ের আলোচনা করিব। শিল্প-সমালোচকেরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এক প্রকারের বা সামান্য-সাদৃশ্য-যুক্ত ভিন্ন প্রকারের গৃহায়তন প্রভৃতি দর্শন করিয়া একই প্রভাবের আবিষ্কার করিবার জন্য ব্যগ্র হয়েন। এ সাদৃশ্য মেক্সিকো, বা সিংহল, বা উত্তর-মেরু-প্রদেশের যেখানেই দৃষ্ট হউক না, তাঁহাদিগকে প্রভাবের একত্ব বাহির করিবার জন্য উৎসুক করিবেই। প্রভাব একই প্রকারের হইলে ফলসাদৃশ্য ব্যাপার সংঘটিত হইতে পারে; কিন্তু বিপরীত সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে; অর্থাৎ, সাদৃশ্য দেখিলেই যে একই প্রভাব অঙ্গীকার করিতে হইবে, যাঁহারা সামান্য তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিবেন যে, ইহা কিরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ। বিভিন্ন মানব-মনের মধ্যে চিন্তা বা কল্পনা-প্রণালীর যে ঐকতানিকতা বর্ত্তমান, তাহা সকলেরই বিদিত; এই ঐকতানিকতার হিসাবে মানব-মনগুলি একই পর্য্যায় বা শ্রেণীর অন্তর্গত। যদি একই শ্রেণীর অন্তর্গত হইল, তাহা হইলে, চিন্তা বা কল্পনা প্রসূত সিদ্ধান্ত বা পদার্থের মধ্যে সাদৃশ্যের আশা করা অন্যায় নহে। আমি এ স্থলে একটি আপাততঃ বিস্ময়কর ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। কয়েক মাস পূর্ব্বে আমি বঙ্গীয় বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভা কর্ত্তৃক আহূত হইয়া পবিত্র বুদ্ধাস্থি-সংরক্ষণের জন্য এক স্তূপ ও তৎসংলগ্ন বিষয় কল্পনা ও অঙ্কিত করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম। ইহা অঙ্কিত করিয়া আমি বৌদ্ধ সভায় প্রেরণ করি। ইহা বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল ও বঙ্গীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ Sir John Marshallকে দেখান হয়। এই সময়ে বা কিছু পূর্ব্বে "মহাবোধি সভা" কর্ত্তৃক আহূত হইয়া Sir John Marshall মহাশয় তাঁহাদের জন্য স্তূপ ও বিহারের এক নক্সা অঙ্কিত করেন। আমার নক্সা প্রেরণ করিবার পাঁচ মাস পরে ইহার নক্সা কলিকাতায় প্রেরিত হয়, এবং ইহা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম যে, বহিরাকৃতিগত বৈষম্য ছাড়িয়া দিলেও, plan বা স্থাপনবিন্যাস-কল্পনা প্রায়ই অনুরূপ; এমন কি, প্রস্থের পরিমাণ প্রভৃতিও মিলিয়া গিয়াছে; বহিরাকৃতির মধ্যেও অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য বর্ত্তমান! Sir John Marshall

মহাশয় যে আমার কল্পনার সাহায্য লইবেন, এ কথা বলিতে সাহস হয় না, এবং আমিও যে তাঁহার কল্পনার কথা বিন্দুবিসর্গও অবগত ছিলাম না, তাহা দুই সভার সভ্যেরা জানেন। ইহাতে যে বিস্ময়ের কোনও কারণই নাই, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে নির্ম্মিত বা ক্ষোদিত দাক্ষিণাত্যস্থ মহাবলিপুরম্ বা মামল্লপুরস্থিত, দ্রৌপদীর রথ বলিয়া অভিহিত ক্ষুদ্রায়তনটি যিনি নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তিনি উহার সহিত আমাদের বঙ্গদেশস্থ "চৌচালা" গৃহের সাদৃশ্যও লক্ষ্য করিয়াছেন। এই সাদৃশ্য ব্যাপার হইতে যদি কেহ অনুমান করেন যে, একটি অপরটির প্রভাবে অন্বিত, তাহা হইলে এ অনুমানকে নিতান্ত ভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

চীনদেশে fret বলিয়া একপ্রকার কারুকর্ম্মের চলন আছে; গ্রীকস্থাপত্যে ইহার সমধিক আদর। আমার যত দূর জানা আছে, উড়িষ্যার কেবল একটি মাত্র মন্দিরের উচ্চাংশে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে fretর ব্যবহার দেখিয়াছি। এ মন্দিরটি অতিশয় প্রাচীন। এই সব উদাহরণের মধ্যে একই প্রভাব বর্ত্তমান, এ কথা স্বীকার করিবার কোনও সার্থকতা দেখা যায় না। প্রাচীন গ্রীক্ ও রোম্যান্ স্থাপত্যে, বা আধুনিক য়ুরোপীয় হর্ম্ম্যাদিতে cavetto নামক mouldingর প্রচলন দেখা যায় বলিয়া যে ভারতীয় বা পারস্যদেশীয় প্রাচীন স্থাপত্যে তাহা দেখিব না, বা দেখিলেই একটি অপরের অনুকৃতি বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিব, ইহা ত একেবারেই যুক্তিযুক্ত নহে; কেন না, যাহা cavetto বলিয়া গ্রীক্স্থাপত্যে দেখি, তাহা ঈশ্বরের প্রত্যাদেশে গ্রীক্জাতির মধ্যে আবির্ভূত হয় নাই। ইহার আকৃতি প্রকৃতির বিচিত্র ভাণ্ডারের মধ্যে, পত্রপুষ্প বহুপরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়; এবং তাঁহারা যাহা হইতে এ কল্পনার মূল পাইয়াছেন, তাহা যে অন্য দেশবাসীর নিকট অজ্ঞাত বা অদৃশ্য থাকিবে, এ কথা স্বীকার করিবার পক্ষে কোনও যুক্তিই দেখা যায় না। এই কারণেই য়ুরোপীয় Cyma, Cavetto, Fillet, Torus প্রভৃতি আমাদের দেশে যথাক্রমে পদ্ম, অলিন্দ, কম্প ও কুমুদ প্রভৃতি নামে অভিহিত ও দৃষ্ট হয়। এই কারণেই গ্রীক্ স্থাপত্যের অন্তর্গত Doric শাখার Bird's beak বা "পক্ষিচঞ্চু" নামক যে moulding দেখি, তাহা ভারতীয় স্থাপত্যে সামান্যরূপে বিভিন্ন আকৃতিতে "কপোতম্" নামে প্রচলিত। দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণকালে ইহার বহুল চলন দেখিয়াছি। ইহা আর্য্যাবর্ত্তে প্রায়শঃ দৃষ্ট হয় না; দেখিয়াছি বলিয়া ত স্মরণ হয় না;

কিন্তু প্রতিভদ্র প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের মন্দিরাধিষ্ঠান (pedestal) বা স্তম্ভের উপপীঠে ইহা সাধারণতঃ দৃষ্ট হয়। কাঞ্চীস্থ "সহস্রস্তম্ভ" মণ্ডপের অধিষ্ঠান বা উপপীঠে ও অন্যান্য বহু মন্দিরে ইহার ব্যবহার দেখিয়াছি।

আরও কয়েকটি উদাহরণ দিয়া আমার মন্তব্যটিকে বিশদ করিবার চেষ্টা করিব। স্তম্ভের শীর্ষদেশে capital বলিয়া যে অঙ্গ দেখি, তাহা যে গ্রীক্ বা রোম্যান্ স্থাপত্যের একচেটিয়া সম্পত্তি, এরূপ মনে করা বিশেষ সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক। মানবের যে সহজাত-সংস্কার ও সৌন্দর্য্যবুদ্ধি আছে, তাহা এই শীর্ষদেশে একটি অঙ্গের কল্পনা করিবেই; এই জন্যই আমরা ভারতীয় স্তম্ভগুলির অগ্রভাগ capital বা বোধিকা দ্বারা শোভিত দেখি। এই বোধিকার পরিমাণ প্রভৃতি সম্বন্ধে "মানসার" গ্রন্থে অনেকগুলি বিধিব্যবস্থা আছে। বোধিকার উপর যে entablature আছে, তাহাও ভারতীয় স্তম্ভে বিদ্যমান; ইহা "প্রস্তার" সংজ্ঞা দ্বারা অভিহিত; এবং য়ুরোপীয় entablature যেমন architran, frieze, cornia প্রভৃতি দ্বারা বিভক্ত, আমাদের "প্রস্তার"ও তেমনই নানা অংশে বিভক্ত। ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় আমি দ্রাবিড় ও চালুক্য স্থাপত্যে পাইয়াছি; দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণকালে এই স্তম্ভপরিমাণ-সম্বন্ধে সামান্য গবেষণা করিয়া তাহার অঙ্গগুলির পরিমাণ স্থির করিয়া যাহা জানিয়াছি, তাহার সহিত য়ুরোপীয় স্তম্ভগুলির অংশবিশেষের তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিব।

	প্রস্তারের সহিত স্তম্ভের অনুপাত
গ্রীক ডোরিক স্তম্ভ (থিসুসের মন্দির, এথেন্স)	১: ২.৬
রোম্যান্ ডোরিক স্তম্ভ	১: ৪
গ্রীক্ আয়োনিক্ স্তম্ভ (ইলিসস্ নদীর উপরস্থিত মন্দির) ...	১: ৩.৫৯
রোম্যান্ আয়োনিক স্তম্ভ	১: ৫
গ্রীক্ করিন্থিয়ান্ (চোরাজিক মনুমেণ্ট)	১: ৪.৩৪
রোম্যান্ করিন্থিয়ান্ (প্যানথিয়ন্, রোম)	১: ৪.২৫
মহীশূরস্থ শ্রবণবেলগোলার শাসনবস্তি মন্দির (জৈন) ...	১: ৩.০৯
মহীশূরস্থ শ্রবণবেলগোলার চামুণ্ডারায় বস্তি (জৈন) ...	১: ৩.৬২
মহীশূরস্থ বেলুড় গ্রামের অণ্ডালসন্নিধি (হিন্দু)	১: ৩.০৮
মহীশূরস্থ বেলুড় গ্রামের কাপ্পে চেন্নরায় মন্দির (হিন্দু) ...	১: ৩.৪৬
মহীশূরস্থ হালেবিড় গ্রামের কেদারেশ্বর মন্দির (হিন্দু) ...	১: ৩

পূর্ব্বোক্ত ভারতীয় উদাহরণগুলির সমস্তই চালুক্যস্থাপত্যের অন্তর্গত। উপরিলিখিত অঙ্কগুলি হইতে বুঝা যাইবে যে, মহীশূরস্থ চালুক্যস্থাপত্যের স্তম্ভ-

গুলির সহিত তাহার প্রস্তারের অনুপাত অনেকটা গ্রীক্ আয়োনিকের ন্যায়, এবং স্তম্ভগুলি অনেকটা সদৃশ অংশে বিভক্ত; তাহা বলিয়া কেহ যদি এরূপ অনুমান করেন যে, চালুক্যীয় স্থাপত্যে গ্রীক্ প্রভাব বর্ত্তমান, তাহাকে বাতুলতা ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না।

হায়দ্রাবাদ রাজ্যে ভ্রমণকালে দেখিয়াছি যে, ওয়ারাঙ্গল্ দুর্গে স্থিত কীর্ত্তিস্তম্ভযুক্ত তোরণগুলি দেখিলে সাঞ্চীস্থ স্তম্ভযুক্ত স্তূপ-বেষ্টনকারী তোরণগুলির কথা মনে পড়ে; কিন্তু Fugussun যাহাই বলুন না, আমি ইহাদের মধ্যে কোনও প্রভাবই দেখি না। মহীশূরান্তর্গত শ্রবণবেলগোলা যাইবার পথে কিক্কেরী-গ্রামস্থ ব্রহ্মেশ্বরের মন্দিরের উপলগাত্রে ঠিক ক্রশের (cross) ন্যায় এক প্রকার চিহ্ন ক্ষোদিত দেখিয়াছি; এগুলি এত স্পষ্টভাবে ক্ষোদিত যে, অনায়াসেই কোনও পাদরী মহাশয় বা সেই ভাবে অনুপ্রাণিত কোনও খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইহাতে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের প্রভাবের কল্পনা করিতে পারেন। তাহার প্রমাণস্বরূপ তিনি হয় ত দাক্ষিণাত্যে সিরিয়ান্ ক্রিশ্চিয়ান্দিগের কথারও অবতারণা করিবেন। কিন্তু ক্রশ চিহ্নটি স্থাপত্যে বা ভাস্কর্য্যে অলঙ্কারস্বরূপ ব্যবহারের কল্পনা যে মানব-মনে সহজেই উদিত হইতে পারে, সে কথা কি প্রণিধানযোগ্য নহে? পূর্ব্বোক্ত উদাহরণগুলি হইতে দেখা গেল যে, সাদৃশ্য-জ্ঞান হইতে প্রভাববিশেষের অনুমান ও কল্পনা করা যুক্তিবিরুদ্ধ।

শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

মেজর হায়দার হাসে। *

ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসসময়ে বহু য়ুরোপীয়ান প্রাধান্য-স্থাপন-প্রয়াসী বিভিন্ন দলের পক্ষাবলম্বন করিয়া আপনাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি-সাধনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগের জীবন বিস্ময়কর, বৈচিত্র্যবহুল। তন্মধ্যে কয়েক জনের জীবনকথা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। † হার্সের জীবন-কথাও বিস্ময়কর। তাঁহার নাম হায়দার জঙ্গ হার্সে। তাঁহার পিতা কাপ্তেন

* The Hearseys—Pearse; Hindusthan under Freelances—Keene; European Military Adventurers of Hindusthan—Compton; East Indian Worthies—Stark and Madge; Asiatic Researches.

† 'আর্য্যাবর্ত্ত' ও 'মানসী'।

হারী হার্সে মৈত্রার যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মাতা জাঠ-জাতীয়া। এরূপ বিবাহ তৎকালে দোষাবহ বিবেচিত হইত না। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে হায়দারের জন্ম হয়। তিনি উলীচ সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েন। তখনও ফিরিঙ্গীদিগের পক্ষে ইংরাজের সেনাবিভাগে প্রবেশাধিকার সহজপ্রাপ্য ছিল না। কিন্তু হায়দারের আত্মীয় কর্ণেল আওরু হার্সে তখন এলাহাবাদ দুর্গের সেনাপতি। তাঁহার চেষ্টায় হায়দার সেনাবিভাগে প্রবেশ করিয়া লক্ষ্ণৌর নবাব সাদৎ আলীর পার্শ্বচর নিযুক্ত হয়েন। তখন তাঁহার বয়স ষোড়শ বৎসর মাত্র। সাদৎ আলী তখন বারাণসী-প্রবাসী। তাঁহার লক্ষ্ণৌর গদীপ্রাপ্তি বিষয়ে যে গোল হইয়াছিল, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। পরিশেষে গভর্ণর জেনারেল সার জন শোর তাঁহার অধিকার স্বীকার করিলে তিনি গদীতে আরোহণ করেন।

লক্ষ্ণৌর কার্য্য হার্সের পক্ষে প্রীতিপ্রদ হয় নাই। তিনি সে কার্য্য ত্যাগ করিয়া সিন্ধিয়ার সেনাদলে কার্য্য গ্রহণ করিলেন। তিনি জেনারল পেরং-এর পদাতিক দলে নিযুক্ত হইলে, তাঁহার ফরাসী ভাষার ব্যুৎপত্তি দেখিয়া পেরং তাঁহাকে স্বীয় এডিকং নিযুক্ত করিলেন, এবং তাঁহার সহিত বিশেষ সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। অল্পকালমধ্যেই হায়দারের ভাগ্যে যুদ্ধদর্শন ঘটিল। পেরং সিন্ধিয়া কর্ত্তৃক দিল্লীর ও আগ্রার দুর্গদ্বয়ের ভার লইতে আদিষ্ট হইলেন। দিল্লীর সম্রাটবংশের ভাগ্যহীন বংশধর শাহ আলম ইঁহারই কর্ত্তৃত্বাধীন হইলেন। পেরং উৎকোচ দিয়া দিল্লী দখল করিয়াছিলেন; কারণ, রাজনীতিক হিসাবে যুদ্ধ করিয়া দিল্লী জয় করিয়া অন্ধ সম্রাটের বিরাগোৎপাদন যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয় নাই। কিন্তু আগ্রার সম্বন্ধে এরূপ কোনও বিঘ্ন না থাকায় পেরং সহসা স্বীয় কেন্দ্রস্থল আলীগড় ত্যাগ করিয়া ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আগ্রার সম্মুখীন হইলেন। এই অতর্কিত আক্রমণে নগর সহজেই জিত হইল; কিন্তু দুর্গ জয় করিতে অষ্টপঞ্চাশৎদিনব্যাপী অবরোধের প্রয়োজন হইল। দুর্গস্থ সেনাগণ আত্মসমর্পণের পর সসম্মানে ও নিরাপদে দুর্গত্যাগের অধিকার পাইল। যুদ্ধে পেরং-এর সেনাদলে হতাহতের সংখ্যা ছয় শত। দুর্গ দৃঢ় বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, এবং দুর্গমধ্যে চারি সহস্র সৈনিক অবস্থিতি করিতেছিল। সুতরাং পেরং-এর বলক্ষয় অধিক বলা যায় না। এই অবরোধকালে পেরং হার্সের কার্য্যে বিশেষ প্রীত হইয়া তাঁহাকে উচ্চতর পদে উন্নীত করেন। ইহার কয়েক মাস পরেই পেরং তাঁহাকে আবার উচ্চতর পদে উন্নীত করিয়া

আগ্রা দুর্গের সহকারী সেনাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন। ইহা সপ্তদশবর্ষ বয়স্ক যুবকের প্রতি তাঁহার বিশেষ বিশ্বাসের পরিচায়ক। আবার অল্পদিন পরেই তিনি হার্সেকে মহারাষ্ট্রীয় সেনাদলের ডেপুটী কোয়ার্টার-মাষ্টার-জেনারলের উচ্চ পদ প্রদান করেন।

এই সময় পেরং আপনার অধীনস্থ ইংরাজ সেনাধ্যক্ষদিগের সহিত নিরপেক্ষ ব্যবহার করিতেছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। এই সময় ইংরাজ কর্ত্তৃক যুদ্ধে বন্দীকৃত কয়েক জন ফরাসীস বোম্বাই হইতে পলায়ন করিয়া সিন্ধিয়ার সেনাদলে যোগদান করিলে, তাঁহারা ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের উপরিস্থিত পদ লাভ করিলেন। ইংরাজ কর্ম্মচারীরা ইহার প্রতিবাদ করিয়া প্রতীকার না পাইয়া পদত্যাগ করিলেন। তখন পেরং-এর ক্ষমতা অসীম—তাঁহার পক্ষে ইংরাজকে দূর করিয়া ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্যের জন্য পুনরায় চেষ্টা করাও অস্বাভাবিক নহে। কম্পটন বলিয়াছেন, —এই সময় পেরং-এর ভাগ্যরবি মধ্যগগনে দীপ্তি পাইতেছিল। তিনি সমগ্র হিন্দুস্থান পদানত করিয়াছিলেন; সিন্ধিয়ার অধিকারের উত্তরাংশে তাঁহার একাধিপত্য ছিল। দক্ষিণে কোটা হইতে উত্তরে সাহারাণপুর ও পশ্চিমে যোধপুর হইতে পূর্ব্বে কোইল পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ ছিল না। এই সময় পেরং যে সকল প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন, এবং যে সকল দেশ তাঁহার আজ্ঞাধীন ছিল, সে সকলের আলোচনা করিলে তাঁহার প্রভাবের স্বরূপ উপলব্ধ হইবে। দোয়াবের উৎকৃষ্ট অংশ তাঁহার জায়দাদ (জায়গীর) ছিল; সে প্রদেশে তিনি রাজার অধিকার সম্ভোগ করিতেন, এবং রাজোচিত ভাবে বাস করিতেন। সাহারাণপুর, পাণিপথ, দিল্লী, কার্ণুল, আগ্রা ও আজমীর —এ সব সুবাই তাঁহার অধীন ছিল। তিনি সে সকলের রাজস্ব আদায় ও শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি জয়পুরের, যোধপুরের ও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজপুত রাজ্যের রাজাদিগের রাজনীতিক নিয়ন্তা ছিলেন, এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতে কর পাইতেন। হিন্দুস্থানে তখন লবণের ও বাণিজ্যে শুল্ক পাইতেন। কেবল তিনিই মুদ্রা প্রস্তুত করিতে পারিতেন। তখন তাঁহার বার্ষিক রাজস্ব ২ কোটী ৪৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা।

পেরং সামান্য নাবিকরূপে ভারতের ভূমিতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই অসাধারণ সাফল্যে তাঁহার মনে ভারতে ফরাসী-প্রাধান্যস্থাপনের ইচ্ছার উদয় অসম্ভব নহে। নামে না হইলেও কার্য্যতঃ তিনি তখন স্বাধীন সম্রাট।

অরাজক ভারতে তখন সাহসী সেনানায়কের উচ্চাভিলাষ সীমাবদ্ধ করিবার কিছুই ছিল না। পেরং স্বীয় জীবনের শেষ অভিলাষ পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি ভারতের নানা স্থান হইতে ফরাসীদিগকে, বিশেষ হায়দ্রাবাদে লর্ড ওয়েলেসলীর কার্য্যকুশলতায় কর্ম্মচ্যুত ফরাসী সৈনিক কর্ম্মচারী-দিগকে আহ্বান করিয়া স্বীয় সেনাদলের উচ্চ পদগুলিতে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। যে সকল ইংরাজ ও ইংরাজ-জাতীয় ফিরিঙ্গী কর্ম্মচারী পেরং-এর ও দুবোঁয়ার অধীনে সর্ব্বত্র—সমরে, অভিযানে, অবরোধে—সাহসের ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহারা ইহাতে ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পদত্যাগ করিলেন, হার্সে ও হপ্‌কিন্স তাঁহাদের অন্যতম। ইঁহারা উভয়েই "হরিয়ানার রাজা" জর্জ্জ টমাসের সেনাদলে যোগদান করিলেন।

পেরং ও টমাস একইরূপ উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে-ছিলেন। টমাসের উদ্দেশ্য—সমগ্র পঞ্চনদ প্রদেশ জয় করিয়া ইংরাজরাজ্য বিস্তার করিয়া স্বয়ং শাসক হইবেন। পেরং-এর উদ্দেশ্য—সমগ্র ভারত ফরাসীর অধিকারভুক্ত করিয়া স্বয়ং ফরাসী সাম্রাজ্যশাসকের পদ লইবেন। কাযেই পেরং-এর পক্ষে টমাসকে জয় করিয়া আপনার পথ নিষ্কণ্টক করাই বিশেষ আবশ্যক হইয়া উঠিল। টমাস তখন এমনই পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি যদি কোনও সুযোগে পঞ্চনদের প্রতি লোলুপদৃষ্টিপাতে নিরস্ত হইয়া বৃদ্ধ সম্রাট শাহ আলমকে নামে সম্রাট রাখিয়া প্রকৃতপক্ষে বন্দী করিতে পারিতেন, তবে তিনিই উত্তর-ভারতে প্রাধান্য লাভ করিতেন। সিন্ধিয়াও তখন তাঁহাকে কৌশলে বিমুখ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি টমাসকে মহারাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারী হইতে অনুরোধ করিতেছিলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় সেনাদলের প্রধান সেনাপতি পেরং তাহার সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় ছিলেন। পেরং যেমন ঘোর ইংরাজবিদ্বেষী, টমাস তেমনই বিষম ফরাসীবিদ্বেষী। প্রধানতঃ এই কারণেই হার্সে ও হপ্‌কিন্স পেরং-এর সেনাদল ত্যাগ করিয়া টমাসের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু তখন টমাসের গৌরবরবি পশ্চিমগগনপ্রান্তে উপনীত হইয়াছে। তাঁহার শেষ অবস্থার বিবরণ স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয়।

টমাসের পরাভবের পর হায়দার হার্সে বিষম অসুবিধায় পড়িলেন। তিনি প্রথমে জয়পুরে ও যোধপুরে সেনাদলে কার্য্য পাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু পেরং ও সিন্ধিয়া প্রতিকূল থাকায় সফলকাম হইতে পারিলেন না। তখন তিনি টমাসের আদর্শের অনুকরণে স্বতন্ত্র সৈন্যদল গঠিত করিয়া যে পক্ষে অর্থ

পাইবেন, সেই পক্ষেই যোগ দিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়া মেবাৎ অঞ্চলে পঞ্চ সহস্র সৈনিক সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। মেবাৎ মোগল সাম্রাজ্যের সুবা আগ্রার অন্তর্গত ও বর্ত্তমান মথুরা ও গুরগাঁও জিলার ও আলোয়ার ও ভরতপুর রাজ্যের কতক কতক লইয়া গঠিত ছিল। হার্সে দেখিলেন, মেবাতীরা ও তাঁহার সৈনিকগণ তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত। তখন তিনি তাহাদিগকে শিক্ষিত সেনাদলে পরিণত করিয়া স্বীয় শাসনাধীন প্রদেশ সুশাসিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু এই সময় একটি রাজনীতিক ঘটনায় সমগ্র ভারতের ইতিহাস অন্য রূপ ধারণ করিল।

লর্ড ওয়েলেসলী দেখিলেন, ধ্বংসোন্মুখ মোগলসাম্রাজ্যে মহারাষ্ট্রীয় প্রাধান্যই ইংরাজাধিকার সুদৃঢ় করিবার পক্ষে সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়। তিনি সেই প্রাধান্য ও তৎসহ পেরং-এর প্রভুত্ববিনাশে সচেষ্ট হইলেন। তিনি প্রধান সেনাপতি লর্ড লেককে অন্যান্য আদেশের মধ্যে আদেশ দিলেন—পেরং-এর জায়গীর অধিকৃত করিতে হইবে, বৃদ্ধ সম্রাট শাহ আলমকে ইংরাজের আশ্রয় ও অধীন করিতে হইবে, পেরং-এর সেনাসংখ্যার হ্রাস করিতে হইবে। প্রধানতঃ পেরং-এর বিরুদ্ধেই সমর-সজ্জা হইল। পেরং-এর জায়গীর তখন স্বাধীন ফরাসী রাজ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না—তথায় তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা, তাঁহার সেনাদল তখন ইংরাজের পক্ষে আশঙ্কার কারণ। ইংরাজ-অভিযানের প্রকাশ্য উদ্দেশ্য মহারাষ্ট্রীয় শক্তিনাশ হইলেও,বাস্তবিক ইহা পেরং-এর বিরুদ্ধেই নিয়োজিত হইল। দেশীয় রাজ্যের ও পেরং-এর সেনাদলের সকল ইংরাজ ও ইংরাজজাতীয় ফিরিঙ্গী সেনাধ্যক্ষদিগকে ইংরাজের সেনাদলে যোগ দিতে আহ্বান করিয়া ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল। এই আহ্বানে হায়দার হার্সে আপনার অন্য সকল উদ্দেশ্য ত্যাগ করিয়া ইংরাজের সেনাদলে যোগ দিলেন। তাঁহার মাসিক বৃত্তি ৮ শত টাকা নির্দ্দিষ্ট হইল। হার্সের বয়স তখন কেবল একুশ বৎসর, তিনি কোনও দলেও ছিলেন না; সুতরাং তাঁহাকে বিশেষ উপযুক্ত মনে না করিলে কখনই তাঁহাকে এরূপ অধিক বৃত্তি দিয়া ইংরাজ দলে রাখা হইত না।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দের অগষ্ট মাসে লর্ড লেক স্বয়ং পেরং-এর প্রধান আশ্রয় আলীগড়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। এ দিকে হার্সে একটি মহারাষ্ট্রীয় দুর্গ আক্রমণ করিলেন; কিন্তু মস্তকে গুরু আঘাত পাইলেন। অল্পদিন পরে তিনি লর্ড ওয়েলেসলীর প্রস্তাবানুসারে স্বীয় পঞ্চ সহস্র সৈন্যকে বিদায় করিয়া কেবলমাত্র এক সহস্র অশ্বারোহী লইয়া লর্ড লেকের সৈন্যদলে যোগ দিলেন।

হার্সেই এই অশ্বারোহীদলের সেনানায়ক রহিলেন, এবং ইহাদিগকে লইয়া আগ্রা-জয়ে, দিল্লী উদ্ধারে ও ডীগের যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধের শেষকালে হার্সে স্বীয় সেনাদল লইয়া বেরিলী অঞ্চলে কয় জন দুর্দ্ধর্ষ জমীদারকে শাসন করিবায় জন্য প্রেরিত হইলেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের শেষে তিনি করেলীর নিকটে যুদ্ধে তাঁহাদিগকে পরাভূত করেন। পরে করেলীর সম্পত্তি তাঁহার হয়, এবং এখনও তাঁহার বংশধরগণ তথায় বাস করিয়া উহা সম্ভোগ করিতেছেন। * এ দেশে ইংরাজের প্রথম আমলে য়ুরোপীয় ও ফিরিঙ্গীদিগের পক্ষে ভূসম্পত্তি-অধিকার কষ্টসাধ্য ছিল। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথমাবধিই কর্ম্মচারীদিগের পক্ষে শাসিত স্থানে ভূসম্পত্তি-অধিকারের বিরোধী ছিলেন। এমন কি, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইংরাজদিগের পক্ষে কোম্পানীর রাজ্যমধ্যে ভূসম্পত্তি-ক্রয় আইনবিরুদ্ধ ছিল, এবং দেশীয় রাজ্যে তাহাদিগের ভূসম্পত্তি-ক্রয় বিশেষ আপত্তিকর ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে হার্সের ব্যবস্থা অন্যরূপ হইয়াছিল। কারণ, এই সময় তিনি কাম্বের স্বাধিকারচ্যুত নবাবের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই নবাব রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় আকবরের শরণাপন্ন হইলে, ক্ষমতাহীন বাদশাহ তাঁহাকে হৃতরাজ্য পুনঃপ্রদানে অসমর্থ হইলেন, কিন্তু তাঁহার কন্যাদ্বয়কে স্বীয় দুহিতা ঘোষণা করিয়া সম্মানিত করিলেন। এই কন্যাদ্বয়ের জ্যেষ্ঠাকে কর্ণেল গার্ডনার † ও কনিষ্ঠাকে হায়দার হার্সে বিবাহ করেন। তৎকালে এইরূপ বিবাহ সমাজে—বিশেষতঃ মুসলমান সমাজে—বৈধ বলিয়া পরিগণিত হইত।

গার্ডনার ও হার্সে উভয়েই উদারহৃদয় ও ভাবপ্রবণ ছিলেন। তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধে কোনও বিরুদ্ধ মত গার্ডনার সহ্য করিতে পারিতেন না, এবং একবার কোনও ভারতীয় সংবাদপত্রে এই মর্ম্মে ঘোষণা প্রচার করেন যে, কাজীর দ্বারা সম্পাদিত কোনও খৃষ্টানের সহিত মুসলমান-মহিলার বিবাহ কলিকাতার লর্ড বিশপের দ্বারা সম্পাদিত বিবাহেরই মত সিদ্ধ; তাঁহার পুত্রের সহিত সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্রী নবাব মালথা হুমানী বেগমের বিবাহে ইহা স্থির হইয়াছে।

* হায়দার হার্সের দৌহিত্রী আমাদিগকে লিখিয়াছেন,—তাঁহাদের পারিবারিক চিত্র ও দলীলাদি সিপাহীবিপ্লবের সময় অগ্নিদাহে নষ্ট হয়; যাহা কিছু বিশ্বাসী ভৃত্যগণের চেষ্টায় রক্ষা পাইয়াছিল, তাহাও প্রায় ২৬ বৎসর পূর্ব্বে জলপ্লাবনে নষ্ট হইয়াছে। ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীর পরলোকগত মিষ্টার ব্যাজকে কতকগুলি কাগজপত্র দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর সেগুলির আর সন্ধান পাওয়া যায় নাই—লেখক।

† মানসী।

তাঁহার পুরস্ত্রীগণের সম্মানের বিষয়—সম্রাট কর্ত্তৃক তাঁহার পত্নীকে কন্যারূপে গ্রহণে ও পরে সাম্রাজীর তাঁহার গৃহে আগমনেই ব্যক্ত হইয়াছে।

এই বিবাহের ফলে সম্রাটের ফার্ম্মানের বলে গার্ডনার ও হার্সে উভয়েই প্রচুর ভূসম্পত্তি লাভ করেন। গার্ডনার আগ্রা হইতে ৩০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী খাসগঞ্জে ও হার্সে বেরিলীর নিকটবর্ত্তী করেলীতে আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করেন।

হার্সের জ্ঞালকগণ তাঁহার সহিত কাজ করিতেন, এবং বোধ হয় সেবাতে কার্য্য করিয়াছিলেন। পরে তাঁহারা পশ্চাদ্বিবৃত কুমায়ুন-অভিযানে (১৮১৫ খৃষ্টাব্দে) যোগ দিয়াছিলেন।

১৮০৭—খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার নবার্জ্জিত প্রদেশ জরীপ করিবার জন্য কয়েকটি অভিযান প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে এক দল—কাপ্তেন হার্সে, লেফটেনাণ্ট ওয়েব ও কাপ্তেন রেপার—এই তিন জনের অধীনে গঙ্গার উৎপত্তি-স্থাননির্দ্ধারণে নিযুক্ত হয়েন। তখনও গঙ্গার উৎপত্তিস্থান নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। কেহ কেহ বলিতেন, গঙ্গোত্রীতেই গঙ্গার উৎপত্তি—আবার কেহ কেহ বলিতেন, গঙ্গা মানসসরোবর হইতে হিমালয়ের মধ্য দিয়া সুড়ঙ্গ-পথে গঙ্গোত্রীতে আসিয়াছে। হার্সে প্রভৃতি গঙ্গা যে সকল পার্ব্বত্যপ্রদেশমধ্যে প্রবাহিত, সেই সকল প্রদেশের সূক্ষ্ম জরীপ করেন, এবং গঙ্গা যে গঙ্গোত্রীতেই উৎপন্ন, তাহা স্থির করেন। এই উপলক্ষে তাঁহারা তিন মাস ভ্রমণ করিয়া হরিদ্বার, দেবপ্রয়াগ, শ্রীনগর, কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ, যোশীমঠ, বদরীনাথ প্রভৃতি গঙ্গা-কূলস্থিত প্রধান প্রধান তীর্থগুলি দেখিয়াছিলেন।

ইহার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে গাড়োয়াল প্রদেশ গুর্খাদিগের অধিকারগত হইয়াছিল। কিন্তু এই পরিব্রাজক দল তথায় কোনরূপ বাধা বা অসুবিধা ভোগ করেন নাই। তাঁহাদিগের সহিত এই সময় গুর্খা শাসনকর্ত্তা হস্তিদল ও তুরিয়ার সহিত পরিচয় হয়। হার্সে পরিবারে কিংবদন্তী আছে যে, হস্তিদল বন্যবরাহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও আহত হইলে হার্সে চিকিৎসায় তাঁহার জীবন রক্ষা করেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে গুর্খারা আরও অগ্রসর হইয়া কোম্পানীর অধীনস্থ ও কোম্পানীর মিত্ররাজন্যবর্গের রাজ্য আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। অযোধ্যা প্রদেশের প্রান্তস্থ তরাই অঞ্চল তাহাদিগের অধিকৃত হইলে, হার্সে সৈন্যসংগ্রহ করিয়া ঐ অঞ্চল পুনরায় অধিকার করিতে আদিষ্ট হইলেন, এবং ব্রহ্মদেও নামক স্থানে গুর্খাদিগকে সমরে পরাভূত করিলেন। পরে কোম্পানী অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে নগদ দেড় কোটী টাকা ও কাণপুরের নিকটস্থ হাণ্ডিয়া

নামক ভূমি প্রদেশ লইয়া হার্সে কর্ত্তৃক পুনরধিকৃত প্রদেশ নবাবকে দেন। এই সময় হার্সের তেহরীর স্বাধিকারচ্যুত রাজার সহিত পরিচয় হয়। তাঁহারা বংশপরম্পরাক্রমে বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া গাড়োয়ালে রাজত্ব করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা প্রদ্যুম্ন শাহ ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে গুর্খাগণ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত ও স্বাধিকার-চেষ্টায় পর বৎসর ডেরাডুনের নিকট যুদ্ধে নিহত হয়েন। প্রদ্যুম্নের পুত্র সুদর্শন এই সময় হীনাবস্থ হইয়া সেরিঙ্গীতে বাস করিতেছিলেন। অত্যন্ত অর্থাভাবহেতু ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন তারিখে লিখিত দলীলে তিনি তিন হাজার পাঁচ টাকা মূল্যে ডুন ও চাঁদি পরগণাদ্বয় হার্সের নিকট বিক্রয় করিলেন। পরে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে গুর্খাযুদ্ধের পর কোম্পানী সুদর্শনকে তাঁহার রাজ্যের—অলকনন্দার পশ্চিমাংশে স্থাপিত করেন। পূর্ব্বাংশস্থিত ডুন ও চাঁদি পরগণাদ্বয় কোম্পানী রাখিলেন। এই গুর্খাযুদ্ধে হার্সে কোম্পানীর সাহায্য করিয়া বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছিলেন। কোম্পানী বার্ষিক বার শত টাকা পাঞ্জনা স্বীকার করিয়া চাঁদি পরগণা হার্সের নিকট হইতে চিরস্থায়িরূপে বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর তারিখে এই দলীল সম্পাদিত হয়। এই দলীলে লিখিত হইল, ডুন কোম্পানীর অধিকারে আসিলেই হার্সে উহা কোম্পানীকে বিক্রয় করিবেন। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে কোম্পানী হার্সেকে ডুন পরগণার অধিকার দিতে ও তাঁহার নিকট হইতে উহা ক্রয় করিতে অস্বীকৃত হয়েন। কোম্পানী প্রকারান্তরে তাহার স্বত্ব অস্বীকার করেন। ডেরাডুন এক্ষণে অত্যন্ত মূল্যবান সম্পত্তি। হার্সের উত্তরাধিকারীরা দলীলের বলে ঐ পরগণার মূল্য পাইবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু সফলকাম হইতে পারেন নাই। কিন্তু যে দলীলে কোম্পানী চাঁদি পরগণা বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন, সেই দলীলেই ডুনে হার্সের স্বত্ব স্বীকৃত হয়। হার্সের বংশধরগণ বলেন, গুর্খাযুদ্ধের পর ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর সেগোলীতে যে সন্ধি হয়, তাহাতে ইংরাজ গভর্মেণ্ট যে সকল স্থান অধিকৃত করেন, এবং আপনারা শাসনাধীন রাখেন, সে সকলেরই উল্লেখ আছে। উহাতে ডুনের উল্লেখ নাই। ইহা হইতেও বুঝা যায়, কোম্পানী ডুন প্রদেশ যুদ্ধে জয় করিয়া লয়েন নাই, হার্সের সহিত সম্পাদিত দলীলের বলে ভোগ করিতেছেন। বিশ্বাসভাজন কর্ম্মচারীর প্রতি সরকারের এই ব্যবহার বাস্তবিকই বিস্ময়কর ও বেদনার কারণ।*

* এই প্রবন্ধ-রচনার জন্য আমরা হার্সেপরিবারের সহিত যে সকল পত্রব্যবহার করিয়াছিলাম তাহাতে তাঁহারা সরকারের এই ব্যবহারে বিশেষ মনঃক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন —লেখক।

১৮১২ খৃষ্টাব্দে যখন হার্সে বেরিলীর নিকট আপনার সম্পত্তিস্থ গৃহে বাস করিতেছিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে গুর্খাদিগকে তেরাই প্রদেশ হইতে বিতাড়িত করিবার প্রস্তাব কোম্পানীর নিকট উপস্থাপিত করিতেছিলেন, তখন তিনি উইলিয়ম মুরক্রফ্‌টের * সহিত কুমায়ুন গাড়োয়ালের মধ্য দিয়া মানসরোবর-দর্শনোদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

এই ভ্রমণের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, যাত্রীরা ইংরাজ রাজ্যের সীমান্ত রোহিলাখণ্ড হইতে হিন্দু তীর্থযাত্রীর বেশে ১৮১২ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে তারিখে গুর্খাধিকৃত কুমায়ুনে প্রবেশ করেন। তাঁহাদের সঙ্গে ৫২ জন ভারতবাসী ছিল—সম্ভবতঃ ইহাদের অধিকাংশই পার্ব্বতীয় কুলী। গোলাম হায়দার নামক হার্সের পুরাতন অনুচরও তাঁহাদের সঙ্গে ছিল। গোলাম হায়দার জাতিতে আফগান। অনুচরদিগের মধ্যে দুই জন ভারতবাসী শিক্ষিত ছিলেন। তাঁহারা জরীপের কার্য্যে নিয়োজিত হয়েন। মুরক্রফ্‌ট বলেন, হার্সে সমস্ত পথ জরীপের ভার লইয়াছিলেন; ভারতবাসীদিগের অন্যতর হরকদেব পদক্ষেপে সমস্ত পথ জরীপ করিয়াছিলেন। তাঁহার দুইবার পদক্ষেপে ৪ ফুট স্থান অতিক্রান্ত হইত। তাঁহারা ৯ই হইতে ২৬শে পর্য্যন্ত যে স্থান অতিক্রম করেন,

---

* মুরক্রফ্‌টের জীবনকথা বিস্ময়কর। তিনি স্বদেশে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া পশু-চিকিৎসার অনাদর দেখিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রের ঐ অংশ শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। এই কার্য্যে প্রসিদ্ধ অশ্বচিকিৎসক ডাক্তার হাণ্টার তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করেন। পরে ফ্রান্সে পশু-চিকিৎসা শিক্ষা করিয়া তিনি লণ্ডনে ফিরিয়া ঐ ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ অর্জ্জন করেন। কিন্তু অন্যান্য ব্যবসায়ে অর্জ্জিত অর্থের অধিকাংশ নষ্ট হইলে, তিনি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক বেনাদলের পশুচিকিৎসা বিভাগের তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত হইয়া ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আইসেন। তিনি ভারতবর্ষের সহিত পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহের বাণিজ্যসম্বন্ধ-সংস্থাপনের প্রয়াসী ছিলেন, এবং স্বদেশের পক্ষ হইতে ঐ সকল দেশের ভৌগোলিক-তথ্যানুসন্ধান তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। এই সকল উদ্দেশ্যেই তিনি তিব্বতে যাত্রা করেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বাল্ক ও বোখারা যাত্রা করেন। তথায় তিনি স্বয়ং, তাঁহার য়ুরোপীয় সঙ্গিদ্বয় ও প্রায় সকল ভারতীয় সমভিব্যাহারী প্রাণ-ত্যাগ করেন। সেবার হার্সেরও সেই সঙ্গে যাইবার কথা ছিল। কিন্তু কোন্ পথে যাওয়া যুক্তি-যুক্ত, তাহা লইয়া মতভেদ হওয়ায় হার্সের যাওয়া ঘটে নাই। অভিযানের ভারতত্যাগের সাত বৎসর পরে সমভিব্যাহারী গোলাম হায়দার ভগ্নদূতরূপে মুরক্রফ্‌টের লিখিত পথের বিবরণ লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ঐ বিবরণ ও গোলাম হায়দারের স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া হার্সে মুরক্রফ্‌টের এই শেষ যাত্রার একটি সুখপাঠ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। উহা London Asiatic Journalএ প্রকাশিত হয়।

তাহা দুই বৎসর পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কোলব্রুকের ভ্রাতা কর্ত্তৃক অতিক্রান্ত হইয়াছিল। ২৪শে তারিখে তাঁহারা যোশীমঠে বদরীনাথের পথ পরিত্যাগ করিয়া, পূর্ব্বে ইংরাজ কর্ত্তৃক অনতিক্রান্ত নূতন পথে প্রবেশ করেন। ৪ঠা জুন তাঁহারা নীতি নামক গ্রামে উপনীত হইলে তিব্বতীয়েরা তাঁহাদিগের যাত্রায় নানারূপ বাধা দিতে থাকে। কারণ, এ পথে মানস-সরোবর যাত্রীরা সচরাচর গমন করে না। এই যাত্রীরা সশস্ত্র—তাঁহাদের সঙ্গে বহু সহযাত্রী, এবং তাঁহারা তিব্বতীয়দিগের শত্রু ফিরিঙ্গী, বা গুর্খা। তিব্বতীয়গণ চিরদিনই য়ুরোপীয়দিগের তিব্বত প্রবেশের বিরোধী। এ দিকে কুমায়ুন গাড়োয়াস তখন গুর্খাধিকৃত—গুর্খারাও ইংরাজদ্বেষী। কাজেই তিব্বতীয়দিগের পক্ষে এই যাত্রিগণের প্রকৃত-পরিচয়-প্রাপ্তি অসম্ভব নহে।

মুরক্রফ্‌ট ও হার্সে নীতির মণ্ডলকে বুঝাইলেন, তাঁহারা কেবল ধর্ম্মার্থ মানসসরোবরে যাইতেছেন; তাঁহাদিগের সহযাত্রীর সংখ্যাধিক্যের কারণ—তাঁহারা পথে ব্যয়নির্ব্বাহার্থ বিক্রয় জন্য অনেক জিনিস আনিয়াছেন, আর আত্মরক্ষা ও দ্রব্যাদিরক্ষার্থ তাঁহাদিগকে অস্ত্র লইতে হইয়াছে। তিব্বতীয়েরা ইচ্ছা করিলে তাঁহারা তাহাদিগের নিকট অস্ত্র রাখিয়া অগ্রসর হইতে প্রস্তুত। এই কথায় নীতির মণ্ডল প্রভৃতি বাহ্যতঃ সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিল, তাঁহারা পক্ষকাল তথায় অপেক্ষা করিলে, তাহারা কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের অভিপ্রায় বুঝিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিবে। পরে জানা যায়, নীতির মণ্ডল যাত্রীদিগকে যাইতে দিলে পার্ব্বত্য পথের অপর পারে তিব্বতীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের তাহাদিগকে বাধা দিবার কোনও অধিকার নাই। এই সংবাদ-প্রাপ্তির পর বহু বাদানুবাদের ও এক বোতল ব্রাণ্ডিদানের ফলে, তাঁহারা ২৩শে জুন যাত্রার অনুমতি পাইলেন, এবং ঐ মাসের শেষদিন পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিলেন। ৩রা জুলাই তিব্বতীয় অধিকারমধ্যে ২০ মাইল দূরবর্ত্তী দাবা নামক স্থানে উপনীত হইলেন। দাবার কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের সহায়তায় তাঁহারা ১২ই তারিখে দাবা ত্যাগ করিয়া ১৭ই গারটোপে উপনীত হইলেন।

দাবায় এক বিভ্রাট ঘটে। তথায় প্রকাশ পায় যে, হার্সের পদে বিলাতী ধরণের হাফ বুটজুতা! মুরক্রফ্‌ট খুব কৌতুকের সহিত এই কথা লিখিয়াছেন—কারণ, তিনি আপনার জুতায় নাগরার মত শুঁড় লাগাইয়া লইয়াছিলেন।

তাঁহারা ২৩শে জুলাই গারটোপ ত্যাগ করিয়া ২রা অগষ্ট রাবণহ্রদে উপনীত হইলেন। ৫ই তাঁহারা অভিলষিতদর্শন মানসসরোবরের দর্শন লাভ করিয়া

পরদিন তাহার তীরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দুই দিন তীরে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

মুরক্রফ্‌ট বলিয়াছেন, হ্রদটি আয়তক্ষেত্র (oblong) বলিয়া মনে হইল—পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণের তীর সরল রেখায় লম্বিত; বিস্তার—উত্তর দক্ষিণে প্রায় ১১ মাইল; দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫ মাইল। সিকতাময় কূলের সান্নিধ্য ব্যতীত অন্যত্র জল স্বচ্ছ ও সুস্বাদু। তলের উপর শৈবাল দৃষ্ট হয় না, কেবল কূলের নিকটে জলমধ্যজাত ঘাস দেখা যায়। দূরে জল হরিৎবর্ণ বলিয়া মনে হয়। কি স্থির অবস্থায়—কি চঞ্চল অবস্থায় হ্রদের দৃশ্য সর্ব্বদাই মনোরম।

পথে কয় জন সন্ন্যাসীকে অর্থাভাবে প্রত্যাবর্ত্তনপর দেখিয়া যাত্রীরা তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন।

মুরক্রফ্‌ট সরোবরকূলে সন্ন্যাসিগণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত কতিপয় গুহা দেখিতে পান। গুহাবাসিনী এক জন সন্ন্যাসিনী সম্ভবতঃ তাঁহার শীর্ণ গৌরবর্ণ দেখিয়া দয়াপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাকে আতিথ্যগ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে বিনয়ব্যঞ্জকভাবে তাঁহার আতিথ্য প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁহাদের কথায় ভবিষ্যতে কোনরূপ সন্দেহ প্রকাশিত হইলে, তাহার অপনোদনার্থ হাসে এক খণ্ড প্রস্তরে উভয়ের নাম ক্ষোদিত করিয়া একটি নিরাপদ স্থানে রক্ষা করিয়া আইসেন।

তাঁহারা ৮ই অগষ্ট মানসসরোবর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন আরম্ভ করিলে, ৯ই চাঁদপুরে গুর্খানায়ক বান্দা থাপ্পা তাঁহাদিগকে ছদ্মবেশে গুর্খাধিকারে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে তাঁহারা বলিলেন, পর্য্যটকগণ সাধারণতঃ ভ্রমণকালে ছদ্মবেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং এ ক্ষেত্রে ছদ্মবেশ গ্রহণ ব্যতীত তাঁহাদের তিব্বতে প্রবেশের উপায় ছিল না। তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ অন্যায় আচরণের অভিযোগ আছে কি না জিজ্ঞাসা করিয়া, তাঁহারা জানিলেন, সেরূপ কোনও অভিযোগ নাই। তখন তাঁহারা বলিলেন যে, শত শত নেপালী প্রজা কোম্পানীর অধিকারমধ্যে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া থাকে—কেহ তাহাদিগকে বাধা দেয় না। বান্দা থাপ্পা বাহিরে অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন না বটে, কিন্তু ১৫ই তারিখে পর্য্যটকগণ বন্দী হইয়া প্রহরিবেষ্টিত হইলেন। তাঁহাদিগকে বলা হইল যে, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কি করা হইবে, সে বিষয়ে পরামর্শ চলিতেছে। কিন্তু পরে প্রকাশ পায়, রাজধানী কাটমুণ্ড হইতে প্রেরিত আদেশানুসারেই তাঁহারা বন্দীকৃত হইয়াছিলেন। মুরক্রফ্‌ট

সশস্ত্র ছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি কঠোর ব্যবহার করা হইয়াছিল—তাঁহার হস্তদ্বয় বন্ধন করা হইয়াছিল। গণ্ডিতদ্বয় ও অন্যান্য সহচরগণকে শৃঙ্খলিত করা হয়। গুর্খা সৈন্যদলের প্রধান সেনাধ্যক্ষ অমরসিংহের ও আলমোরার গুর্খা শাসনকর্ত্তা বামশাহের পত্রব্যবহারের ফলে ১লা নভেম্বর হার্সে ও মুর-ক্রফ্‌ট মুক্তিলাভ করেন। আর সকলে তখনও বন্দী রহিলেন। পরে ৫ই নভেম্বর নেপালের মহারাজের আদেশলিপি-প্রাপ্তির পর সকলকেই মুক্তি দিয়া ইংরাজাধিকারে রাখিয়া যাওয়া হয়। এইরূপে মানসসরোবর পর্য্যন্ত ইংরাজ পর্য্যাটকদিগের প্রথম পর্য্যটন পরিসমাপ্ত হয়।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর অধিকৃত প্রদেশে গুর্খাদিগের অত্যাচার অসহনীয় হইয়া উঠে, এবং পর বৎসর যুদ্ধ অনিবার্য্য হয়। সে যুদ্ধের বিবরণ আমরা গার্ডনারের বিবরণে বিবৃত করিয়াছি। * তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপে বলা যায়, চারিটি আক্রমণের মধ্যে তিনটিতে ইংরাজের পরাজয় ও তাঁহাদের খ্যাতি মলিন হইয়াছিল। চারি দলই অগ্রসরে অক্ষম দেখিয়া বড়লাট লর্ড ময়রা ডিসেম্বর মাসে যুদ্ধের প্রণালীর পরিবর্ত্তন প্রয়োজন বুঝিয়া কুমায়ুন অঞ্চল আক্রমণ করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। হার্সে ও গার্ডনার এই কার্য্যের ভার পাইলেন। তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ বৈবাহিক সম্বন্ধের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইঁহারা উভয়েই যেরূপ দুঃসাহসিক, তাহাতে মনে হয়, ইঁহারাই এই প্রণালী-পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বিশেষ, হার্সে ১৮০৮ ও ১৮১২ খৃষ্টাব্দে কুমায়ুন অঞ্চলে গমন করিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, গুর্খারা বিক্রমশালী নহে। এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের জন্য এবার তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

গার্ডনার মোরাদাবাদ জেলায় তিন হাজার ও হার্সে বেরিলী ও পিলিভিট অঞ্চলে দেড় হাজার রোহিলা সৈন্য সংগ্রহ করিতে উপদিষ্ট হইলেন। ঐ অঞ্চলে হার্সের প্রচুর সম্পত্তি ও প্রভাব ছিল। স্থির হইল—গার্ডনার কুশী নদীর উপত্যকাপথে কুমায়ুনাভিমুখে অগ্রসর হইবেন, এবং হার্সে পিলিভিট হইতে কালী নদী ধরিয়া টিনকা উপত্যকা দিয়া কালী-কুমায়ুনে প্রবেশ করিবেন। এইরূপে শতদ্রু ও গণ্ডক নদীদ্বয়ের নিকটস্থ অভিযান দুই ভাগে বিভক্ত হইবে। অমরসিংহ তখন জেনারল অক্‌টারলোনীর সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। এই ব্যবস্থায় তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের একমাত্র পথ বন্ধ হইবে।

হার্সে অল্পকালমধ্যেই দেড় হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। কিন্তু বেরিলী

* 'মানসী'।

অঞ্চলের রোহিলাদিগের যোদ্ধা বলিয়া খ্যাতি ছিল না—হার্সে তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিবার সময়ও পাইলেন না। এক মাসে সৈন্যসংগ্রহ শেষ করিয়া, এক মাসেরও কম সময় তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া, তৃতীয় মাসে হার্সে গুর্খাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ মার্চ্চ মাসের শেষ দিনই তাঁহার কষ্ট শেষ হয়। ১লা এপ্রেল তাঁহার সেনাদল বিধ্বস্ত হইল।

হার্সের সহিত কামান ছিল না—গুলী বারুদও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছিল না—রসদেরও অভাব ছিল। দলপতি হস্তিদল ও অপর এক জন নায়কের অধীনে গুর্খারা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিল। যুদ্ধের আরম্ভেই হার্সে উরুতে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহার এক শ্যালক নিহত হইলেন—আর এক শ্যালক ঢালের উপর বসিয়া নিম্নগ ভূমিতে অবতরণ করিয়া রক্ষা পাইলেন। তাঁহার অনুচর গোলাম হায়দারও আহত হইয়া কোনরূপে প্রাণরক্ষা করে। রোহিলারা নায়কদিগকে আহত দেখিয়া পলায়নপর হইল। তখন গুর্খারা অগ্রসর হইয়া তাহাদিগের সামরিকপ্রথানুসারে হতাহতের শিরশ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা হার্সের শিরশ্ছেদনে উদ্যত হইলে, হস্তিদল তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিলেন, এবং তাঁহাকে আলমোরায় লইয়া যাইলেন। হার্সে ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন; সেই কথা স্মরণ করিয়া হস্তিদল তাঁহার সহিত ভ্রাতৃবৎ ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

ঐ এপ্রেল মাসে ইংরাজগণ জয়ী হইয়া আলমোরা হস্তগত না করা পর্য্যন্ত হার্সে তথায় বন্দী রহিলেন। গার্ডনার আলমোরা-দুর্গজয়ে অসমর্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু কর্ণেল নিকলস্ আর এক সৈন্যদল লইয়া দুর্গ-জয় করিলেন। হস্তিদল দৌত্যকার্য্যে হার্সেকে নিযুক্ত করায় সন্ধির পথ সুগম হয়।

কুমায়ুনের যুদ্ধের পর হার্সে বেরিলীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। গোলাম হায়দারও অল্পদিনমধ্যে তথায় আসিল। হায়দার অল্প দিনেই সুস্থ হইল; কিন্তু অবরোধ ও কুচিকিৎসার ফলে হার্সে আর নষ্টস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন না। জীবনের অবশিষ্ট কাল—পঞ্চদশ বৎসর—তিনি আর পূর্ব্ববৎ স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করিতে পারেন নাই।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে বেরিলী জেলার জনগণমধ্যে অসন্তোষ আত্মপ্রকাশ করিল; বৃটিশশাসনে ভারতে যে শান্তি সংস্থাপিত হয়, রোহিলাদিগের পক্ষে তাহা প্রীতিপ্রদ হয় নাই। অধিকন্তু বেরিলীর তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট অসৌজন্যহেতু লোকের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। ১৬ই এপ্রেল তথায়

দাঙ্গা হইল, এবং তাহার দুই দিন পরে নিকটবর্ত্তী নানা স্থান হইতে প্রায় পঞ্চ সহস্র মুসলমান বেরিলী সহরে সমবেত হইয়া প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনে সিপাহী-সংখ্যা মোট ৪২০ ও দুইটি কামান, এক জনও সেনানায়ক নাই। হায়দার হার্সে যাচিয়া কামান চালাইবার ভার লইলেন। ১৯শে তারিখে বেরিলীতে এক দল অশ্বারোহী সেনা উপস্থিত হইল। বিলম্বে আরও সৈন্যসমাগম হইবে বুঝিয়া বিদ্রোহীরা অতর্কিতভাবে সিপাহীদিগকে আক্রমণ করিল। হার্সের পরিচালিত কামানের সাহায্যে ইংরাজগণ বিদ্রোহী-দিগকে পরাভূত করিলেন—তাহাদের মধ্যে তিন চারি শত লোক হত ও বহু লোক আহত ও বন্দী হইল। এই কার্য্যের জন্য বড়লাটের ঘোষণাপত্রে হার্সেকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল, এবং তিনি মেজর-পদে উন্নীত হইলেন, এবং একখানি তরবারি উপহার পাইলেন।

এবারও গোলাম হায়দার প্রভু হার্সের পার্শ্বে ছিল। সে বন্দুকের গুলীতে মস্তকে আহত হইয়াছিল। সে গুলী বাহির করা যায় নাই—মস্তকেই ছিল। তথাপি হার্সের অনুরোধে হায়দার মুরক্রফ্‌টের শেষ অভিযানে তাঁহার সহগামী হইয়াছিল। মুরক্রফ্‌ট ও তাঁহার সঙ্গীদের শোচনীয় মৃত্যুর পর হায়দার প্রায় আট বৎসর বহু কষ্ট ভোগ করিয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করে,এবং জীবনের অবশিষ্ট কাল হার্সের আশ্রয়ে অতিবাহিত করে। তাহার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণ হার্সের পুত্রদিগের সহিত প্রতিপালিত হইয়াছিল।

১৮২০ খৃষ্টাব্দে হরিদ্বারে বহুযাত্রীর সমাগমে বিষম দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। তাহাতে প্রায় চারি শত নরনারী নিষ্পিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করে। সেই সময় হায়দার হার্সে ও তাঁহার আত্মীয় বেনেট হার্সে হরিদ্বারে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট এই দুর্ঘটনার কারণ বিবৃত করিলে, বড়লাট মার্কুইস অব হেষ্টিংসের আদেশে হরিদ্বারে প্রশস্ত ও সুগঠিত তীর্থ—সোপান-শ্রেণী প্রস্তুত হয়। তদবধি স্নানার্থীর বাহুল্যে হরিদ্বারে আর কখনও কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটে নাই।

হার্সে আরও একবার যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ভরতপুর যুদ্ধে তিনি যোগ দিয়াছিলেন। গুর্খাযুদ্ধের আঘাতের ফলে তিনি তখন ভগ্ন-স্বাস্থ্য; ডুন পরগণা লইয়া তিনি তখন কোম্পানীর ব্যবহারে মর্ম্মাহত। কিন্তু ইংরাজ সৈন্য যুদ্ধযাত্রা করিতেছে শুনিয়া তিনি সব বিস্মৃত হইলেন। যুদ্ধের পর—ভরতপুর-জয়ান্তে ইংরাজ সৈন্যগণ আপনাদের স্বার্থসংরক্ষণার্থ তাঁহাকে সহকারী Prize Agent মনোনীত করে। এ সম্মান বড় সাধারণ নহে।

এই কার্য্য শেষ করিয়া হাসান করেলীতে স্বীয় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, এবং সুখে ও সম্ভ্রমসহকারে জীবনের অবশিষ্ট কয় বৎসর কাটাইয়া, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন।

তাঁহার তিন পুত্র ও এক কন্যা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় দশ বৎসর পরে তাঁহার পত্নী—কাম্বের নবাবনন্দিনীর মৃত্যু হয়। প্রাচীরবেষ্টিত ভূমিখণ্ডে তাঁহার দেহ সমাহিত হয়। আজও পর্ব্বদিনে গ্রামবাসীরা এই মহিলার প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য তাঁহার সমাধি কুসুমে সজ্জিত ও দীপালোকিত করিয়া থাকে। তিনি আগ্রার তাজমহলের প্রবেশদ্বারের নিকটে স্বীয় পিতার আবাস-গৃহের সান্নিধ্যে সাধারণের ব্যবহার জন্য একটি কূপ খনন করাইয়া দেন। সেই কূপপ্রাচীরে একখানি প্রস্তরফলক সন্নিবিষ্ট আছে। কিন্তু সেই আবাস এক্ষণে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার উত্তরাধিকারীরা এখনও তাঁহার অর্জ্জিত সম্পত্তি সম্ভোগ করিতেছেন।

শ্রীদেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

ভালবাসার এক ধারা।

["One way of Love"—by *R. Browning.*]

১

সারাটা বসন্ত আমি গাঁথিলাম গোলাপের হার।
এখন সে সব ছিঁড়ি—একে একে দলগুলি তার,
ছড়াই সে পথে—যেথা মাঝে মাঝে প্রিয়া মোর যায়।
ছেঁড়া ফুল হেরি পথে, ফিরে কি সে চাহিবে না—হায়!
থাক্‌না ছড়ান সেথা—থাক্ থাক্—শুকাবে? শুকাক।
কোন যোগে পড়ে যদি চোখে তার—তাই, থাক্ থাক্।

২

কত কত মাস ধরি করিয়াছি কত না যতন,
অবাধ্য অঙ্গুলি মোর বীণা-বশে করিতে চালন!
সাহস করেছি আজ, যাহা জানি সবই তা বাজাতে।
না শুনে যদি সে গান? না শুনুক্—কি ক্ষতি তাহাতে?
ছিঁড়িব বীণার তার—থামাইব সঙ্গীত-ঝঙ্কার।
ভাবিব—গায়িতে গান বলেছিল প্রেয়সী আমার!

৩

সারাটা জীবন ধরি শিখিয়াছি ভালবাসিবারে।
ছলাকলা যত জানি, পরিচয় দিব আজি তারে;
কহিব মর্ম্মের কথা—স্বর্গ কি নরক তায় হবে?
দিবে না মোরে সে স্বর্গ? নাহি দেয়—তাই ভাল তবে!
হারাই—লভুক্ স্বর্গ যে বা হয়—কহি এ নিশ্চয়—
যে লভে প্রেমের স্বর্গ, সেই ধন্য—ভাগ্যে তারই জয়।

শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

আলোচনা।

আর্ট ও আর্ট-রসিক।

গত ভাদ্রের 'ভারতী'তে শ্রীযুত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—'বাংলা সাহিত্যে যাঁরা থিয়রি লইয়া মারামারি করেন, তাঁদের রচনায় রসবোধ ও রসবিশ্লেষণের ক্ষমতার গন্ধ পর্য্যন্ত পাই না।' ইহা অবশ্যই থিয়রি-ওয়ালাদের দুর্ভাগ্য! কিন্তু সাহিত্যে যাঁহারা থিয়রি লইয়া মারামারি করেন না, তাঁহাদের ঘ্রাণশক্তি কত দূর প্রবল, তাহার পরিচয় তাঁহারা কতটুকু দিয়াছেন? রুমাল দ্বারা নাসিকা আবৃত করিয়া মুখগহ্বরের সাহায্যে যাঁহাদের শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া চলে, তাঁহাদের নাসিকা হইতে রুমাল টানিয়া ফেলিয়া দিবার শক্তি অবশ্যই থিয়রি-ওয়ালাদের নাই।

অজিতকুমার বাবু বলেন,—'আসলে তর্কটা আর্টের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ লইয়া দাঁড়ায় না—আর্টের সঙ্গে নীতির সম্বন্ধবিচার লইয়াই এই তর্ক।...তর্কটা পুরাণো—বাংলা দেশের মাটিতে নূতন করিয়া গজাইয়াছে মাত্র।' ক্ষতি কি? তর্ক পুরাতন হইলেই যে তাহা আলোচনার অযোগ্য হইবে, এমন কোনও বিধান নাই। বিশেষতঃ, এতকাল যে তর্কের মীমাংসা হয় নাই, তাহা যতই পুরাতন হউক, আলোচনার যোগ্য। আর্টের সঙ্গে নীতির সম্বন্ধবিচার লইয়াই এই তর্ক হইতেছে, এ কথা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু সেই নীতি কোন্ নীতি? নীতির উৎপত্তি কোথায়? বিশিষ্ট সমাজের নীতি আর্টের আলোচ্য হউক বা না হউক, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত যদি আর্টের যোগ থাকে, তবে সাধারণ মানবসমাজের সহিত শ্রেষ্ঠ আর্টের যোগ থাকিবেই। বিশ্বপ্রকৃতির সহিত যোগ আছে বলিয়াই শ্রেষ্ঠ আর্ট সর্ব্বতোভাবে বিশ্বপ্রকৃতির অনুসরণ করে না; দোষগুণ, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও পাপপুণ্যের বিচার করিতে পারে, কিন্তু সাধারণ ও স্বাভাবিক সমাজজীবনের মূলে কুঠারাঘাত করে না। যে আর্ট নীতি মানে না, তাহা সাধারণ মানবের সমাজধর্ম্মও মানে না। সাধারণ মানবের সমাজধর্ম্মকে অবহেলা করিয়া কয় জন আর্টিষ্টের দান সাহিত্যে স্থায়ী হইয়াছে, 'ভারতী'র লেখক তাহার একটা হিসাব দিলে,

আমরাও বুঝিতে পারি যে, সাধারণ মানবের মঙ্গলধর্ম্মকে অবহেলা না করিয়াই কোনও কোনও লেখক সাহিত্যে যাহা দান করিয়াছেন, তাঁহাদের দান তথাকথিত আর্টিষ্টের দানের অপেক্ষা কত উচ্চ, বা কত নীচ। নতুবা এক পক্ষ যদি ক্রমাগতই বলেন—আর্টের সঙ্গে নীতির যোগ না থাকিলে ক্ষতি নাই; আর অপর পক্ষ বলেন—আর্টের সঙ্গে নীতির যোগ চাহি; তবে এই তর্কের মীমাংসা কোনও কালেই হইবে না।

অসুকার ওয়াইল্ড আর্টের সঙ্গে নীতির সম্বন্ধ বিচার করিতে চাহেন নাই। রাস্কিনের মতে, আর্টের বক্ষে নীতির সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। অজিতকুমার বাবু অসুকার ওয়াইল্ড বা রাস্কিন, এই দুইয়ের কাহারও মতের সমর্থন করেন না। অজিতকুমার বাবু অসুকার ওয়াইল্ড বা রাস্কিনের মত যুক্তিশালী হইলে, এবং একটা নূতন মতের প্রতিষ্ঠা করিয়া 'আর্টের আদর্শ' নির্ণয় করিতে পারিলে আমরা সুখী হইতাম, কিন্তু তিনি অসুকার ওয়াইল্ডের মতের দিকে ঝুঁকিয়া পড়া ছাড়া আর কিছুই করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—'আর্টের মধ্যে সব ক্ষেত্রেই নৈতিক উদ্দেশ্যের প্রেরণার সন্ধান করিতে গিয়া রাস্কিন যে সব সময়ে আর্ট-সম্বন্ধে সুবিচার করিয়াছেন এমন কথা বলা যায় না।' এমন কথা বলিতে না পারিবার কারণ দেখাইতে গিয়া তিনি যে উদাহরণটি দিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত কাঁচা। সিপাহীবিদ্রোহকালে ভারতবাসীর চরিত্র সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত অর্থাৎ মিথ্যা সংবাদ বিলাতে প্রচারিত হওয়ায় রাস্কিন ভারতবাসীকে নীতিতে দুর্ব্বল ভাবিয়াছিলেন। এই ভুল সমালোচনার আশঙ্কায় রাস্কিনের মতটা যে কিরূপে উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। রবীন্দ্রনাথের এখনকার 'লৌবন রে তুই যে পারিস্ কাঁটা গাছের উচ্চ ডালে পুচ্ছ নাচাতে' জাতীয় কবিতায়, বা 'ঘরে-বাইরে', 'চোখের বালি', বা 'নৌকাডুবি'র ভুল সমালোচনায় আপত্তি ত রবীন্দ্রনাথের পার্শ্বচরগণ যোল আনাই করেন, তবে কি আর্ট সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সুবিচার করিতেছেন না, ইহা সকলেই অবিসংবাদিতরূপে সিদ্ধান্ত করিবেন? তাহা হইলে আর্ট সম্বন্ধে আলোচনার আর কোনও কারণই থাকে না।

তাহার পর হুইস্‌লারের কথা। তিনি আর্টকে নীতির আধিপত্য হইতে মুক্তি দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। হুইস্‌লারের পরবর্ত্তী এখনকার অনেক লেখকও ত ঐ ধুয়া ধরিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন—আর্ট জীবনের প্রকাশক, জীবনের উদ্ঘাটক। কেহ কেহ বলেন—জীবনের সৃষ্টিই সাহিত্যের কাজ, আর্ট জীবন-সৃষ্টিকৌশলের স্রষ্টা। ইহাতেই ত তর্কের সৃষ্টি। তথাপি অজিতকুমার বাবু সর্ব্বত্র শুনিতেছেন—আর্ট জীবনের প্রকাশক, জীবনের উদ্ঘাটক। বিপক্ষীরেরা যাহা বলিতেছেন, তাহা কি সর্ব্বত্রই গুরুতর বাহিরে? এক পক্ষ সামাজিক শুভাশুভের দিক্ দিয়া আর্টের বিচার করিতে চাহেন; অন্য পক্ষ বলেন, 'সমাজের দিক্ হইতে কোন জিনিসটা ইষ্টকর বা অনিষ্টকর, আর্টের সেজন্য কোনও মাথাব্যথা নাই।' দ্বিতীয় পক্ষের কথা এই, গল্প বা উপন্যাসের বিষয় যাহাই হউক, রচনাটি কলানৈপুণ্যপূর্ণ ও রসযুক্ত হইয়াছে কি না, তাহাই বিচারের বিষয়। প্রথম পক্ষ রচনাটি কলানৈপুণ্যপূর্ণ ও রসযুক্ত হইয়াছে কি না, তাহা ত বিচারের বিষয় বলিয়া গণ্য করেনই, অধিকন্তু ইহাও বিচার করেন যে, সামাজিক শুভাশুভের সঙ্গে ঐ রচনার কতটুকু সম্বন্ধ আছে। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, এই ভাবে বিচার

করিলে আর্ট নীতির শাসনে সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। কিন্তু উপায় কি? নীতিকে অবহেলা করিয়া কোনও সভ্যজাতির সমাজ কোনও কালেই উন্নতিলাভ করিতে পারে না। সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করাই মানুষের স্বভাব। সমাজের কল্যাণের জন্যই মানুষ কার্য্যে ও ব্যবহারে নীতির অনুসরণ করে। সেই জন্য কোনও স্বয়ংসিদ্ধ আর্টিষ্ট আর্টের দোহাই দিয়া দুর্নীতির প্রচারে উদ্যত হইলে, সমাজের শুভাশুভের দিকে লক্ষ্য করা সমাজহিতৈষী যে কোনও ব্যক্তির পক্ষে আবশ্যক হয়। তখন সাধারণ সমাজবাসীর পক্ষ হইতে স্বতঃই একটা প্রশ্ন উত্থিত হয়—তোমার রচনার রস ও কলাসৌষ্ঠব আমার কি উপকারে আসিল? রবীন্দ্রনাথ গল্পে ও উপন্যাসে বিলাতী পাপের ছবি বায়স্কোপের মত বাঙ্গালীকে ক্রমাগতই দেখাইতেছেন বলিয়াই বাঙ্গালার জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা আসিয়াছে। প্রথম-পক্ষভুক্ত অনেকেই এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের হৃদয়বৃত্তি—রসের গভীরতা—পরখ করিয়া লইতেছেন। 'ভারতী'র লেখক বলিয়াছেন,—'আর্টের বিচার করিতে হইলে প্রথমতঃ আর্টিষ্ট তাঁর চিতরকার কোন্ vision বা কোন্ রসভাব তাঁর কলাসৃষ্টিতে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন তাহা অনুসন্ধান করিতে হইবে।' শিল্পীর কলাসৃষ্টির রসভাবের সঙ্গে শিল্পীরও রসভাবের অনুসন্ধান করা ক্ষতির বিষয় হইলেও, দোষের বিষয় নহে। কলাসৃষ্টির রসভাবের অভাবের জন্য শিল্পীই দায়ী। যিনি স্বেচ্ছায় যে কোনও দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাহার জন্য তিনি হয় নিন্দা, নতুবা প্রশংসা পাইবেনই। প্রশংসা যদি এতই মুখরোচক হয়, তবে নিন্দাও মুখরোচক হওয়া উচিত। দ্বিতীয় পক্ষ যদি কোনও শিল্পীকে প্রশংসার জোরে 'ঋষি' করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন, তবে প্রথম পক্ষ সেই শিল্পীতে ঋষিত্বের 'ঋ' পর্য্যন্ত নাই, ইহা সপ্রমাণ করিয়া দিলে কদাচ নিন্দিত হইতে পারেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে 'ভারতী' এই এক বৎসরের মধ্যে কত চরম অভদ্রতা দেখাইয়াছেন, আলোচ্য সংখ্যায় 'সাহিত্যে গণ্ডগোল' প্রবন্ধেও অভদ্রতার আভাস দিয়াছেন, সেই 'ভারতী'ই আবার ভদ্রতার দাবী করেন। নবকুমারের লক্ষঝম্প আমাদের মনে আছে। ছুঁচো, চামচিকে, বাদুড়, সাহিত্য-কোটাল—এগুলা কোন্ ভদ্রসাহিত্যের উপযুক্ত? সেই জন্যই বলি, ভদ্রতার বিচার এখন থাকুক। আর্ট সম্বন্ধে লেখকের মূল বক্তব্য বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করা যাউক।

আর্টের সঙ্গে নীতির যোগ আছে, এ কথা অজিতকুমার বাবু স্বীকার করেন না। তিনি রসের স্ফূর্ত্তি লইয়াই 'আর্টের আদর্শ' গড়িতে চাহেন। ইহার উত্তরে আমরা বলিতে চাহি—কেবলমাত্র রসসৃষ্টির স্ফূর্ত্তির দিকে লক্ষ্য করিয়া বিচার করিলে আর্টকে হীন করা হয়। কারণ, জীবনসৃষ্টিই আর্টের কাজ। রসসৃষ্টি জীবনস্ফূর্ত্তির অন্তর্গত। জীবনই রসের আধার। শিল্পসৃষ্টি বিশ্বসৃষ্টির মত নব নব রূপে ব্যাখ্যাত হয়, হউক; কিন্তু সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির সংযতভাব শিল্পসৃষ্টির মধ্যেও থাকা আবশ্যক। বিশ্বের কুৎসিত ও নিষ্ঠুর দিকটাতেই সমগ্র বিশ্বকে চিনিতে পারা যায় না। শ্রেষ্ঠ আর্ট লেখকের অসংযম বা স্বেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দেয় না। স্বেচ্ছাচারমূলক আর্ট পদে পদে বিকৃত রসের সৃষ্টি করে। রসের দিক্ দিয়াই যদি আর্টের বিচার করিতে হয়, তবে যে গ্রন্থ শুধু বিষই দেয়, অমৃত দেয় না; অথবা অমৃতই দেয়, বিষ দেয় না, তাহা খণ্ড ও অপূর্ণ। এই খণ্ড ও অপূর্ণ রসে পূর্ণ সত্যের প্রচার হয় না। আর্ট যে সত্যের প্রচার করে, তাহা অখণ্ড

ও পূর্ণ। খণ্ডরসমদিরাপানে সাময়িক উত্তেজনায় কোনও লেখক যাহা দান করেন, তাহাতে রসভাবের প্রকাশ যতই সূক্ষ্ম ও গভীর হউক, তাহা শ্রেষ্ঠ শিল্পীর দান নহে। এই খণ্ড, অপূর্ণ ও বিকৃত রসের স্ফূর্ত্তি যে আর্টের সৃষ্টি করে, তাহা স্থায়ী হইবে না, এমন কথা বলা যায় না; কারণ, বিকৃতরুচিসম্পন্ন আর্ট-রসিকের অভাব কোনও দেশে কোনও কালেই হয় না।

দুঃখের বিষয়, নীতি লইয়া যে দেশের লোকের—পরিবারে ও সমাজে, রাষ্ট্রে ও সাহিত্যে—এতকালের সাধনা, আজ সেই দেশে—আমাদের এই বাঙ্গালায়—নিকৃষ্ট শ্রেণীর আর্ট-রসিকের সংখ্যা বাড়িতেছে। প্রমাণ—তাঁহাদের বিবিধ গল্প, বিবিধ উপন্যাস, বিবিধ কবিতা ও সঙ্গীত। এই শ্রেণীর আর্ট-রসিকের কল্পনাপটে কোন্ রসভাবের ছাপ সহজেই পড়ে, তাহা সহজেই অনুমেয়। ইঁহারা যে অঙ্কের রচনায় রসবোধ ও রসবিশ্লেষণের গন্ধ পর্য্যন্ত পান না, তাহার কারণ—ইঁহাদের ব্যক্তিগত রুচি, শ্লীলতা ও আর্টের আদর্শ সাধারণ বাঙ্গালী-জীবনের রুচি, শ্লীলতা ও আর্টের আদর্শের প্রতিকূল।

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সিন্ধু।

["পুরীতে সমুদ্রদর্শন"-দর্শনে।]

কাব্যগ্রন্থে পড়ি—তুমি হে বারিধি! অনন্ত উদগ্র মূর্ত্তি ধরি'
গর্জ্জিতেছ রাত্রিদিন অনিবার, রোষে ফুলি' আছাড়ি' আছাড়ি'!
কি সে রোষ নাহি জানি, এত দূরে ত্রাসে না সে গুপ্ত পরিচয়;
গ্রন্থ-গত শব্দে শুধু স্তব্ধ কর্ণে জাগে এক প্রচণ্ড বিস্ময়!
গর্জ্জ, গর্জ্জ,—রোষে, ক্ষোভে, অভিমানে, অপমানে, তীব্র তিরস্কারে,—
শুনি বুঝি যাত্রিমুখে, নিরন্তর তুচ্ছ কাব্যে কি লিখিছে নরে?

সৃষ্টির প্রথম দিবা, জাগি যবে প্রভাতের অরুণ কিরণে,
নিরখিল রক্তনেত্রে তোমার তরঙ্গ-পুষ্ট দুষ্ট বারি পানে,—
ঊর্দ্ধে উঠি', আরো ঊর্দ্ধে চাহিল সে যাত্রাপথে লঙ্ঘিতে তোমারে,
প্রাণান্ত নিষ্ফল চেষ্টা দিনান্তে ডুবিল তার তব ক্ষুব্ধ নীরে!
সেই এক দিন! আর সেই দিন হ'তে কত লক্ষ বর্ষ ধরি'
প্রতি প্রাতে চাহে দিশা,—সভয়ে, বিস্ময়ে, ক্ষোভে,—সেই কথা স্মরি'!

রাত্রি যবে বিস্তারিয়া বিশ্বব্যাপ্ত মসীলিপ্ত সুপ্তি-যবনিক',
—নক্ষত্রখচিতা কভু, চন্দ্রকরোজ্জ্বলা কভু, কভু রাকা-আঁকা—
তোমারে ঢাকিতে চাহে, তাহার প্রশান্ত গৃহে, লুকাতে তোমারে;
প্রভাতে ভাঙ্গে সে স্বপ্ন; ডুবে যায় গর্ব্ব তার তোমারি গহ্বরে!
রাত্রিদিন পরাজিত; লক্ষ বর্ষ পরাজিত; পরাজিত নহে কিন্তু নর,
অদ্যাপি সে থাকি' থাকি' বাক্যে চাহে ডুবাইতে তব রুদ্র স্বর!

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

নাসিক।

নাসিক বুরহাণপুর হইতে দূরত্বে ১৯৩ মাইল। পথের প্রাকৃতিক দৃশ্যের কথা বলিতে পারিব না। কারণ, বুরহাণপুর হইতে ট্রেণ ছাড়িবার একটু পরেই অন্ধকার হইয়া গেল। আর সে দিন কৃষ্ণপক্ষ। কাজেই সকলই অন্ধকারে ঢাকা ছিল। তবে এইটুকু বলিতে পারি যে, বন-পথের অনেক স্থানেই পাহাড় আছে।

ভোর ছয়টার সময় ট্রেণ নাসিক ষ্টেশনে পঁহুছিল। পূর্ব্বে ইহার নাম ছিল —নাসিক রোড। আমি ট্রেণ হইতে নামিয়া ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, সারি সারি টাঙ্গা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সজ্জিত রহিয়াছে। পাণ্ডারা ষ্টেশনে যাত্রী লইতে আসিয়া অনেককে ঘেরাও করিয়া ফেলিয়াছে। ষ্টেশন হইতে নাসিক সহরে টাঙ্গায় যাওয়া যায়। ভাড়া এক টাকা হইতে দেড় টাকা। আবার ট্রামগাড়ীও আছে—এ ট্রাম ঘোড়ায় টানে। ভাড়ার ঠিক নাই, যখন যেমন, তখন তেমন। কখনও এক আনা, কখনও দেড় আনা, কখনও বা দুই আনাও হইয়া থাকে। আরোহীর ভিড় অনুযায়ী ভাড়ারও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। আমি এক স্থানে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছি যে, দ্রব্যাদি লইয়া টাঙ্গায় যাই, কি ট্রামে যাই? ট্রামে যাওয়াই ত সুবিধা, ভাড়া যৎসামান্য, তবে কিছু কুলী খরচ লাগিবে। তাহা হইলেও টাঙ্গার চেয়ে ঢের সস্তা। দু' একটি পাণ্ডা দূর হইতে আমার পানে মিট-মিট তাকাইতেছে—আধা-সাহেবী পোষাক দেখিয়া, সন্দেহভরে সাহস করিয়া নিকটে আসিতে পারিতেছে না। আমি একটি পাণ্ডাকে নিকটে ডাকিয়া হিন্দু বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিবামাত্র অমনই মক্ষিকার ন্যায় পাণ্ডার দল আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল। কিন্তু আমি পূর্ব্বকথিত ব্যক্তিকেই পাণ্ডা মনোনীত করিয়াই তাহার সহিত ট্রামে আরোহণ-পূর্ব্বক নাসিক সহরের অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

পথটি বেশ মনোরম। কতক দূর রাস্তার উভয় পার্শ্বেই শীতলছায়াময় বটশ্রেণী! ষ্টেশনের অল্প দূরেই পথের বাম দিকে কতকগুলি সুদৃশ্য বাঙ্গলোর সমষ্টি। এগুলি স্বাস্থ্যনিবাস (Sanatorium); শুনিলাম, অল্প ব্যয়েই রোগীরা এই সকল বাঙ্গলোয় বাস করিতে পায়। প্রায় এক ঘণ্টার কিছু পরে আমরা সহরে পঁহুছিলাম। যেখানে ট্রাম থামিল, সেখান হইতে আমার পাণ্ডা বালকৃষ্ণ

মহাদেও খাণ্ডোয়ের বাটী কিছু দূরে। একটি কুলীর মস্তকে ট্রাঙ্কটার চাপাইয়া তাহার বাটীতে উপনীত হইলাম। নাসিকের যে মহল্লায় বালকৃষ্ণের বাটী, তাহার নাম সোমবারিপেট।

২৪শে জানুয়ারী, ১৯১৪।—বালকৃষ্ণ মহাদেবের বাটী ত্রিতল। কাষ্ঠ-নির্ম্মিত। একতল ও দ্বিতলের ছাদ কাষ্ঠ ও মৃত্তিকায় গঠিত। সর্ব্বোপরি ত্রিতলের ছাদ খপ্পরাচ্ছাদিত। নাসিকের সকল বসতবাটীই প্রায় এইরূপ। কাষ্ঠনির্ম্মিত গবাক্ষে ও বারান্দায় কারুকার্য্যও আছে। তবে আধুনিক ফ্যাশানের সুরম্য হর্ম্ম্যও নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু সংখ্যায় অল্প।

রাস্তার ধারেই (এখানে রাস্তা অতি অল্প-পরিসর, গলি বলাও চলে) দ্বিতল কক্ষটি আমার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। আর কেহ যাত্রী ছিল না। আমি যে কয়দিন নাসিকে ছিলাম, একাই একটি কক্ষে বাস করিয়াছিলাম।

কিয়ৎকাল বিশ্রামান্তে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন জলযোগ করিয়া আমি পাণ্ডার ভ্রাতুষ্পুত্র—একটি কিশোরবয়স্ক বালককে সঙ্গে লইয়া গোদাবরীতীরে উপনীত হইলাম। গোদাবরী নদী এই অঞ্চলে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে; কিন্তু প্রায় এক মাইল দীর্ঘ নাসিক সহরের সম্মুখভাগে অপূর্ব্ব কৌশলে বড় বড় প্রস্তরনির্ম্মিত বিরাট চতুষ্কোণ কুণ্ডসমূহ (basin) নির্ম্মাণ করিয়া যেরূপ ভাবে জলপূর্ণ করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা দেখিলে তরঙ্গায়িত নদী বলিয়াই বোধ হয়। স্নানের নিমিত্ত প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলী জলগর্ভে নামিয়াছে। নদীর পরপারে যাইবার নিমিত্ত প্রস্তরনির্ম্মিত কুণ্ডের আলগুলিই পাদপথ (cause-way); তাহার উপর দিয়াও জল চলিতেছে। হিন্দুমাত্রই পাদুকা উন্মোচন করিয়া তাহার উপর দিয়া যাতায়াত করিতেছেন। গোদাবরীর উভয় কূলেই মন্দির-সৌধ-সমন্বিতা নয়ন-রঞ্জিনী নাসিক নগরী। মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণমহিলাসমূহ গোদাবরীতটে ফটাফট্ শব্দে আকাশ ফাটাইয়া বস্ত্র আছড়াইতেছেন; তাঁহাদের বস্ত্রাদি বিধৌত করিবার স্থানই গোদাবরী। সাধারণ স্ত্রীলোকেরা অনেকে বড় বড় পিত্তল ও তাম্র-নির্ম্মিত বিচিত্র গঠনের কুম্ভপূর্ণ গোদাবরী-বারি কাঁখে ও মস্তকে লইয়া গৃহে গমন করিতেছে। অনেকে স্নান করিতেছে; গোদাবরীর উভয় তটের দৃশ্য অতি অপূর্ব্ব! উভয় তটই জনকোলাহলময়; লোকে লোকারণ্য। দক্ষিণবাহিনী গোদাবরী স্বচ্ছন্দিগ্ধপ্রবাহে, ধীর-মন্থরগতিতে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিতা। পশ্চিম তটে তরিতরকারী, ফল মূল ও বিবিধ প্রকার শাকসব্জীর বাজার বসিয়াছে। এমন সুন্দর ফল, তরকারী ও শাক

পশ্চিম-ভারতেই দৃষ্ট হয়। পূর্ব্ব তটে বস্ত্রনির্ম্মিত মণ্ডপসমূহের ভিতর তাম্র ও পিত্তল-নির্ম্মিত রন্ধনের তৈজসপত্র, গেলাস, ঘটী, বাটী, থালা প্রভৃতি ও নানা প্রকারের পিত্তল-নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি, পশুপক্ষীর মূর্ত্তি, এবং বহুবিধ গঠনের তাম্র ও পিত্তলের মিশ্রণে (গঙ্গা-যমুনা) গেলাস, ঘটী, পুত্তলিকা ও শিল্প প্রভৃতি অত্যন্ত সুন্দর। তাম্র ও পিত্তলের এরূপ কারুকার্য্যময় দ্রব্যাদি পশ্চিম-ভারতে আর কোথাও নাই। অন্যান্য বস্ত্রমণ্ডপে আহারের স্থান; তদ্দেশীয় নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইতেছে। চায়ের দোকান; টেবিলের উপর অসংখ্য চায়ের পেয়ালা প্রভৃতি সজ্জিত রহিয়াছে। কত রকমের হালুয়া, কত প্রকার মিষ্টান্ন, কত রকমের সরবত যে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত হইতেছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। মহারাষ্ট্রদিগের আহারের দোকানে কত প্রকার ভাজি প্রস্তুত হইতেছে। বড় বড় থালায় সে সব সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। কড়ি তৈয়ারি হইতেছে। কড়ির কথা পরে লিখিব।

এইবার আমরা গোদাবরীর পশ্চিম তটের (অর্থাৎ যে তীরে বাজার বসে) মন্দিরসমূহ ও দ্রষ্টব্যস্থান দেখিতে আরম্ভ করিলাম। প্রথমেই কপালেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া মহাদেব-দর্শন করিলাম। এখানকার দেবমন্দিরগুলি প্রায় সমস্তই কালো পাথরে নির্ম্মিত ও বিচিত্র-দর্শন। কতকটা দক্ষিণ-ভারতের ও বারাণসীর মন্দিরের আদর্শে গঠিত। মন্দিরগুলি উচ্চবেদিকার উপর প্রতিষ্ঠিত। উঠিবার সিঁড়ি আছে; প্রথমেই জগমোহন বা দেবতা-দর্শনের বারান্দা; তার পরেই মন্দির। কপালেশ্বর দর্শন করিয়া, কালারামের অর্থাৎ, শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির দেখিতে গেলাম। ইহাই নাসিকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্দির। ইহার সবই কালো,—আগাগোড়া সবই কৃষ্ণপ্রস্তরের দ্বারা রচিত। প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকস্থ স্তম্ভমালা—বারান্দা, নাটমন্দির, দেবমন্দির, সোপানাবলী, এমন কি, মন্দির-মধ্যে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের মূর্ত্তিত্রয়—সবই কালো পাথরের। এই মন্দির হইতে অল্প দূরে সীতাগুম্ফা। এবং নিকটেই পঞ্চবটী। পঞ্চবটী পঞ্চবটে শোভিত; অর্থাৎ, পাঁচটি সুদীর্ঘ বটতরুবেষ্টিত একটি ছায়াশীতল স্থানের নাম পঞ্চবটী। পূর্ব্বকালের সেই সুরম্য কাননশোভা এখানে নাই। মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের সেই অপূর্ব্ব বর্ণনাসমূহ মনে পড়িল।—

"ছিনু মোরা, সুলোচনে। গোদাবরী-তীরে, বাঁধি নীড়, থাকে সুখে; ছিনু ঘোর বনে,
কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে নাম পঞ্চবটী, মর্ত্ত্যে সুর-বন সম।

* * * *
ফুটীরের চারি দিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে ?
পঞ্চবটী-বন-চর মধু নিরবধি।
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে
পিকরাজ। কোন্ রাগী, কহ, শশিমুখি,

হেন চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক-গীতে
খোলে আঁখি ? * *
* * * *
পঞ্চবটী বনে মোরা গোদাবরীতটে
ছিনু সুখে। হায়, সখি, কেমনে বর্ণিবে
সে কান্তার-কান্তি আমি ?"

হায়, মহাকালের প্রভাবে সেই প্রাকৃতিক-স্বর্গ—নিবিড়পাদপসমাচ্ছন্ন পঞ্চবটী ভূ-পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গিয়াছে। কেবল নাম ও স্মৃতি আছে—'পঞ্চবটী।' পাঠক, অনেক ভ্রমণকারীই কবি-বর্ণিত পঞ্চবটীর বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু যদি কখনও তাঁহারা এ স্থান দেখিতে আসেন, তাহা হইলে বাস্তব, কল্পনা ও অতিরঞ্জিত বর্ণনার প্রভেদ বুঝিতে পারিবেন। ভ্রমণকাহিনী যে কাব্য নহে, লিখিবার সময়ে অনেকে এ কথা ভুলিয়া যান।

তৎপরে সীতাগুম্ফা দেখিলাম। একটি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত বাটীর অভ্যন্তরে একটি কক্ষের নিম্নতলে সুড়ঙ্গ-পথ প্রস্তুত করিয়া গুহা প্রস্তুত করা হইয়াছে। একটি অতি সঙ্কীর্ণ সোপান দ্বারা ভূ-গর্ভস্থ গৃহে অবতরণ করিতে হয়। গুহাভ্যন্তরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। পাষাণগাত্রে ক্ষোদিত সীতাদেবীকে অনেকে ফলজলপুষ্পে পূজা করিতেছে,—পয়সা দিয়া প্রণাম করিতেছে। আমিও যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া মহাদেবীর চরণতলে মস্তক লুণ্ঠিত করিলাম। একটি বিষয় চিন্তা করিয়া আমার আপাদ-মস্তক রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল! পরমসাধ্বী জননী সীতাদেবীর মহিমা এমনই যে, ভারতের ধনকুবের হইতে সামান্য ভিক্ষুক অবধি জননীজ্ঞানে তাঁহাকে ভক্তি-অর্ঘ্যে চিরদিন পূজা করিতেছে!

এতদ্ভিন্ন রামকুণ্ড ও আরও কয়েকটি মন্দিরে দেব-দর্শন করিয়া বাসায় প্রত্যাগমনকালে একটি দেবীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলাম। এত বড় প্রকাণ্ড মস্তক ইতিপূর্ব্বে আর দেখি নাই। এই প্রথম দেখিলাম। বেলা সাড়ে এগারটার সময় বাসায় প্রত্যাগত হইয়া স্নানাদি সমাপন করিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইলাম। মহারাষ্ট্র-পরিবারে এই আমার প্রথম আহার। তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, অনেকের নিকট নূতন না হইলেও, সম্ভবতঃ অপ্রীতিকর বোধ হইবে না।

পাণ্ডা মহাশয়ের পরিবারবর্গের মধ্যে তাঁহার ভ্রাতা, তিনটি ভ্রাতুষ্পুত্র, একটি বিধবা ভগ্নী ও তিনটি কিশোরী ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ। তিনি নিজে বিপত্নীক। ভগ্নী রন্ধনকার্য্য করেন; বধূ তিনটি তাঁহাকে রীতিমত সাহায্য করে।

আশ্চর্য্য! ইহাঁদের অণুমাত্র আলস্য নাই। আমি যখনই দেখিয়াছি, তাঁহারা কোনও না কোনও গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা আছেন। আমার বিবেচনায় মহারাষ্ট্র-মহিলাদিগের ন্যায় শ্রমপটু মহিলা ভারতে আর নাই।

বাটীতে স্নানের সময় একটি ভৃত্য বাল্‌তি করিয়া গরম জল, ঘটী প্রভৃতি দিয়া যায়। যদি কোনও সময়ে ভৃত্য অনুপস্থিত থাকে, তাহা হইলে মহিলারাও সে কার্য্যে সহায়তা করেন। কোনও দ্রব্য আবশ্যক হইলে, মহিলাদিগকে বলিলে, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহা আনিয়া দেন। তাঁহারা অতিথিসেবায় চির-তৎপর।

ভোজনের নিমিত্ত আমাকে থালা দেওয়া হইল; (আবার সময়ে সময়ে শালপাতাও দেওয়া হইয়াছিল) একটি ঘটীতে পানের জন্য জল রাখা হইল। আমি ভোজনে উপবেশন করিলে একটি কিশোরী বধূ অন্ন আনিয়া (একটি হাতার মাপে) দিয়া গেল। তাহা অতি অল্প। তৎক্ষণাৎ আর একটি বধূ আসিয়া তুপ অর্থাৎ গরম ঘৃত সেই অন্নের উপর ঢালিয়া দিল। পূর্ব্বোক্ত বধূ তৎপরে দাল, নিরামিষ ব্যঞ্জন, এবং দুই প্রকার ভাজি পর পর দিয়া গেল। আমি ভোজনে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু সেই বধূদ্বয় পাকশালার দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া আমার ভোজনকার্য্য দেখিতেছে। সামান্য ভাত দিয়াছিল, শীঘ্রই ফুরাইয়া গেল। কি বলিয়া চাহিব, কারণ, তাহাদের ভাষা অবগত নহি। কিন্তু এ দিকে চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে সেই প্রথমা বধূ সেই হাতায় অন্নপূর্ণার ন্যায় অন্ন দিয়া গেল। আর তাহার পশ্চাতেই দ্বিতীয়া বধূ চকিতের ন্যায় ঘৃত ঢালিয়া দিল। কোনও দ্রব্য চাহিবার আবশ্যক নাই। যতবার ফুরাইবে, ততবার দিবে। সে বিষয়ে তাহাদের তীব্র লক্ষ্য। অন্ন ফুরাইলে অন্ন, ব্যঞ্জন ফুরাইলে ব্যঞ্জন, দাল ফুরাইলে দাল ক্রমাগতই দিতে লাগিল। ইহাতে তাহাদের আদৌ শ্রান্তি নাই। আমি দেখিয়া বাস্তবিকই বিস্মিত হইলাম। আবার দেখি, রুটী লইয়া আসিয়াছে। এক একখানি গোল বড় রুটী চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া দুই অংশ দিয়া গেল। তৎসঙ্গে দুগ্ধ, মিষ্টান্ন আসিল। রুটী ফুরাইলে আবার রুটীখণ্ড লইয়া আসে। আমি হস্ত দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া নিষেধ করিলে তবে ক্ষান্ত হয়। কিন্তু তাহাদের ভাষায় বলিতে হইলে 'নাফু' 'নাফু' বলিতে হয়। আমি ঐ কথাটি শিখিয়া লইয়া পরবর্ত্তী আহারের সময়, তাহারা রুটী দিতে আসিলে, যেমন 'নাফু' 'নাফু' বলিলাম, অমনি বিদেশীয়ের মুখে দেশীয় বুলি শুনিয়া তাহারা মৃদুমধুর হাসিতে লাগিল।

নাসিকের ব্রাহ্মণেরা কেহই মৎস্যমাংসভোজী নহেন। তাঁহাদের প্রায় সকলেরই পুরোহিত-বৃত্তি; ধর্ম্মকার্য্য করিয়াই তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এখানে প্রায় বেড় হাজার ব্রাহ্মণ-পুরোহিত সপরিবারে বাস করেন। ইহাদের মধ্যে পলাণ্ডুর ব্যবহার নাই, কিন্তু রশুনের চাটনীর ব্যবহার আছে। আমি পাণ্ডার গৃহে একদিন রাত্রে রশুনের চাটনী খাইয়া সমস্ত রাত্রি ঘুমাইতে পারি নাই; তবুও শীতকাল।

মহারাষ্ট্রদিগের নানাবিধ খাদ্যদ্রব্যাদি আছে। সকলগুলির নির্দ্দেশ সম্ভবপর নহে। আর আমার ভাগ্যে সকল প্রকার খাদ্যের আস্বাদলাভের সুবিধাও ঘটে নাই। তবে তাঁহাদের খাদ্যবস্তুর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহারা ঝাল ভালবাসেন। অনেক তরকারী ও ভাজি লঙ্কাসহযোগে প্রস্তুত হয়। আমিষ বিবিধ প্রকারের থাকিলেও, তাহাতে ধনেশাকের প্রচলন অত্যধিক। ধনেশাকে যে কেবলই আচার প্রস্তুত হয়, এমন নহে, অনেক তরকারী ও ভাজিতেও ধনেশাক ব্যবহৃত হয়। বাস্তবিক, ধনেশাক যেন পশ্চিম-ভারতে রাজত্ব করিতেছে। আমিও সে প্রদেশে বহুদিন ভ্রমণ করায় ধনেশাক-প্রিয় হইয়াছি। এখনও বঙ্গদেশে বাজারে গেলে অগ্রেই উহার অনুসন্ধান করিয়া থাকি। 'কড়ি' একটি বৈচিত্র্যময় খাদ্য। ইহা বেসম গুলিয়া, ধনেশাক প্রভৃতি দিয়া প্রস্তুত হয়। আস্বাদ লবণাক্ত, অভ্যাসে মন্দ লাগে না। তিন্তিড়ী, লঙ্কা ও ধনেশাক দিয়া তরকারী প্রস্তুত হয়। গোধূম, জওয়ারা ও বাজরা প্রভৃতি শস্যের রুটী আস্বাদ হয়। দধি দুগ্ধের বিবিধ প্রকারের খাদ্য, মিষ্টান্ন ও হালুয়া খাইয়াছি। সকল খাদ্যদ্রব্যই মুখরোচক ও উপাদেয়; তবে কতকগুলি বাঙ্গালীর রসনার প্রিয় না হইতে পারে।

আমি আহারান্তে কিয়ৎ কাল বিশ্রামের পর একটি টাঙ্গা আনাইয়া পাণ্ডুলেনা নামক পর্ব্বতে ক্ষোদিত দেবালয়সমূহ দেখিতে যাত্রা করিলাম। এই পাহাড়-শ্রেণী বোম্বাই-এর পথপ্রান্তে অবস্থিত। নাসিক সহর হইতে দূরত্ব তিন ক্রোশ। আমি পাণ্ডার এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে লইয়া টাঙ্গাযোগে পাণ্ডুলেনা গুহাবলী দেখিতে চলিলাম। আমি ইতিপূর্ব্বে উল্লেখযোগ্য পাহাড়-ক্ষোদিত গুহা-মন্দির (Cave Temples) কখনও দেখি নাই। বিহারের রাজগৃহ বাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা গণনার যোগ্যই নহে। বেলা প্রায় তিনটার সময় পাহাড়-তলে উপনীত হইয়া পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। পাহাড়ের উচ্চতা দুই তিন শত ফিটের অধিক নহে; কারণ, অধিরোহণে বিশেষ শ্রান্তি অনুভব করি

নাই। এই গিরি-অঙ্গে সারি সারি ২৪টি পর্ব্বত-খোদিত গুহামন্দির আছে। আমি প্রত্যেকটিই ভাল করিয়া দেখিয়াছি। তাহাদের বিস্তৃত বর্ণনা সম্ভবপর নহে, এবং অনেকগুলি একই ধরণের; সুতরাং তাহাদের স্বতন্ত্র বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। আমি অল্পে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গুহার উল্লেখ করিব। একটি গুহার অভ্যন্তরে ৪০ ফিট দীর্ঘ ও ২৫ ফিট প্রস্থ জলাধার আছে। ইহার নাম সীতা-সরোবর। একটিতে গৌতম, কীচক ও বিরাটের মূর্ত্তি রহিয়াছে। একটি গুহার সম্মুখভাগে কারুকার্য্যময়, সুদৃশ্য-স্তম্ভ-সমন্বিত অলিন্দ; স্তম্ভশীর্ষ অতীব মনোহর; সিংহ, ব্যাঘ্র, ষণ্ড ও অপর একটি জন্তুর মূর্ত্তির দ্বারা অলঙ্কৃত; অভ্যন্তরে ৪০×৪০ ফিট হল; চারি দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষসংবলিত দালান। কোনটিতে হস্তিমূর্ত্তি, কোনটিতে হনুমান, কোনটিতে শিলালিপি, কোনটিতে গাভী, ব্যাঘ্র ও হস্তী। তাহার পরে আবার একটি প্রকাণ্ড হল (৪৫×৪৫) ইহার স্তম্ভগুলি নানা জন্তুর মূর্ত্তির কারুকার্য্যে শোভিত—তলদেশ বড় বড় কুম্ভসদৃশ জলপাত্রের ন্যায়। কতকগুলি গুহায় বুদ্ধমূর্ত্তি বিরাজিত। একটিতে ইন্দ্রসভা, ইহা একটি গুহার উপরে। অপর একটি গুহায় ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাদিগের মূর্ত্তি-সমন্বিত সভা। একটি অর্দ্ধাকৃতি সুদৃশ্য শিল্পযুক্ত স্তম্ভশোভিত গুহায় মহাদেব অবস্থান করিতেছেন। একটি গুহার অভ্যন্তর ঠিক গির্জ্জার মত। ভিতরের সমস্ত স্তম্ভের তলদেশ কুম্ভাকৃতি—বড়ই সুন্দর বাহ্যদৃশ্য! ছাদ গোল, অর্দ্ধ-অণ্ডাকৃতি (oval); এতদ্ভিন্ন নানা গুহায় নানা পৌরাণিক মূর্ত্তি ও বুদ্ধমূর্ত্তি বিরাজিত। একটীতে দ্রৌপদী—দুই পার্শ্বে ভীমার্জ্জুন, দ্বারদেশে গদা ও ধনু অবস্থিত। এই অসংখ্য বুদ্ধমূর্ত্তি ও নানা প্রকার উৎকীর্ণ মূর্ত্তি-শোভিত গুহাবলী দর্শন করিয়া আমরা পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রসভা নামক গুহার সম্মুখভাগে উপবেশন করিয়া বিরাম উপভোগ করিতে লাগিলাম। স্নিগ্ধসমীর আমার ঘর্ম্মাক্ত ললাটদেশ স্পর্শ করিতে লাগিল। বড়ই তৃপ্তি ভোগ করিলাম। তখন অপরাহ্ণ ঢলিয়া পড়িয়াছে—'অস্তগামী ভানুপ্রভা' ধীরে ধীরে বিলীন হইয়া আসিতেছিল। ইন্দ্রসভা হইতে নিম্নস্থ বাসিক প্রদেশ, একটি বিশাল তৃণ-তরু-লতা-বর্জ্জিত পীতমরুখণ্ডবৎ প্রতীয়মান হইতেছে—মধ্যে মধ্যে শ্যামল বৃক্ষগুলি সেন হরিদ্রা বর্ণের বস্ত্রের উপর হরিৎ মুক্তার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। আমার মনে হইল, এই নির্জ্জলা ভূমি সুফলা হইল কিরূপে? এত তরিতরকারী, ফল, পুষ্প কিরূপে উৎপন্ন হয়? বাসিকের মৃত্তিকা কি রসময়ী?—যাহা হউক, গিরিশিখরে আর অধিক বিলম্ব করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া, অবতরণ করিতে লাগিলাম।

২৮শে জানুয়ারী, রবিবার, ১৯১৪।—প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া গোদাবরীর পরপারে, অর্থাৎ, পশ্চিম তটে তপোবন-দর্শনে যাত্রা করিলাম। সঙ্গে সেই পথপ্রদর্শক কিশোর বালক। নদীর পশ্চিম তট হইতে তপোবন দুই মাইলের কিছু অধিক; তপোবন দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে গোদাবরীতটেই অবস্থিত। প্রবাদ,—সেইখানেই রামানুজ লক্ষ্মণ রাবণভগ্নী শূর্পনখার নাসিকা কর্ত্তন করেন। রাত্রির সুশান্ত নিদ্রায় শরীর বেশ সচ্ছন্দ—মনও স্ফূর্ত্তিযুক্ত। পথপ্রদর্শকের সহিত নানা কথা কহিতে কহিতে, পথ-চিত্র দেখিতে দেখিতে, পদব্রজে চলিয়াছি। গ্রাম্যপথ—চলিতে চলিতে বিস্তর ফণীমনসা ও তেকাটাশিরের গাছ পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। পথিমধ্যে এক স্থানে মারুতি-নন্দনের মন্দির দেখিলাম। মন্দিরমধ্যে প্রকাণ্ড হনুমানজীর মূর্ত্তি। মধ্যে মধ্যে এক একটি তেকাটাশির কিংবা ফণীমনসার বৃক্ষের নিকট প্রস্তর-নির্ম্মিত সুদীর্ঘ সর্পমূর্ত্তি ফণা বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান। দেখিয়া বোধ হইল, এ দেশে নাগপূজাও প্রচলিত। পথের দৃশ্য কোথাও মনোরম না হইলেও অসহনীয় নহে। পথ অতিক্রম করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে রাম-সীতার মন্দির, সন্ন্যাসীদিগের ধর্ম্মশালা, ছোট ছোট মন্দির ও মঠ, বেদিকা প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। একটি বড় ধর্ম্মশালার পশ্চাদ্ভাগে একটি উদ্যানমধ্যে দ্রাক্ষাকুঞ্জ দেখিলাম। গাছগুলি বেশ শ্রেণীবদ্ধভাবে সন্নিবিষ্ট। প্রত্যেক দ্রাক্ষালতায় গুচ্ছ গুচ্ছ হরিতমুক্তানিভ দ্রাক্ষাফল ঝুলিতেছে। বৃক্ষগুলি উচ্চতায় অধিক নহে; দাঁড়াইয়া ফল পাড়া যায়। দুই চারিটি দ্রাক্ষাফল পাড়িবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না; ফল এখনও পাকে নাই, আস্বাদনে বেশ অম্লরস অনুভূত হইল। তখন 'Grapes are sour' মনে পড়িল। ক্রমে গোদাবরীতটে উপনীত হইয়া দেখি, নদীবক্ষ রুক্ষ-পাষাণময়; নদীগর্ভস্থ অনুচ্চ পাষাণবুক হইতে প্রপাতের ন্যায় জলধারা পতিত হইতেছে। এখানেও বাইদিগের পাষাণের উপর বস্ত্র ধৌতকরণের পট্‌াপট্ চট্‌চট্ শব্দ দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিতেছে! এই স্থানের নদীতীরের বনশোভা প্রীতিপ্রদ। এখানেও নদীগর্ভে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুণ্ড আছে। নদীগর্ভস্থ পাষাণস্তূপের মধ্যে একটি কুণ্ডের নিকট রাম-সীতার মূর্ত্তি ও অপর একটি কুণ্ডের নিকট কপিল মুনি ও কপিলা গাভীর মূর্ত্তি, এবং অদূরে একটি শিবলিঙ্গ ও বৃষভমূর্ত্তি রহিয়াছে। এখানে প্রস্তরে উৎকীর্ণ লক্ষ্মণ, রাক্ষসী শূর্পনখার নাসিকা ছেদন করিতেছেন। অনুরে

পূজা দিতেছে; কেহ বা পয়সা দিতেছে। মূর্ত্তিগুলি অনাবৃত নদীবক্ষে বিরাজিত। বর্ষাকালে সমস্তই জলমধ্যে নিমজ্জিত হইয়া যায়। স্থানীয় সাধারণ লোকেরা বলে যে, সূর্পনখার নাসিকা হইতেই শ্রীরামচন্দ্রের চিরস্মৃতিময় মহা-তীর্থের নাম 'নাসিক' হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, নয়টি পর্ব্বতের উপর নগরী প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহার নাম নাসিক। নাসিকই পশ্চিম-ভারতের বারাণসী; গোদাবরীই এ দেশে গৌতমীগঙ্গা বলিয়াই পূজিতা। এ দেশে গঙ্গা অপেক্ষাও গোদাবরীর মাহাত্ম্য অধিক। আমি তপোবনেই স্নানাদি শেষ করিয়া বেলা ১১টার সময় বাসায় প্রত্যাগত হইলাম।

অপরাহ্ণে নগরদর্শনে বহির্গত হইলাম। নগরীর অধিকাংশ পথই অপ্রশস্ত, গলির মত। দুই চারিটি চওড়া রাস্তাও আছে। রাস্তার উভয় পার্শ্বে নানাবিধ পিত্তল ও তাম্রনির্ম্মিত দ্রব্যের উজ্জ্বল বিপণী শ্রেণী—ঘড়ীর দোকানও বিস্তর। চা, লেমনেড, সরবতের দোকান হইয়াছে। নগরীমধ্যে একটি নাট্যশালা আছে। প্রত্যহ রাত্রেই অভিনয় হয়। ইতরসাধারণ দোকানদার, ফেরীওয়ালা, টাঙ্গাচালক, ট্রাম-কনডাক্টার প্রভৃতি সকলেই নাটক দেখিতে যায়। শুনিলাম, ইহারাও চা, লেমনেড ও সিগারেটের শ্রাদ্ধে বিলক্ষণ পটু হইয়াছে। সহরের স্থানে স্থানে রক্তবর্ণ মৃত্তিকায় নির্ম্মিত দশভুজা দুর্গার মূর্ত্তি দেখিলাম। গণেশের মূর্ত্তিতে নাসিক পরিব্যাপ্ত। কালভৈরবও আছেন।

ক্রমে গোদাবরীতীরে উপনীত হইলাম। নদীতট প্রভাতের ন্যায় তেমনই জনপূর্ণ—কোলাহলময়। নদীতটে অনেক প্রস্তর-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাধি দেখিলাম। প্রত্যেক সমাধির উপরে দুইটি করিয়া চরণ-চিহ্ন ক্ষোদিত রহিয়াছে। কর্পূরথালার মহারাজের স্মৃতিস্তম্ভ নদীতটে অবস্থিত। ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার স্মৃতি-কাহিনী স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ। স্তম্ভের চারি দিকে চারিটি সিংহের মুণ্ড সংলগ্ন।

নগরীপ্রান্তে সোণারালী নামক সমুচ্চ মৃত্তিকাস্তূপের উপর হইতে নাসিক নগরীর চতুঃপার্শ্বস্থ দৃশ্য অবলোকন করিলাম। দৃশ্য বড়ই বিচিত্র। অস্তাচল-চূড়াবলম্বী সূর্য্য-করে দূরস্থিত ভগ্ন দুর্গকিরীট, নগ্ন গিরিরাজি, নদী, তরু, প্রান্তর ও নগরীশোভা বড়ই মনোহারিণী। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে দীপ-মালিনী গোদাবরীর তীর পরিক্রমণ করিয়া বাসায় ফিরিলাম।

২৬শে জানুয়ারী, সোমবার, ১৯১৪।—অদ্য প্রভাতে পুণ্য-গোদাবরীর হিম-স্নিগ্ধ নীরে অবগাহন করিয়া, রামকুণ্ডের উপকূলে বসিয়া আমার স্বর্গগত পিতৃদেবের শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিলাম।

বেলা চারিটার পূর্ব্বে আমার পাণ্ডাপ্রবর ব্যস্ত হইয়া আসিয়া বলিলেন, 'এতক্ষণ শয়ন করিয়া করিতেছেন কি? শীঘ্র উঠুন, সত্বর গোদাবরী-তীরে গিয়া রামকুণ্ডের নীরে কপালেশ্বর মহাদেওজীর স্নানদৃশ্য দর্শন করুন। বিলম্ব করিবেন না, শীঘ্র যান।' আমি বলিলাম, 'সে কিরূপ?' পাণ্ডা বলিলেন, 'বলিবার সময় নাই, গিয়া দেখুন, সে অপূর্ব্ব ব্যাপার!' আমি আর কোনও উত্তর না করিয়া, ধড়মড় করিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলাম; তাড়াতাড়ি অলষ্টারটা টানিয়া স্কন্ধে ফেলিয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে দ্রুতপাদবিক্ষেপে গোদাবরীর রামকুণ্ডের নিকটে উপস্থিত হইলাম। গিয়া দেখি—অপূর্ব্ব কাণ্ড! কুণ্ডের চারি দিকে লোকে লোকারণ্য! বালক বালিকা, যুবক যুবতী, প্রৌঢ় প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, নানা শ্রেণীর নরনারী রামকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে গিস্-গিস্ করিতেছে! বহু কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া কুণ্ডতীরে একটু সুবিধাজনক স্থানে (অর্থাৎ যে স্থান হইতে সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায়) গিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম, মন্দির হইতে বিবিধ বাদ্যভাণ্ড সহকারে দেবাদিদেব মহাদেব কপালেশ্বর সজ্জিত শিবিকায় মহাসমারোহে রামকুণ্ডের উত্তর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাঠক, মনে করিবেন না যে, পাল্‌কীতে শিবলিঙ্গ আসিলেন; শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে সকল দেশেই একই ব্যবস্থা; 'শিবলিঙ্গং ন চালয়েৎ।' তবে আসিলেন কে? আসিলেন, তাঁহার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, অধরোষ্ঠ-সংবলিত, সর্পজটা-বিভূষিত, রৌপ্যনির্ম্মিত, অনিন্দ্যসুন্দর ফাঁপা মস্তক; সন্ধ্যার সময় মহাদেবের শৃঙ্গার-বেশের সময় এই রৌপ্যনির্ম্মিত মস্তক শিবলিঙ্গের উপর বসাইয়া দিয়া, নানা পুষ্পালঙ্কারে আভরণে অপূর্ব্ব সজ্জায় সজ্জিত করা হয়।

পুরোহিত কুণ্ডতীরে বসিয়াছিলেন। দেবাদিদেবের পাল্‌কী উপস্থিত হইবামাত্র তিনি তাঁহাকে অবতরণ করাইয়া একটি সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। তূরী, ভেরী, শৃঙ্গ, দামামা, বাঁশী প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যধ্বনি বন্ধ হইতে লাগিল। তৎপরে পুরোহিত মহাশয় শিবের মস্তকে, দুগ্ধ, জল, চন্দন প্রভৃতি নানা সৌগন্ধসম্ভার ঢালিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরেই তিনি ঐ শিব-মস্তক রামকুণ্ডের নীরে ভাসাইয়া দিলেন। মস্তক জলে ভাসিতে ভাসিতে চলিল। উপস্থিত জনসঙ্ঘের উল্লাস দেখে কে? আবালবৃদ্ধবনিতা দুই হস্তে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া, কুণ্ড হইতে জল তুলিয়া মহাদেবের মস্তক লক্ষ্য করিয়া সজোরে কুণ্ডের জলে ছিটাইতে লাগিল। তাহাদের উল্লাস-ধ্বনি গগন

কম্পিত করিয়া তুলিল। শিবমস্তক যতই ভাসিয়া অগ্রসর হয়, সমাহিত নর-নারীবৃন্দ ততই মহোল্লাসে অঞ্জলিসঞ্চিত জল ছুঁড়িতে থাকে। কতকগুলি ব্রাহ্মণ জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া শিবমস্তকের সঙ্গে সঙ্গে সন্তরণ করিতে লাগিল। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে শিবমস্তক সলিল হইতে উত্তোলিত হইল। পুরোহিত পুনর্ব্বার সেই মস্তক মাল্যচন্দনে ও নানা পুষ্পস্তূপে সুসজ্জিত করিয়া, প্রজ্বলিত দীপদামে আরতি আরম্ভ করিলেন। তৎপরে মহাদেব পাল্‌কী আরোহণে, বাদ্যধ্বনি ও জনমণ্ডলীর উচ্চ জয়ধ্বনি সহকারে, মন্দিরে প্রত্যাগমন করিলেন। বস্তুতঃই কপালেশ্বর মহাদেবের স্নান-দৃশ্য অপূর্ব্ব! পাণ্ডা মহাশয় আমাকে না জানাইলে, আমার ভাগ্যে দর্শন ঘটিত না।

কপালেশ্বর মহাদেবের মন্দির ছয় শত বৎসরের পুরাতন। নাসিকের ইহাই প্রাচীনতম মন্দির। পঞ্চাশটি সোপান ভাঙ্গিয়া মন্দিরে উঠিতে হয়। সুন্দরনারায়ণের মন্দির অতি সুন্দর। এতদ্ভিন্ন নারোশঙ্কর, তিলভাণ্ডেশ্বর, ত্রিপুরেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, শঙ্কর, গোরারাম, মুরলীধর ও বালাজীর মন্দিরসমূহও উল্লেখযোগ্য। এখানে অহল্যাবাই-এর নির্ম্মিত তিনটি দেবমন্দির আছে। কাশীর ন্যায় অসংখ্যমন্দিরময়ী ও ঘাটশ্রেণীমেখলা নগরী না হইলেও নাসিক অতীব মনোরম, শান্তরসাস্পদ ও তৃপ্তিপ্রদ উজ্জ্বল নগরী। এখানকার জলবায়ু বিশেষ স্বাস্থ্যকর। এ অঞ্চলের অনেকেই জলবায়ুপরিবর্ত্তনের নিমিত্ত নাসিকে বাস করেন। অসংখ্য যাত্রী ও সাধু সন্ন্যাসী প্রতিদিন যাতায়াত করিতেছেন। গোদাবরীতীরে তাঁহাদের নিমিত্ত সুদৃশ্য ধর্ম্মশালাসমূহ নির্ম্মিত হইয়াছে। কার্ত্তিক মাসে মহামেলা হয়। তখন এখানে প্রায় পাঁচ ছয় লক্ষ যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। গোদাবরীর তটযুগশোভিনী শুভ্র ধর্ম্মশালা, হর্ম্ম্যমালা ও মন্দিরমঠ বড়ই মনোহর ও নয়নরঞ্জন।

নাসিকে আমি যে বাড়ীতে ছিলাম, ঠিক তাহার অপর পার্শ্বে একটি ব্রাহ্মণ তাঁহার অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী পত্নীকে লইয়া বাস করিতেছিলেন। আমি সতত তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতাম। পতি পত্নীকে ছাড়িয়া কোথাও গমন করেন না। গৌরাঙ্গীর একটি শিশু হইয়াছে, তাঁহার স্বামী কেবল তাহাকে ক্রোড়ে লইয়াই থাকেন। আর সুন্দরী কেবলই দোলনায় দুলিতেছেন, এবং কেশপ্রসাধনে ও অঙ্গরাগে নিমগ্ন হইয়াই আছেন। কচিৎ দুই জনে একত্র বেড়াইতে বাহির হন। এই কপোত-কপোতী-যুগলকে দেখিয়া আমার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের একটি কন্দরীগীতির দুই ছত্র মনে পড়িত;—

"ওগো, চলো বাড়ী মে,
তোঁহে হাওয়া খিলাই না।
বন্ বন্ মে আম কে ডালিয়া পর,
তোঁহে ঝুলাই না॥"

নাসিক হইতে ত্র্যম্বকেশ্বর প্রায় দশ ক্রোশ। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম ত্র্যম্বক তথায় বিরাজ করিতেছেন। আমি নাসিক হইতে ২৭শে জানুয়ারী, মঙ্গলবার, অতি প্রত্যূষে টপালে ত্র্যম্বকেশ্বর যাত্রা করিলাম।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

বৈষ্ণব-কবিতা।

প্রথম বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রও, বৈষ্ণব-কবিতা লইয়া হঠকারিতা করিয়াছিলেন। তাঁহার এক ইংরাজী বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, কতকগুলি নিকৃষ্ট-রুচি ব্যক্তির মনোরঞ্জনের জন্য, কতকগুলি ক্ষমতাশালী চাটুকার কবি, বৈষ্ণব কবিতারূপ আবর্জ্জনার আমদানী করিয়াছে। বৃন্দাবনলীলা সম্বন্ধেও তাঁহার ঐরূপই অভিমত ছিল, এবং সে মতটা একটু বেশী বয়স পর্য্যন্তও ছিল।

আমাদের ভবিষ্যৎ সাহিত্য-মহারথ তখন পাশ্চাত্য সাহিত্যের সৌরভে এতই মুগ্ধ ছিলেন যে, যে কাব্যের রচয়িতা জন্মযোগী শুকদেব, শ্রোতা মৃত্যু প্রতীক্ষায় উপবিষ্ট মোক্ষার্থী রাজা পরীক্ষিত, স্থান গঙ্গাতীর, এবং বিষয় ভগবৎপ্রসঙ্গ, উহা নিকৃষ্টরুচি ব্যক্তিদিগের মনোরঞ্জনের জন্য রচিত হইতে পারে কি না, তাহা চিন্তা করিবার অবসর পান নাই। যদি বা শুকদেব বচয়িতা না হন, তবু যে ব্যক্তি এইরূপ বক্তা, শ্রোতা, বিষয় ও স্থান নির্ব্বাচিত করিয়াছেন, তিনি কখনই নিকৃষ্ট-মনা ব্যক্তি নহেন।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ গায় শোনে পরম আনন্দ।

যিনি পবিত্রতার অবতার, সেই মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব যে সকল গান শুনিয়া গায়িয়া, নাচিয়া আনন্দে বিভোর হন, কোনও মানুষের মাথার উপর এমন মাথা নাই যে, সেই সকল গানকে কুরুচির সৃষ্টি বলিয়া অবজ্ঞা করিতে পারে।

আজি চারি শত বৎসরের অধিক কাল হইতে যে সকল সঙ্গীত বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যায় ধর্ম্ম-সঙ্গীতরূপে সমাদৃত, যাঁহাদের চরিত্রের ছায়ামাত্র পাইলে

জীব কৃতার্থ হয়, এমন সহস্র সহস্র বৈষ্ণব সাধু যে সকল সঙ্গীত দ্বারা সচ্চিদানন্দ-ঘন ভগবানের উপাসনা করেন, এবং যে সকল সঙ্গীতের ভাবে অশ্রুকম্পপুলকে অভিভূত হন, সেগুলি যে কুরুচিপূর্ণ, এমন উক্তি খুবই দুঃসাহসিকের কর্ম্ম। বলা বাহুল্য যে, বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ জীবনে তাঁহার এই পূর্ব্বমতের প্রায় আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।

বাঙ্গালার অমর কবি, অপূর্ব্ব-প্রতিভাশালী, বাণীর বরপুত্র মাইকেল মধুসূদনও বৈষ্ণব-কবিতা সম্বন্ধে বিষম ভুল করিয়াছেন। বৈষ্ণব-কবিতা তাঁহার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল, তাই তিনি উহার অনুকরণ করিয়া 'ব্রজাঙ্গনাকাব্য' লিখিয়াছেন। 'ব্রজাঙ্গনা' নব্য-বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ "ললিতকাব্য", কিন্তু ব্রজাঙ্গনা বৈষ্ণব-কবিতা নহে।

"যে যাহারে ভালবাসে, মদন রাজার বিধি—
সে যাইবে তার পাশে, লঙ্ঘিব কেমনে ?"

ইহা ত বৈষ্ণব-কবিতা নহেই, হিন্দু-কবিতাও নহে। ইহা স্বাধীন প্রেমের ধুয়া। রাধাকৃষ্ণের প্রেম, আধুনিক স্বাধীন প্রেম (Free love) নহে। এইটা না বুঝিতে পারিয়াই যত ভুলের উৎপত্তি হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ মদন-মোহন, শ্রীমতী মদন-মোহন-মোহিনী। "ধনী যে দিকে পয়ান করে, মদন পলায় ডরে"। বৃন্দাবনে কামের স্থান নাই। গোপীর প্রেম কাম-গন্ধশূন্য। রাসপঞ্চাধ্যায়ীর ফল-শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, রাসলীলা পাঠ বা শ্রবণ করিলে "হৃদ্‌রোগ কাম বিনষ্ট হয়।" আর আমাদের মধুসূদন লিখিয়াছেন ;—

"যদি অবহেলা করি, রুষিবে সম্বর-অরি
কে সম্বরে স্মর-শরে এ তিন ভুবনে ?"

ছি, ছি! আত্মাশক্তি, পরমা-প্রকৃতি, সতী-শিরোমণি, বৈষ্ণবারাধ্যা শ্রীমতীর মুখে কি এমন কথা বলাইতে আছে ?

সাধু বৈষ্ণবদিগের সঙ্গ না ঘটায়, এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম না বুঝায়, বুঝিবার চেষ্টা না করায়, বৈষ্ণব-কবিতার শত্রু মিত্র উভয় পক্ষই বিষম গোল করিয়াছেন।

বঙ্গ-গৌরব কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কোনও কোনও রকমের কবিতার সঙ্গে কেহ কেহ বৈষ্ণব-কবিতার তুলনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বৈষ্ণব-কবিতা অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে উচ্চতর স্থান প্রদান করেন।

এই শ্রেণীর সমালোচকদিগের সমালোচনার প্রণালীটা কিছুই বুঝা যায় না। আমরা এই মোটা কথা বুঝি যে, ছ্যাংড়া আম ও রসগোল্লা, এই উভয়ের যেমন

তুলনায় সমালোচনা চলে না, সেইরূপ বৈষ্ণব-কবিতার সঙ্গে অন্য কোনও কবিতার তুলনা হয় না। এক-জাতীয় বস্তু না হইলে তুলনা কি করিয়া করিবে? বৈষ্ণব-কবিতা যে একান্তই ভিন্ন-জাতীয়। কালিদাস, মাঘ, ভারবি, ভবভূতি, ভারতচন্দ্র, মধুসূদন, বঙ্কিম, হেম, নবীন, দ্বিজেন্দ্র, রবীন্দ্র, কাহারও সহিতই ইহার মেল-বন্ধন নাই। বৈষ্ণব-কবিতা একাই এক। যদি ইচ্ছা কর, তবে বলিতে পার যে, কাব্য-রাজ্যে বৈষ্ণব-কবিতা একান্তই একঘরে।

আমরা যে চক্ষে বাঙ্গালা কাব্য ও কবিতার রূপ দেখি, সে চক্ষে দেখিতে গেলে, বৈষ্ণব-কবিতা অতি নিম্ন শ্রেণীর কবিতামাত্র। একমাত্র অশ্লীলতা দোষে বৈষ্ণব-কবিতার সমস্ত সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

যে যে স্থানে স্পষ্ট অশ্লীলতা নাই, সে সকল স্থানেও প্রেম বড়ই স্থূল, বড়ই মোটা, একান্তই শারীরিক লালসার পূতিগন্ধময়; মিলন শুধু শারীরিক-মিলন। সুতরাং শুধু খাতির করিয়া কিংবা চক্ষুলজ্জায় বৈষ্ণব-কবিতাকে ভাল বলিবার প্রয়োজন কি? সমালোচকের দৃষ্টিতে উহা বিদ্যাসুন্দরের মতন অপাঠ্য। সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা গলিত-কুষ্ঠ-রোগিণী রমণী যেমন অস্পৃশ্যা, বৈষ্ণব-কবিতাও সেইরূপই।

এরূপ সমালোচনা বেশ রোখা চোখা, কিন্তু "হাঁ, বৈষ্ণব-কবিতা খুব উৎকৃষ্ট কবিতা বই কি, কিন্তু বড়ই শারীরিক-প্রেমজ", এইরূপ মন-রাখা কথার কোনও অর্থই হয় না। বৈষ্ণব-কবিতাকে হয় বলিতে হইবে অতি নিকৃষ্ট, নতুবা বলিতে হইবে অত্যুৎকৃষ্ট; অন্যথা বলিতে হইবে বৈষ্ণব-কবিতা বুঝিতে পারিলাম না। মাঝামাঝি কোনও মীমাংসা নাই।

বৈষ্ণব-কবিতার সর্ব্বস্বই রাধাকৃষ্ণের প্রেম; তাহা শুনিয়া লোকেরা ভক্তি-ভাবে গদ্‌গদ হয় কেন? বিদ্যাসুন্দরও ত বাঙ্গালার প্রেম-কাব্য, উহাও অসাধারণ শক্তিশালী কবি কর্ত্তৃক রচিত, বিদ্যাসুন্দরের মিলন-সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া কেহ ত ভক্তিতে অশ্রু-বিসর্জ্জন করে না।

"শ্যামচাঁদ চাঁদ চাঁদের বামে কাচে বেড়া কাঞ্চন, কাঞ্চন বেড়া কাচে,
চাঁদবদনী দাঁড়াল, রাধাশ্যাম দুঁহো তনু এক হ'য়ে আছে।"

এই সঙ্গীত শুনিয়া নির্ম্মল-চরিত্র ভক্তের মনে যে ভাবের ও যে রসের সঞ্চার হয়, বিদ্যাসুন্দরের মিলন-সঙ্গীতে কাহারও মনে সে ভাবের সঞ্চার হয় কি?

"ব্রজগোপীর নেত্র যেন কৃষ্ণ মুখ নীলপদ্মে
ভ্রমরার পাঁতি, পড়ে মাতি মাতি।"

এই সঙ্গীতে গায়ক ও শ্রোতা, উভয়ের শরীর মন রসাবেশে অবশ হয়, চক্ষের চাহনী বদলাইয়া যায়। বিদ্যা ছাদের উপর হইতে নায়ক দর্শন করিতেছেন, তাহারও চক্ষু মুগ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তাহা লইয়া কেহ্ত কাঁদে না, কেহ ত ঐ ভাবের সাধনা করে না। উভয়ই ত বাঙ্গালা শ্রেষ্ঠতম কবির রচনা।

শুধু রচনার তাৎপর্য্যই বৈষ্ণব-কবিতার সর্ব্বস্ব নয়। মহাকবি কালিদাসের একটী অত্যুৎকৃষ্ট কবিতার বাঙ্গালা অনুবাদ করিতে যত্ন করিব; অনুবাদ শুনিয়া মূল কবিতাটী অনেকেরই মনে পড়িবে;—

কুচযুগভারে যেন অল্প আকুঞ্চিতা,
তরুণ-অরুণ-বর্ণ-বাস-পরিহিতা,
পর্য্যাপ্ত-কুসুম-গুচ্ছ-ভারে অবনত
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতাটীর মত।

একটী বৈষ্ণব-কবিতায় শ্রীমতীর রূপবর্ণনা এইরূপ,—

"অপরূপ পেখনু রামা,
কনকলতা অবলম্বনে উয়ল
হরিণীহীন হিমধামা।
* * *
গিরিবর গুরুয়া পয়োধর পরশিয়ে
গীম গজমতিহারা,
কাম কম্বু ভরি, কণয়া শম্ভু পরি
ঢারত সুরধুনীধারা।"

এখানে দুইটী বর্ণনার মধ্যে কোন্‌টী উৎকৃষ্ট, তাহা দেখাইবার জন্য আমি উদ্ধৃত করি নাই। কালিদাসের বর্ণনাটীও যে খুব সরস, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু উহা লইয়া কেহ ভক্তিসাধনা করে না। কিন্তু বৈষ্ণব-কবিতাটী যখন গীত হয়, তখন সভাস্থলে ভাবের বন্যা প্রবাহিত হয়।

অন্যান্য কাব্যের নায়কনায়িকাদিগকে যদি পাঠক পাঠিকা পছন্দ করেন, তবে তার ফল এই হয় যে, পাঠকগণ আপনাকে নায়কের অনুকরণে এবং আপনার প্রণয়িনীকে নায়িকার অনুকরণে গঠিত করিতে চাহেন; আবার পাঠিকারাও আপনাদিগকে নায়িকার এবং প্রেম-পাত্রদিগকে নায়কগণের অনুকরণে গঠিত করিতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু বৈষ্ণব-কাব্যের ভক্তগণ—স্ত্রীপুরুষ কেহই রাধা কিংবা কৃষ্ণ হইতে চাহেন না, তাঁহারা সখীর অনুগত হইয়া রাধাকৃষ্ণ-লীলা দেখিতে চাহেন, তাঁহারা উভয়ের রূপেই সমান মুগ্ধ।

"কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়",
এ কথা বলিয়া কেন,
গৌরাঙ্গ কাতর হেন,
ঝর-ঝর আঁখিনীরে গণ্ড ভেসে যায়?
পুরুষের সে রূপ কেমন,
যে রূপে পাগল করে পুরুষের মন?
কেউ কি দেখে নাই শিখিচূড়া?
দেখেনি শ্যামল পৃষ্ঠে পীত-ধড়া উড়া?
কেউ কি শুনে নাই মোহন বাঁশী?
দেখে নাই কি বিম্বাধরে সুমধুর হাসি?
কেউ কি দেখে নাই কদমতলা?
পাঁচন হাতে রাখালগণের গোপাল
নিয়ে চলা;

কেমন ধারা পুরুষের সে শোভা ?
যুগে যুগে যোগি ঋষি-ভক্ত মনোলোভা ?
বল সখি এ কেমন রীতি,
পুরুষ-রূপে পুরুষের এ হেন পিরিতি।

সখি আমরা না হয় কুলবালা,
কালো রূপে ঝাঁপ দিয়ে জুড়ায়েছি জ্বালা।
সই, পুরুষের সে রূপ কেমন
যে রূপে পাগল করে পুরুষের মন ?

কোন্ নাটকের নায়কের রূপে পুরুষের এবং নায়িকার রূপে স্ত্রীলোকের চিত্তকে এরূপ ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে ?

"সখি, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম,
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

রূপ গুণ না জানিয়া নামটা যে কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল, এবং প্রাণকে আকুল করিয়া তুলিল, ইহার কারণ কি ? অলঙ্কারশাস্ত্র মতে কোন্ জাতীয় নায়কের নামের এমন গুণ থাকে ?

কালিদাস ত প্রাণপণে রতিবিলাপ লিখিয়াছেন, ব্রজবিলাপের সঙ্গে কোনও অংশে তুলনা হয় কি ? বৈষ্ণব-কবিদের অনুকরণ করিয়া আমাদের কবিওয়ালা-গণ যে সকল গান রচিয়াছেন, তাহাও দেশের লোকের প্রাণে লাগিয়া আছে। একটী কবিগানে শ্রীমতী বলিতেছেন,—

"বিচ্ছেদ বিরহে, যদি প্রাণ না রহে,
এই ক'রো তোমরা সখী সকলে,
আমার কৃষ্ণবিলাসের দেহ
দগ্ধ করো না কেহ,
দেহ বাঁধিয়া রেখো তরু তমালে।"

মানবদেহ অসার বস্তু, বিশেষতঃ মৃতদেহ ঘৃণিত জিনিস, কিন্তু আমার দেহ কৃষ্ণবিলাসের দেহ, তাই ইহাকে পোড়াইতে মানা, আমার প্রিয় তমাল ভাল বাসিত, বিশেষতঃ শ্যাম ও তমাল উভয়ই কালো, তাই তমালে বাঁধিয়া রাখিও।

আর একটী কবিগানে আছে, উদ্ধব ব্রজ হইতে ঘুরিয়া আসিয়া কৃষ্ণকে বলিতেছেন,—

"দেখে এলেম শ্যাম, তোমার বৃন্দাবনধাম
কেবল নাম আছে।
সেথা বসন্ত ঋতু নাই, কোকিল নাই, ভ্রমর নাই,
জলেতে কুমুদ কমল নাই,
শুধু নাই কমল ধূলায় প'ড়ে রয়েছে।

যেমন প্রেম, তেমনই বিরহ। সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য রসের চরম বিকাশ

দেখাইতে সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবান্ ব্রজভূমে প্রকাশিত। তাই সখ্যে, বাৎসল্যে, মাধুর্য্যে বৃন্দাবন রসময় মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এই তিন রসের পূর্ণাদর্শ প্রকাশিত করিয়া সর্ব্বচিত্তাকর্ষকরূপে ঠাকুর বৃন্দাবনে ত্রিভঙ্গ হইয়াছেন; গোলোক, মথুরা, দ্বারকা, কোথায়ও এই ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা নাই। মা যশোদার বাৎসল্য, ব্রজ রাখালের সখ্য, এবং ব্রজগোপীর প্রেম জগতে অতুলনীয়। এই তিনটী রসের আদর্শ-প্রতিষ্ঠার জন্যই শ্রীভগবান আপনাকে "সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথমদন" করিয়াছেন।

যেখানে রাধাকৃষ্ণের রূপে নরনারী সবাই সমান মুগ্ধ, সেখানে অশ্লীলতার স্থান কোথায়? অশ্লীলতাটা মনের ভাবের উপরেই নির্ভর করে। আমাদের কোনও কোনও দেবী পূর্ণযৌবনা উলঙ্গিনী। সে মূর্ত্তি দেখিয়া কেহ অশ্লীল মনে করে না, সকলেই মা বলিয়া ভক্তি করে: অথচ নৃত্যপরায়ণা মিস্ মড্‌কে দেখিয়া হিন্দুমাত্রেরই মনে লজ্জা ও ঘৃণার সঞ্চার হয়। পিতা পুত্র, মাতা কন্যা, একই সভায় রাধাকৃষ্ণলীলা শ্রবণ করেন, কাহারও মনেই সঙ্কোচ নাই, বরঞ্চ নয়নে অশ্রু দেখা যায়।

যদি কেহ বলেন যে, হিন্দুদের অশ্লীলতাবোধ নাই, তাদের মন এখনও পশুর মতনই আছে, এ কথার উত্তর এই যে, তবে তাহারা মিস্ মডের নগ্ন-নৃত্যের কথা শুনিয়া ঘৃণায় জিভ্ কাটে কেন? আর ত্রৈলঙ্গ স্বামী বা ভাস্করানন্দ স্বামী সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকিতেন, হিন্দু নরনারী ভক্তিভরে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতেন, অশ্লীল ভাব কাহারও মনে আসিত না কেন? কাহারও মনে যে না আসিতে পারে, তাহা নয়; সেরূপ লোক কৃষ্ণলীলাশ্রবণের ও সাধুদর্শনের অধিকারী নহে।

বৈষ্ণব-কবিতার অশ্লীলতা সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে অধিক কিছু বলিবার অবসর নাই,

"রাই অঙ্গে অঙ্গ দিয়ে শ্যাম দাঁড়াল"

এ কথা শুনিয়া কেন যে সাধকের প্রাণমন পুলকিত হয়, শরীরে সাত্ত্বিক বিকার উপস্থিত হয়, তাহা বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া উহাকে অশ্লীল বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া একান্তই হাল্‌কা বুদ্ধির কার্য্য।

যিশুখৃষ্ট জীবের কল্যাণের জন্য প্রাণ দিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্বে এবং পরে শত শত কেন, সহস্র সহস্র লোক জগতের কল্যাণের জন্য, সত্যপ্রচারের জন্য, প্রাণ দিয়াছেন। যিশুখৃষ্টের ক্রুশারোহণের কথা গায়িয়া লোকেরা অশ্রুবিসর্জ্জন

করে; সক্রেটিসের, এমন কি, সেণ্টপলের মৃত্যু-বিবরণ গাহিয়া সেরূপ করে না কেন? আজ খৃষ্টের নামে জগৎ মাতিয়াছে, অন্যান্য মার্টারদের নামে মাতে নাই কেন? রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিরহ লইয়া এত কাঁদাকাটি কেন, দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রেম-বিরহ লইয়া সেরূপ হয় না কেন?

লোকেরা বৈষ্ণবদিগের ভাবপ্রবণতাকে পরিহাস করিয়া বলে যে, "এই মাটিতে মৃদঙ্গ হয়" বলিয়া বৈষ্ণব ভূমিতে গড়াগড়ি দেয়। আমি বলি, এত ভাগ্য কিছু সকলের হয় না, যার হয়, তাহার ধন্য সুকৃতি! ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের কুলীনগ্রামের বসুবংশে গুণরাজ খাঁন নামে এক কবি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" নামে একখানি কাব্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন, সেই গ্রন্থে নন্দের নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে "প্রাণনাথ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিয়া শ্রীচৈতন্য ভাবে বিভোর হইলেন, আমার প্রাণনাথকে যে প্রাণনাথ বলেছে, সেই লোক ধন্য, তার বংশ ধন্য। তাই বলিলেন,

গুণরাজ খাঁন কৈল "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়",
তাঁহা একবাক্য তাঁর আছে প্রেমময়।
"নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ"—
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত।

—চরিতামৃত—ম-লী।

আমার প্রিয়তমকে যিনি "প্রাণনাথ" বলিয়াছেন, আমি তাঁহার বংশের নিকট বিকাইয়া আছি। এ প্রেম বুঝা কি সহজ কথা? এমন ভাব শুধু কবি হইলেই কি বুঝিতে পারে? তাই বলি, এই মাটীতে মৃদঙ্গ হয় বলিয়া যে ব্যক্তি মাটীতে গড়াগড়ি দিয়াছিলেন, সর্ব্বপ্রথম যাঁহার মনে এই ভাব উদিত হইয়াছিল, তাঁহার সুকৃতিকে ধন্য ধন্য বলিতে হয়। এখনও ত কীর্ত্তনীয়ারা খোল করতালকে নমস্কার করিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করেন; সে সমস্তই যে পূজার উপচার। কতটা প্রাণের টান হইলে তবে "এলাইলে কেশ নাহি বাঁধি" ভাব আসিতে পারে? যে যুগে গর্ভধারিণীকে গুদাম ভাড়া দিবার গল্প উঠিয়াছে, সে যুগে কুটুম্বের কুটুম্ব তস্য কুটুম্বকে পাইয়া যে ব্যক্তি প্রেমে অধীর হয়, সে ত উন্মাদ পাগল! মৃদঙ্গের উদ্দেশে মাটীতে গড়াগড়ি দেওয়া, আর আমার প্রিয়কে প্রাণনাথ বলিয়াছে বলিয়া তাহার বংশের নিকট বিকাইয়া থাকা, সে যুগে উভয়ই পরিহাসের বিষয়।

অনেকে মনে করেন, প্রেম যে পূজা, এ কথাটা বুঝি নূতন আবির্ভূত হইয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণব-কবিতায় প্রেম আর পূজা অঙ্গাঙ্গি হইয়া আছে; তবে সেটা কথায় নয়, কাজে,

"আনিয়া যমুনার জল চরণ পাখালে,
নমঃ প্রেমময়ী বলে রাই চরণে ঢালে,
ছিঁড়িয়া চূড়ার ফুল নিজ হাতে নিল,
নমঃ প্রেমময়ী বলে রাই-চরণে দিল।"
(নাগর পূজা যে কৈল গো)

বৈষ্ণব-কবিতার প্রেম যেমন উচ্চ, তেমনই গভীর, তেমনই পবিত্র, তেমনই নিগূঢ়। এ প্রবন্ধে দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইবার স্থান নাই।

"কৃষ্ণ ইতি আখর দু'টী, যদনে যব বিলসতি
বাঢ়য় রতি রসনা কোটী লাগি,
(এক মুখে আর সাধ মিটে না)
ময় শ্রবণকন্দরে, যবহুঁ পুন ক্রীড়তি
রতি শ্রবণ অর্ব্বুদ লাগি।"

পুনহুঁ যব পরশে হরি, প্রাণ মন ইন্দ্রিয়াদি কত না সুধা রস ছানি, সৃজিলা বিহি না জানি
শুক রহ মানি বহু ভাগি। ধনী রে ধনি মরমে রহ জাগি।

এই কৃষ্ণনামের মাহাত্ম্যই প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব একটু বিশদ করিয়া বলিয়াছেন,—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরব-চন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্ম স্নপনং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্।"

এইরূপ যাঁর নামের গুণ, তাঁর প্রেমের গুণ কে কহিতে পারে? যাঁর নামে জীব পবিত্র হয়, তাঁর প্রেম কি ব্যভিচার? সহস্র সহস্র বৎসর হিন্দুজাতি কি ব্যভিচারের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন করিতেছে, ব্যভিচারীর পূজা করিয়া আসিতেছে? অনধিক দুই শত বৎসরের মধ্যে নব্য হিন্দু কেমন শোচনীয়রূপে ধর্ম্মহারা ও মর্ম্মহারা হইয়াছে, রাধাকৃষ্ণ-লীলার অপব্যাখ্যাই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ।

কৃষ্ণলীলার তিনটী ধাম অথবা অবস্থা, তিন প্রকারের নায়িকা বা অধিকারী। তিনটী ধামের নাম মথুরা, দ্বারকা ও বৃন্দাবন; তিন প্রকারের নায়িকার নাম সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা। যাঁহারা আত্মসুখ-কামনায় সাধনা করেন, তাঁহারা সাধারণী। তাঁহাদের ধাম মথুরা; যাঁহারা আত্মসুখ ও কৃষ্ণসুখ, উভয় চান, তাঁহারা সমঞ্জসা; তাঁহাদের ধাম দ্বারকা। যাঁহারা শুধু কৃষ্ণসুখে সুখী, তাঁহারা সমর্থা; তাঁহাদের ধাম শ্রীবৃন্দাবন। ভগবান্ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার

অধিকারীর সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে লীলা করেন। বৃন্দাবনে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভিন্ন ঐশ্বর্য্য ভাব নাই, তাই বৃন্দাবনের কৃষ্ণ ও মথুরা দ্বারকার কৃষ্ণ এক বস্তু নয়। কৃষ্ণের অন্বেষণে মথুরায় আসিয়া দূতী জিজ্ঞাসা করিল, এখানে নন্দের নন্দন কৃষ্ণ কোথায় আছেন? মথুরাবাসিনী বলিল—

"সো কাঁহে ইহা পাওব,
হেথা, বসুদেবকী-সুত, কৃষ্ণ খ্যাত
কংশবাদী মাধব।"

মথুরা ঐশ্বর্য্যধাম, এখানে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ কেমন করিয়া আসিবেন? "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি" রসের হিসাবে এই কথাটী সদাই সত্য।

বসন্ত-রাগের আলাপে পঞ্চমে মেজরাপ ঠেকিলেই যেমন সমস্ত নষ্ট হয়, সেইরূপ বৈষ্ণব-কবিতায় এক রসের মধ্যে অন্য রসের একটী শব্দের প্রবেশ-মাত্রই রসাভাস ঘটে। যাহার তাল বোধ আছে, এমন ব্যক্তি যেমন বেতালা গান বাদ্য শুনিতে পারে না; সেইরূপ রসাভাস হইলে বৈষ্ণব-শ্রোতা সেখান হইতে দৌড়াইয়া পলায়ন করেন, রসাভাসের আঘাতে তাঁহার শরীর পর্য্যন্ত অস্থির হয়।

যমুনা নদীর এ পারে বৃন্দাবন ও পারে মথুরা। ব্রজবাসীরা এই নদী পার হইয়া মথুরায় যাইতে পারিল না; তারা যে ব্রজের কৃষ্ণ চায়, মথুরার কৃষ্ণ চায় না, তাই বিরহে মরিবে তবু মথুরায় যাইবে না। সেখানে গেলে রসাভাস ঘটে। বৈষ্ণব ভাষায় ভক্তদিগের পরিচয়প্রসঙ্গে "ইনি ব্রজের লোক" এই কথা বলিলে বুঝিতে হয় যে, ইনি সখ্য, বাৎসল্য, বা মধুর রসের সাধক। দ্বারকার লোক, মথুরার লোক বলিলে তেমনই সাধকের "সমঞ্জসা" ও "সাধারণী" অবস্থা বুঝায়। কিন্তু ব্রজের লোক কথাটা মোটা কথা, ইহার মধ্যে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম বিবিধ অবস্থা আছে।

"সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ। আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
অতএব স্বরূপ শক্তি-হয় তিন রূপ॥ চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥"

ভগবান সচ্চিদানন্দ, সুতরাং তাঁহার তিনটী স্বরূপ শক্তি আছে, সদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সম্বিৎ, এবং আনন্দাংশে হ্লাদিনী। এই হ্লাদিনী শক্তিই আনন্দ-দায়িনী

সুখ রূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন,
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম,
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥

প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি,
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী—

এই হ্লাদিনীর পরম সার বা চরম আনন্দরূপিণী রাধাঠাকুরাণী, ইনি কৃষ্ণানন্দ-বিধায়িনী, এবং ভক্তানন্দদায়িনী। এই পরমাশক্তির সহিত সচ্চিদানন্দ ভগবানের যে বিলাসসম্ভোগ, তাহারই নাম রাধাকৃষ্ণলীলা। ইহার কিছুই কল্পনা নহে, কিছুই রূপক নহে। এই নিত্যলীলা নিত্য বৃন্দাবনে অনাদিকাল হইতে চলিতেছে। দ্বাপরের শেষে এই মর্ত্ত বৃন্দাবনে উহারই মূর্ত্যলীলা হইয়া গিয়াছে। বৈষ্ণবকবিগণ তাঁহাদের কবিতায় এই লীলারই বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনা সাধকের হৃদয়ে হ্লাদিনীর সঞ্চার করে; তখন মাধুর্য্য রসে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়; তখন তুচ্ছ কাম পথে পড়িয়া মূর্চ্ছা যায়। এই অমৃত-রসসম্ভোগে আত্মা নিষ্পাপ হয়, ইহাই বৈষ্ণব সঙ্গীতের শক্তি ও উদ্দেশ্য। কিন্তু

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতং।"

গীতার এই ভগবদ্‌বাক্য সত্য বলিয়াই তর্কপরায়ণ সংশয়াত্মা ব্যক্তিগণ তাঁহার মানুষী তনুকে বিশ্বাস করিতে পারে না। বৈষ্ণবরা বলেন,—

'শ্রীকৃষ্ণের যত খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা'

কেন না, সচ্চিদানন্দ মানুষের মধ্য দিয়া যেরূপ ফুটিয়াছেন, মানুষের চক্ষে অন্য কোথাও সে রূপ প্রকাশ পান নাই। উপনিষদের প্রমাণে যিনি একা থাকিতে ইচ্ছা না করিয়া বহু হইয়াছেন, সেই বহুর মধ্যে নরই সর্ব্বোত্তম, নরের মধ্যে যিনি নরোত্তম, তাহাতেই সচ্চিদানন্দের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি, তিনিই সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। যোগীরা পরমাত্মারূপে যাঁহাকে অন্তরে ধ্যান করেন, তিনি এই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি।

কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি এই প্রবন্ধে এই সকল তত্ত্ব প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিতেছি। আমি যথাসাধ্য বৈষ্ণব মতের আভাস দিতেছি। ইহাও যেন কেহ মনে না করেন যে, বৈষ্ণবগণ একটা তত্ত্বকে কাল্পনিক মূর্ত্তি প্রদান করিয়া উপদেশকে উপন্যাস করিয়া লইয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহারা ভগবানের সাকার রূপই বিশ্বাস করেন, এবং সাকার রূপেরই উপাসক। ইহা সৌভাগ্যের কি দুর্ভাগ্যের কথা, এরূপ বিশ্বাস জ্ঞানজনিত কি মূর্খতাজনিত, সে কথা লইয়া আলোচনা করা বৃথা। এক দল প্রাচীন কালের ব্রহ্মজ্ঞানী, যখন বৈষ্ণব হইলেন, তখন কেন বৈষ্ণব হইলেন জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর দিলেন—

"অদ্বৈতবীথিপথিকৈরুপাস্যাঃ শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন
স্বানন্দ-সিংহাসন লব্ধ-দীক্ষাঃ। দাসীকৃতা গোপবধূ বিটেন॥"

ভক্তিপথে যুক্তির অপেক্ষা থাকে না। প্রাণই টানিয়া লইয়া যায়। মানুষী তনু পরিগ্রহ করিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ বৃন্দাবনে লীলা করিয়াছেন, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের পূর্ণাদর্শ প্রকটিত করিয়া প্রেমের বন্যায় বৃন্দাবন ভাসাইয়া দিয়াছেন, কবি গায়িয়াছেন,

"রাধাকৃষ্ণ আমার পঞ্চ রসের রসময়
বৃন্দাবন প্রেম রসেতে ভেসে যায়।"

বৃন্দাবন, ব্রজ, বর্ষাণ, প্রভৃতি স্থান, নদী যমুনা, পর্ব্বত গোবর্দ্ধন, সেই বংশীবট আর কদমতলা, গোষ্ঠ, গোপাল, রাখাল প্রভৃতি নামগুলি সমস্তই অমৃতসেচনে চিরকালের জন্য অমর ও মধুময় হইয়া রহিয়াছে।

রাধাকৃষ্ণের ইতিহাস যাহাই হউক, বৈষ্ণব কবিগণ অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে যে রাধাগোবিন্দলীলা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, উহা অমৃতের প্রস্রবণ-রূপে প্রবাহিত হইয়া চিরকাল তপ্তধরা জুড়াইবে। কোনও কবিতা, কোনও সঙ্গীতই উহার সমকক্ষ হইতে পারিবে না। অন্য কবিদের বৃন্দাবন নাই, রাধাকৃষ্ণও নাই, অন্য নায়ক নায়িকায় রাধাকৃষ্ণের ভাব অর্পণ করিতে গেলে, উহা বিদ্যাসুন্দর হইবে, বৈষ্ণব-কবিতা হইবে না।

"মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকল-নিগম-বল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপং
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥"

উপনিষদে যিনি "রসস্বরূপ" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তিনিই বিবর্ত্তিত হইয়া "রাসলীলা"য় আপনাকে "রসরাজ"রূপে প্রকটিত করিয়াছেন। সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি,—

"শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষণ্ বেণুস্বনৈর্গোপী র্গোপীনাথঃ শ্রেয়োঽস্তু নঃ॥" *

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা।

পূজার কাপড়।

১

দুখের মা বারো বছরের ছেলে দুখীরামকে কিছুতেই আপনার দৈন্য বুঝাইতে না পারিয়া প্রমাদ গণিল।

তখন চারি দিকে পূজার ঢাক বাজিয়া উঠিয়াছে; ছেলের দল নূতন কাপড়

* বাঁকীপুরের দশম সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

পরিয়া নাচিতে নাচিতে ঠাকুর দেখিতে ছুটিয়াছে; ভিখারী দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া খঞ্জনীর তালে তালে গায়িতেছে,—

"গা তোলো গা তোলো বাঁধো মা কুন্তলো,
ঐ এলো পাষাণী তোর ঈশানী।"

এমনই সময়ে বাগ্দীর ছেলে দুখীরাম বিধবা মাকে ধরিয়া বসিল, "আমার নতুন কাপড় চাই।"

মা ধান ভানিয়া, গোবর কুড়াইয়া, দিন চালাইত। কাপড় ছিঁড়িলে কায়েত-পাড়া হইতে গৃহস্থের পরিত্যক্ত ছেঁড়া কাপড় চাহিয়া আনিয়া, সেলাই করিয়া আপনি পরিত, ছেলেকে পরিতে দিত। সুতরাং ছেলেকে নূতন কাপড় কিনিয়া দিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। কিন্তু অবোধ আহুরে ছেলে মাতার অক্ষমতা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। গ্রামের প্রায় সকল ছেলেই নূতন কাপড় পরিয়াছে। দীনু খোড়ুয়ের ছেলেরা নূতন কাপড় দেখাইয়া দেখাইয়া, হাততালি দিয়া, তাহাকে উপহাস করিয়াছে। সুতরাং সে ভাত খাইতে বসিয়া গোঁ ধরিল, "আমার নতুন কাপড় চাই। নয় তো ভাত খাব না।"

মা ছেলেকে অনেক বুঝাইল; বলিল, "ছি বাবা, পেটে খেতে পাই না, কাপড় কিনতে পয়সা কোথায় পাব?"

দুখীরাম জোরে মাথা নাড়িয়া, বলিল, "তা আমি শুনবো না, আমার কাপড় চাই। কেন, পটলাকে বেচলে তো পয়সা হয়?"

মা তাড়াতাড়ি দন্তে জিহ্বা দংশন করিয়া বলিল, "ছি বাবা, অমন কথা বলতে আছে? ও যে বাবা পঞ্চানন্দের পাঁঠা। সে বছর কি তুই ছিলি? কেবল বাবাই দয়া করে' ফেলে গেছেন। ও বাবার-মানসিকী।"

দুখীরাম বলিল, "হোক মানসিকী, তুই ওকে বেচে কাপড় কিনে দে।"

মা কিন্তু কিছুতেই পটলাকে বেচিতে সম্মত হইল না। দুখীরাম তখন পঞ্চানন্দের উদ্দেশে একটা কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া থালার ভাতগুলাকে উঠানময় ছড়াইয়া দিল। ভাতের জন্য না হউক, ঠাকুরের উপর কটূক্তি প্রয়োগ করায় মা না রাগিয়া থাকিতে পারিল না; সে "হতভাগা ছেলে" বলিয়া ছেলের পিঠে একটা চড় বসাইয়া দিল। ছেলে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া পলাইল। মা তখন একটী একটী করিয়া উঠানের ভাত খুঁটিতে খুঁটিতে বাঁ হাতে ছেঁড়া কাপড়ের আঁচলটা টানিয়া ঘন ঘন চোখ মুছিতে লাগিল।

হায়! অনেক দুঃখের ছেলে দুখীরাম। যে দিন দুখীরাম জন্মিয়াছিল, সে দিন কি আনন্দ! মিনসের মুখে কি হাসি! সেই ছেলে আজ একখানা কাপড়ের জন্য মার খাইল? আজ যদি মিনসে থাকত? তাহার চাকরী-বাকরী ছিল না, জমীজমাও ছিল না, তবু গতরের মেহনতে সে যাহা আনিত, তাহাতে ছেলে কত নূতন কাপড় পরিত! তাহা হইলে আজ কি দুখীরামকে ভাত খাইতে বসিয়া চড় খাইতে হইত, না এত দুঃখের ছেলের এই করুণ চীৎকার তাহার বুকে শেল বিদ্ধ করিত! দুখের মা যত চোখের জল মুছিতে লাগিল, ততই কোথা হইতে চোখের কোলে জল আসিয়া জমিতে লাগিল। আঁচল ভিজিয়া গেল, কিন্তু সে জলস্রোত আর থামিল না।

হায় মা, আনন্দময়ী তুই; তোর আগমনে দুখের মার মত কত নাকে চোখের জল মুছিতে হয়! কেন?

২

সেই দিন বিকালে রামজীবন দত্তের গোমস্তা শিবু আকুলি আসিয়া ডাকিলেন, "দুখের মা, ও দুখের মা!"

দুখের মা তখন কুটীরের পশ্চাতে এক গাদা গোবর লইয়া ঘুঁটে দিতেছিল। সে গোবরমাখা হাতে ছেঁড়া কাপড়ের আঁচলটা তাড়াতাড়ি মাথায় তুলিয়া দিয়া, সম্মুখে আসিয়া বলিল, "কেনে গা বাবাঠাকুর!"

আকুলি মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর না একটা কালো পাঁঠা আছে?"

দুখের মা একটু থতমত খাইয়া উত্তর করিল, "পাঁঠা? একটা পাঁঠা আছে বাবাঠাকুর, কিন্তু—"

আকুলি মহাশয় একটু চড়া গলায় বলিলেন, "কিন্তু-সিন্তু নয়, পাঁঠাটা চাই। আমাদের সন্ধিপূজার কালো পাঁঠা পাওয়া যাচ্চে না। কৈ পাঁঠাটা কোথায়?"

আকুলি মহাশয় ইতস্ততঃ ব্যগ্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

পাঁঠাটী তখন অদূরে আশশ্যাওড়ার বনের ধারে দাঁড়াইয়া বুনোগাছের পাতা চিবাইতেছিল। আকুলি মহাশয়ের সঙ্গে চাকর দামু আসিয়াছিল। সে সেই দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ বুঝি?"

আকুলি মহাশয় নধরকান্তি ছাগনন্দনের দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন, "বেশ পাঁঠা, বলির যোগ্য বটে। ধ'রে নিয়ে আয় দামু!"

দামু পাঁঠা ধরিতে চলিল। দুখের মা আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিল, "না বাবাঠাকুর, ও বাবা পঞ্চানন্দের পাঁঠা, আমার দুখীর মানসিক। ওকে আমি বেচতে পারব না।"

মৃদু হাসিয়া আকুলি মহাশয় বলিলেন, "দূর বেটী, এত বড় পাঁঠা পঞ্চানন্দকে দেয়? এর দামে যে তিনটে পাঁঠা হবে। সিকে পাঁচেক হ'লেই মানসিক-শোধের মত একটা পাঁঠা পাওয়া যাবে। বাকী টাকায় তোর দুখেকে কাপড় কিনে দিতে পারবি।"

দুখের মার বুকটা যেন একটু কাঁপিয়া উঠিল। সে নীরবে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল।

দামু পাঁঠা ধরিয়া আনিলে আকুলি মহাশয় তাহার সর্ব্বশরীর পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন, কোথাও একটু সাদা বা লালের দাগ পর্য্যন্ত নাই। তিনি সন্তুষ্টচিত্তে পাঁঠার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত নিবি দুখের মা?"

দুখের মার মুখে কোনও কথা নাই। সে তখন কোন্ দিক্ রক্ষা করিবে, তাহাই ভাবিতেছিল। এক দিকে ঠাকুরের কোপ, অন্য দিকে ছেলের আব্দার। ছেলে কোলের ভাত ফেলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গিয়াছে। কোথায় ঘুরিতেছে, তাহার ঠিকানা নাই। যে রকম একগুঁয়ে ছেলে, তাহাতে কাপড় না পাইলে সে যে শান্ত হইবে, বা কিছু মুখে দিবে, এমন ত বোধ হয় না। কিন্তু অন্য দিকে ঠাকুর। সত্যই কি কম দামের আর একটা পাঁঠা কিনিয়া দিলে ঠাকুর সন্তুষ্ট হইবেন?

দুখের মার কোনও উত্তর না পাইয়া আকুলি মহাশয় দামুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কি রে দামু, কত দাম হ'তে পারে?"

দামু পাঁঠাটাকে একবার শূন্যে তুলিয়া তাহার মাংসের গুরুত্বের পরিমাণ অনুমান করিয়া লইল; তার পর মনে মনে হিসাব করিয়া বলিল, "কত আর হবে? জোর সিকে এগারো।"

আকুলি মহাশয় সহাস্যমুখে বলিলেন, "তাই বটে, তবে দূর হোক, পুজোর বাজার, আর ভাঙ্গা ভর্ত্তিতে কাজ নাই। তিন টাকাই হ'লো। গরীব মানুষ!"

বাস্তবিক, গরীব বলিয়া চার আনা বেশী স্বীকার করিবার পাত্র আকুলি মহাশয় ছিলেন না। পাঁঠাটার দর পাঁচ টাকার কম হইতে পারে না। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে চার আনা দর বাড়াইয়া তিনি গরীবের উপর সহানুভূতি

প্রকাশ করিতে ছাড়িলেন না। এরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তিনি প্রায়ই অনেক গরীবকেই অনুগৃহীত করিয়া থাকেন।

দুখের মার কিন্তু দরের দিকে লক্ষ্য ছিল না। সে শুধু পঞ্চানন্দের কোপ, আর ছেলের রাগের কথাই ভাবিতেছিল। সুতরাং পাঁচ টাকার পাঁঠার তিন টাকা দর শুনিয়াও সে কোনও প্রতিবাদ করিল না। আকুলি মহাশয় তখন পাঁঠাটাকে বাঁধিয়া লইতে হুকুম দিয়া দুখের মাকে বলিলেন, "কাল এক সময় গিয়ে দামটা চুকিয়ে নিয়ে আসিস্।"

দামু আপনার গামছা দিয়া পাঁঠাটাকে বাঁধিল। দুখের মা সহসা ছুটিয়া আসিয়া গোবর-মাখা হাতে আকুলি মহাশয়ের পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল, "দোহাই বাবাঠাকুর, আমাকে বাবার কোপে ফেলো না।"

আকুলি মহাশয় তাহার হাত হইতে পা ছিনাইয়া লইলেন, এবং গাছের পাতা ছিঁড়িয়া পায়ের গোবর মুছিতে মুছিতে বিকৃতমুখে বলিলেন, "মর বেটী, বাবার আবার কোপ কিসের? এই পাঁঠাটাই বাবাকে দিতে হবে, এমন কোনও লেখাপড়া আছে? এটা যদি হঠাৎ মারা যায়?"

দুখের মা শঙ্কিতদৃষ্টিতে আকুলি মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আকুলি মহাশয় গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "তোর কোনও ভয় নাই। আমি বামুন, ব্যবস্থা দিচ্চি, সিকে পাঁচেক দিয়ে একটা ছোট পাঁঠা কিনে মানসিক শোধ করবি। মানসিক শোধের সময় আমাকে খবর দিতে ভুলিস্ নি, বুঝলি?"

আকুলি মহাশয় অগ্রসর হইলেন। দামু পাঁঠাটাকে টানিতে টানিতে তাঁহার পশ্চাৎ চলিল। দুখের মা স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

যখন ছেলে আসিয়া ডাকিল, তখন তাহার চৈতন্য হইল। দুখীরাম জিজ্ঞাসা করিল, "পটলাকে বেচেছিস্, মা?"

মা কোনও উত্তর দিল না, শুধু স্নিগ্ধদৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে চাহিল। দুখীরাম প্রফুল্লমুখে বলিল, "আমাকে কাপড় কিনে দিবি?"

মা সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া বলিল, "চল্, এখন ভাত খাবি আয়।"

৩

পর দিন বৈকালে দুখের মা দত্তবাবুদের বাড়ীতে গিয়া আকুলি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিল। আকুলি মহাশয় তখন গয়লা, জেলে, ময়রা প্রভৃতির বায়না লইয়া বড় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি দুখের মার দিকে চাহিয়া বিরক্তভাবে

বলিলেন, "তোর যে আর হাঁড়ী চড়ে না দেখছি। তাড়াতাড়ি দাম আদায় করতে এসেছিস্।"

দুখের মা কোনও উত্তর না দিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। আকুলি মহাশয় অন্যান্য গোলযোগ কতক মিটাইয়া তাহার হিসাব দেখিতে বসিলেন। দুই তিনখানা খাতা উল্টাইয়া, আঁক কষিয়া বলিলেন, "পাঁঠাটার দাম তিন টাকা, না? তা তোর গেল সনের ভিটের খাজনা দশ আনা বাকী। তা গেল সনের দশ আনা, আর হাল সনের দেড় টাকা, হ'লো দু' টাকা দু' আনা; সুদ চার আনা আট গণ্ডা। মোট দু' টাকা ছ' আনা আট গণ্ডা। আর পার্ব্বণী চার আনা, নগদীর রোজ দু' আনা, তা হ'লে দু' টাকা বারো আনা আট গণ্ডা। যাক্, দু'কড়া ছেড়ে দিলাম, সাড়ে সাত গণ্ডা। তিন টাকার দু' টাকা বারো আনা সাড়ে সাত গণ্ডা বাদ গেলে থাকে তিন আনা সাড়ে বার গণ্ডা, তা হ'লে সাড়ে চোদ্দ পয়সা। বুঝলি?"

না বুঝিলেও দুখের মা ঘাড় নাড়িল। তখন আকুলি মহাশয় বাক্স হইতে সাড়ে চোদ্দ পয়সা বাহির করিলেন, এবং দুইবার গণিয়া তাহা দুখের মার সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। দুখের মা কিছুক্ষণ বিস্মিতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, "বাবাঠাকুর, মোটে সাড়ে চোদ্দটী?"

আকুলি মহাশয় ধমক দিয়া বলিলেন, "যা যা মাগী, এখন কাজের সময় বকাস্ নি; (গয়লাকে লক্ষ্য করিয়া) তার পর কি বলছিলে হে ঘোষের পো, সাড়ে আট টাকা ক'রে দই? কেন, তোমাদের দই দুধও যুদ্ধে যাচ্চে নাকি?"

দুখের মা পয়সা কয়টী কুড়াইয়া লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

ঘরে না ঢুকিতেই দুখীরাম ছুটিয়া আসিয়া মায়ের আঁচল ধরিল; ব্যগ্র—উৎফুল্লকণ্ঠে বলিল, 'কৈ দেখি, কেমন কাপড়?"

মা কোনও উত্তর দিতে পারিল না; তাহার চোখ দুইটা তখন জলে ভরিয়া আসিয়াছিল। দুখীরাম কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য করিল না; মা আসিবার সময় কেন পালেদের দোকান হইতে কাপড় কিনিয়া আনে নাই, তজ্জন্য মাতাকে তিরস্কার করিল, এবং তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দোকানে যাইবার জন্য মায়ের হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। শেষে মা যখন অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে তাহাকে আকুলি মহাশয়ের প্রদত্ত পয়সার পরিমাণ বুঝাইয়া দিল, তখন দুখীরাম রাগে আগুন হইয়া বলিল, "ফি, আমার পটলাও গেল, কাপড়ও হ'লো না? আমি পটলাকে ফিরিয়ে আনব।"

মা বলিল, "তারা কেনে নিয়ে গেছে, আর কেন ফিরিয়ে দেবে?"

দুর্গীরাম জোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "তার বাবা দেবে। আমি আমার পাঁঠা ফিরিয়ে আনব, দেখি সে বামুন—"

মা তাড়াতাড়ি ছেলের মুখ চাপিয়া ধরিয়া ব্যস্তভাবে বলিল, "ছি বাপ, বামুনকে কি গাল দিতে আছে? বামুন দেবতা।"

দুর্গীরাম কিন্তু এমন প্রতারক ব্রাহ্মণকে দেবতা বলিয়া মানিতে চাহিল না। সে আঙুলি মহাশয়ের উদ্দেশে যাহা মুখে আসিল, তাহাই বলিতে লাগিল। মা দুইহাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "রক্ষে কর্ দুখে, যদি বাঁচতে চাস্ বামুনকে আর গাল দিস্ নি।"

দুর্গীরাম দৃঢ়স্বরে বলিল, "বাঁচি আর মরি, আমি হয় কাপড় চাই, নয় পটলাকে চাই। আমি পটলাকে কত ভালবাসি—তা জানিস্?"

মা শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

৪

ষষ্ঠীর দিনে দত্তবাড়ীর লোক জন যখন এক দিকে কল্পারম্ভের, অন্য দিকে ঠাকুর সাজান, মেরাপ বাঁধা, বাজার করা প্রভৃতি কার্য্যে ব্যস্ত ছিল, তখন দুর্গীরাম ধীরে ধীরে গিয়া, বাহিরে যেখানে পাঁচ ছয়টা পাঁঠা বন্ধ-অবস্থায় ঘাস ভক্ষণে নিরত ছিল, সেই খানে দাঁড়াইল। পটলাও সেখানে ছিল। দুর্গীরামকে দেখিয়া পটলা সকরুণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া অব্যক্ত শব্দ করিতে লাগিল। দুর্গীরাম তাহার গায়ে হাত বুলাইল, তাহার মাথাটা জড়াইয়া ধরিয়া বুকের উপর রাখিল। তার পর ইতস্ততঃ সতর্কদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে তাহার গলার বাঁধন খুলিয়া দিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিল। পটলা ডাক করিতে করিতে তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল।

দামু বাজার করিয়া ফিরিতেছিল; সে "পাঁঠা-চোর, পাঁঠা-চোর"। বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বাড়ীর ভিতর হইতে লোক জন ছুটিয়া বাহিরে আসিল। দুর্গীরাম উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। কিন্তু সে অধিক দূর যাইতে পারিল না, একটা নালা ডিঙাইতে গিয়া আছাড় খাইল। পাঁচ সাত জন আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। পটলা কিন্তু ধরা পড়িল না, সে পাশের জঙ্গলে ঢুকিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। কয়েক জন লোক তাহার অনুসরণ করিল।

পূজক তখন কল্পারম্ভের পূজা শেষ করিয়া চণ্ডীপাঠ করিতেছিলেন। দত্তগৃহিণী রেশমবস্ত্রে বিশাল বপু আবৃত করিয়া ভক্তিগদগদচিত্তে দেবীমাহাত্ম্য শ্রবণ

ছিলেন, আর মাঝে মাঝে ভৃত্যদিগকে নিম্নস্বরে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিতেছিলেন। এমন সময় চাকরেরা পাঁঠা-চোরকে ধরিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিল, এবং সে কিরূপে নবক্রীত সন্ধিপূজার পাঁঠাটা চুরী করিয়া পলাইতেছিল, দামু তাহা সালঙ্কারে বিবৃত করিল। পূজকের চণ্ডীপাঠ থামিয়া গেল। দত্তজা ক্রোধরক্তদৃষ্টিতে চোরের দিকে চাহিলেন। দুখীরাম কিন্তু তাহাতে একটুও ভীত হইল না; সে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া তীব্র সতেজকণ্ঠে বলিল, "তোমরা বুঝি ফাঁকি দিয়ে পটলাকে নেবে? আমার হয় কাপড় চাই, নয় পটলাকে চাই।"

উত্তর শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল। বাগ্দীর ছেলের মুখে এত বড় তেজের কথা শুনিয়া দত্তজা রাগে আগুন হইয়া উঠিলেন; ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে আদেশ দিলেন, "বেটা বিচ্ছুটীর ঝাড়; জুতিয়ে বেটার মুখ ছিঁড়ে দাও।"

আদেশমাত্র সেই দ্বাদশবর্ষীয় বালকের পৃষ্ঠে পটাপট্ শব্দে জুতা, কিল, চড় পড়িতে লাগিল। যখন প্রহারের নিবৃত্তি হইল, তখন দুখীরাম অর্দ্ধমৃত। প্রতিবেশী দীনু খোড়ই তাহাকে ধরিয়া তাহার ঘরে লইয়া গেল। পুরোহিত মহাশয় পুনরায় আচমন করিয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি উদাত্ত স্বরে পড়িতে লাগিলেন,—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

দত্তজার চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় ভক্তির নির্ঝর বহিতে লাগিল!

৫

মা ডাকিল, "দুখী, ও বাবা দুখীরাম!"

দুখীরাম রক্তচক্ষু উন্মীলিত করিয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিল। মা জিজ্ঞাসা করিল, "অমন কচ্চিস্ কেন বাবা? কিছু খাবি?"

দুখীরাম নিরুত্তর। মা তাহার মুখে মুখ দিয়া কাতরস্বরে বলিল, "কাল সারা দিনরাত যে একটু কাঁচা জলও তোর পেটে যায় নি! কিছু খাবি?"

দুখীরাম বলিল, "খাব।"

মা তাড়াতাড়ি একটা থালায় কেনভাত আনিয়া দিল। দুখীরাম উঠিয়া খাইতে বসিল, কিন্তু খাইতে পারিল না; এক গ্রাস ভাত মুখে তুলিয়াই

শুইয়া পড়িল। মা তাহার হাত ধুইয়া দিল, মাথার কাছে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

দত্তবাবুদের বাড়ীতে সপ্তমীপূজার বলিদানের বাজনা বাজিয়া উঠিল। দুখীরাম ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল; চীৎকার করিয়া বলিল, "ঐ পটলাকে কাটলে! কৈ, আমার নতুন কাপড় কোথায়?"

মা তাহাকে দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিল। দুখীরামের মাথা মায়ের কোলে লুটাইয়া পড়িল।

দীনু খোড়ুই আসিয়া বলিল, "দেখছিস্ কি মাগী, বিকার হয়েছে, ডাক্তার ডাক্।"

দুখের মা ব্যস্তে ব্যস্তে দত্তবাবুদের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তারকে ডাকিতে ছুটিল। ডাক্তার বাবু কিন্তু আসিলেন না; বলিলেন, "এখনি আমাকে বাবুদের বাড়ী নিমন্ত্রণ রাখতে যেতে হবে।"

না আসিলেও তিনি ঔষধ দিলেন। বলিলেন, "এই ওষুধটা নিয়ে যা, তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াবি।"

দুখের মা একবার ছেলেকে দেখিয়া আসিবার জন্য কাঁদাকাটা করিতে লাগিল। ডাক্তার রাগিয়া বলিলেন, "ভিজিট দিতে পারবি?"

দুখের যার সে সংস্থান ছিল না। থাকিলে ভিজিটের টাকা দিয়া সে ছেলেকে কাপড় কিনিয়া দিত, ছেলেকে আজ ঔষধ খাইতে হইত না। দুখের মা ব্যথিতচিত্তে শুধু ঔষধ লইয়াই ফিরিল। ফিরিবার পথে সে ঘোষপুকুরের পাড়ে পঞ্চানন্দের গাছতলায় মাথা কুটিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দোহাই বাবা, আমায় অপরাধ হ'য়ে থাকে, আমায় নাও, আমার দুখীকে বাঁচাও। আমি ভিক্ষে ক'রে ডাইনে বাঁয়ে পাঁঠা দিয়ে তোমার পূজো দেব।"

ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া ফিরিতেই সহসা দুখের মা দেখিল; পুকুর-ধারে পটলা চরিতেছে। এই যে এখানে পাঁঠা, আর বাবুদের লোক জন আজ দুই দিন পাঁঠা খুঁজিয়া হায়রাণ হইতেছে। দিনে সাতবার তাহার ঘরে খানাতল্লাসী করিতে আসিতেছে, তাহাকে কত ভয়, কত লোভ দেখাইতেছে। সে যেন পাঁঠাটাকে বেচিয়া আবার তাহাকে ঘরে লুকাইয়া রাখিয়াছে। ছি ছি, লোকের কি অশুদ্ধ মন!

পটলাকে ডাকিতেই পটলা মুখ তুলিয়া চাহিল, এবং ধীরে ধীরে আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। দুখের মা বাঁ হাতে ওষুধের শিশিটা ধরিয়া ডান হাতটা

তাহার গায়ে বুলাইতে লাগিল। তার পর আঁচলের খুঁটে কোনরূপে তাহাকে বাঁধিয়া দত্তবাবুদের বাড়ীর দিকে চলিল।

যাইতে যাইতে সহসা তাহার মনে হইল, কে যেন তাহার বুকের ভিতর বসিয়া বলিতেছে, "ও দুখের মা, করিস্ কি? এ যে বাবার পাঁঠা, বাবাই ইহাকে লোকচক্ষুর অন্তরাল করিয়া রাখিয়াছেন। নয় ত এত লোকের চক্ষু এড়াইয়া সে কি এখানে বেড়াইতে পারে? তুই কি না আবার সেই পাঁঠা ধরিয়া বাবুদের বাড়ী দিতে চলিয়াছিস্? তোর কি ভাল হইবে? একবার ত পাঁঠা বেচায় তোর ছেলে এমন শাস্তি পাইল, ইহার উপর তুই নিজে উহাকে ধরিয়া দিয়া আসিলে কি তোর দুখে বাঁচিবে?"

দুখের মার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইল। সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া সভয়-দৃষ্টিতে পশ্চাতে চাহিল। দেখিল, বাবার অধিষ্ঠিত বৃহৎ অশ্বত্থ গাছটা যেন নীরব নিথর ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে; তলদেশে সিন্দুর-মণ্ডিত ঘটের উপর বসিয়া কে এক রুদ্রমূর্ত্তি পুরুষ হস্তসঙ্কেতে তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিতেছে, "সাবধান দুখের মা, আমার মানসিকী পাঁঠা ফিরিয়ে দিলে তোর ভাল হবে না।"

দুখের মা স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। হায় বাবা, অভাগী আমি, তোমার মানসিকী পাঁঠা যে বেচিয়া ফেলিয়াছি! স্বেচ্ছায় না হউক, অনিচ্ছা-সত্ত্বেও—ছেলের আবদার রাখিতে বেচিয়াছি, বেচিয়া দাম লইয়াছি। এখন ইহাকে দেখিয়াও ফিরাইয়া দিয়া না আসিলে কি অধর্ম্ম হইবে না? ক্রেতাকে কি ফাঁকি দেওয়া হইবে না? কিন্তু বাবার কোপে পড়ি—

দুখের মার বুকটা বড় জোরে কাঁপিতে লাগিল। সে ভাবিল, "দূর হোক, নিজে একে ধ'রে দিয়ে আসব না, বাবুদের বাড়ীতে খবর দিই, তারা এসে ধ'রে নিয়ে যাক্। কিন্তু ততক্ষণে পাঁঠাটা যদি আর কোথাও চলিয়া যায়?"

দুখের মা কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

তা দুখের মার যদি একটুও বিচারশক্তি থাকিত, তাহা হইলে সে অনায়াসেই বুঝিতে পারিত, এ ক্ষেত্রে পাঁঠাটাকে ধরিয়া দিয়া আসিবার জন্য তাহার কি এমন মাথাব্যথা! সে মূল্য লইয়া বিক্রেয় বস্তু ক্রেতার হাতে তুলিয়া দিয়াছে। তার পর সে জিনিস কোথায় গেল, তাহার কি হইল, এত খোঁজে

তাহার দরকার কি? এখানে সে-ই দায়ী; ন্যায়ের সূক্ষ্ম তর্কে সে সম্পূর্ণ নির্দোষ।

কিন্তু দুখের মা কখনও ন্যায়ের তর্ক লইয়া আলোচনা করে নাই। সে গরীবের মেয়ে, সংসারে শুধু ধর্ম্ম অধর্ম্ম এই দুইটা জিনিসই চিনিয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং সে হারালো পাঁঠাটার জন্য আপনাকেই সম্পূর্ণ দায়ী স্থির করিল, এবং তাহাকে দেখিয়াও ছাড়িয়া দিলে ধর্ম্মের নিকট দোষী হইবে ভাবিয়া লইল। সে পশ্চাৎ হইতে দুই ফিরাইয়া লইয়া পাঁঠাটাকে টানিতে টানিতে দ্রুতপদে দত্তবাবুদের বাড়ীর দিকে চলিল।

৬

পাঁঠার জন্য দত্তবাবুদের বাড়ীতে হুলস্থূল বাধিয়া গিয়াছিল। সকলেই জানে, রামজীবন দত্তের পূজা যে সে পূজা নয়, যথার্থ সাত্ত্বিকী পূজা; এ পূজায় তিলমাত্র ত্রুটী হইবার যো নাই। যাহা নিয়ম, দত্তজা যথা সামর্থ্য দিয়া যেরূপেই হউক, তাহা নিশ্চয়ই করিবেন। জগদম্বার উপর তাঁহার অচলা ভক্তি, সে ভক্তির তিলমাত্র ব্যতিক্রম হইলে, মায়ের পূজার একটু অঙ্গহানি হইলে তিনি আছাড় খাইয়া পড়েন। সন্ধিপূজায় কৃষ্ণবর্ণ ছাগে মায়ের প্রীতি, সুতরাং ভালো পাঁঠা চাই-ই। পাঁচখানা গ্রাম খুঁজিয়া, অনেক কল কৌশলে সংগৃহীত সেই পাঁঠা পলাইয়াছে। তাহার অন্বেষণে গ্রাম ছাড়িয়া ভিন্ন গ্রামে লোক ছুটাছুটি করিতেছে, কিন্তু পলায়িত পাঁঠার কোনও সন্ধানই পাওয়া যাইতেছে না। সময়ও নাই, রাত্রি পোহাইলেই সন্ধিপূজা; পূজা রাত্রিতে নয়, দিনমানে বেলা আটটার সময়। মাঝে আর একটা রাত্রিমাত্র ব্যবধান। ইহার মধ্যে যদি পাঁঠা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ! পূজার নিয়মভঙ্গ হইবে, মা রুষ্ট হইবেন, ভক্তের ভক্তির মূলে কুঠার পড়িবে।

দত্তজা অনাহারে মায়ের সম্মুখে বসিয়া মাথা কুটিতে লাগিলেন; আর লোকজনদের হুকুম দিলেন, "যেখান থেকে পার, পাঁঠা খুঁজে এনে হাজির কর। যে আনতে পারবে, সে নগদ দশ টাকা বকশীস পাবে।"

বকশীসের লোভে দূরদূরান্তরে লোক ছুটিল।

এমন সময় দুখের মা যখন আঁচলে বাঁধা পাঁঠা লইয়া উপস্থিত হইল, তখন বাড়ীতে একটা হৈ হৈ পড়িয়া গেল। দত্তজা প্রতিমার দিকে চাহিয়া ভাব-গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "মা গো, তুইই সত্যি, নিজের বলি নিজে খুঁজে এনে দিস্। তুই কি কখন ভক্তের প্রাণে ব্যথা দিতে পারিস্?"

আকুলি মহাশয়ের ধড়ে যেন প্রাণ আসিল। তিনি তাড়াতাড়ি এক-গাছা শক্ত দড়ি আনিয়া পাঁঠাটাকে বাঁধিয়া ফেলিলেন। তখন সকলেই বলিতে লাগিল, "এ সব দুখের মায়ই বজ্জাতী। এই মাগীই পাঁঠা লুকিয়ে রেখেছিল। এখন বকলীসের লোভে এনে হাজির ক'রেছে।"

দত্তজা ক্রুদ্ধ হইয়া গম্ভীরস্বরে আদেশ দিলেন, "মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে মাগীকে গ্রামের বা'র ক'রে দাও।"

সকলেই চীৎকার করিয়া এই দণ্ডের অনুমোদন করিল। দুখের মা সেই উন্মত্ত জনকোলাহলের মধ্যে বিস্ময়স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

এমন সময় দীনু খোড়ই আসিয়া তাহার গা ঠেলিয়া বলিল, "মর্ মাগী, এখানে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস্, আর সেখানে ছেলেটা যে হ'য়ে এসেছে। সে ঝেড়ে ঝেড়ে উঠছে, আর 'কাপড়, কাপড়' ব'লে চেঁচাচ্চে। এতক্ষণ বোধ হয় নাই।"

দুখের মা একটা আর্ত্তনাদ করিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল। তাহার করুণ আর্ত্ত চীৎকারে উৎসবময় পূজাপ্রাঙ্গন কাঁপিয়া উঠিল।

দত্তজা গম্ভীরকণ্ঠে আদেশ করিলেন, "হতভাগা মাগীকে বাইরে টেনে নিয়ে যা।"

তার পর তিনি আকুলি মহাশয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কাল পাটের কাপড় দিয়ে মায়ের আলাদা এক প্রস্থ ষোড়শোপচারে পূজার আয়োজন ক'রে রাখ।"

পূজক বিদ্যানিধি মহাশয় মুক্তকণ্ঠে তাঁহার ভক্তির সাধুবাদ করিয়া উঠিলেন।

বাড়ীর সম্মুখের রাস্তা দিয়া তখন চণ্ডে মাতাল স্খলিতচরণে জড়িতকণ্ঠে গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল,—

"দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে মন! কেবল ভক্তিমাত্র উপাসনা;
তুমি লোক-দেখানো ভক্তি কর, মা তো কারো ঘুষ খাবে না।
মন তোমায় কি ভ্রম খোচে না।"

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা।

২

কলিকাতায় মাল্‌পাড়া মহাল্লার অধিবাসী মৌলবী ইম্‌তিয়াজ আলী মরহুমের (১০) মুখে শুনিয়াছিলাম, তাঁহারা কলিকাতা সহর পত্তনের পূর্ব্ব হইতে বংশপরম্পরায় ঐ মহাল্লায় বাস করিয়া আসিতেছিলেন। (১১) মৌলবী সাহেব মরহুমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুন্‌শী আহ্‌সান্ আলী সাহেবের মুখে শুনিয়াছি, আজমগড় জেলার মাদারবক্‌শ্ নামক এক ব্যক্তি ঐ মহাল্লায়, তাঁহাদের বাটীর পার্শ্বে বাস করিত। এক দিন কোনও কারণবশতঃ মাদারবক্‌শের সহিত মৌলবী সাহেব মরহুমের ঝগড়া হয়। মাদারবক্‌শ্ হিন্দী বা উর্দ্দূ ভাষায় কথা বলিতেছিল, এবং মৌলবী সাহেব বঙ্গভাষায় তাহার উত্তর দিতেছিলেন। এই জন্য মাদারবক্‌শ্ বলিয়াছিল, "আপ্‌কো খেয়াল্ রাখ্‌না চাহিয়ে কে ম্যাঁয় বাংলা জবান্ মোত্‌লাকান্ নেহি সমঝ্‌তাহুঁ। আওর আপ্‌কো এহ ভি খেয়াল্ রাখ্‌না চাহিয়ে কে আপ্ আলেম্ হ্যাঁয়। ইস্‌তারাইসে বাংলা জবান্ ইস্তেয়মাল্ কর্‌নেসে আলেমোঁকি ইজ্জাত মে ধাক্কা লাগ্ জাতা হ্যায়।"

অর্থাৎ—আপনার মনে রাখা উচিত যে, আমি আদৌ বাঙ্গালা ভাষা বুঝি না, আর ইহাও আপনার স্মরণ রাখা উচিত যে, আপনি (আরবী ও ফার্সী ভাষায় পণ্ডিত) আলেম। আপনি যদি এই প্রকারে বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করেন, তাহা হইলে আলেমদিগের সম্মানের লাঘব হইবে।

মৌলবী সাহেব মরহুম উর্দ্দূভাষায় মাদারবক্‌শের এই কথার যে উত্তর দিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতেছি।

মৌলবী (১২) সাহেব মরহুম বলিয়াছিলেন, "তোমারও মনে রাখা উচিত

---

(১০) মরহুম একটি সাঙ্কেতিক শব্দ। মৃত ব্যক্তিদিগের নামের শেষে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। হিন্দুরা যে ক্ষেত্রে ৺ এই সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করিয়া থাকেন, মুসলমানেরা সেই ক্ষেত্রে "মরহুম" শব্দ ব্যবহার করেন।

মৌলবী ইম্‌তিয়াজ আলী কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজের অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন। তিনি কিছু দিন চাকরী করিয়া, ইস্তফা দিয়াছিলেন।

(১১) এখন তাঁহাদের বংশধরেরা উক্ত মহাল্লায় বাস করেন না; নারিকেলডাঙ্গা নর্থ রোডে বাস করিতেছেন।

(১২) ইংরাজী-শিক্ষিত মুসলমানদিগকেও আজ কাল 'মৌলবী' বলা হইতেছে। মৌলবী লিখিলে কে আরবী ফার্সীর মৌলবী ও কে ইংরাজীর মৌলবী, তাহা বুঝিবার

রে, এই কলিকাতা সহরটীও বাঙ্গালা দেশের একাঙ্গ। এখানকার ভাষা বাঙ্গালা। আমি যখন তোমার দেশে যাইব, তখন উর্দ্দু অথবা হিন্দী ভাষায় কথা কহিব। এখন তুমি আমাদের দেশে আসিয়াছ, তোমাকে এই দেশের ভাষায় কথা কহিতে হইবে। তুমি যেমন উর্দ্দু বা হিন্দীকে তোমার মাতৃভাষা মনে কর, আমিও তেমনই বাঙ্গালা ভাষাকে আমার মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করি। প্রয়োজন তোমার, আমার নহে। তোমাকেই আমাদের ভাষায়, তোমার মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া আমাদিগকে বুঝাইতে হইবে। নিজের বাড়ীতে বসিয়া কেন আমি আমার মাতৃভাষাকে ত্যাগ করিব?

"মৌলবী ও মওলানা হইলেই যে উর্দ্দু ভাষায় কথা কহিতে হইবে, এ কথা তোমাকে কে বলিল? উর্দ্দুভাষাও ত ঐস্‌লামিক ভাষা নহে? মুসলমান রাজত্বের সময়, সৈন্যদিগের মধ্যে ভাবের বিনিময় করিবার জন্য, উর্দ্দু ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। (১৩) যে সকল ইংরাজ শাসনকর্ত্তা এ দেশ শাসন করিতেছেন, তাঁহারা যেমন প্রজার মনের ভাব বুঝিবার জন্য, প্রজার সহিত ভাবের বিনিময় করিবার জন্য বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকেন, তোমরাও সেই প্রকার নিজের মনের ভাব আমাদিগকে বুঝাইবার জন্য, এবং আমাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কর্ম্ম করিবার জন্য, বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা কর না কেন? বাঙ্গালা দেশে বাস করিবে, বাঙ্গালীর সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া চলিবে, এবং নিজের দেশের ভাষায় বাঙ্গালীর সহিত বাক্যালাপ করিবে, ইহা কখনও হইতে পারে না। হয় তোমাদিগকে বাঙ্গালা দেশ ছাড়িতে হইবে, নতুবা বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে।"

মওলানা আব্দল খালেক্ মরহুম ও মৌলবী ইম্‌তিয়াজ আলী মরহুমের উক্তির সারমর্ম্ম উপরে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। উহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ১০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে খাঁটী বাঙ্গালা ভাষাই কলিকাতায় মুসলমানদিগের মাতৃভাষা ছিল। কলিকাতা ব্যতীত বাঙ্গালা দেশের অপরাপর স্থানের মুসলমানেরাও যে

উপায় নাই। তাই আমরা আরবী ও ফার্সী ভাষায় পণ্ডিতদিগকে "মৌলবী" ও ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে "মৌলভী" লিখিবার ব্যবস্থা করিয়াছি।

(১৩) কাহারও কাহারও মতে, সম্রাট শাহজাহানের শাসনকালে, ভারতবর্ষের কয়েকটী প্রাদেশিক ভাষা ও আরবী-ফার্সী ভাষা হইতে কতকগুলি শব্দ লইয়া উর্দ্দু ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল।

(১১) পূর্ব্বাপর বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, সপ্রমাণ করিয়াছি। (১৫)

কলিকাতা সহরের পঞ্চম শ্রেণীর পৃথক পৃথক শাখার মুসলমানেরা বাঙ্গালা ভাষার সহিত কোনও প্রকার সম্বন্ধ না রাখার ফলে, তাঁহারা খাঁটী বাঙ্গালী মুসলমানদিগের নিকট সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেছেন না। পরন্তু তাঁহারা খাঁটী উর্দ্দুভাষাভাষীদিগের দলেও সম্পূর্ণরূপে মিশিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের এখন উভয়-সঙ্কট হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার বর্ণমালার সহিত তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত থাকায়, এ দিকে অগ্রসর হইতে সাহসে কুলাইতেছে না। পরন্তু ভাঙ্গা-উর্দ্দুর কল্যাণে তাঁহারা বিশুদ্ধ উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা করা সহজসাধ্য বলিয়া মনে করিতেছেন। এই কারণে তাঁহারা বিগত ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে ক্রমে ক্রমে উর্দ্দু ভাষার পক্ষপাতী হইয়াছেন।

বিগত ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার টাউনহলে এক সভা হইয়াছিল। সভা-আহ্বানকারীরা যে প্রায় সকলেই পূর্ব্বোক্ত পঞ্চম শ্রেণীর প্রথম শাখা শ্রেণীর মুসলমান ছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। উক্ত সভায় মোট তিনটী মন্তব্য গৃহীত হইয়াছিল। আমরা নিম্নে প্রথম প্রস্তাবটী উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। যথা—

"ভারতের মুসলমানদিগের মাতৃভাষা উর্দ্দু। সুতরাং এই সভা ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বঙ্গপ্রদেশের মুসলমানদিগের মধ্যেও উর্দ্দু ভাষার প্রচলন আবশ্যক বলিয়া মনে করেন, এবং এই সভা বঙ্গপ্রদেশের মুসলমান নেতৃবৃন্দকে এই কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন।"

যিনি সেই সভায় এই প্রস্তাবটী উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, তিনি এক জন

(১৪) ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ-সিটী সহরদ্বয়ের অধিকাংশ মুসলমান অধিবাসীই ভাঙ্গা উর্দ্দু, মাতৃভাষারূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, উক্ত দুই স্থান মুসলমান আমলের শেষ সময় বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজধানী ছিল। চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে যে সকল আরব ও পারস্যদেশবাসী সওদাগর, দরবেশ ও পরিব্রাজক আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরেরা এখন বাঙ্গালা ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত আলাওল, কাজী দৌলত, দৌলতী হামিদুল্লা প্রভৃতি খ্যাতনামা কবিগণ ইহার দৃষ্টান্তস্থল

(১৫) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ত্রয়োবিংশ ভাগের দ্বিতীয় সংখ্যার ৯০ হইতে ১০২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

শ্রদ্ধাভাজন বাঙ্গালী মুসলমানের বন্ধুধর। তিনি বলিয়াছিলেন, "যে বা যাহারা বাঙ্গালা ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করে ও বাঙ্গালা ভাষায় কথা-বার্ত্তা কহে, তাহারা মুসলমান নহে।" আমি প্রকাশ্য সংবাদপত্রে একাধিকবার বিবিধ যুক্তিতর্ক দ্বারা তাঁহার এই উক্তির খণ্ডন ও প্রতিবাদ করিয়াছি।

অতঃপর কলিকাতা সহরে আরও কয়েকবার এ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আলোচনাকারী মহোদয়েরা বিশেষ কোনও সুফল প্রাপ্ত হয়েন নাই। তাঁহাদের এই চেষ্টা বরাবরই বন্যার প্রবাহে তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বারংবার অকৃতকার্য্য হইয়াও তাঁহারা হতাশ বা ভগ্নোদ্যম হয়েন নাই। সম্প্রতি তাঁহারা আবার নূতন করিয়া এই আন্দোলনের আরম্ভ করিয়াছেন।

কিছু দিন হইল, উর্দ্দূ ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য ভারতের বর্ত্তমান রাজধানী দিল্লী নগরে এক উর্দ্দূ সাহিত্য-সভা স্থাপিত হইয়াছে, এবং কলিকাতাতেও উহার একটি শাখা সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত পূজাবকাশের সময় এই সভার পক্ষ হইতে কয়েক জন প্রচারক বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় সভার উদ্দেশ্য প্রচার করিতে বাহির হইয়াছিলেন। (১৬)

কলিকাতায় যে সভা স্থাপিত হইয়াছে, তাহার নাম হইয়াছে, "আঞ্জুমন-ই-তারাক্কিয়ে উর্দ্দূ-বাঙ্গালা।" অর্থাৎ, বাঙ্গালা দেশের মুসলমানদিগের (মক্তবের) জন্য, উর্দ্দূ ভাষার উন্নতিবিষয়িণী সভা। সভায় সভাপতি হইয়াছেন, দিল্লী-নিবাসী ও কলিকাতা-প্রবাসী বিখ্যাত সিগারেট-সওদাগর, হাজী বক্‌শ্ ইলাহী সাহেবের অন্যতম পুত্র, আমাদের প্রিয় বন্ধু মিঃ আব্দর রহিম বক্‌শ্ ইলাহী; আর সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু মৌলভী ওয়াহেদ হোসেন সাহেব, বি-এল, উকীল। (১৭) আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে সভা বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালী মুসলমানদিগের জন্য স্থাপিত হইল, তাহার কোনও সংবাদই বঙ্গদেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৫২৷৷০ জন মুসলমানকে

(১৬) পরে জানা গিয়াছে যে, আজিও বঙ্গদেশে মধ্যে মধ্যে প্রচারকদিগকে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু শ্রোতার অভাবের জন্য তাঁহাদের প্রচার কার্য্যে বাধা উপস্থিত হইতেছে।

(১৭) আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, বন্ধুবর মৌলভী ওয়াহেদ হোসেন সাহেব, আমাদের এই প্রবন্ধের বিষয় অবগত হইয়া, এবং নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, উর্দ্দূ সাহিত্য-সভার সম্পাদকের পদ ত্যাগ করিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ, সন্দেহ নাই। যে খোদা তাঁহাকে সুমতি দিয়াছেন, তিনি তাঁহার মঙ্গল করুন। আমিন।

জানান হইল না; অথচ সভা স্থাপিত হইল! দুই চারি জন 'খোষ-খেয়ালী' ও 'খোষ-মেজাজী' লোকে যাহা করিবেন, বাঙ্গালা দেশের মুসলমান অধিবাসি-বর্গ যে 'জী-হুজুর' ও 'হাঁ-হুজুর' বলিয়া অবনতমস্তকে তাহা স্বীকার করিয়া লইবেন, ইহা কখনই সম্ভব নহে।

প্রিয় বন্ধু মিঃ আব্দর রহিমের মাতৃভাষা উর্দ্দু, সুতরাং তাঁহাকে একটি উর্দ্দু সাহিত্য-সভার সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে দেখিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। কিন্তু বন্ধুবর মৌলভী ওয়াহেদ হোসেন সাহেবকে কোনও দিন আমরা এই প্রকার উর্দ্দু সাহিত্য-সভার সম্পাদক-রূপে দর্শন করিবার আশা করি নাই। কারণ, আমরা জানি, তিনি খাঁটী বাঙ্গালী। (১৮)

কোন্ ভাষা বাঙ্গালী মুসলমানদিগের মাতৃভাষা হওয়া উচিত, এবং বাঙ্গালী মুসলমানেরা কোন্ ভাষাকে স্বীয় মাতৃভাষার স্থলাভিষিক্ত করিলে তাঁহাদের মঙ্গল হইবে, সে চিন্তা বাঙ্গালার খাঁটী বাঙ্গালী মুসলমানদিগের পক্ষেই স্বাভাবিক, এবং সেরূপ চিন্তা তাঁহারা করিয়াও থাকেন। মুন্‌শী মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী মরহুম, শাহ্ গরীবউল্লা মরহুম, মৌলবী সৈয়েদ হামজা মরহুম, সৈয়েদ আলাওয়াল মরহুম, মৌলভী সৈয়েদ হামিদুল্লা মরহুম, কাজী দৌলত মরহুম, পণ্ডিত আব্দল হাকিম মরহুম, মীর মোশাররফ হোসেন মরহুম, মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরউল্লা মরহুম, নওয়াব সৈয়েদ নওয়াব আলী চৌধুরী খান্‌বাহাদুর, মুন্‌শী মোহাম্মদ রেয়াজদ্দিন আহমদ, মুন্‌শী শেখ আব্দর রহিম, মুন্‌শী আব্দল হামিদখান, ইউসফ-জাই মরহুম, মৌলভী নৈমুদ্দিন মরহুম, মুন্‌শী আব্দল কাদের মরহুম, মুন্‌শী গোলাম মওলা সিদ্দিকী, মুন্‌শী আব্দল করিম সাহিত্যবিশারদ, মুন্‌শী মোজাম্মেল হক কবি-কণ্ঠ, মৌলবী মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মৌলবী মোহাম্মদ মনির উজ্জমান, মৌলভী রেয়াজদ্দিন, মৌলভী একিন্‌উদ্দিন আহমদ, মুন্‌শী আব্দল লতিফ, মুন্‌শী মোহাম্মদ কে, চাঁদ, মুন্‌শী ফজ্‌লুল করিম, মৌলভী কাজী ইম্‌দাদুল হক, মুন্‌শী ইস্‌মাইল হোসেন সেরাজগঞ্জী, মৌলভী মোহাম্মদ শহীদুল্লা, মুন্‌শী রওশন আলী চৌধুরী, মৌলভী ইয়াকুব আলী চৌধুরী, মৌলভী ওস্‌লিমউদ্দিন আহমদ, মুন্‌শী কায়কোবাদ, মৌলভী মোহাম্মদ মোজাম্মিল হক্, মুন্‌শী আব্দল মালেক

(১৮) মৌলভী ওয়াহেদ হোসেন সাহেব বরাবরই বঙ্গভাষার অনুরাগী। উর্দ্দু সাহিত্য-সভার সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তিনি যে যে ভাবে বঙ্গসাহিত্যের অনুশীলন করিয়াছিলেন, এই প্রবন্ধমধ্যে আমরা সেই সকল ঘটনা উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি তাঁহার ভ্রমসংশোধন করায়, তাহা পরিত্যক্ত হইল।

চৌধুরী, মুন্‌শী আব্দল জব্বার, শ্রীমতী মিসেস্ আর, এস, হোসেন, শ্রীমতী ফাতেমা খানম্, শ্রীমতী জোহরার রহমান, শ্রীমতী আজিজুল্ নিসা প্রভৃতি সাহেবান্ ও সাহেবানীগণ বাঙ্গালা ভাষাকেই বাঙ্গালী মুসলমানদিগের মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

গত পূর্ব্ব চৈত্র মাসে বর্দ্ধমান সহরে বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষাসমিতির যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতেও এ বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষাই যে বাঙ্গালী মুসলমানদিগের মাতৃভাষা, সে কথা উক্ত শিক্ষা-সমিতিও স্বীকার করিয়াছেন। এমন কি, উক্ত শিক্ষা-সমিতিতে বঙ্গীয় মুসলমানদিগের জন্য জুমা ও ঈদের খোত্‌বা যে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত ও পঠিত হওয়া উচিত, এই মর্ম্মে এক মন্তব্যও গৃহীত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত, বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা-সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ কলিকাতা ও বঙ্গদেশের অপরাপর মাদ্রাসা-সমূহে বঙ্গভাষা শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট একাধিকবার অনুরোধও করিয়াছেন। এমন অবস্থায় বাঙ্গালী মুসলমানদিগের মাতৃভাষা—বাঙ্গালা ভাষাকে পরিবর্জ্জন করিয়া, উর্দ্দূ ভাষাকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করিবার সার্থকতা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, অতঃপর আমরা বাঙ্গালী মুসলমানদিগের জন্য স্থাপিত, পূর্ব্বোক্ত উর্দ্দূ সাহিত্যের উন্নতিবিষয়ক সভার উদ্দেশ্যগুলি একে একে নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, মোট নয়টী উদ্দেশ্য লইয়া এই সভা গঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম তিনটী মুখ্য উদ্দেশ্য, এবং শেষ ছয়টী গৌণ উদ্দেশ্য।

১। বৃটীশ ভারতে উর্দ্দূ ভাষা ও সাহিত্যের প্রাধান্য-স্থাপন। (১৯)

২। উর্দ্দূ ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির চেষ্টা, এবং তাহার শ্রীবৃদ্ধিসাধনের উপায়-অবলম্বন।

৩। ভারতের সকল প্রদেশের মুসলমানেরা যাহাতে উর্দ্দূ ভাষাকে কথিত ও লিখিত ভাষারূপে গ্রহণ করেন, তাহার চেষ্টা।

৪। ভারতবর্ষের সকলপ্রদেশবাসী মুসলমানদিগের মাতৃভাষা এক না হইলে, তাহাদের মধ্যে একতার ভিত্তি সুদৃঢ় হইবে না।

---

(১৯) সভার কর্ত্তৃপক্ষ আশা করেন যে, ইউরোপের বর্ত্তমান মহাসমর শেষ হইলে, ভারতীয় শাসন-ব্যাপারের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। এই পরিবর্ত্তনের সময়, ভারতের যে কোনও একটি ভাষাকে সরকারী ভাবে প্রাধান্য দেওয়া হইবে। উর্দ্দূ ভাষা যাহাতে সেই প্রাধান্য লাভ করিতে পারে, সভার কর্ত্তৃপক্ষ সেরূপ চেষ্টা করিবেন ও করিতেছেন।

৫। ভারতবর্ষ হিন্দুপ্রধান। হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অল্প। যদি মুসলমানেরা একতার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাদের উপর হিন্দুর অত্যাচারের মাত্রা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে।

৬। উর্দ্দু ব্যতীত অপর কোনও দেশীয় ভাষাই ভারতের মুসলমানদিগের মাতৃভাষার স্থান অধিকার করিতে পারে না। কারণ, ভারতের ভাষাসমূহের মধ্যে উর্দ্দু ভাষাই একমাত্র ইস্‌লামধর্ম্মানুমোদিত ভাষা।

৭। যাহাদের ধর্ম্মের সহিত মাতৃভাষার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর নহে, তাহারা সমানভাবে ধর্ম্ম ও মাতৃভাষার সম্মান বজায় রাখিতে পারে না। হয় তাহাদিগকে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অপরের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে, নতুবা মাতৃভাষার মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া স্বধর্ম্মানুমোদিত কোনও ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, এবং তাহার উৎকর্ষসাধনে বত্নবান হইতে হইবে।

৮। হিন্দুরাই ভারতের আদিম অধিবাসী, এবং অল্প দিন হইল, মুসলমানেরা এ দেশে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মুসলমানেরাই উর্দ্দু ভাষার স্রষ্টা, এবং ইহাই ইস্‌লাম ধর্ম্মের অনুমোদিত ভাষা। একমাত্র উর্দ্দু ভাষা ব্যতীত, এ দেশের অপর সমস্ত ভাষাই হিন্দুদিগের ধর্ম্মানুমোদিত ভাষা। মুসলমানেরা যদি উর্দ্দু ভাষা ব্যতীত হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত কোনও ভাষার, যে কোনও একটির প্রাধান্য স্বীকার করে, তাহা হইলে ক্রমেই তাহাদের জাতীয়তার আদর্শ নষ্ট হইয়া যাইবে, এবং ধর্ম্মবিশ্বাসের মূল শিথিল হইয়া পড়িবে।

৯। ভারতের সকলপ্রদেশবাসী মুসলমানেরা যদি উর্দ্দু ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার না করে, তাহা হইলে যে যে স্থানের বা যে যে প্রদেশের মুসলমানেরা সেই সেই প্রদেশের প্রাদেশিক ভাষাকে মাতৃভাষারূপে ব্যবহার করিতেছে ও করিবে, তাহাদিগকে প্রাইমারী বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকতার অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইবে। কারণ, প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে কিছুতেই মুসলমানেরা হিন্দুদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না। ফলে মুসলমান ছাত্রেরা অর্থ দ্বারা হিন্দু শিক্ষকদিগের উদর পূর্ণ করিতে বাধ্য থাকিবে। মুসলমান সমাজে শিক্ষকের সৃষ্টি হইবে না। অর্থনীতি হিসাবে একটি প্রধান আয়ের অংশ হইতে চিরকালতরে মুসলমানদিগকে বঞ্চিত থাকিতে হইবে।

আমরা একে একে উপরে নয়টী উদ্দেশ্যের সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এইবার আমরা একে একে বিবিধ যুক্তি ও তর্কের দ্বারা ঐ উদ্দেশ্যগুলির খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিব। ক্রমশঃ।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী।

মৃত্যুর আহ্বান।

হায় নিদ্রা, হায় শান্তি, হায় রে জীবন!
হা আমার মূঢ়, মূক, মলিন বেদন!
আবার উঠিল ঝড়—আঁধার করিয়া,
সকল বন্ধন বাধা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া;
একবার খুঁজেছিলি আলো আলেয়ার—
এবার কোথায় যাবি হৃদয় আমার!
রে পথিক প্রাণ! কার মুগ্ধ করি গান
নিশির ডাকের মত ডাকে তোর নাম।
উঠিলি আসন ছাড়ি' ফেলিয়া সাধনা—
বক্ষে আঁকড়িয়া ধরি' অসীম বেদনা।
তারে যদি দিবি পূজা, চল্, তবে চল,
ছিঁড়ে লয়ে হৃদয়ের রক্ত জবাদল!
ওরে মূর্খ, নহে প্রিয়া,—মৃত্যু তোরে মাগে;
বংশীসম—মধু কণ্ঠে—মধু অনুরাগে!

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। ভাদ্র।—'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সংবর্দ্ধনা উপলক্ষ্যে রামমোহন রায় লাইব্রেরী হলে' আচার্য্য শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল 'পশ্চিমে ও পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের আদান প্রদান' নামক যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, 'প্রবাসী'র এই সংখ্যায় তাহাই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। শীল মহাশয়ের নামের মহিমাই বোধ হয় তাহার প্রধান কারণ। 'Cult of Nationalism' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'সর্ব্বাবরণমুক্ত মানবে'র 'যে আদর্শ ইউরোপের সম্মুখে ধরিয়াছেন', তাহা আমরা দেখি নাই; দেখিবার উপায়ও নাই। কারণ, গবর্মেণ্ট এ দেশে তাহার প্রচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সেই অজ্ঞাত আদর্শের

[illegible] আমিয়ের একটা বড় অধ্যায়, একটা ঝঞ্ঝাবাত, একটা storm and stress [illegible] প্রচেষ্টা ব্যক্তিজীবনের জন্য সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়।' দীন মহাশয় কি বোঝাতে নিয়া [illegible] লেখেন? 'storm and stress' পাঠে বঙ্গবাণী না বুঝিতে পারে বলিয়া তিনি [illegible] লেখক তাহার বক্তব্যের সঙ্গে 'sturm und drang' বলিয়া যাহার ব্যাখ্যা দিয়াছেন 'আত্ম প্রচেষ্টা ব্যক্তিজীবনের জন্য সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়', ইহাই যদি তাঁহার মনঃপূত হইবে, বাঙ্গালীর জীবন হইতে তাহার ঠিক পর্যায় খুঁজিয়া মুদ্রিত বোধিনীর জন্য গোটা দুই গোলাগোলাই—'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়' নামক সংবিধি। বাঙ্গালীর জীবনে—দীন মহাশয় সহ ডাক্তার স্টাইতোন মুখোপাধ্যায় সরস্বতীর সাহচর্য্য করিতেছেন কেন? 'সত্যমেবজয়তে' যাঁহাদের আদর্শই যদি তাঁহার জন্য হয়, তাহা হইলে, বাঙ্গালীর উত্তরপুরুষের জন্য তিনি 'সর্বমিথ্যেবজয়তে' আদর্শের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন কেন? অবশ্য, সার ব্রাডলো যে [illegible] মুক্ত' মানবের শ্রেষ্ঠ আদর্শ, অর্থাৎ অনেচ্ছাচারের অতি সরল আদর্শ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ডাক্তার স্টাইন কি সেই আদর্শের পূজা করিয়াই বাঙ্গালীকে মুক্তির পথে [illegible] করিবেন?—তাহার পর প্রশ্ন করিব,—হিন্দের হইতে 'ঋত ও তথা' আনিয়া কি [illegible] 'মুক্তির পথে বাহির' করা যায়? কেম্ব্রিজীয় প্রথার মত তাহা। 'sturm und drang' কি কেহ আহরণে ভূমিষ্ঠা আমদানী করিতে পারে? আবহাওয়ার যে অবস্থায় [illegible] আবির্ভাব হয়, দেশে তাহার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি না হইলে কি বড় [illegible] উদ্ভব সম্ভব? ডাক্তার স্টাইন মনে করেন,—'পূর্ব ও পশ্চিমের [illegible] একটা 'আদানপ্রদান' চলিতেছে। পূর্ব প্রদান করিতেছে, ইহা সত্য; তবে তাহা কাঁচা মাল ও পাকা সোনা। পশ্চিম [illegible] করিতেছে। পূর্বের ভাবের আদানে পশ্চিমের তেমন আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। সে বিনে পূর্বের আগ্রহ অত্যন্ত অধিক; এত অধিক যে, সময়ে সময়ে সে নিজ আমাদের [illegible] মহাত্মাদের মত অনেক মনীষী অবাধে প্রদান করিয়া গেছেন, এবং করিতেছেন বটে, কিন্তু [illegible] সম্বন্ধে একটু সন্দেহ আছে। আর এক কথা, প্রদান করিবে কে? যাহারা প্রদান করিতে পারে, তাহারা ত পশ্চিমের লাম্পদানী মালেই আপনাদের ভরাটু পূর্ণ করিতেছে; [illegible] নেওয়া মালের স্থান নাই। পূর্ব।—অন্ততঃ আমাদের পূর্ব যেমন মহত্ত্বে অবলোকে পশ্চিমের দান গ্রহণ করে, পশ্চিম তাহা পারে না; দেড় শত বৎসর আমাদের সংস্রবে থাকিয়াও [illegible] আমাদের একটা ভাবেরও ভাবুক হইতে পারে নাই, ইহাও তাহার অন্য এক প্রমাণ। 'কালে বাবু পণ্ডিত হইতে পারে।' তাহার পর,—'পশ্চিমের সামাজিক আদর্শের [illegible] যাহা উদার ও উন্নত, তাহার সহিত পূর্বদেশীয় হিন্দুর সামাজিক আদর্শের reconciliation বা সৌসামঞ্জস্যের স্থান আছে। Rituals (পদ্ধতি) symbols (প্রতীক) ceremonies (অনুষ্ঠান) myths (পুরাণ) প্রভৃতি ছাড়াও হিন্দুর মধ্যে বহুবের একটা বিশেষ ভাব আছে—হিন্দু-সভ্যতার তাহা এক আশ্চর্য্য বিশেষত্ব। সেই মুক্তি-তত্ত্বে ও মুক্তি-[illegible] সাধ্য-বৈষম্য, সসীম-অসীম, ভোগ ও ত্যাগের এক মহানন্দিলন, এক মহাকাব্য সমাধান [illegible] হিন্দুর কোনটি কর্তব্যও নহে, কোনটি rituals (পদ্ধতি) symbols [illegible]

মুক্তির দ্বারা আত্মার ও আত্মাকৃতি নহে। এই ভারতবর্ষে নানাজাতির ও ধর্মমতের বৈচিত্র্যের [illegible] মিল। এই এক বিশাল মুক্তির আদর্শ হিন্দুধর্মের ভিতরে ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং এই [illegible] বিরুদ্ধসংঘে দান করা সম্বন্ধে হিন্দুর গুরুতর দায়িত্ব আছে।' 'reconciliation' কি [illegible]? সে কথা যাউক ;—'পদ্ধতি, প্রতীক, পুরাণ প্রভৃতি ছাড়াও হিন্দুর মধ্যে সর্বাবয়ব [illegible] বিশাল মুক্তির ভাব আছে' বটে, কিন্তু তাহা প্রতীক প্রভৃতি ছাড়া নয়। তাহার আলো-[illegible] একটা সবল, সম্মতি, ধারা আছে। তাহার একটাকে ছাড়িয়া আর একটাকে রাখা যায় না ;—প্রতীক প্রভৃতিও সেই মুক্তির সাধন। স্তরে স্তরে, ক্রম-পর্য্যায়ে মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে হয়, ইহাই হিন্দুর বিধান। বন্ধনে সংযত সাধারণ মানব অনুশীলনের দ্বারা আপনাকে মুক্তি-সাধনার যোগ্য করিবে ; তাহার পর ক্রমে ক্রমে সাধনার পথে অগ্রসর হইবে ; সাধনার উচ্চ [illegible] হইতে অবশেষে পূর্ণ পরিণতি ও সিদ্ধি লাভ করিবে ; তখন কোনও বন্ধন থাকিবে না ; [illegible] হিন্দুর বিধান। পুরাণমাত্রই 'myths' নহে। আচার্য্য শীল রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার এই [illegible] বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া ইহাতে দুই একটা কথা বলিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রতি অবিচার করিয়াছেন। অত্যন্ত কৃপণ যেমন অতি কষ্টে দুই একটা পয়সা খরচ করে, সেইরূপ। শ্রীযুক্ত অমিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্যের পুরাতন ও নূতন ধারা'য় আপনার ইংরেজী পড়া-শুনা ও বাঙ্গালা লেখাপড়ার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। অমিতবাবু এই প্রবন্ধে বলিয়াছেন ;—'শূদ্রদেরও মধ্যেও যে মনুষ্যত্ব মহত্ত্ব সংযম আত্মত্যাগ আছে তাহা বর্ণনীয় ; অবহেলিত, পরদলিত, দুর্বিত "নীচ" জাতির প্রবন্ধেও যে করুণীয় ও মহনীয় ভাব আছে, যে মনুষ্যত্ব দেখিবার আছে, তাহা দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, নিদিধ্যাসিতব্য।'—অমিতবাবুর বক্তব্য এই যে, ইংরেজী সাহিত্যের নূতন ধারায় এই 'নীচ জাতি' স্থান লাভ করিয়াছে, এবং বাঙ্গালাতেও তাহার সূচনা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালা সাহিত্যে এ বিষয়ের যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন, এবং করিতেছেন। অমিতবাবুর প্রবন্ধে উদ্ধৃতগুলি ভিন্ন অন্য কোনও নূতন কথা নাই।—রাধাকমল রবীন্দ্রনাথে ইহার অভাব দেখিয়াছেন ; অমিতকুমার বলিতেছেন,—'যত দূর বুঝি, তাহাতে মনে হয়, ইংরেজী সাহিত্যে যেমন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এই নবধারা-প্রকাশে যশস্বী, তেমনি আমাদের সাহিত্যে "এসিয়ার রাজকবি" রবীন্দ্রনাথ এই নবভাবের, নবরুচির, নবধারার, নব সাহিত্যকলার প্রবর্ত্তয়িতা। কবিতা ও ছোট-গল্পে তিনিই এই নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।' রাধাকমলের আলোচনার সুধা-পড়া হউক।—এই আলোচনার আর একটা দিক আছে। সংক্ষেপে তাহা এই :—যাহা ইউরোপের সাহিত্যে আছে, তাহাই ভারতের বা বাঙ্গালার সাহিত্যে থাকিবে, এ আকাঙ্ক্ষার কারণ কি? ইংরেজী সাহিত্যের 'আদর্শে' নয়—নবনবে বাঙ্গালা সাহিত্যে ইংরেজীয়ানার প্রবর্ত্তন হইয়া থাকিবে ; কিন্তু তাহা গতানুগতিকতার নকল, মৌলিকতার পরিচায়ক নহে। ইউরোপের 'ইতরে' ও বাঙ্গালার 'ইতরে' প্রভেদ আছে। সমাজের সংস্থানেও পার্থক্য অত্যন্ত অধিক।—স্বাভাবিক কারণে ইউরোপের সাহিত্যে যে বিবর্ত্ত হইয়াছে, তথাকথিত 'ইতর' নায়ক-নায়িকার সৃষ্টি হইতেছে, সেই সকল কারণের সমবায়ে এ দেশে সেই অবস্থার সৃষ্টি না হইলে, ইউরোপে হয় বলিয়া, আমাদের সাহিত্যেও তাহার ঘোড়-কলম বাঁধিতে হইবে না। ইউরোপের সাহিত্যে ঔদাত্ত চরিত্রের নিদানের পর স্বাভাবিক কারণে সমাজ-

সাধারণের ছবি ফুটিতেছে। তোমার আধুনিক সাহিত্যে সে পূর্ণ-স্তন কই? গোড়া কই? আগেই ডগার সৃষ্টি করিবে? নিজের জীবনই দেখিতে পাও না, পরের জীবন, উচ্চ স্তরের জীবন, বা নিম্ন স্তরের জীবন কেমন করিয়া দেখিবে?—ইউরোপে 'ইতর' ও 'দরিদ্র' প্রায় একার্থক। ভারতে দরিদ্র ও ধর্ম্ম—ইউরোপের মত এখনও 'ভিন্ন' হয় নাই; একাসনবর্ত্তী আছে। অন্ততঃ, বাঙ্গালায় 'দারিদ্র্য' ও 'অপরাধ' একার্থবাচী নহে। এ দেশের সাহিত্যে মানব-সাধারণের শ্রেণীবিভাগ করিয়া কখনও রসের সৃষ্টি হয় নাই। ধনীর সাহিত্য ও গরীবের সাহিত্য ইউরোপে আবশ্যক হইয়াছে। এখানে রাজা প্রজার সাহিত্য একই ছিল। এক থাকাই স্পৃহনীয়। তাহাই আমাদের আদর্শ।—ইউরোপে আছে বলিয়াই এখানেও তাহা থাকিবেই, অথবা না থাকিলে চলিবে না, এমন কোনও কথা নাই। যদি তর্কের অনুরোধে তাহাও স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও মনে রাখা উচিত, যে অনুভূতির প্রভাবে ইউরোপ এখন Demosকে স্বীকার করিতেছে, দেশে সে অনুভূতির সঞ্চার না হইলে, সাহিত্যে স্বাভাবিক ভাবে মানব-সাধারণের ছবি ফুটিবে না, ফুটিতে পারে না। দেশ যখন আপনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিবে—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', তখন সকলের সুখ-দুঃখে তাহার বেদনা-বোধ জাগিয়া উঠিবে;—সেই বেদনাবোধ সাহিত্যকেও অনুপ্রাণিত করিবে। বোধ হয়, ভারতবর্ষে সে বেদনাবোধ একটু জাগিয়াছে। তাই এ দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। আশার কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইউরোপের দশমা দিয়া যেন আমরা দেশকে দেখিবার চেষ্টা না করি। ইউরোপে উচ্চ স্তরে ও নিম্ন স্তরে যেরূপ সম্বন্ধ, প্রতীচ্য সমাজে উভয় স্তরের যেরূপ সংঘর্ষ, ভারতবর্ষে 'পতিত জাতির দুর্দ্দশা' সত্ত্বেও, অবস্থা সেরূপ বিষম—সেরূপ শোচনীয় নহে। অন্ততঃ, আমাদের আদর্শ উচ্চ। তাহা যেন আমাদের মনে থাকে।—আর একটা কথাও স্মরণীয়। বিধিত, পরাধীন, নিষ্ক্রিয় দেশে জীবনের সে স্ফূর্ত্তি কই, যাহাতে মানব-জীবন বিচিত্র ও নানা রসে পূর্ণ হইয়া উঠে?—যে তীব্র সুখ, যে তীব্র দুঃখ 'গ্যাল্‌ভ্যানিক ব্যাটারী'র মত মানুষকে 'চাঙ্গা' করিয়া তোলে, সে তীব্র সুখ, সে তীব্র দুঃখ তোমার সমাজের কোন্ স্তরে আছে? যে তীব্র দুঃখবোধে নিষ্পিষ্ট রুসিয়ায় টলষ্টয়ের মত, ডেষ্টোভস্কীর মত, গোর্কীর মত মানববিদ্বের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে, তোমার দেশে সে অন্তর্ভেদ দুঃখের তীব্র, তীক্ষ্ণ, অনুভূতি কই? শুধু 'করমসে' লোক-সাহিত্যের সৃষ্টি হয় না; হইতে পারে না; কখনও কোনও দেশে হয় নাই; হইবে না। জাতির অনুভূতিই সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করে। সাহিত্যই জাতির অনুভবকে সঞ্চয় করিয়া রাখে। শুধু 'সাত নকলে' পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন করা যায় না। বঙ্কিম, রবীন্দ্রই সম্ভব; টলষ্টয়, ওয়াল্ট হুইটম্যান সম্ভব নয়। 'অন্য' ও 'ভিন্ন' দেশের আদর্শে 'জাতীয়' ও 'স্বদেশী' সাহিত্যের সৃষ্টি হয় না। যখন জাতির মধ্যে দেশাত্মবোধ ফুটিয়া উঠে, তখন জাতীয় প্রতিভারও উদ্ভব হয়। সে প্রতিভা নকল করে না, ভরসা খাটে না। তখন সেই প্রতিভা জগতের নানা আদর্শ দেখিয়া, আপনার ভাবে আপনার আদর্শ গড়িয়া লয়। সেই আদর্শে জাতি অনুপ্রাণিত হয়। তাহার সাহিত্যও জাতির উপযোগী, আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুকূল হয়; সে সাহিত্যে 'সাত রাজার ধন এক মাণিক'; তাহাতেই আত্মস্বরূপের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়। সেই ভাবী সাহিত্যই মণি; এ সাহিত্য সে হিসাবে 'মৃদ্ভাং চয়ঃ'।

'সবখানি ক'টি মেয়ে এ অধি র মূলধন চায়।' এই 'সবখানি' কথাটির মধ্যে যে ইঙ্গিত আছে, তাহা কবির সমস্ত ভাবে প্রতিনিধিত্ব করিতেছে না। এই 'কৃষ্ণা চাই' যার দাবী পড়িবে, তাহার সমস্তকে সেই দাবী পূরণ করিতে হইবে। আরও চাপে, আরও উত্তাপে, মহাকালের মহা-কিংবা সেই অন্ধকার স্তূপে হীরকও উৎপন্ন হইতে পারে। কেবল তাহাতে, নরজন্মটিতে যাহাকে বলা হয় গোলকধাঁধা পরিণত হইবে না। শ্রীমতী পারা দেবীর 'একলা' নামক পুস্তক মাত্র বহে। ইংরাজ ভোজনাথ বসু 'রাজপুতানার মনোজ্ঞ দৃশ্য' নামে যাহা প্রচারিত, একটি গানের অনুবাদ করিয়াছেন। মীরা কবি বলিতেছেন,—

'আজনা রূপা। দিই তোমাকে
পাজনা তোমার পাওনা,
আর বেশী আর চাও যদি তো
বলবো সোজা— যাও না।'

শ্রীমতী মল্লিকের শেষ দুইটি ছত্র—

'পাওনা যাচাই, তবে প্রেমের—
এই আমাদের গণনা।'

এ কথা সর্বস্ব দিতে হয়! অনেকে তাহার উপর বিবেকবুদ্ধিটুকুও বলিদান দেন। তবে তাহার ফলে 'চাকরী পাওয়া যায়; 'সেমন তেমন চাকরী—বি-এ-ভাত' কপালে জুটিয়া যায়; অনন্ত নাম হইয়া যায়; পশুপতি রথপতি হইতে পারে; ভারত-পৃথ্বীরাজের ভাবটা চিরজাগরূক থাকে।— শ্রীপ্রেমেন্দ্রনাথ রায় 'তার 'সাহিত্যের পথের পাঁচালী' নামক বক্র চিত্রখানি আমরা উপভোগ করিয়াছি, তবুও ও 'তারাপদ'র নীচে পড়িয়া আমরাও ছোট হইয়া গিয়াছি। কিন্তু শরৎবাবু যা নরহত্যাকে ভাল বলিলেন কেন? এ কথাটি একটু 'বেফাঁস' হইয়াছে। তিনি নিজে কবি কালিদাসের মত অজ ও ইন্দুমতীর বিবাহ দিলে আমরা নিশ্চয়ই আপত্তি করিতাম না। কিন্তু মা নরহত্যা, বা কলাপাতা খাওয়ার চেয়ে 'আপনার হাতুয়া পিয়ে' যে ভাষায় হনুমান পিছ আছে, তাহা কখনও সমর্থনযোগ্য। 'ভক্তি অবতারের ঐতিহাসিকত্বে' শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষবাল মন্তব্য করিয়াছেন,—'পুরাণবর্ণিত ভক্তি এক যদি ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং তিনি তাঁহার ভক্তি দ্বারা বিষ্ণুকে বশীভূত করিয়াছিলেন।' তাহা হইলে আর 'মোক্ষনিরূপণবিষয়ে কলহপরি কল্পনায়' ওদিকে ঝুঁকিবার অবকাশ পাইব না? সব চুকিয়া গিয়াছে? শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়ের 'ওজের উদ্ভব' পড়া দরকার। আমেরিকার যাহারা এখনকার সাহিত্যের উন্নতি করিতেছে, তাহারা সাহিত্য করিবার নিজের দেশের ভাষার যৌবন রূপ দেখা যাইতে পারে। শ্রীপ্রাণমোহন সেনগুপ্তের 'এক' একটি পহেলিকা। কবি বলেন,—'অমীমে মাঝার মনে পলাশ টানে।' ইহা নূতন কথা। আমরা এত দিন নলীমের মনে ছিলাম। নিশ্চয়ই কবি তাহাকে প্রমাণের গ্রাসে 'বস্তুগীন' করিবেন। তাহার মুক্তির জন্য বাঙ্গালীরা কি আন্দোলন করিবেন না? ইহা ত পলাটির মনে, খুব একটা সহজ ও সরল গভীর আধ্যাত্মিকতা আছে। আমরা 'ও কথা পড়িতে' পড়িতে খুব মজা পাই। শ্রীকৃষ্ণমোহন সেনের 'মেঘের গান' ভৈরবী রাগে। রাজার নাম

রবীন্দ্রনাথের 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম' সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথও অনেক দিন এমন চক্‌চকে, ঝক্‌ঝকে, শানানো, ধারালো রচনা বাঙ্গালীকে দেন নাই। ইহাতে অনেক কথা আছে। তবে অনেক কথার সামঞ্জস্য বা পূর্ব্বাপর সঙ্গতি পাই নাই। সামাজিক সিদ্ধান্তগুলি 'নানা মুনির নানা মতে'র উৎস। হিন্দুর বিরোধী। সে সম্বন্ধে মতভেদ অনিবার্য্য। কিন্তু রাজনীতিক সিদ্ধান্তগুলি দেশ-কাল-পাত্রের অনুকূল। এ অংশের অনেক কথা বাঙ্গালীর পক্ষে সুপথ্য। 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্মে'র প্রকাশে দেশে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। তাহাও অল্প লাভ নহে। এই সংখ্যায় শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সাংখ্যদর্শনের প্রথম পৈঁটা' হইতে যাত্রারম্ভ করিয়াছেন। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'দাবীর চিঠি'তে mannerism ও চল্‌তী ভাষার 'বক্‌ালে' sublimeকে অভ্যস্ত অনায়াসে ridiculous করিয়া তুলিয়াছেন। ক্ষমতার এমন অপব্যবহার ও প্রতিভার এমত লাঞ্ছনা দেখিবার দুর্ভাগ্য বিধাতা বাঙ্গালীর ললাটে লিখিয়া দিলেন কেন? কবি যেন নির্দ্দয়ভাবে ভাব ও ভাষার তুলো ধুনিয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালায় ত হুতুমী কবির অভাব নাই। ইনি তাহাদের পেশার হন্তারক হইতেছেন কেন? 'বিবিধ প্রসঙ্গ' ভারতির ভাষায় 'হিত, মনোহারি চ'। আমরা প্রত্যেক বাঙ্গালীকে পড়িতে বলি, পড়িয়া ভাবিতে বলি।

নারায়ণ। ভাদ্র। মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'মেদিনীপুর পরিষদে সভাপতির কথা'য় অনেক নূতন কথা শুনিলাম। শাস্ত্রী মহাশয় চিরজীবন ধরিয়া কত সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার ফর্দ্দও শুনিলাম। জ্ঞানের এমন ভাঁড়ার-ঘর বাঙ্গালা দেশে আর কোথায় আছে? ভারতেই বা কই? আমার দেশের কথা এত মমতা করিয়া আর কেই বা কোন দেশে সংগ্রহ করিবে?—কিন্তু ভাবিলে চোখে জল আসে, শাস্ত্রী মহাশয় বক্ষের মত এই 'সাত রাজার ধন' একলা আগলাইয়া রহিলেন। ছিটে-ফোটাও দেশবাসীকে দিলেন না। শাস্ত্রী মহাশয়! আপনি যে ফর্দ্দ দিয়াছেন, তাহার সবই আমরা শুনিতে চাই। আমরা ত হাত ধুইয়া বসিয়া আছি। আমাদের ত কানে বাজিতেছে,—'শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।' আর কবে শুনাইবেন? আপনি 'ফাঁকা দেওড়া'র নিন্দা করিয়া 'ফাঁকা দেওড়া'তেই, যাহা পারিবেন, এবং যাহা পারিয়া উঠিবেন না, তাহারও একটা 'আর' দিয়াছেন।—আমরা বলি, যাহা ইচ্ছা, যেমন ইচ্ছা, তেমনই করিয়া বলুন। আমরা কেবল শুনিতে চাই। 'ভিক্ষায় চাল কাঁড়া কি আঁকাড়া', তাহার বিচার ত করিতেই নাই। এ ক্ষেত্রে সে বিচারের অবকাশও ঘটিবে না, তাহাও আমরা মানি। এখন আমরা হরীতকী হাতে করিয়া বসিব কি? 'হর-মুখ-বিনির্গত' কিছু শুনিবার সৌভাগ্য বাঙ্গালীর ঘটিবে কি? শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'স্বামী' নায়ক গল্পে প্রতিপন্ন হইয়াছে,—'যে আসে লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ!' শুনিলাম, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলিয়াছেন,—'রাম! বাঁচা গেল। আমারও দাদা আছে।' তা তিনি বলিতে পারেন। শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাটি মন্দ নহে। শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের 'সঙ্গভাষা ও বাংলা ভাষা' প্রবন্ধের ভাষা 'নূতন'ও বটে, 'নতুন'ও বটে। লেখক বলেন,—'বাংলার সাধু ভাষাটি কুলেখকের হস্তে প্রাণহীন, আড়ষ্ট, আড়ম্বরগ্রস্ত পণ্ডিতী ভাষা হইয়া উঠিতেছে।' কুলেখকের হস্তে পণ্ডিতী ভাষার কিরূপ দুর্গতি হয়, নলিনীর ভাষায় তাহার পূর্ণ পরিচয় আছে। কিন্তু 'পণ্ডিতী ভাষা' প্রাণ হইতে আরম্ভ করিয়া 'আড়ম্বরগ্রস্ত' পর্য্যন্ত সব, তাহা স্বীকার করিব না। ইনি নূতন

সিদ্ধ অনুস্যূত করিয়া গেল; আবার দৈনন্দিন জীবনকে হুবহু অনুকরণ করেন। 'বাংলার চলিতভঙ্গিমা' প্রভৃতি নলিনীর 'নতুন' সৃষ্টি। আমরা সে দিন চল্‌তী ভাষার প্রধান পাণ্ডা শ্রীপ্রমথ চৌধুরীকে বলিয়াছিলাম,—বাঙালী কি লিখিবে, আগে তাহাই ঠিক কর। তার পর, কোন্ ভাষায় লিখিবে, তাহার বিচার করিও।—ভাষা কি ফরমাইসে চলে? না, যাহার style আছে, সে কাহারও উপদেশে সে style ছাড়ে, ছাড়িতে পারে, অথবা ছাড়িলে সাফল্য লাভ করে? খোদ প্রমথনাথের মত সংস্কৃত ত অনেক পণ্ডিতও চালাইতে পারেন না? 'তাজ-মহল' লিখিবার সময় রবীন্দ্রনাথও ত 'খেয়া'র ভাষায় লেখেন নাই? সব জিনিসের ভাষাও কি 'এক-রকম' হইতে পারে? শক্তিশালী লেখকেরা কি একটা style-এর গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকিতে পারেন? পণ্ডিতেরা কি চল্‌তী ভাষায় লেখেন নাই? বিদ্যাসাগরের 'উপক্রমণিকা' বা 'ব্রজবিলাসে'র ভাষায় শকুন্তলার অনুবাদ চলিত না; সীতার বনবাসের ভাষায় তিনি বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহের বিচার করেন নাই। মদন তর্কালঙ্কার বাসবদত্তার ভাষায় শিশুশিক্ষা লেখেন নাই। শিশুশিক্ষার ভাষাই বঙ্কিমের হাতে পড়িয়া বঙ্কিমী ভাষায় বিবর্ত্তিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগরের বড় গাছ, ছোট পাতাও সেই ভাষা। ভাষারও বিবর্ত্ত আছে। অশ্লীল বা নলিনী, কেহই সে বিবর্ত্তের গতি রুদ্ধ করিতে পারিবেন না। তবে না শিখিয়া যাহারা বাঙ্গালা লেখে, তাহাদের হাতে সকল ভাষারই লাঞ্ছনা হয়। অপপ্রয়োগ সুকুল রচনারীতিরই অপবাদ। বাঙ্গালা ভাষা 'অশিক্ষিতপটুত্বে'র অত্যাচারেই কাবু হইয়া পড়িতেছে। সাধু বা চল্‌তী, যেটা জানো, তাহাতেই লেখো। কিন্তু প্রথমে লিখিবার বস্তুর ও বক্তব্যের সন্ধান কর। আর গুছাইয়া লিখিতে শেখ। শ্রীবিপিনচন্দ্র পালের 'বুদ্ধিমানের কর্ম্ম' রবীন্দ্রনাথের 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্মে'র—প্রতিবাদ বলিবার যো নাই,—আলোচনা। 'বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি'—এখনও সমাপ্ত হয় নাই।

ভারতী। ভাদ্র।—এই সংখ্যার প্রথমেই 'কার্টুনে' এক জন 'খর্ব্ব স্থূলকলেবর' দুই-হাত টাকার মিনারে দাঁড়াইয়া সূর্য্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া হাউই ছুঁড়িতেছেন। দক্ষিণ পার্শ্বে হাইকোর্টের চিত্র।—শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত। 'বুঝ লোক, যে জানো সন্ধান।'—'কার্টুনে'র কল্পনা প্রশংসনীয়। তবে সূক্ষ্মধর্ম্মী বাঙ্গালা দেশের পক্ষে উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যে এইরূপ ব্যঙ্গ-চিত্রের আমদানীর ফলে কি ঘটিবে, তাহা বলা যায় না। শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর 'দণ্ডনীতির প্রথম ইতিহাস' সুসঙ্কলিত সন্দর্ভ। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'টুপি' চলনসই—কিন্তু সুপাঠ্য। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ক্রপটকিনের 'সার্ব্বজনীন কল্যাণ' সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। ভাষায় জড়তা আছে। লেখক প্রাঞ্জল করিবার জন্য চল্‌তী ভাষার প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু তুরূহ সংস্কৃত শব্দেরও অভাব নাই। বোধ হয়, 'হালে পানী' পান নাই। রচনারীতি আয়ত্ত না হইলে, পরিপাক করিয়া লিখিবার অভ্যাস না হইলে, শুধু চল্‌তী ভাষায় কুলায় না। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকারের 'বংশানুক্রমের গোড়ার কথা' এক বিন্দু। বিষয়টি সময়োপযোগী। শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী 'পূজা' কবিতায় বলিয়াছেন,—

'দুঃখ এ যে চিরমৌন, কোথায় ভাষা তার!'

ওই জন্যই কি এই শ্রেণীর কবিতার ভাষা এত নিষ্ফল হয়? শ্রীমতী রেণু রায় ওয়াই

[illegible] অপরূপ সহজ সুরে [illegible]। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ইন্দ্রোৎসব-বিলাস' নামটিতে যে [illegible] আছে, কবিতায় কবি যেন তাহাকে ভাষা চাইয়াছেন। একটি চরণ, বা চরণাংশ [illegible] ভুলিবারও কবি পথ রাখেন নাই।—এইরূপ,—'ফুরতৎ নেই নাম নেই, বস্তু!' [illegible] নিশ্চয়ই আছে, নহিলে মিথিলে কেমন করিয়া? কিন্তু বস্তু, যাহাদের 'ফুরন্থৎ' [illegible] বেশী যে, তাহারা বার্ষিক তিন টাকা ছয় আনা মিছা ধরা পড়িতেছে বলিয়া এইরূপ [illegible] অসহায় পড়িবে। রবীন্দ্রনাথের 'ওগুার ইন্ডিয়া' 'ভারতী'তেও ছাপা হইতেছে। [illegible] নামের গান'—যেন যেন নন্দিত করি' চন্দ্রী ভাষায় বিশ্বকে বিশ্ব আহ্বান।

"নূতন-যুগ-সূর্য উঠিল, ছুটিল তিমির রাত্রি,
তব মন্দির-অঙ্গন ভরি মিলিল নবল যাত্রী।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই?
গত গৌরব, লুপ্ত আসন, নতমস্তক লাজে,
শুনি তাঁর যোচন কর, বসেছ যারে
স্থান দাও, স্থান দাও, দাও দাও স্থান হে,
জাগ্রত ভগবান হে, জাগ্রত ভগবান।

যেনগণপথ তব প্রাঙ্গণতলমুখর আজি,
পুলকিত করি দিগ্বিগন্ত উঠিল বন্দ বাজি।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই?
দৈন্যজীর্ণ কক্ষ তার, মলিন দীর্ণ আশা,
ম্লান নত চিত্ত তার, নাহি নাহি ভাষা,
কৌটিলেনকণ্ঠপূর্ণ বাণী কর দান হে,
জাগ্রত ভগবান হে, জাগ্রত ভগবান।"

[illegible] চৌধুরী এও কোং কি বলেন? চন্দ্রী ভাষায় 'চন্দ্রী চাকী' চলিতে পারে, [illegible] চলে না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাহা স্বীকার করিলেন। অন্ততঃ তাঁহার প্রতিভা [illegible] তাহার চলতী ভাষায় বিকল্পেই সাক্ষ্য দিতেছে।—ইহার 'দিন আগত ঐ, তবু ভারত তবু' এই ধুয়ার অর্থ ইংরেজী অনুবাদ পড়িয়া বুঝিতে হয়। ইহাতে উদ্দীপনা আছে, কিন্তু [illegible] বিশ্বাস-সূর্য-করোজ্জ্বল ধরণীর অপূর্ব ঝলকও নাই, বস্তুসমীক্ষার কৌতুহলও নাই। [illegible] অনুপ্রাণিত নাই। 'বিশ্বযাত্রীর পুলপুরুষ' উল্লেখযোগ্য। 'যাস-বাবাজীর' [illegible] যদি এ [illegible] যদের সাধকগণের সাহায্য করিবে।

স্বাস্থ্য-সমাচার। ভাদ্র।—ডাক্তার শ্রীরাধাগোবিন্দ নাগের 'কথা মোদে [illegible] অনেক জানিবার ও শিখিবার কথা আছে। এ সকল কথা জানি না, এবং [illegible] আমরা প্রায়ই 'আধাখেঁচড়ে' পড়ি। কোন রোগের নিদর্শন কিরূপ, তাহা জানা থাকি [illegible] রোগীরও নিজের দুইবেরও হবিধা। [illegible] শ্রীরাধাগোবিন্দ নাগের [illegible] পাবে [illegible]

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা' প্রবন্ধে অনেক তথ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রবন্ধটি এখনও শেষ হয় নাই। বিশেষজ্ঞ লেখকগণ কলম ধরিলে এইরূপ অনেক নূতন তথ্য জানা যায়। 'পল্লীর-চর্চ্চা' যত প্রবল অধিকমাত্রায় প্রকাশিত হইলে ভাল হয়।

গৃহস্থ। শ্রাবণ। বহু দিন পরে 'গৃহস্থ' পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। বাঙ্গালী যদি 'গৃহস্থে'র জীবন রক্ষা করিতে না পারে, তাহা হইলে, বাঙ্গালীকে দুর্ভাগ্য ভাবিবার কারণ ঘটিবে। এবারকার 'আলোচনা'য় 'পল্লী-সেবার আয়োজনে' অনেক সুপরামর্শ আছে। পল্লীই বাঙ্গালার প্রাণ। পল্লীর দুর্দ্দশার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর অধঃপাত হইয়াছে; বাঙ্গালীর জীবনীশক্তি কমিতেছে। পল্লী রক্ষা না করিলে আমরা আত্মরক্ষা করিতে পারিব না। গৃহস্থ তদবধি পল্লীসেবার পথে বাঙ্গালীকে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সুখের বিষয়, 'গৃহস্থে'র চেষ্টা সার্থক হইয়াছে;—'কয়েক স্থানে আমাদের ['গৃহস্থে'র] আদর্শানুযায়ী কাজ আরম্ভ হইয়াছে ও কিছু সুফলও পাওয়া গিয়াছে।' 'পল্লীসেবার সদুপায়' গ্রামে গ্রামে অনুসৃত হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা। 'আমাদের শিক্ষা' ও 'সর্ব্বশাস্ত্রের ইতিহাস' উল্লেখ-যোগ্য। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুহ 'কচু' নামক প্রবন্ধে কচুর নানা জাতির ও নানা তথ্যের পরিচয় দিয়াছেন। 'নিজামপুর-পরগণার বিবরণ' বার্ত্তাপত্রের আলোচনাকারীদের উপকারে আসিবে। 'মনসামঙ্গলের বাণী'তে 'সুরমা' হইতে কোনও বাঙ্গালী সৈনিকের জননীর এক পত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা সকলকে তাহা পড়িতে বলি।—যুগধর্ম্মের প্রভাব কে অতিক্রম করিবে? বাৎস্যায়ন তাঁহার 'সূত্রে' কত শত বৎসর পূর্ব্বে যে বঙ্গাঙ্গনাকে 'কোমলা' বলিয়া গিয়াছেন, এবং আজও যে বঙ্গনারী 'অবলা' বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ, সেই বঙ্গনারীকে যিনি এই মনোবলের আধার করিয়াছেন, তাঁহার কৃপায় এই যুগধর্ম্ম সাফল্য লাভ করুক, বাঙ্গালী ধন্য হউক।

ভ্রম-সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৮২	৬	Chateaw	Chateau
"	২৩ ও ২৭	হাঙ্গা	ছাঙ্গা
৩৮৪	১০	-ভবনের	-ভবনের প্রতিকৃতি রাখিয়া
"	২১	সার্ফার্থার	সাফার্থার
৩৮৫	২৩	"মান—"	জাভ—
"	২৪	"অটম"	"অটল"
৩৮৬	১	রীতীর	রীতির
৩৮৮	১৩	architran	architrave
"	১৮	cornia	cornice
৩৮৯	৭	Fugussun	Fergusson
"	৯	উপল	পাপন